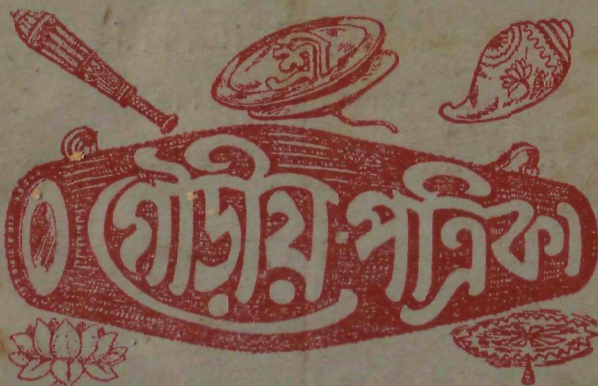


শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জন্মত:



৪র্থ বর্ষ

}

চৈত্র ১৩৫৮

{

১য় সংখ্যা



সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

সম্পাদক—ত্রিদিবস্বামী শ্রীশ্রীগদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম, এ, বি, এল্

পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন

পণ্ডিত শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্তৃক শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া

(হুগলী) হইতে প্রকাশিত ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অতিথি-সংকার	৬২২০, ৭২৬১, ৮২৯৯
২। অন্নকূট-মহোৎসব	১০।৩৭২
৩। অম্বরীষ-রাজার উপাখ্যান	১০।৩৮৯
৪। আত্মানুসন্ধান	১০।৩৯৪
৫। আমাদের কর্তব্য	৬২৩৫
৬। আশি কে ?	৪।১৪৮
৭। আর্তি-স্তবরাজঃ—(শ্রীল প্রভুপাদস্ব তিরোভাব-তিথৌ)	১০।৩৮৫
৮। আসাম-প্রদেশে প্রচার—[গোলোকগঞ্জ, ধুবড়ী, মাপটগ্রাম, অভয়াপুরী, ভাটপাড়া, বঙ্গাইগাঁও, মলিগাঁও, বাঁশবাড়ী, গোহাটী প্রভৃতি স্থানে]	৪।১৫৮
উপদেশানুতম—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৫।১৬১
উপদেশানুতমের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬৩
একাত্তী বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য [পত্]	৩।১০৫
কাম্বীর কাণাকড়ি [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।১৬৫
কৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা—শ্রী [পত্]	৫।১৭৮
কৃষ্ণ-নামাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৩।৮১
কৃষ্ণ-নামাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৩।৮৩
‘কৃষ্ণ-সংহিতা’-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৮
কৈদার-বদ্রী-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	৫।১৯৩
কেশবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৬২০১
কেশবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৬২০৩
২০। ক্রোধের কুফল ও তাহার সম্বরণোপায় [পত্]	১।১০
২১। গুরু-কৃপা হি কেবলম্ [বন্দনা ও প্রার্থনামূলক—পত্]	১১।৪৩২
২২। গুরু-গোরাঙ্গ-চরণে প্রার্থনা—শ্রীশ্রী [পত্]	৬২১৩
২৩। গুরুদাস [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২৪
২৪। গুরু-পাদপদ্মে শরণাগতি—শ্রী [পত্]	৭২৬৯
২৫। গুরুপূজা-প্রশস্তি—শ্রীশ্রী [শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে]	১২১, ৩।১০৬
২৬। গোবিন্দ-স্তোত্র—শ্রীশ্রী [পত্]	৮২৯৩, ৯৩৪১
২৭। গৌরকৃষ্ণ—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৭
২৮। গৌর-জন্মোৎসব—এলাহাবাদে শ্রী	২।৭৯
২৯। গৌরভক্তের মহিমা—শ্রী [পত্]	১।২৭

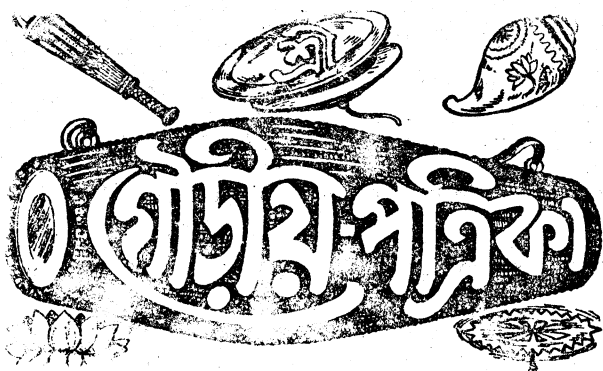
৩০।	গৌরাদ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৩
৩১।	চিত্রকেন্দ্রের উপাখ্যান	৭।২৭১
৩২।	চুচুড়ায় প্রচার [দে-পাড়ার হরিসভায় গুরু-মহারাজের ভাগবত পাঠ]	৩।১১৮
৩৩।	চৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত বাণী—শ্রী	৩।২১
৩৪।	জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রী	৫।১২২
৩৫।	জন্মাষ্টমী-উৎসব—শ্রীশ্রী	৮।৩১৪
৩৬।	জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার—শ্রী [সমালোচনা]	৭।২৭৪
৩৭।	জয়তীর্থ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৬
৩৮।	জ্ঞানকথা	২।৩৩২, ১০।৩৭৬
৩৯।	ঠাকুর নরহরি—শ্রীল [পত]	১২।৪৬৫
৪০।	তটস্থ-ধর্মবশতঃ জীব মায়া-কবলিত	৮।৩১৪
৪১।	ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধানাথ দাসাদিকারী ও শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধবের]	২।৭৭
৪২।	দীনদয়াল প্রভুর প্রবন্ধ— পরলোকগত শ্রীপাদ [শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক তারণের চেষ্টা]	২।৬২, ৬২২
৪৩।	দীনের নিবেদন—[শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-চরণে—পত]	৩।২
৪৪।	দীনের পত-প্রস্থনাঞ্জলি—জগদগুরু [নিতানীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অষ্ট-সপ্ততিতম শুভ প্রকট-বাসরে]	২।৫
৪৫।	দীনের প্রার্থনা—[শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অষ্ট- সপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে—পত]	৪।১৮
৪৬।	দুই বন্ধুর আলাপ	৩।১১১, ১০।৩৮
৪৭।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মাষ্টমী—শ্রী	২।১
৪৮।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমার আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমা-উৎসব-পঞ্জীসহ]	১২।৪৬৩-
৪৯।	নবদ্বীপ-স্তোত্রম্—শ্রীমন্ [শ্রীশ্রীমদ-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১
৫০।	নবদ্বীপ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ	২
৫১।	নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা—শ্রীল [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।
৫২।	নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১
৫৩।	নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক-তারণের চেষ্টা—শ্রীমন্	২।৬২, ৬।২
৫৪।	নিবেদন [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১
৫৫।	‘নিবেদন’—কি নিগোপন [সমালোচনা]	৭।২
৫৬।	নিয়ামক-মহারাজের বক্তৃতা [আচার্য্য প্রবরের প্রকট-বাসরে]	২
৫৭।	নিয়ামক-মহারাজের হরিকথা [মথুরা পরিক্রমার প্রথম দিবসে]	১
৫৮।	নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—প্রথম দর্শন [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২
	দ্বিতীয় দর্শন ৮।২৮৫, তৃতীয় দর্শন ২।৭	
৫৯।	নৃসিংহ-স্তবঃ—শ্রী [শ্রীল-শ্রীধরস্বামি-বিরচিতঃ]	২
৬০।	নৃসিংহ-স্তবের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১১। ঐক্যোপাসনা [শ্রীল প্রভুপাদ]	১১।৪০৪
১২। পতিতের আশা [পদ্ম]	৫।১২১
১৩। পরাদর ও পরনিন্দা	১।১৪, ২।৫২, ৩।২৬
১৪। প্রপত্তি-প্রস্থনাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অষ্ট- সপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে	৪।১৪৫
১৫। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৭, ৭।২৪৮, ৮।২৮২, ৯।৩২৭, ১০।৩৬২, ১১।৪০৮, ১২।৪৪৬
১৬। প্রশ্ন ও উত্তর [ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]— ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে—	৩।৮২
” ” ” ” ” ‘শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা’-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে—	২।৪৮
১৭। বদরিকাশ্রম পরিক্রমা—শ্রী	২।৩৫৭, ১১।৪৩৭, ১২।৫৪৮
১৮। বদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্—শ্রী শ্রী [শ্রীবেদবাস-বিলিখিতম্] অগ্নিকৃতম্	২।৩২১, মার্কঃগুরুতম্ ১০।৩৬১, গরুড়কৃতম্ ১১।৪০১, শিবকৃতম্ ১২।৪৪১
১৯। বদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ-শ্রীশ্রী-অগ্নিকৃত	২।৩২৩, মার্কগোকৃত ১০।৩৬৩, গরুড়কৃত ১১।৪০৩, শিবকৃত ১২।৪৪২
২০। বদ্রীনারায়ণ পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পত্র—শ্রী শ্রী [নিয়মাবলীসহ]	৬।২৩৮
২১। বর্তমান জগৎ	২।৩৪৭
২২। বর্তমান সমাজের আচার	১০।৩৮৭
২৩। বর্ষ-পরীক্ষা [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪৪৩
২৪। বর্ষ-বিদায় বা বেদান্ত (?)	১২।৪৭২
২৫। বলদেব বাক্যের অমুসরণ ও গুরুবাক্য - (৬) শ্রী [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধবিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৭।২৭৪
২৬। বিরহ-বিজ্ঞপ্তি—জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের ষোড়শ-বার্ষিক অপ্রকট-তিথিতে	১১।৪১৫
২৭। বিশুদ্ধ শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ততা [সমালোচনা]	২।৩৫৫
২৮। বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা	১।৪০, ২।৭২, ৩।১২০, ৪।১৫৪, ৫।২০০, ৬।২৪০, ৮।৩১২, ৯।৩৬০, ১০।৪০০, ১১।৪৪০, ১২।৪৭৩
২৯। বেদ-বর্ষ	১।৩৩
৩০। ব্যাসপূজা-পদ্ধতি:—শ্রীশ্রী [শ্রীল প্রভুপাদেন সংগৃহীতা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর রং সংশোধিতা পরিবর্দ্ধিতা চ]	৩।১১৭
৩১। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১।৩৫
৩২। ব্যাসপূজার আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	১১।৪২৪
৩৩। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউজ্জ্বল-৮৪ ক্রোশ শ্রী	১।২৮, ২।৬৭, ৪।১৫৪, ৫।১২৪, ৮।৩১৫
৩৪। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি?—প্রশ্ন ও উত্তর [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৮২
৩৫। ভক্তিকথা	১।১৭, ২।৫৫, ৪।১৩২, ৫।১৮০, ৬।২১৫, ৭।২৫৭, ৮।২২৫

- ৮৬। ভক্তি-তরঙ্গিণী—শ্রী [পত্ৰ] ভক্তি-মহিমা ৭১২৫৫, ভক্তিশাস্ত্র-মহিমা ৮১৩০৭, ৯১৩০০, ভক্তিবশ ভগবন্-মহিমা ১১১৪১২, ভক্তিসাধক ভক্ত-মহিমা ১২১৪৪৭
- ৮৭। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে ৪১১৭২
- ৮৮। ভক্তির অধিকারী কে ? ৪১১৩৬, ১০৫
- ৮৯। ভক্তি-সিদ্ধান্ত [শ্রীল প্রভুপাদ] ১১২০৪
- ৯০। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষোড়শ-বার্ষিক বিরহ-উৎসব—জন্মদুগ্ধ শ্রীমদ্ ১০১৩৯৯
- ৯১। ভক্ত্যুপহৃত দুর্বাদল—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-বাসরে [পত্ৰ] ১০১৩৭৩
- ৯২। ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির উপায় ৯১৩৫০
- ৯৩। ভগবান্ ভক্ত-বৎসল ১২১৪৫৫
- ৯৪। ভবিষ্য [পত্ৰ] ৪১১৪১
- ৯৫। ভাবী গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন ৮১২৯২
- ৯৬। ব্রহ্মবাত্রা-মহোৎসব—শ্রীপুরীধামে ৪১১৫৭
- ৯৭। রাধাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্] ৭১২৪১
- ৯৮। রাধাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী ৭১২৪৩
- ৯৯। রামানুজাচার্যের উপদেশ—শ্রী ১১১৪২৫
- ১০০। রিপূর বশে [পত্ৰ] ২১৬
- ১০১। রুক্মিণী ও ভীষ্মক-রাজার উপাখ্যান ১১১১৭
- ১০২। শচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্] ৮১২৮১
- ১০৩। শচীনন্দন-বিজয়াষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী ৮১২৮৩
- ১০৪। শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [কলিযুগ-পাবনাবতারী-শ্রীশ্রীমৎ-কৃষ্ণচৈতন্য-বদনাজ-বিগলিত-বাক্যবেদম্] ৪১১২১
- ১০৫। শিক্ষাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী ৪১১২২
- ১০৬। সনাতন গোস্বামী—শ্রীশ্রীল ৬১২৩১, ৭১২৬৫, ৮১৩০৭, ৯১৩৩৬, ১০১৩৮০, ১২১৪৫১
- ১০৭। সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল প্রভুপাদের (ষোড়শ-বার্ষিক) বিরহ-বাসরে ১১১৪৩৪, ১২১৪৬৭
- ১০৮। সুনীতি ও দুর্নীতি [শ্রীল প্রভুপাদ] ১০১৩৬৫
- ১০৯। 'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা ১১১৪২৩
- ১১০। স্মার্তমত ও বৈষ্ণবমত ৯১৩৪২, ১১১৪২৮
- ১১১। হরি-পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি—শ্রীশ্রী [পত্ৰ] ৬১২২৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরালো জয়ত:

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্বশ্চ ॥

অত্র ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম

৪র্থ বর্ষ

প্রদ্ব্যন্ন, ৩০ গোবিন্দ, ৪৬৫ গৌরান্দ
মঙ্গলবার, ২৭ ফাল্গুন, ১৩৫৮; ইং ১১।৩।৫২

১ম সংখ্যা

শ্রীমন্নবদীপ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগৌড়দেশে সুর-দীর্ঘিকায়া-
স্তীরেহতি-রম্যে ইহ পুণ্যমধ্যাঃ ।
লসন্তুমানন্দভরণে নিত্যং
তং শ্রীনবদীপমহং স্মরামি ॥১॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ
কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি ।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জগা-
ন্তং শ্রীনবদীপমহং স্মরামি ॥২॥

যঃ সর্বব দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ স্নানীতৈ-
নানাদ্রমৈঃ স্ন-পবনৈঃ পরিতঃ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্ন-বিহার পাট্রে-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৩॥

বিছা-দয়া-ক্ষান্তি-মথৈঃ সমস্তৈঃ
সদ্বিগ্ধ গৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তু যমানা ঋষি-দেব-সিক্কে-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৬॥

শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ
স্ববর্ণ-সোপান-নিবন্ধ-তীরা।
ব্যাপ্তোন্মিভি-র্গে ঐরবগাহ মযে
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৪॥

যশ্রান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্ত
স্বানন্দ গম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌর-জন্মাদিক-লীলয়াঢ্য-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৫॥

মহান্ত্যনন্ত্যনি গৃহাণি যত্র
স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রী-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৫॥

গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ
সঙ্কীর্তন প্রেমভরেণ সর্ববম্।
নিমজ্জ্য ত্যুজ্জ্বল-ভাব-সিক্কৌ
তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৮॥

এতন্নবদ্বীপ বিচিস্তনাঢ্যং
পছাফটকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছটানন্দন পাদপদ্মে
সুহৃৎ ভং প্রেমমবাপুয়াৎ সঃ ॥৯॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্য-তটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে
বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে স্মরণ করিতেছি ॥১॥

যাহাকে কেহ কেহ ‘পরবোম’, কেহ কেহ ‘গোলোক’ এবং তত্ত্বজ্ঞগণ
‘বৃন্দাবন’ বলিয়া জ্ঞানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥২॥

যে-স্থান নিরন্তর চতুর্দিকে প্রকাশমান স্তম্ভময় সূর্য্যতল পবন-পরিচালিত
নানা-বৃক্ষে শোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারে সুষোগ দান করে,
সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করি ॥৩॥

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপ্তান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥৪॥

যেখানে সুবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠগৃহ বর্ত্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥৫॥

যেখানে লোকসকল বিद्या, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত সদগুণে বিভূষিত, ঋষি, দেবতা, সিদ্ধগণও যাহাকে স্তুতি করেন, সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥৬॥

যাহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদি-লীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দ-লভ্য শ্রীপুষ্কন্দর মিশ্র গৃহ বর্ত্তমান, সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥৭॥

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করতঃ সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল-ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥৮॥

যিনি শ্রীতমনে এই নবদ্বীপ-ধামের সূচিন্তা-পূর্ণ পদ্মাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সূচলভ প্রেম লাভ করেন ॥৯॥

শ্রীগোরাঙ্গ

শ্রীগোরাঙ্গ—সর্বশক্তিমান ও মায়াভীত

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দই শ্রীগোরাঙ্গ। শ্রীগোরাঙ্গকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি-সৃষ্ট বস্তু কালক্ষুর, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবধ্য। শ্রীগৌর নিত্য, শক্তিমান ও বৈকুণ্ঠ! পাঠক। গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।

কাল্পনিক গোরাঙ্গ-বাদেন শিলাস

শ্রীকৃপাসুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর অভক্তি-মার্গাপ্রিত অথের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে বা কেহ-মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন কবিলে, তাদৃশ অভক্তের করনার আশুগত্যকে বিজাতীয়-জ্ঞানে শুদ্ধ ভক্তগণ ত্যাগ করেন। শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটা ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকটিত আছে। এক বঙ্গদেশীয়

বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ কিরূপে বিফল করেন—নিম্নোক্ত পংক্তি কয়েকটী সেই কথার প্রমাণ করিবে।

উক্ত কাল্পনিক মতবাদের নিরাস-কল্পে যদ্বা-তদ্বা কবির দৃষ্টান্ত

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।

নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫১২ঃ)

সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম'।

স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন ॥২৪,২২॥

স্বরূপ কহে,—“তুমি 'গোপ' পরম-উদার।

যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥

'যদ্বা-তদ্বা'-কবির বাক্যে হয় 'রসাতাস'।

সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥

'রস,' 'রসাতাস' যার নাহিক বিচার।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিদ্ধি নাহি পায় পার ॥১০১-১০৩॥

গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।

'বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ' ॥

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।

শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ" ॥১০৭-১০৮॥

কবি কহে, “জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।

চৈতন্য-গোসাঞি শরীরী মহাদীর" ॥১১৪॥

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।

দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন ॥

“আরে মুখ, আপনার কৈলি সর্বনাশ!

দুই ত' দ্বিধা-রং-তোর নাকিহ বিশ্বাস ॥১১৬-১১৭॥

দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!

অতদ্বজ্জ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি ॥১২০॥

শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিষয়।

হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥১২২॥

“যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥১৩১॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ' ।

তবে জানিব সিদ্ধান্ত-সমুদ্রে-তরঙ্গ" ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩২)

সেই কবি সর্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে ।

গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে ॥ ১৫৮ ॥

প্রাকৃত কবির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তের আশ্রয় কর্তব্য

গৌরভক্ত-সমাজে এই পূর্ববঙ্গবাসী কবির ছায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাহাদের অছায় আচরণ গৌরভক্তি নাহি জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ-জন প্রেরণ করেন । সেই শুদ্ধ-ভক্তি-স্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা

শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ প্রভু সবিনয়ে যুগ্মকরে সदैগ্ধে বলিলেন—
গৌর-কান্তিদারী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামক কৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার । গৌরাঙ্গ মহাবদাত্ত এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা । এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি—এই গৌর-বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণের ছায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট নহেন, তিনি গৌরস্বিট্ । তাঁহার নাম—**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** ।

"শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ।"

(চরিতামৃত আদি, ৩য় পরি, ৩৪ সংখ্যা)

'কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে ।

অথবা কৃষ্ণকে তিহৌ বর্ণে নিজ হুখে ॥

দেহ-কান্ত্যে হয় তিহৌ অকৃষ্ণ-বরণ ।

অকৃষ্ণ-বরণে তাঁর কহে পীত-বরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।৫৩ ৫৬)

শ্রীগৌরাঙ্গের গণ—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা

পাঠক ! শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাম' ও 'রূপ' জানিলেন । এক্ষণে তাঁহার 'গুণ' অবগত করুন । তিনি মহাবদাত্ত । মাধুধ্যারসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুধ্যারসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়া-গুণধর । পাত্ৰাপাত্ৰ বিচার না করিয়া স্বচ্ছন্দে কৃষ্ণ-মাধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন । লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুদ্র, আগমাপায়ী বস্তু প্রদান করে ; গৌরহরি-তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় নিত্য-কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ।

“চৈতন্তচন্দ্রের দয়া করহ প্ৰচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥”

অগ্ৰাণু দাতৃবর্গের দানসমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গোরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। একরূপ গুণধর পুরুষগৌর দাতৃ-শক্তির তুলনায় চতুর্দশ-ভুবনই বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—অপরের দয়ায় ‘মন্দ’ উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া ‘অমন্দোদয়া রূপা’ অর্থাৎ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। ফলু চতুর্বর্গ-প্রদায়িনী দয়া গৌররূপার নিকট তুলনা হয় না। যিনি কৃষ্ণভক্তিরূপা পৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ বিপাকক্রমে ভ্রমময় মার্গে বিচরণ করেন, তিনি ভক্তিবিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়। অধনে ধনজ্ঞানে যত্ন করিয়া যিনি গৌরসেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্ম-বঞ্চক কখনই প্রেমরত্ন লাভে কৃতকার্য হন না। শ্রীগৌরের নাম—কৃষ্ণচৈতন্ত, গৌরের রূপ—শ্রীগৌরাজ, গৌরের গুণ—মহা-রূপাময়।

শ্রীগৌরের লীলা—কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচার

এক্ষণে গৌরলীলার কথা শুদ্ধন। তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আশ্বাদন করিবার উদ্দেশে কৃষ্ণভক্ত ; বদান্ত-গুণে কৃষ্ণ ভক্তির প্রচারক। সেব্য বস্তু হইলেও সেবক হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারই তাঁহার লীলা। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটিতে যেকোন পদার্থের ভেদ প্রাকৃত বস্তু-মাত্রে আছে, অপ্ৰাকৃত শ্রীগৌরসুন্দর অদয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া তাঁহাতেও এই চারিটি অভিন্নভাবে অবস্থিত। অত্নের মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহই পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পারিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে।

শ্রীরূপানুগত্যই সকল মঙ্গলের আকর

শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্ত-নাম—‘সম্বন্ধ’, গৌররূপা কৃষ্ণভক্তি—‘অভিধেয়’ ও গৌর-দেয় কৃষ্ণপ্রেম—‘প্রয়োজন’। ভগবদ্-‘রূপ’-বিমুখ হইলে জীব নির্বিশেষ মায়াবাদ বা মায়া-শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া গৌর-বিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ-পথ ত্যাগ করিয়া বাউল, কর্ত্তাভজ্ঞা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরীভজ্ঞা, সহজিয়া, জ্ঞানিবৈষ্ণব, গোঁসাই, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অদ্বৈত মতবাদ-বিষয়ের অন্তরালে উদ্ভিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি প্রচারের সর্বপ্রধান সহায়

শ্রীকৃপ-গোস্থামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন—সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃপকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।

শ্রীকৃপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারাই একমাত্র সাধুসঙ্গ ও শ্রীগৌরানন্দ-তত্ত্ব জানিবার পথ

সাধনভক্তির মূল বস্তু শ্রদ্ধা, ভাবভক্তির মূল বস্তু রতি, প্রেমভক্তির মূল বস্তু রস, ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থানে লক্ষ্য করিতে শুলিবেন না। শ্রীগৌর-উপদিষ্ট শ্রীকৃপের কাথত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ ভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমত শ্রীকৃপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ-ভক্তিমাগে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীকৃপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্ত ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিথিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়িক বুদ্ধির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

— শ্রীল প্রভুপাদ

নিবেদন

হরিশক্তিই শ্রীপত্রিকার জীবন

শ্রীপত্রিকার প্রতিজ্ঞা এই যে, কোন-সময়েই পরমার্থ-তত্ত্ব ব্যতীত আর কোন বিষয়ের আলোচনা করিবেন না। এই জগতে জড় বিষয় লইয়া অত্যাঁত পত্রিকা-সকল সর্বদা আলোচনা করেন, কিন্তু সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) হরিকথা, হরিতত্ত্ব, আত্ম-সম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করেন না। স্বতরাং হরিশক্তিই এই পত্রিকার জীবন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে-স্থলে বিশুদ্ধ হরিশক্তির সহায়, সেই স্থলেই এই পত্রিকায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চর্চা হয়।

পত্রিকা-প্রকাশে পূর্বাচার্য্যবর্গের অনুসরণ

ভক্তগণের জীবন ও হরিলীলা বর্ণন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। হরিলীলা-বর্ণনেও দুই প্রকার প্রবৃত্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ-ভক্তিপ্রাবিত হরিলীলা-বর্ণন-প্রবৃত্তি (১) এবং যে-কোন ভাবেই ইউক হরিনাম ইত্যাদির গান-প্রবৃত্তি (২)। এই পত্রিকায় বিশুদ্ধ-ভক্তি প্রাবিত হরিকথার প্রবৃত্তি আছে। হরিকথা বলিয়া ভক্তিবিরোধী

ভোগ-মোক্ষের স্হায়স্বরূপ মায়াবাদাদি দুই মতের প্রশংসা দেওয়া এই পত্রিকার অভিপ্রায় নয়। পূর্বে পূর্বে মহামুভবগণ যেরূপ বিশুদ্ধ-হরিভক্তির বর্ণনা করিয়াছেন; আধুনিক লোকগণ সেরূপ করেন না। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীহরি-ভক্তিরসাস্বত প্রভৃতি উপায়ে গ্রন্থে যেরূপ বিশুদ্ধ-ভক্তির আবির্ভাব দেখা যায়, সেরূপ আর আধুনিক লোকদিগের রচনায় দেখা যায় না। আমরা এইজন্যই এই পত্রিকায় পূর্বে-মহাজনদিগের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি (স্তোত্র ও প্রবন্ধাবলী) প্রকাশ করিয়া থাকি। তাঁহাদের রচনা পাঠে শুদ্ধবুদ্ধি-ব্যক্তিদিগের বিশুদ্ধ-ভক্তি উদিত হয়।

পাঠকের সুবিধার জন্ত সংস্কৃত শ্লোক ও টীকার সর্বত্র বঙ্গানুবাদ দেওয়া শ্রীপত্রিকার বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত-ভাষায় সকলের প্রবেশ নাই বলিয়া আমরা সঙ্গ-সঙ্গে বঙ্গানুবাদ দিয়া থাকি। সেই অনুবাদের সাহায্যে সকলেই গ্রন্থের রস আন্বাদন করিতে পারেন। সে-সব গ্রন্থ অল্পত মুদ্রিত হইয়া থাকিলেও, আমরা কয়েকটি কারণে তাহাদের পুনর্মুদ্রাক্ষণে প্রবৃত্ত হই। সংস্কৃত শ্লোকের টীকাই জীবন। পূর্বে যে-সকল টীকা ছাপা হয় নাই, তাহা আমরা গ্রন্থের সহিত দিয়া থাকি। নূতন টীকাহুমারে বঙ্গানুবাদ দিয়া থাকি। ভক্তি-রসিকগণ ইহার জন্ত সর্বদা আমাদেরকে শ্রবণ করিয়া থাকেন।

মূল গ্রন্থের নূতন টীকা ও ব্যাখ্যার আবশ্যকতা

কাহারও মনে একরূপ হয়, যে কোন একটি টীকা ও মূল যাহা পূর্বে ছাপা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই হইতে পারে, আবার নূতন-টীকার প্রয়োজন, কি? একথার যে উত্তর আছে, তাহা ভক্তিরসিক বাতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। শুদ্ধভক্তিগণ মহাজন-কৃত ভক্তি-গ্রন্থগুলিকে মধুচক্র বলিয়া জানেন। সেই-সকল মধুচক্র যতপ্রকার নূতনভাবে নিকটবর্তী হয়, ততই নূতন নূতন রসের উদয় হয়। এইজন্য শ্রীশুকদেব ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, হে রসিকগণ! হে ভাবুকগণ! এই ভাগবত-গ্রন্থ রস-স্বরূপ, ইহাকে মুহূর্ষু আন্বাদন কর। তাৎপর্য এই যে, হরিলীলা মধুময়। বারবার যত আন্বাদন করিবে, ততই মধুর মাধুর্য আন্বাদন করিতে পারিবে। তদ্রসামৃত-তৃপ্ত-ব্যক্তির অল্প বস্তুতে রতি হয় না।

রসিকের লক্ষণ ও রসোদ্দীপক গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা

রসিকের লক্ষণ এই যে, তিনি রসকে কখনই ত্যাগ করেন না। যিনি যে রসের রসিক, তিনি সেই রসেই মগ্ন। আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গ প্রভু অনেকবার চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিয়াও প্রতি-

দিবসই রসিকদিগের সহিত ঐ সকল গ্রন্থ আশ্বাদন করিতেন। আমরাও এই পত্রিকায় আমাদের রসিক পাঠকদিগের সুখ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ঐসকল গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত করিব। যেরূপ একবার পাঠ করিলেই তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ অহরহঃ পাঠ না করিলে সুখ পাওয়া যায় না। যে-সকল সংবাদপত্র প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের সুখ বিধান করেন, তাঁহারা জড় বিষয়ে বিচিত্র নূতন কথা বলিতে পারেন। হরিকথা সেরূপ নয়। হরিকথা কখনই পুরাতন হয় না। যতবার বলা যায় বা শুনা যায়, ততই রসের উদয় হয়।

নিজ রচনা অপেক্ষা মহাজনগণের রচনা প্রকাশের মাহাত্ম্য বর্ণন

হে পাঠকবর্গ! যদি হরিকথায় রতি থাকে, তবে ‘মহাজনগণের বর্ণনা’ পুনঃ পুনঃ আশ্বাদন করুন। এই পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রতি সংখ্যায় পূর্ব-মহাজনকৃত ভক্তিরস বর্ণন ও দ্বিধাস্ত এক এক কক্ষা প্রকাশ করা উচিত্ত বোধ করি। খোসগল্প যেস্থলে নাই, সেস্থলে পরমার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পূর্ব-রচনা কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। এই সংসার খোসগল্পময়। ইহার মধ্যে সজ্জন-তোষণীর (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার) স্বল্লাক্ষ্যে যে হরিভক্তি-তত্ত্ব ও লীলা-বর্ণন পাওয়া যায়, তাহা আশ্বাদনে পরাজুখ হইবেন না। আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব সাধুদিগের রচনা এবিষয়ে অধিক আদৃত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

নিজ ও নবীন রচনা অপেক্ষা মহাজনবর্গের রচনাই মঙ্গলপ্রদ

আর এক কথা এই—যাঁহারা কেবল কিছু রচনা পড়িলেই সুখ পান, তাহাদিগের পক্ষে পূর্ব-সাধুদিগের ভক্তিপূর্ণ রচনা পড়া আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে সেইসকল গ্রন্থের রস প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সুখ বৃদ্ধি করিবে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদের নিজ রচনা বা নবীন-প্রণালীর রচনা ভাল লাগে, কিন্তু যখন আমরা গাঢ়রূপে পূর্ব-মহাজনদিগের রচনার রস প্রবেশ করি, তখন আর আমাদের নবীন রচনা ভাল লাগে না। ইহার মুখ্য তাৎপৰ্য্য এই যে, আমরা মনে করি, আমরা পূর্ব-মহাজনগণ অপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারি, কিন্তু এই ভ্রমটী যখন দূর হয়, তখন আর নবীন রচনা ভাল লাগে না।

আধুনিক কবি অপেক্ষা প্রাচীন কবিগণই শ্রেষ্ঠ

মহৎলোক ও কবি সর্বদা জগতে আসেন না। তাঁহারা বিরল, স্মৃতবা-শ্রীজয়দেব-রূপাদির পর আর ভাল কবি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের কোন রূপাপাত্র জগতে আবির্ভূত হইবেন, তখনই আমরা শ্রীগীত-

গোবিন্দ, শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ত্রায় অত্যাশ্রয় গ্রন্থ দেখিতে পাইব। বর্তমান কবিদিগের কাব্য বা রচনায় হুথ-বোধ করা—কেবল দুষ্কৃত্যাবেশে ঘোলে দুষ্কের স্বাদ পাইয়াছি, মনে করা মাত্র।

পাঠকবর্গের প্রতি গোস্বামি-গ্রন্থ আলোচনার নির্দেশ

পূর্ব-মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা কিছুই আমাদের নিকট মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিদ্ধি অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রস-গ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী, ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী। তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থের রসাস্বাদন করুন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ক্রোধের কুফল ও তাহার সম্বরণোপায়

ব্রহ্মাণ্ডে যাহারা কামাশক্ত অতিশয়।

তাদের কামনা-বিশ্বে ক্রোধোৎপত্তি হয় ॥

প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ-অগ্নি এত শক্তি ধরে।

মুহূর্ত্তে সকল জীবে বিনাশিতে পারে ॥

অতি ক্রোধে তপস্বীর তপঃ নষ্ট হয়।

সদগুণ, সহিমুগ্ধতা, ক্ষমা লুপ্ত হয় ॥

কণামাত্র জ্বলে যদি ক্রোধের আগুন।

বিস্তার করয়ে শাখা ক্রমে শতগুণ ॥

তাহাতে সকল পুণ্য নষ্ট হ'য়ে যায়।

অফুরন্ত পাপরাশি করয়ে আশ্রয় ॥

ক্রোধের অধীন হ'য়ে বদ্ধজীবগণ।

জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সদা করে বিচরণ ॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে তখন।

মহা মহা অপরাধ করিয়া অজ্ঞান,

অনন্ত নিরয়-পথের পথিক হইয়া,

নিজ সর্ববিনাশ করে আপনা ভুলিয়া ॥

নারী-হত্যা গো-ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত ।
 অগণিত মহাপাপে নিত্য হয় রত ॥
 শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব আর গুরুনিন্দা আদি ।
 মহা মহা অপরাধে হ'য়ে অপরাধী,
 অনন্ত কালের জন্য ভীষণ রৌরবে ।
 অসহ্য যাতনা ভোগ করে জীব সবে ॥

স্বরূপেতে জীব সব হয় কৃষ্ণদাস ।
 একথা ভুলিয়া জীব করে সর্ববনাশ ॥
 নিজেকে করিবে 'কৃষ্ণদাস' অভিমান ।
 সকল জীবেরে 'কৃষ্ণদাস' বলি' জ্ঞান ॥
 সকল জীবেরে কৃষ্ণ হৈলে দরশন ।
 তবে ত' হইবে জীবে আত্ম-দরশন ॥
 তা' হ'লে ক্রোধাদি যত বাটপাড়াগণ ।
 দৌরাভ্য্য করিতে নাহি পারিবে কখন ॥
 সহিষুতা-ক্ষমা আদি দিব্য অলঙ্কারে ।
 ভূষিত থাকিলে জীব সর্বকাল তরে ।
 গুরু-বৈষ্ণবের সেবানন্দ-সাগরেতে ।
 নিরন্তর নিমজ্জিত পারিবে থাকিতে ॥

ক্রোধ হ'তে হয় যত অনর্থ-উদয় ।
 স্তূতরাং ক্রোধ ত্যাগ সমুচিত হয় ॥
 ক্রোধ-বাটপাড়ে কভু না দিও প্রশয় ।
 ক্রোধেতে জীবের কভু শ্রেয়ঃ নাহি হয় ॥
 ক্রোধ সে ঘৃণিত-হীনবৃত্তি অতিশয় ।
 ক্রোধেতে মুহূর্ত্তে জীব ধ্বংস হ'য়ে যায় ॥
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ এর আছে চমৎকার ।
 বহু'র সমক্ষে যাহা ঘ'টেছে সে-বার ॥

‘কাঙ্গালী ঠাকুর’ নাম নারমায় বাড়ী ।
 ছিপ্‌ছিপে লম্বাপানা তনুময় নাড়ী ॥
 রন্ধন করিয়া বিপ্র অন্নে ঢাকা দিয়া ।
 স্নান করিবারে যায় গামছা কাঁধে দিয়া ॥

হেনকালে ব্রাহ্মণের ভ্রাতৃপুত্র এক ।
 জননীয়ে ক্রোধভরে বলে ছাখ্‌ ছাখ্‌ ॥
 মোরে খেতে নাহি দিয়ে কোথা চ’লে যাস্ ?
 এক্ষুণি তোর গালে চড় মারব ক’রে ঠা’স ।
 এত বলি বিপ্রস্তুত ক্রোধান্বিত হ’য়ে ।
 মায়েরে মারিতে ধায় হাতে বাড়ী ল’য়ে ॥
 বালকের এইরূপ অনাচার হেরি* ।
 কাঙ্গালী ঠাকুর ক্রোধে হ’য়ে ত্বরান্বিত—
 অভিজ্ঞান-শূন্য হ’য়ে বালকে শাসিতে—
 ইচ্ছিয়া ছুটিল বেগে তাহারে ধরিতে ॥
 পায়েতে হুচোট লেগে পড়িল যেমনি ।
 মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ ত্যজিল অমনি ॥
 কোথা রৈল পুত্র-ভ্রাতৃপুত্র-ভ্রাতৃবধু ।
 কোথা রৈল অন্ন যাহা জীবনের মধু ॥
 কোথা রৈল জমি-জমা স্বীয় বাসস্থান ।
 সকলের মায়া ত্যজি’ চ’লে গেল প্রাণ ।
 (আমি)—এ’ ঘটনা হেরিয়াছি আপন-নয়নে ।
 ক্রোধের কুফল ইহা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

তবে অপ্রাকৃত ক্রোধ সেহ সর্বোত্তম ।
 তাহাতে জীবের নাহি নাশয়ে সংঘম ॥
 হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদেবী-জন-প্রতি ।
 ক্রোধের যে অভিনয় তাহা গুণ অতি ॥

উহাই হয় ত' ক্রোধ-জয়ের লক্ষণ ।
 উহাই প্রকৃতভাবে গোস্বামীর ধন ॥
 ইহাদ্বারা কৃষ্ণ-বহিন্মুখ সমুদয়—
 জীবগণ-নিত্যশুভ সুসাধিত হয় ॥
 প্রাকৃত ব্যক্তির ক্রোধ বলি' যারে কয়,
 তার সম অমঙ্গল কিছু না আছয় ॥
 কর সদা কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তন ।
 কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সবে কররে স্মরণ ॥
 (ক্রোধে) ভক্তি-ভাবিত মন-অধীন করিবে ।
 জীবে দয়া তাহাদ্বারা সাধিত হইবে ॥
 যেরূপ শ্রবণ করি' সিংহের গর্জন ।
 দীর্ঘকায় হস্তীগণ করে পলায়ন ॥
 সেইরূপ সাধু-গুরু-মুখ-বিগলিত ।
 শ্রীনাম শ্রবণ করি' ক্রোধ আদি যত—
 পরাক্রান্ত রিপুগণ হয় পরাভূত—
 তাহাতে জীবের শুভ হয় সুনিশ্চিত ॥
 ভজন-পথের যত রিপু কর' জয় ।
 তাহাতে পরম কার্য সুসাধিত হয় ॥
 চৈতনের মহাবানী সবে সর্বলক্ষণ ।
 'কবচ' রূপেতে কণ্ঠে করহ ধারণ ॥
 তাহাতে হইবে হরি-ভজনাধিকারী ॥
 শ্রীহরি ভজিয়া পারে যাবে ভববারি ॥

শ্রীচৈতনের বানী, যথা :—

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিসুনা ।
 অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥”

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন
 নারমা (মেদিনীপুর)

পরাদর ও পরনিন্দা.

(১)

“পরের আদর”

পরনিন্দা ও পরচর্চা করা বড় অগ্রাঘ ও ভক্তি-হানিকারক। নিন্দা হিংসার সমতুল্য ; কোন জীবের প্রতি অবজ্ঞা, হিংসা, নিন্দা ও ঘেঁষ করিলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুতি হয়। জীবকে পীড়ন করা, দুঃখ দেওয়া ও হিংসা-নিন্দা করা প্রীতির বিপরীত। ভক্তি নিঃস্বংসর ধর্ম। সেখানে মৎসরতার কোন কুথা নাই। ভক্ত সমদর্শী। তাঁহার বিষম-দর্শন না থাকায়—সর্বত্র ভগবৎ-সম্পর্ক-দৃষ্টি থাকায় তিনি সকলকেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে সম্মান করিয়া থাকেন। ভক্তের স্বভাব এইরূপ,—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ’বে নিরভিমান।

জীবে সম্মান দিবে জানি’ কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৫)

আমার হৃদয়ে যে রূপ ভগবান্ আছেন, বৃক্ষ-লতা, হস্তী-পিপীলিকা, ধার্মিক-অধার্মিক, নর-নারী, সৎ-অসৎ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ-সকলের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন। সাধুগুরু-রূপায় ইহা উপলব্ধি করিয়া নিজের গ্রাম পরেরও মঙ্গল-অমঙ্গলকেই প্রকৃত সাধন বলে। ইহার পরিণতিকেই মহাজনগণ সমদর্শন বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। নিজের গ্রাম পরেরও উপকার করিতে হইবে। তবে নামাশ্রিত ভগবদ্ভক্তকে বেশী আদর করিতে হইবে, আর অগ্র জীবের প্রতি যথাসাধ্য সম্মানাদি প্রদর্শন করা বিশেষ কর্তব্য। শ্রীভগবান্-বিষ্ণুই অন্তর্ধ্যামি-স্বরূপে জীব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিতেছেন—ইহা জানিয়া সকল প্রাণিকেই মনে মনে সম্মান করিয়া প্রণাম করিতে হইবে—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-ভগবদাদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহমানয়ন।

ঈশ্বরো জীবন্তলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৩৪)

বিসৃজ্য ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।

প্রণমেদ্ববদন্তু মা বাস-চাণ্ডাল-গোথরম্ ॥ (ভাঃ ১।১২৯।৬)

উপহাসকারী-বন্ধুগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এবং দেহ-বিষয়ে উচ্চ-নীচ ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুকুর-চণ্ডাল-গর্দভাদি সকল প্রাণিকেই ভগবদধিষ্ঠান জানিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া সম্মান করিবে।

ব্রাহ্মণাদি কুকুর চণ্ডাল অস্ত্র করি।

দণ্ডবৎ করিবেক বহু মাণ্ড করি ॥

এই সে বৈষ্ণবধর্ম—সবারে প্রণতি।

সেই ধর্মধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮-২৯)

যাঁহারা প্রাথমিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চন ও নাম করেন, তাঁহারা সর্বভূতে আদর করিতে অবশ্য শিখিবেন—ইহাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধি লঙ্ঘনে তাঁহাদের কোন দিনই মঙ্গল হইবে না। যাঁহারা দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদের সর্বত্রই শ্রীভগবানের বৈভব-স্মৃতি হয় বলিয়া তাঁহারা স্বতঃই সকলকে আদর ও প্রণতি করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সর্বত্র ইষ্টস্মৃতি, সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে যাঁহারা ভগবানের সম্পর্কিত দর্শন করেন, অগত্যা যাঁহারা জগদীশের সেবাপকরণ বলিয়া জানেন, সকল বস্তুকেই তাঁহারা গুরুজ্ঞানে সেবাপূজা করেন। যিনি সেবক, তাঁহার সর্বত্রই সেব্য-সম্পর্ক-দৃষ্টি। যাঁহার হরিভক্তি আছে, তাঁহার অহিংসা-গুণ স্বাভাবিক। শ্রীনারদের কৃপাপাত্র জনৈক ভক্ত-ব্যাধের আচরণে আমরা তাহা দেখিতে পাই।—

এতে ন হৃদ্যুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।

হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্ত্যঃ পরতাপিনঃ ॥ (স্কান্দ-বচন)

অর্থাৎ—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি-গুণসমূহ কিছুই অদৃষ্ট নহে।

কারণ যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হন না।

ভগবদ্ভক্ত জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখনও আদর করেন না। মায়াবশযোগ্য জীব কখনও মায়াধীশ ঈশ্বর হইতে পারে না। “জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান”—এই বিচারেই ভক্ত জীবকে আদর করিয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন—

“পরমসিদ্ধানাঞ্চ ‘সর্বভূতেষু যঃ পশ্চেদুগবদ্ব্যবমানঃ’ (ভাঃ ১।১।৪৭)

ইত্যাদিসূত্রেণ সিদ্ধ এব সং। তত্র সাধকানাং যন্তু ‘যথা তরোমূল-নিষেচনেন’ (ভাঃ ৪।৩।১৪) ইত্যাদৌ তদাত্মোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমূলভাতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্র-তত্তদৃষ্টোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশুকত্বঞ্চ তৎ সম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে। তচ্চাত্তত্র ঋটিতি রাগদেবনিবৃত্তার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চনং তাক্রবতো ভরতশাস্তরাযঃ। তস্মাদ্ভক্তিত্বমুখ্যা নার্কনমিতি নিরন্তম্।”

শ্রীকৃষ্ণে অল্পরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্বক বাঁহারা পরমহংস-
 অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের নিষ্কলংকতা ও সর্বভূতে আদরই স্বাভাবিক ধর্ম
 হয়,—এই বিচার অল্পসারেই পরমসিদ্ধ পুরুষগণে সর্বভূতের প্রতি আদর
 দেখিতে পাওয়া যায় ; কারণ যিনি সর্বভূতে বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া আত্মায়
 চিদ্বিলাস শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও আত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাসোপকরণ-
 সমূহ দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোক্তম । ‘বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনের দ্বারা
 যেরূপ তাহার স্বক, শাখা, উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুত-সেবাতেই
 সর্বভূতের পূজা হয় ; সুতরাং পৃথকভাবে অত্যাশ্রয় প্রাণীর প্রতি আদর করিবার
 প্রয়োজন নাই,—এরূপ স্থলে বক্তব্য এই যে—অত্যাশ্রয় প্রাণীতে অন্তর্যোগী-ঈশ্বর-
 রূপে অধিষ্ঠান-যুক্ত শ্রীভগবানেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে এবং ভগৎ-সম্বন্ধেই
 অর্থাৎ নিজ উপাশ্রয় হরিসম্বন্ধি বস্তুজ্ঞানেই সেইসকল প্রাণীর প্রতি আদর করা
 একান্ত কর্তব্য । নিজ-ব্যতীত অপরাপর প্রাণীতে শীঘ্রই যাহাতে রাগ-দ্বেষ্টের
 নিবৃত্তি ঘটে, তন্নিমিত্তই সেইরূপ আদর করা বিহিত বলিয়া জানিতে হইবে ।
 অতএব কেবল কর্মাদি-কাসনাময় ভূতদয়া বা ভূতাদর-বশে শ্রীভগবানের অর্চন
 পরিত্যাগ করিলে যে ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহা প্রেমিক ভক্তবর জড়ভরত হরিণদেহ-
 লাভ করিবার অভিনয়ের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন । জড়ভরত
 প্রেমিক ভক্ত ছিলেন । তাঁহার পতন বা ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিতে পারে
 না ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তও যদি কেবলমাত্র প্রাণীর বহির্দৃষ্টি দেহের প্রতি
 আসক্তি-নিবন্ধন কর্মকাণ্ডীয় বিচার অনুসরণ করিয়া কাহারও
 দৈহিক ও মানসিক প্রীতিবিধানে ব্যস্ত হন এবং তজ্জন্ম শ্রীভগবানের
 সেবায় শিথিলতা প্রদর্শন করেন, অথবা বহির্দৃষ্টি জীব-সেবাকে
 অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎ-সেবা বলিয়া কল্পনা করেন, তবে তাঁহারও বন্ধন
 অনিবার্য্য । এইরূপ পরের আদর করিয়াও ভক্তিহীন হইলে পতন
 অবশ্যস্তাবী । সুতরাং পরনিন্দার ত’ কথাই নাই ।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

ভক্তিকথা

(পূর্বপ্রকাশিত. ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৪ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মার দিন ও রাত্রিব্যাপক অব্যক্ত ও ব্যক্ত-ভাবাপন্ন যে জড় প্রকৃতি, তাহার পরপারে সনাতন অর্থাৎ যাহার পুনঃ পুনঃ প্রলয় ও সৃষ্টি হয় না— এই প্রকার আর একটি নিত্য-স্বভাব বা ধাম বর্তমান আছে। তাহাই বৈকুণ্ঠ-জগৎ বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের এই দৃশ্য-জগতের চরাচর সমস্ত প্রাণীসমূহের বিনাশ হইলেও, সেই বৈকুণ্ঠ-জগৎ অবিনশ্বরই থাকে। এই বৈকুণ্ঠ-জগতে বা ভগবদ্ব্যমে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের জীবনচয়ের আয় পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি-প্রলয়াদি দুঃখে আর অভিভূত হইতে হয় না। পর-জগতে জড়াকারের পরিবর্তে যে চিদাকাশ বর্তমান আছে, তাহাই ‘পরব্যোম’ বলিয়া বিখ্যাত। সেই পরব্যোমের অন্তর্গত যে অপ্রাকৃত গোলোক বা মণ্ডলাদি বর্তমান আছে, তাহাই ভগবানের নিত্যলীলা-স্থান অনন্ত-বৈকুণ্ঠ ধাম।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ভগবানে পরা ও অপরা নামে দুইটি প্রকৃতি আছে। পরা প্রকৃতি-সম্ভূত—বৈকুণ্ঠাদি-ধাম, আর অপরা প্রকৃতি-সম্ভূত—এই জড় জগৎ। জীবশক্তিও ভগবানের পরাশক্তি-সম্ভূত। কিন্তু জীবসকল বৈকুণ্ঠ এবং জড় জগৎ উভয় স্থানেই থাকিতে পারেন বলিয়া, পরাশক্তি-সম্ভূত হইলেও জীবশক্তিকে ‘তটস্থ-শক্তি’ নামে একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ-জগৎ ভগবানের ‘আলমারী’ বা অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাস, আর জড় জগৎ তাহার বহিরঙ্গ-শক্তির বিকাশ। এই সমস্ত শক্তিতেই শক্তিমান-তত্ত্ব যে ভগবান, তাহার অধ্যক্ষতা আছে। সুতরাং আমরা এই যে জড়-জগৎ দেখিতে পাই, তাহাতেও তাহার অধ্যক্ষতা পূর্ণমাত্রায় আছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপমা-স্থলে বলা যাইতে পারে, যেমন একটি কুন্ত। কুন্তের উৎপত্তির কারণ মৃত্তিকা, চক্ররূপ যন্ত্র এবং কুন্তকার। কুন্ত-উৎপত্তিরূপ কার্যের প্রথমতঃ মৃত্তিকাই ‘উপাদান-কারণ,’ দ্বিতীয়তঃ কুন্ত-চক্র ‘নিমিত্ত-কারণ,’ আর তৃতীয়তঃ কুন্তকারই ‘প্রধান কারণ’। সেই-প্রকার প্রকৃতি সমস্ত জড়-জগতের উৎপত্তির কারণ ‘উপাদান’ এবং ‘নিমিত্ত’-কারণ হইলেও, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ‘প্রধান-কারণ’। প্রকৃতি তাহারই ইচ্ছিতে সমস্ত কার্য্য ছাড়ায় করিয়া থাকেন। যথা,—

ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সৃযুতে দচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ (গী. ৯।১০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাক্ষতায় এই জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং তাঁহারই অধ্যাক্ষতায় পুনরায় প্রলয়গত হয়। ইহাই নিত্যসত্য-তত্ত্ব।

দুঃখের বিষয় এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নিজতত্ত্ব ব্যক্ত করিলেও, দুর্ভাগ্য লোক তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ধর্ম্মধ্বজী মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাকে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে। এইপ্রকার নাস্তিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ নিজে নিজে কোনদিনই ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং বা তাঁহার দাসানুদাসগণ ভগবৎ-তত্ত্ব বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও, তাহা ভগবৎ-ভাগবত-বিদেষী অস্বরগণের কখনও বুঝিবার অবকাশ হয় না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

মতিন্ কৃষ্ণে পরতঃ স্ততো বা, মিথোহভিপত্তেত গৃহব্রতানাম্।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং, পুনঃ পুনঃ চর্কিতচর্কণানাম্ ॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।

অন্ধা যথাক্ষৈরূপণীয়মানাস্তেহপীশতস্ত্র্যামুরুদানি বন্ধাঃ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

[মহাভাগবত প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন, হে পিতঃ! গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, স্ততরাং বারংবার এই ক্লেশকর সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্কিত বিষয়ই চর্কণ করিতে থাকে। বাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেইসকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্ধ অন্ধ-কড়ুক চালিত হইয়া গর্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না; সেইরূপ কাম্বীগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকক্ষে নিযুক্ত হন।]

এই প্রকার অদান্ত-ইন্দ্রিয়, গো-দাস, অন্ধ, গৃহব্রত, মূঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

অবজ্ঞানন্তি মাং মূঢ়া মাহুষীং তন্মুগাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (গীঃ ৯।১১)

স্বয়ং ভগবান্ নিজে আসিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব বিবৃত করিলেও বোকা লোকগুলি শ্রীভগবানকে আমাদেরই মত একজন দাবারণ মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া অপরাধী হয়।

অতিক্ষুদ্র মনুষ্যজাতি সামান্য ঘটী-বাটি, ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা প্রভৃতিই সৃষ্টি করিতে সমর্থ। অতএব আমাদের মত দেখিতে একটি মনুষ্য-শরীরধারী ব্যক্তি (?) যিনি কিছুদিন পূর্বে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যে অনন্ত-কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনিই যে সৃষ্টিকর্তা ও সর্বেশ্বর বা তিনিই যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান—এই সমস্ত কথা যতই ভালভাবে বুঝান হউক না কেন, শ্ব-লাজুল-বক্র ক্ষুদ্রমস্তিকে দুর্ভাগা মনুষ্যগণ কিছুতেই উহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা মায়াবাদের আশ্রয়ে কৃষ্ণকে ‘স্বয়ং ভগবান’ স্বীকার না করিয়া বরং কৃষ্ণ ও ভগবান্ এবং তাহারা নিজে-নিজেও এক একজন ভগবান্ (?)—এইরূপ একটা রফা-নিষ্পত্তি করিতে রাজী হয়। এই প্রকারে তাহারা ভগবানের প্রতিযোগী হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মুখ ভ্যাঙ্গ চাইয়া শেষ পর্যন্ত ‘আমিই সব’—এইরূপ মূঢ়-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

এইসকল মূঢ় লোকগুলিকে কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী ‘Satan’ বা শয়তান বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। পূর্বেও এইপ্রকার ভগবানের প্রতিযোগী শয়তান-জাতীয় রাবণ, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, কংশ ইত্যাদি বহু অশুরের জন্ম হইয়াছিল। এখন তাহাদের অনেক বংশ-বৃদ্ধি হইয়াছে। এইসকল শয়তানগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও ‘শচী পিসির ছেলে’ বলিয়া ডিসমিস করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু, চিন্তা করা আবশ্যক যে, ভগবানের প্রতিযোগী কেহই হইতে পারে না। ভগবান্ অসমোদ্ধ এবং ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্।’ সুতরাং ভগবানের সমান বা ভগবান্ অপেক্ষা বড় কেহই নাই। ‘একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।’ সামান্য উদরান্ন-সংস্থানের জন্ত দাসত্ব করিয়া, মায়ার লাখি খাইয়া যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা যদি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের প্রতিযোগী হইবার দুর্কীসনা পোষণ করে, তবে তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। তাহারা আসলে শ্রীভগবানের ভূতমহেশ্বরত্ব পরমভাব অবগত নহে বলিয়াই এইরূপ দুর্দাশা পোষণ করে। কিন্তু ভগবান্ এমনই দয়াময় যে, সেইসকল ‘শাটান্’ জাতীয় লোকগুলিকেও তাহার ভূত-মহেশ্বরত্ব পরমভাব কোশলে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবানের দাসানুদাসগণ বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হাজার হাজার গ্যালন চিদ্ৰক্ত জল করিয়া এইসকল ‘ভূতে পাওয়া’ লোকগুলির ‘শাটান্’ বা শয়তানী-রোগদূরীভূত করিবার জন্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আবার অতি পণ্ডিতগণও বলিয়া থাকেন যে, যাহারা “শাস্ত্রাদি পাঠ করে নাই এমন লোক মূঢ়তাবশতঃ না হয় বোকা হইতে পারে, কিন্তু আমরা ত’ বহু শাস্ত্র

শাস্ত্রেই দেখিতে পাই যে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। বসুদেবের পুত্র দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সেই মহাবিষ্ণুর অংশ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে সর্বোপরি—একথা কি করিয়া স্বীকার করা যায়?” পণ্ডিত-গণও সময়ে সময়ে মায়া দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া যান, যখন এইপ্রকার আত্মরিক্ততা আশ্রয় করেন। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে-সকল প্রমাণ আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর শ্রুতি হইতে এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—“তমেবং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবন-স্বরভূরুহতাবনাঙ্গীনং সততং স-মরুদগাণোহুং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি” ইতি শ্রুতে ; “নরাকৃতিঃ পরব্রহ্ম” ইতি স্মৃতেঃ।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মসংহিতা হইতেও আমরা এইপ্রকার প্রমাণ পাই যে, কারণার্ণব-শায়ী বিষ্ণুর অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ। যথা,—

যঃ কারণার্ণব-জলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রাগমনস্ত-জগদণ্ড-সরোমকূপঃ।

আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমুক্তিং, গোবিন্দমাদিপুরুষং ভ্রমহং ভজামি ॥

(ব্রঃ সং ৫৪৭)

পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেন যে, “মানুষকে ভগবানের মত রূপ করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে।” এইপ্রকার সিদ্ধান্তানুযায়ী মানুষ ভগবানের মত দ্বিভূজ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া দ্বিভূজ ভগবান্ মানুষ হইয়া যাইবেন—এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করা মহাপরাধ। তাঁহার পরমভাব কি, তাহা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে জানিয়া লওয়াই মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

কিন্তু অহর-স্বভাব ব্যক্তিগণ মনুষ্যজীবন কিভাবে পরিপূর্ণ করিতে হয়, তাহা না বুঝিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ নহেন (?)—এই কথা প্রমাণ করিতেই সর্বদা তৎপর। সেইসকল নাস্তিকগণ যতই উচ্চাশা পোষণ করুক না কেন, যতই উত্তম কর্ম করুক না কেন, এবং যতই উত্তম জ্ঞান লাভ করুক না কেন, তাহাদের উচ্চাশাদির মূলে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-রূপ ভিত্তি না থাকায় সেইসমস্ত আশা, কর্ম-জ্ঞান সকলই বিফল জানিতে হইবে। একের পৃষ্ঠে শূণ্য দিলে দশ হয়, দশের পৃষ্ঠে শূণ্য দিলে একশত হয় এবং একশতের পৃষ্ঠে শূণ্য দিলে একহাজার হয়। অর্থাৎ একক সংখ্যা অবলম্বন করিয়া যত শূণ্য বসান যায়, ততই মূল্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ‘এক’ সংখ্যা বাদ দিলে শূণ্যগুলির মূল্য শূণ্যই থাকে। আজীবন কেবলমাত্র শূণ্য বাড়াইলে কোনদিনই একের সমান হইতে পারা যায় না। রাবণ যেরূপ স্বর্গের সিঁড়ি করিয়া

দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, ভগবদ্বিঃস্বীয় আশা-ভরসাও সেইপ্রকার রাবণের। দাঁড়ির মত। যথা—

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাসুরীক্লেব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ (গীঃ ৯।১২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যাহারা মানুষ-বুদ্ধি করিয়া, অথবা প্রথমে তিনি মানুষ ছিলেন তারপর হঠাৎ ভগবান্ হইয়া পড়িলেন, যেমন আজকাল বহু অবতার (?) গজাইয়া উঠে—এরূপ মনে করিয়া নিজেদের কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত আশাই বিফল জানিতে হইবে। আমরা জানি, অনেক মাদ্ঘাবাদী, মিছাভক্ত, ছলভক্ত, প্রভৃতি দল বাঁধিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ-বুদ্ধি করিয়া তাহার ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরে বেচারী কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপিবার ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ নিজেরাই ‘কৃষ্ণ’ হইবার ছুরভিসন্ধি পোষণ করেন। এইসকল ছুরাশা পোষণকারী ব্যক্তিগণই ‘মোঘাশা’। ভগবানে গম্ভীরা-বুদ্ধিকারী কৰ্ম্মিগণও তাহাদের কৰ্ম্মের ফল যে স্বর্গাদি-লাভ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পরিশেষে ‘মোঘকর্মা’ হইয়া যান। আর তাহারা যদি জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত হন, তাহা হইলে জ্ঞানের ফল যে মায়া-মুক্তি, তাহাও নিষ্ফল হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিক্তান্ত সন্ন্যাসী প্রভুপাদের
অষ্টসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে—

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-প্রশান্ত

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরক্লেব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মই ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ । সমগ্র বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন । পরতত্ত্ব লাভের জন্ত যে সাধু-মহাজনগণের ব্রাহ্মসরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সেই সাধুগণও শ্রীগুরুদেবকে ঐভাবেই চিন্তা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের

আচার্য্য-লীলায় তাঁহাকে মুকুন্দ-প্রের্ষরূপে দেখিতে পাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই ভগবৎ-কৃপালাভ হয়। পক্ষান্তরে, তিনি অপ্রসন্ন হইলে আশ্রয়-প্রদান করিতে জগতে অণু কেহ নাই। শ্রীগুরুদেব পতিত-পাবন; পতিত-জনকে উদ্ধারের জন্তই তাঁহার প্রপঞ্চে শুভ পদার্পণ। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম এই প্রপঞ্চে শুভদা মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে অবতরণ করিয়াছেন। পতিত-পাবনী সেই তিথিবরার পূজা একমাত্র দেব-স্বভাবসম্পন্ন ভাগ্যবান্ জনগণই করিয়া থাকেন, “নাদেবো দেবমর্চয়েৎ”; অদৈব প্রকৃতির জনগণ এই অপ্রাকৃত রহস্যের গুঢ়মর্ম্ম অবধারণ করিতে অসমর্থ। “পঞ্চ-তদ্ব্যঙ্গকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥” অনন্ত চিদচিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্র একই পরম-পরাংপর-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার ও শুদ্ধভক্তে কোন ভেদ নাই। এই পঞ্চতত্ত্বের প্রতি-তত্ত্বে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-স্বরূপে তদাঙ্গক-তত্ত্ব। পরন্তু রসাস্বাদোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই ‘ভক্তরূপ’—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, ‘ভক্ত-স্বরূপ’—শ্রীনিত্যানন্দ, ‘ভক্তাবতার’—শ্রীঅদ্বৈত, ‘ভক্তশক্তি’—শ্রীগদাধর ও ‘শুদ্ধভক্ত’—শ্রীবাস-পণ্ডিত, এই পঞ্চ-তত্ত্বরূপে প্রকাশিত। শ্রীগুরু-পাদপদ্মই শ্রীনিত্যানন্দ-ভিন্ন-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ।

“যতপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪-৪৫)

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গোপনের পর বাণীরূপে যে-প্রকার ভাগবত-সূর্য্যের প্রকাশ—সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের লীলা সঙ্গোপনের পর “হ্যংকলে পুরুষোত্তমাং” এই ব্যাসবাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই বাণী নীলাম্বুধির-তটে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে ‘ভক্তভাগবত’-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

“কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাখাতেই রহে,”—একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছাই পূর্ত্তি করিতে সমর্থ। বলিয়া তিনি ‘সর্ব্ব-কান্তি’; তাই তিনি কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপিণী ও মহাভাব-স্বরূপা। তিনি পঞ্চম-পুরুষার্থের মূর্ত্তিমন্দির,—এই বিগ্রহ-পরমা সুন্দরী ও কৃষ্ণপূজা-ক্রিয়ার বসতী-নগরী বলিয়া ‘দেবী’; তাঁহার অন্তর ও

বাহিরে সর্বত্র কৃষ্ণের স্ফূর্তি হয় বলিয়া “শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ”—এই বিচারে তিনি ‘কৃষ্ণময়ী’; কৃষ্ণবাহু-পূর্তিই তাঁহার আরাধনা, সেহেতু তিনি ‘রাধিকা’ নামে অভিহিতা। সর্বশোভার বা সর্বলক্ষ্মীগণের মূল বলিয়া সর্ব-লক্ষ্মীগণেতে তাঁহার অধিষ্ঠান, এজন্ত তিনি ‘সর্বলক্ষ্মীময়ী’; ভুবন-মোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনকে শ্রীরাধা মোহন ও আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি “ভুবন-মোহন-মোহিনী”; শ্রীরাধিকার ‘সেবা-শ্রী’র নিকট উমা-রমা-শচী-সত্যা-চন্দ্রা-রুক্মিণী এবং অত্যাশ্চর্য শতকোটি ব্রজাঙ্গনাগণের সেবাও সম্পূর্ণরূপে পরাজিতা, তাই শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী ‘দেবী’ অর্থাৎ স্নোতমানা এবং সর্বোপরি ‘জয়’-সৌন্দর্য্যে পরিশোভিতা বলিয়া তিনি “জয়শ্রী” সংজ্ঞায় অভিহিতা। এই ‘জয়শ্রী’র জয় ঘোষণার জন্তই ভক্ত-ভাগবত ও রাধাভাব-দ্ব্যতি-স্ববলিততম শ্রীশ্রীগৌরানন্দের আবির্ভাব; মুখ্যভাবে জয়শ্রীর সেবা-পৌর্ণমাসীর কিরণের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্তই সেবায় সর্বজ্যোষ্ঠা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা যে শ্রীমতী রাধিকাদেবী, তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভের জন্তই তাক্তগৃহ সারস্বত-গৌড়ীয়গণের আরাধ্য-রূপে রাধাভাবে বিভাবিত-তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিপ্রলম্ব-ক্ষেত্র শ্রীনীলাচলে শ্রীরাধানিত্যজ্ঞান শ্রীবার্হভানবী-দয়িতদাস প্রভু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব।

আবার সেই সর্বজ্যোষ্ঠা আত্মশক্তি শ্রীরাধিকার সেবাতেই যে পঞ্চম-পুরুষার্থের পূর্ণতম বিকাশ, সেই পূর্ণ-বিকশিত পঞ্চম-পুরুষার্থের সেবানুশীলনই ‘শ্রীপঞ্চমী’র সেবকগণের মৃগ্য। ‘জয়শ্রী’র আনুগত্যেই যে কৃষ্ণ-সেবা সম্ভব, সেই আনুগত্যপর ভক্তগণ ‘পঞ্চমী’ শব্দ শ্রবণমাত্রেই পঞ্চম-পুরুষার্থ-ধারিণী ‘জয়শ্রী’—শ্রীবার্হভানবী-দেবী শ্রীরাধাকেই বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং বিদ্বদ্রুঢ়ি-বৃত্তিতে ‘শ্রীপঞ্চমী’-শব্দ যে ‘জয়শ্রী’র সেবা-পৌর্ণমাসীর সহিত একতাংপর্য্যপর, তাহা প্রদর্শনার্থই শ্রীবৃষ-ভানুসুতায় দয়িতের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ শ্রীগৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদা দয়া—শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীর গোবিন্দ-মাসের শুভা-কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আবির্ভাব।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পরম প্রিয়তমপাত্র এবং অভিধেয়-তত্ত্বের আচাধ্য ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম রসতত্ত্ববেত্তা শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামি-প্রভুর অভিন্ন-স্বরূপে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগতে অপ্রাকৃত আচাধ্য-ভাস্বররূপে প্রকাশ। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, মাঘী-কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ন ৩।০ ঘটিকার পর পুরী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিকট “নারায়ণ ছাতার” সংলগ্ন ঠাকুর শ্রীমন্ত-ভক্তি-

বিনোদের হরিকীৰ্ত্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতিষ্ময় দিব্যকান্তি শিশুরূপে অবতীর্ণ হন। যাহারা তৎকালে ঐ শিশুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিশুর শ্রীঅঙ্গে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িতভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে গৃহে ঐ দিব্য শিশু অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই সমগ্র গৃহটী ঐ অতিমর্ত্য শিশুর চিন্ময়-জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল। তাহাতে সৌভাগ্য-বান্ দর্শনকারী সকলেই অত্যাশ্চর্য্যায়িত হইয়াছিলেন। শিশুর আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হইল। সে-বৎসর সেইরথ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবেরই ইচ্ছায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাস-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসস্থানের সম্মুখে তিনদিবস-কাল রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবসকাল শ্রীহরিকীৰ্ত্তনোৎসব হইতে থাকিল। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়ে শায়িত ছয়মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন করেন এবং তাঁহার গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী দিব্যমাল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষ-লক্ষ নরনারী সকলেই এই অলৌকিক ব্যাপারে অত্যাশ্চর্য্যায়িত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই দিব্যশিশুর শ্রীমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

আকুমারিকা-হিমাচল তথা সমগ্রবিশ্বে বিবদমা-যুগ শাসক-শাসিতের অহঙ্কার বিমূড়তাজাত সংঘর্ষে সর্বসমস্যার সমাধানকারিণী স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনা-বতী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অপ্ৰাকৃত বাণীর প্রচারদ্বারা বিশ্বের সকলকেই নিত্য কল্যাণ প্রদানের চেষ্টা আমাদের উক্ত পরমার্হাধ্য শ্রীআচার্য্যদেবের করুণাতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। ইতঃপূর্বে আর কখনও শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাণী প্রচারের এবস্থিধ প্রসারতা কেহ দর্শন ত' দূরের কথা, কল্পনাও করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা সংগোপনের পর তদীয় পার্শ্ব গোড়ীয় আচার্য্যগণও যখন একে একে নিত্যলীলায় আত্ম-সংগোপন করিলেন, তখন গোড়ীয় গগণকে আউল বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের কুমতরূপ কুজ্জটিকা আচ্ছাদন করিল। তখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উদিত তপনরূপে শতাদিক গ্রন্থ আবিষ্কারপূর্বক জগতে পরমকল্যাণ বিস্তার করিয়াছেন। তখন কতপ্রকার অদৈব বা আসুর-মতবাদের অত্যাধম-হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল পর্বেণ্ড-মতবাদ দলনের জগুই যে অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীমন্তুক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আবির্ভাব, তাহা তাঁহার আচারে ও প্রচারে আমরা

পেটভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। একদিকে ষট্‌সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদির প্রতিকূলে সকল প্রকার অদৈব পাষণ্ড মতবাদ নিরসন, অপরদিকে যোগ্য সেবকগণের নিকট স্তবাবলী, স্তবমালা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিলাপ-কুসুমাজলি, উজ্জলনীলমণি, শ্রীকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচঞ্জিকা, লীলাশুক বিদ্যমঙ্গলের কর্ণামৃত, চণ্ডীদাস-আচাৰ্য-রায়রামানন্দ-জয়দেব প্রমুখ অপ্ৰাকৃত কবিগণের হুমধুর পদাবলী প্রভৃতি ব্যাখ্যা দ্বারা প্রেম-প্রচারণ-কার্য্য তাঁহার পরম-গম্ভীর নিরবচ্ছিন্ন চরিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

তিনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস-রচিত বেদান্ত-সূত্রের পরম গম্ভীর অথচ অকৃত্রিম চিহ্নিলাসপূর্ণ অন্তর্নিহিত আশয়, যাহা শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিহার্ক, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য্য, গোড়ীয়াচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি প্রতিভাশালী অতিমর্ত্য আচার্য্যগণের টীকা ও ভাষ্যে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইসকল ক্রম-বৈশিষ্ট্য-সমূহ স্থাপনমুখে কেবলাদ্বৈত-বাদরূপ ধ্বাস্ত-মতবাদের বিরুদ্ধে সিংহ-বিক্রমে হুঙ্কার করিয়া সকলপ্রকার অপমতবাদকে অপসারিত করিয়াছিলেন। এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ নিগূঢ় অপ্ৰাকৃত শব্দ ও সিদ্ধান্ত-সমূহকে অত্যন্তুতভাবে আবিষ্কারপূর্ব্বক তাঁহার প্রোজ্জ্বল-প্রভা প্রদর্শনে যিনি মায়াবাদাদি সকল প্রকার তমোরাশি বিদূরিত করিয়াছেন, তথা সমগ্র শ্রীবেদের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃ উজ্জলনীলমণির স্নিগ্ধালোকে সমগ্র জগৎ স্নিগ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কথামৃত বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই অমনোদয়-করুণার ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন !

শ্রীমদ্ভাগবতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্যই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিপাত্ত সিদ্ধান্ত। তাহাই গোড়ীয়া-বেদান্তাচার্য্য শ্রীজীব-গোস্বামী, শ্রীল বলদেব, শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি তত্ত্বাচার্য্যগণ সমগ্র জগতের ভাগ্যে পরম বাস্তব-মঙ্গল বিস্তার করিয়া অপার করুণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরে সমগ্র আচার্য্যগণের গুরুত্বের বৈশিষ্ট্য ও বদান্ততা মূর্ত্তিমন্তরূপে প্রকটিত ছিল।

শ্রীকৃপাভিঃবিগ্রহ শ্রীবার্ধভানবী-দয়িতদাস প্রভু রাধাদাস্তের চমৎকারিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সেবা-বরণের জন্ত অহরহঃ বলিতেন;—

(1) Just adjust yourself truly and properly, for being dovetailed with the gratification of the senses of

the Absolute Truth—Lord Sri Krishna. * * * * (১)

(২) Godhead or Krishna has reserved the absolute right of not being exposed to human senses. (২)

(৩) Mahaprabhu comes to establish service through subodination to Srimati Radhika. (৩)

(৪) Sri Krishna-chaitanya, identical with Sri Krishna with his consort Barshavanabi. (৪)

(৫) He has advised us * * to direct our services to the **Adhokshaja** ; and in that case our feeble limbs and senses cannot claim to approach Him unless we have a true serving mood. (৫)

শ্রীল প্রভুপাদ বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট অমুক্ণ হরিকথা-শ্রবণ ও বৈষ্ণবতার বাস্তব আচরণসমূহে মূর্তিমন্ত আদর্শ-সমূহ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রৌঢ় যৌবনে অবধূতকুল-চুড়ামণি পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রূপাভুগ-ভজন-চেষ্টাসমূহ সর্বক্ণ সন্দর্শনের মণিকাঞ্চন-সংযোগ তাঁহার সেই নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্য স্বরূপে যেন শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়-দয়া-শক্তিকে সর্বকল্য পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

(১) নিত্যসত্য স্বরাট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তোষণের নিমিত্ত তুমি তোমাকে যথাযথভাবে সত্যসত্যই নিযুক্ত করিবে।

(২) কাহারও পার্থিব ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অধীন না হওয়ার শক্তি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিহিত রহিয়াছে।

(৩) শ্রীমতী রাধিকার দাস্তে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইংজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(৪) মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততম্।

(৫) তিনি আমাদিগকে সেই অধোক্ণ-তত্ত্বের উদ্দেশ্যে-যাবতীয় সেবা-প্রবৃত্তি প্রদাবিত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন ; এবং তাহাতেই অর্থাৎ প্রকৃত সেবানুষ্ঠান-ক্রমেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, নচেৎ আমাদের অসম্পূর্ণ প্রাকৃত অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলে সন্ন্যাস-লালা প্রচার করিয়াছিলেন। গৌরশক্তি এই মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা-প্রচার-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শ্রীমন্মাহাপ্রভুর প্রকট-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে সন্ন্যাস-গ্রহণের-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণী বিস্তারের জন্ত ইনি বঙ্গীয় ১৩২৪ সালের ১৩ই চৈত্র ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌরজন্মবাসরে সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণপূর্বক শ্রীধাম মায়াপুরে ব্রজপতনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-গান্ধারিকা-গিরিধারী-বিগ্রহ স্থাপন ও থাকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেইদিন হইতেই বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী-সংকীৰ্তনের তুন্ডুভি বাজিয়া উঠিল। এই তুন্ডুভির নির্ঘোষ আজ পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতেই শ্রীচৈতন্যবাণী উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র সঞ্চারিত হইবে—এই ব্যাসবাণীর প্রকৃত সার্থকতা শু বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দিব্য চরিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিশ্রীপাণ দামোদর মহারাজ

শ্রীগৌরভক্তের মহিমা

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদি-দুস্ত্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪।২২)

(১)

চারি বর্ণাশ্রম, ধর্ম্ম আচরণ,
আর তীর্থ পর্য্যটন।
শ্রীবিষ্ণু পূজন, বেদ বিচারণ,
করে যদি কোনজন ॥
তথাপি সে-জন, লভে না কখন,
বেদের দুস্ত্রাপ্য ধনে।
শ্রীগৌর-ভকত, তাঁর প্রিয় যত,
চরণ-সেবন বিনে ॥

(২)

ভকত চরণ, করিলে ধারণ,
কৃষ্ণেতে ভকতি হয় ।

ভকতি প্রভাবে, মায়িক বৈভবে,
আসক্তি নাহিক রয় ॥

জড় অভিমান, করিয়া বর্জন—
বৈষ্ণব দাসের দাস ।

হইতে শকতি মাগে মুচমতি—
সতত ভকত-পাশ ॥

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

৮-৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগুরু-গৌরাজের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীমথুরা-পরিক্রমা

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় দেখা যায়—
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে সঙ্গে লইয়া যমুনার
পূর্বতীরস্থ (১) বৃন্দাবন, (২) মধুবন, (৩) তালবন, (৪) কুমুদবন, (৫) বহুলা
বন, (৬) কাম্যবন, (৭) খদিরবন, ও পশ্চিমতীরস্থ (৮) ভদ্রবন, (৯) ভাণ্ডির
বন, (১০) বেলবন, (১১) লৌহবন ও (১২) মহাবন—এই দ্বাদশ বনযুক্ত
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। দ্বাদশ-বন ভ্রমণ-কালে তিনি সর্বপ্রথমে
মথুরা পরিক্রমা ও দর্শন করেন। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদও গৌর-লীলা অনুসরণে
ইং ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে মথুরানগরী হইতেই বিরাট পরিক্রমা পরিচালনা
করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিও তজ্জন্ম তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ
করিয়া সর্বপ্রথমে মথুরা দর্শনমুখে দ্বাদশ-বনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার
সুভারম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য যাত্রিগণের সুবিধার্থ বিশেষ অনিবার্য্য কারণবশতঃ
আপাত-দর্শনে দুই একস্থানে পরিক্রমা-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করা
গেলেও, সমিতি সর্বতোভাবে শ্রীগুরুবর্গের অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীমথুরা পরিক্রমার প্রথম দিবস

২৩শে অক্টোবর, ১৯৫১, ৫ই কার্তিক, ১৩৫৮, মঙ্গলবার—সকাল ৭টার সময় সুসজ্জিত শিবিকারূঢ় শ্রীশিগুরুগোরাঙ্গের বিজয়-বিগ্রহের অমুগমনে বিরাট সঙ্কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-খোল-করতালাদি বিবিধ বাद्यযন্ত্র ও বিচিত্রবর্ণের পতাকাশোভিত শোভাযাত্রা মথুরা-নগরীর রাজপথ দিয়া পরিচালিত হইতে থাকিলে স্থানীয় জনসাধারণ উহা দর্শন করত চমৎকৃত হন ও শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পরিক্রমা-সজ্জের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। যাত্রিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অর্চাবিগ্রহের ও তাহার প্রণয়ি-ভক্ত ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের আমুগত্যে মথুরার বিশ্রাম ঘাট, ধ্রুবঘাট প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে পবিত্র তীর্থজল শিরে ধারণ করেন।

শ্রীমথুরায় ২৪টা ঘাটের মধ্যে বিশ্রামঘাটের দক্ষিণে দ্বাদশটি ও তাহার উত্তরে দ্বাদশটি ঘাট অবস্থিত। তন্মধ্যে উত্তরদিকের ঘাটসমূহ :—(১) মণি-কর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড, (৩) সংঘমনতীর্থ, স্বামীঘাট বা বাসুদেবঘাট, (৪) ধারা-পতন-তীর্থ, (৫) নাগতীর্থ, (৬) বৈকুণ্ঠঘাট, (৭) ঘণ্টাভরণ-ঘাট, (৮) সোমতীর্থ বা গো-ঘাট, (৯) কৃষ্ণগঙ্গা, (১০) চক্রতীর্থ, (১১) বিঘ্নরাজ-ঘাট, (১২) দশাশ্বমেধ ঘাট। বিশ্রামঘাটের উত্তরদিকে ক্রমশঃ দর্শনীয় স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি :—শ্রীগতশ্রম-বিগ্রহ, শ্রীবরাহদেব, শ্রীপদ্মনাভজীউ, শ্রীবিহারীজীউ, শ্রীমথুরা-দেবী, শ্রীদীর্ঘবিমুখ, শ্রীগণ্ঠেশ্বর মহাদেব, কুজাকূপ, মহাবিষ্ণেশ্বরী, মহাবিষ্ণুকুণ্ড, সরস্বতীকুণ্ড, মহালক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি।

বিশ্রামঘাটের দক্ষিণ-দিকের ঘাটগুলি, যথা :—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিক্রুত, (৩) গুহ, (৪) প্রয়াগ, (৫) কঙ্কাল, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়াল ঘাট, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ এবং (১২) বোধ-তীর্থ। অবিমুক্ত তীর্থ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে নিম্নলিখিত স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনীয় :—স্বমঙ্গলাদেবী, বীরভদ্র মহাদেব, শ্রীশক্রব্র, কংসনিকন্দন (কংস-ভবন), দেবকীনন্দন, বৎসকূপ (হোলিদরজার বহির্ভাগে), রঙ্গেশ্বর মহাদেব বা সিদ্ধমুখ-রুদ্র, সপ্তসমুদ্র-কূপ, শিবতলি, বালভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব, ভূতেশ্বর মহাদেব, জ্ঞানকবরী, পোতরা কুণ্ড, শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান বা যোগপীঠ, শ্রীকেশবদেব।

প্রয়াগঘাটে দেবীমাধবের মন্দির বিরাজমান। বিরোচন-পুত্র বলি-মহারাজ সূর্য্যতীর্থে ভজন করেন। “বটস্বামী” সূর্য্যের নামানুসারে বটস্বামী-তীর্থ। ধ্রুবতীর্থ উত্তানপদ-পুত্র ধ্রুবের তপস্যা-স্থান। ইহার দক্ষিণে ভগবৎপ্রিয়

কৃষ্ণভক্তিপ্রদাতা ঋষিতীর্থ অবস্থিত। চক্রতীর্থে বিখ্যাত অম্বরীষ-টীলা আজও ভক্ত ও ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। যমুনার এইসকল ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নাননীলা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—
“যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।”

বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দর্শন করত যাত্রিগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানে মথুরার অধিদেব শ্রীকেশবদেবকে দর্শন করেন। এস্থলে কিছুক্ষণ কীর্তনের পর যাত্রিগণ ‘ভক্তিরত্নাকর’ হইতে স্থানমাহাত্ম্য শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন।

শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দ্বাদশ-বন-সমন্বিত পদ্মাকৃতি শ্রীমথুরা ধামের কর্ণিকারে ভক্তদুঃখাপহারী শ্রীকেশবদেব অধিষ্ঠিত। পদ্মের পূর্বপত্র শ্রীবিপ্রান্তিদেব, পশ্চিমপত্র শ্রীহরিদেব, উত্তরপত্র শ্রীগোবিন্দদেব, এবং দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহদেব বিরাজিত আছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্যমূর্তিরূপে যেরূপ নীলাচলে ‘পুরুষোত্তম জগন্নাথ,’ প্রয়াগে ‘বিন্দুমাধব,’ মন্দারে ‘মধুসূদন,’ কেরলদেশে দাক্ষিণাত্যে আনন্দারামে ‘বাহুদেব,’ পদ্মনাভ ও ‘জনার্দন,’ বিষ্ণুকাকীতে ‘বরদরাজ বিষ্ণু,’ মায়াপুরে ‘হরি,’ মতান্তরে ‘গৌরহরি,’ তদ্রূপ মথুরায় শ্রীকেশবদেবের নিত্য অধিষ্ঠান।

প্রাচীন জন্মস্থানের উপরে যেস্থলে কেশবদেবের প্রাচীন মন্দির বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল, আরঙ্গজেবের অত্যাচারে তাহা ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে পরিণত হয়। ইহারই সংলগ্নবর্তী স্থানে আরঙ্গজেবের নির্মিত বৃহদাকার মসজিদ আজও দণ্ডায়মান থাকিয়া যবনগণের হিন্দুবিষেষের নিষ্পন্ন কাহিনী বহন করিতেছে। এই মসজিদের পশ্চিমদিকে সমতল-ভূমিতে নির্মিত দেবালয়ই পরবর্তীকালে আদিকেশবের মন্দির। নির্বিশেষবাদী নাস্তিকগণ চিরদিনই ভগবান্ ও ভগবৎ-শক্তিকে ধ্বংস করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃত-বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। অহিন্দু সম্রাট বা বিধর্ষিগণের অত্যাচারে শ্রীভগবানের জন্মভূমি কখনই লুপ্ত হয় না। রাবণের ছায়াসীতা-হরণের তায় উহা বৃথা প্রয়াস মাত্র। তুরীয় ভগবান্ স্লেচ্ছ বা বিধর্মীর ইন্দ্రిয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন—তিনি তাহাদের নির্বিশেষ চেষ্টাকে ধিকৃত করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত।

নিয়ামক-মহারাজের হরিকথা

মথুরা-পরিক্রমার প্রথম দিবস সন্ধ্যাকালে পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজ ত্রিচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে ব্রজ-পরিক্রমায় যাত্রিগণের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করেন। নিম্নে তাহার সারমর্ম প্রদত্ত হইল—

তিনি বলেন—“ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে-যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া”—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই গীতির তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন।” ভারনার পথ অতিক্রমপূর্বক বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে মধুরাদি মুখ্যরস প্রকাশিত হইলে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান সম্ভব হয়। সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ই প্রকৃত ‘বন’ নামে কথিত। ভাবনাবত্নরূপ মনোধর্ম পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কখনই অপ্রাকৃত রসের অধিকারী হইতে পারা যায় না। দ্বাদশ বনে যে রস-লীলা, “রসো বৈ সঃ” পুরুষ ব্রজেন্দ্রনন্দনই তাহার একমাত্র মালিক। ষাঁহারা সেই বনে বা ব্রজে বাস করেন, তাঁহারাি প্রকৃত ব্রজবাসী। কিভাবে সর্বোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা যায়, তাহা তাঁহারাি স্বর্নুভাবে অবগত আছেন। গো, বেত্র, বিষণ, বেণু; রক্তক, চিত্রক; স্নদাম, বহ্নদাম; নন্দ-যশোদা; ব্রজদেবীগণ—সকলেই বিভিন্ন রসে সেই অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত। কি-প্রকারে ভগবানকে সর্বতোভাবে স্থখী করিতে পারা যায়—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রকার নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসীর আনুগত্যেই আমাদের ব্রজে বাস করা উচিত। শাস্ত্রকারগণ চিন্ময় বিচারসম্পন্ন ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণকেই প্রকৃত ‘ব্রজবাসী’ বলিয়াছেন। মহাজনগণ বলেন—অপ্রাকৃত বস্তু কখনই মায়িক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। স্মতরাং প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদির দ্বারা আমরা সেই চিন্ময় বস্তুকে কি করিয়া বুঝিয়া লইব ? তাই ব্রজবাসিগণের রূপা-প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহাদের রূপা-প্রভাবে শ্রীধামের উপরিভাগ হইতে মায়াজাল অপসারিত হইলে আমরা শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমাদের গুরুবর্গ জানাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ-মঞ্জরী ও রতি-মঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতীত ব্রজ ও ব্রজরাজনন্দনের দর্শন ও সেবা-লাভ অসম্ভব। তাই শ্রীনয়নমণি-মঞ্জরী ও শ্রীকমল-মঞ্জরীর অনুকম্পায় আমরা তাঁহাদের রূপা প্রার্থনা করিতেছি।

স্বামিজী-মহারাজ আরও বলেন—ব্রজের তৃণ-গুল্ম-লতা সকল বস্তুই চিন্ময় ও

ভগবৎলীলার সহায়ক। যদি বন ভ্রমণকালে উহাদিগকে আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণে লাগাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বন-ভ্রমণ না হইয়া আমাদের অপরাধই সঞ্চয় করা হইবে। তজ্জগুই তীর্থযাত্রী সাধারণের পক্ষে ব্রজমণ্ডলের বৃক্ষ-লতাদির অঙ্গহানি করা দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানকার প্রত্যেক কুণ্ডই—তীর্থস্থান। সেজগু সাধারণ পুষ্করিণীর ত্রায় ঐগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ। ভোগময় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আমাদের স্বার্থ বন-ভ্রমণ হইবে না।

স্বামিজী-মহারাজ আরও জানান—যেস্থলে আমরা অবস্থান করিতেছি, ইহার নাম—মথুরা-পুরী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানেই আবিভূত হইয়া নির্কিংশেষবাদের প্রতীক কংসকে ধ্বংস করিয়াছেন। রজকরুণী কশ্মজড়-স্মার্তবাদও এইস্থানে নিরস্ত হইয়াছে। নির্কিংশেষবাদিগণ—অহংগ্রহোপাসক; চরমে ‘আমি প্রভু হইব’—ইহাই তাহাদের বিচার। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই—‘মায়ী’। শক্তি মনুকে রাখিয়া শক্তির ধ্বংস-সাধন, আবার শক্তিকে রাখিয়া শক্তিমৎ-তত্ত্বের বিনাশ-চেষ্টা—এই দুইটাই আত্মরিক প্রবৃত্তি। শক্তি ও শক্তিমৎ-তত্ত্বের অবমাননা লক্ষ্য করিলেই ভগবান্ ভোগী, ত্যাগী ও জ্ঞানি-দম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়া ভক্তগণকে তাঁহার স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

পরিশেষে বেদান্ত মিতির নিয়ামক-মহারাজ বলেন—শরীরের স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্যতার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে গেলে আমাদের ব্রজপরিক্রমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। ভালরূপ খাওয়া-দাওয়া এবং উত্তম স্থানে বিশ্রামাদির ব্যবস্থা লইয়াই আমাদের যেন মূল্যবান্ সময়টুকু অতিবাহিত না হয়। এবিষয়ে আমরাই যতদূর সম্ভব সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করিতেছি। দুইবেলা আপনাদের আমরা ভগবৎ-প্রসাদ দিয়া থাকি। উহা আপনারা অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করিতেছেন মনে করিলে খুব ভুল করিবেন। টাকাপয়সার বিনিময়ে কিছু প্রসাদ পাওয়া যায় না। প্রসাদ—ভগবৎ-অমুগ্রহ, ইহা সর্বদা মনে রাখিবেন। এই বিদেশে আমাদের উপযোগী চাউল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুপ্রাপ্য হইলেও আমরা উহা সংগ্রহের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। তথাপি ভগবান্ যখন যেক্রপ প্রসাদ ব্যবস্থা করেন, তাহাই আমাদের প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। আমার মনে হয়, অনেক যাত্রীই এই ব্রজে অনেকবার আদিয়াছেন; তাঁহারাও এবিষয়ে সমিতির সেবকগণকে সন্ধানাদি দিয়া সাহায্য-সহায়ভূতি করিলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। রেশন কন্ট্রোলের যুগ—সুতরাং সর্বত্রই আইন রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নিকাশ করিতে হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি— (ক্রমশঃ) —প্রকাশক কর্তৃক সংগৃহীত

বেদ-বর্ষ

আমরা ক্রমে-ক্রমে চন্দ্র-পক্ষ বর্ষদ্বয় মহানন্দে অতিবাহিত করিয়াছি। গত নৈত্র-হায়নে নারসিংহ-প্রহ্বারে দক্ষিণদেশীয় চিন্তাশ্রোত-প্রসূত শাস্ত্র-‘বৃহ-স্পৃংহের’ পক্ষদ্বয় বিদীর্ণ করিয়া সেবক-তত্ত্বের অতিবাড়ী চিন্তাশ্রোত প্রশমিত হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর কনক-কামিনী-লোলুপতা বিধ্বংস হওয়ার শ্রীপত্রিকার সেবকগণ প্রহ্লাদ-লাভ করিয়াছেন। বর্তমান বেদ-বর্ষে ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সেবক শ্রীনারসিংহ-প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনারদ-ব্যাসাদি-ভাগবন্ত-ধারায় নিম্নাত শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত আলোচনা-দীপ্তিতে বেদবিরোধী শূত্রবাদী বা বেনামবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শ্রমণগণের বিচার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিশ্ব-বাসীর নিকট-বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য উপস্থিত করিবেন।

যেদ্বয় গণিত শাস্ত্রের ১,২,৩ সংখ্যাকে ক্রমান্বয়ে ‘চন্দ্র,’ ‘পক্ষ’ ও ‘নৈত্র’-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, সেইপ্রকার চতুর্থ সংখ্যা বিজ্ঞাপনের জন্ত ‘বেদ’-শব্দ ব্যবহৃত হয়। বেদ শব্দে চার (৪) সংখ্যা বিজ্ঞাপনের গুঢ় তাৎপর্য আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বেদের নাম ‘ত্রয়ী’ হইলেও ইহা চারি-সংখ্যাবাচক। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারিবেদের নাম ‘ত্রয়ী’। ইহা বেদেরই একটি তাৎপর্য। এক (১) চন্দ্রের উল্লেখ থাকিলে তাহাতে দ্বাদশমাসে দ্বাদশ আদিত্যের তেজ-প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ‘এক’-এর মধ্যে বহুত্বের অবস্থিতিই অদ্বিতীয়ত্ব। ঠাহারা একের মধ্যে বহুর অবস্থিতি অস্বীকার করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই ত্রয়ী-বিরোধী হইতে বাধ্য হন। ত্রিস্থের অন্তর্গত চতুঃসংখ্যা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত ‘বেদ’—এই শব্দের ধাতুনিম্পন্ন অর্থ গ্রহণ করিতে গেলেও, বেদ-শব্দে নিত্যসত্তাসহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-রূপ চারিটি প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহাই চারিবেদের অমুসরণ। বেদ-শব্দ—বিদ্ ধাতু কর্তৃবাচ্যে অথবা কস্মবাচ্যে অন্ বা অন্ প্রত্যয় করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে। কর্তৃ-বাচ্যে ‘বেদ’-শব্দের আভিধানিক অর্থ—‘নিষ্কৃ’; ‘ব্রহ্ম’ তাহার আপেক্ষিক অর্থ মাত্র। বিদ্ ধাতু চারিপ্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পাণিনি প্রভৃতি বৈকরণিগণ বলেন—

বেত্তি বেদ বিদো জ্ঞানে বিত্তে বিদো বিচারণে।

বিদ্বতে বিদ সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে ॥

অর্থাৎ বিদ্ ধাতুর অর্থ—জ্ঞান (১), বিচারণ (২), সত্তা (৩) ও লাভ (৪) সুতরাং বেদ-শব্দে জ্ঞান, বিচার, সত্তা ও লাভ—এই চারিটি তত্ত্বকেই লক্ষ

করিয়া থাকে। এই চারিটি তত্ত্বের মধ্যে ‘সত্তা’ বস্তুটি নিত্যসত্তা-জ্ঞাপক অর্থাৎ বিদ্ধ্যাতুর অণু তিনটি অর্থের নিত্য ও সনাতন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ষাঁহার ঐ ত্রয়ীর অথবা বেদের উক্ত ‘জ্ঞান,’ ‘বিচার’ ও ‘লাভ’-রূপ তত্ত্বত্রয়ের নিত্যসত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারাই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা প্রকাশ-বৌদ্ধ। বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের নিত্যসত্তা প্রচার করেন। জ্ঞান-অর্থে—সম্বন্ধজ্ঞান বা অদয়জ্ঞান, বিচারণ-অর্থে—অভিধেয়-তত্ত্ব, লাভ-অর্থে—প্রয়োজন বুঝায়। এবং এই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনমূলক তত্ত্বের নিত্যত্ব ও সনাতনত্ব বিদ্ধ্যাতু হইতে যে বেদ-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রকাশ পায় এইজন্তই নিত্যসত্তা-সমন্বিত বেদের অপর নাম—ত্রয়ী। সত্তা সর্বক্ষেত্রেই অবশ্য স্বীকৃত বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে চতুর্থ সংখ্যায় তাহার গণনা করা হয় নাই। ষাহা সর্ববাদিসম্মত, তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন। মূর্তিমন্ত বেদ-হৃদয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অপ্ৰাকৃত লেখনী-ধারায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—“অদয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ত্রয়ে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন।” “অদয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।” ইহাই বেদ-শব্দের জ্ঞান-অর্থজ্ঞাপক। ‘অভিধেয়’ ও ‘প্রয়োজন’ সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ (টঃ চঃ আঃ ৮ ১৫)

ইহাই বেদ-শব্দে ‘বিচারণ’-অর্থে অভিধেয়-তত্ত্ব—কৃষ্ণভক্তি এবং ‘লাভ’-অর্থে প্রয়োজনমূল্য—কৃষ্ণপ্ৰীতিরূপা চমৎকারিতা। সম্বন্ধ-তত্ত্বে অদয়জ্ঞান কৃষ্ণ, অভিধেয়-তত্ত্বে ভগবদনুগ্রহের বিচার ও প্রয়োজন-তত্ত্বে কৃষ্ণপ্ৰীতির চমৎকারিতা—এই তত্ত্বত্রয় নিত্যসত্তাবিশিষ্ট। ইহার কোনপ্রকার ধ্বংস বা বিলোপ সাধিত হয় না। ইহাই বেদের সত্তাজ্ঞাপক। ষাঁহার প্রয়োজন লাভ করিয়া অভিধেয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহার অবৈদিক। অথবা ষাঁহার কেবল-জ্ঞানের বিচার করিয়া ‘জ্ঞেয়’ এবং ‘জ্ঞাতার’ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা উহা প্রাতিভাসিক ও ক্ৰমিক বলিয়া মনে করেন, তাহারও অবৈদিক।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার দ্বারা—সাক্ষাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ-দ্বারা। বর্তমান বেদ-বর্ষে অনেক অনুসন্ধানের ফলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের “নিবেদন”-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ “সজ্জনতোষণী” পত্রিকা হইতে প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান সংখ্যায় ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রসাদ লাভ করিতেছি। পাঠকগণ! ঐ প্রবন্ধটাই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদকীয় আদর্শ বলিয়া জানিবেন। তিনি শ্রীপত্রিকার

৯ম পৃষ্ঠায় আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—“আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব সাধুদিগের রচনা এবিষয়ে অধিক আদৃত হইবে।” আমরা এই আদর্শ অবলম্বন করিয়াই নিজ প্রবন্ধ অপেক্ষা আচার্য্যবর্গের স্তোত্রাদি, শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধ সর্বোত্তম মূদ্রিত করিয়াছি ও করিতেছি এবং এই ধারাই সর্বতোভাবে বজায় রাখিতে চেষ্টা করা হইবে।

বর্ত্তমান সংখ্যা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাক্ষের আবির্ভাব-তিথি লইয়াই প্রকাশিত হইতেছে—ইহা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গৌরব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশ-অনুসারে শ্রীগুরু-গৌরাক্ষের সেবার উদ্দেশ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সহযোগে নবদ্বীপধাম পরিক্রমা সম্পাদিত হইয়াছে. ৩ হইবে। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রাধান্যহেতু আমরা সর্বপ্রথমেই কীর্ত্তনাখ্যা শ্রীগোক্রমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া থাকি; যেহেতু এই কীর্ত্তনাখ্যা-দ্বীপে গোক্রমে শ্রীস্বরভিকৃষ্ণে ব্রজরস-আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবস্থান করিতেছেন। আমরা তাঁহার স্বরচিত অপ্রাকৃত পবিত্র স্বহস্ত-লিখিত একটী শ্লোক ইহার নিদর্শন-স্বরূপ মুদ্রিত করিয়া বেদ-বর্ষের প্রারম্ভিক বক্তব্য সমাপন করিলাম।—

সুখ সাবদুপধরে গোদ্রাম গোড়ীতীথে
বসতি সুবড়িকুঞ্জে ওক্তি সুবর্ষবিনোদঃ।
মুগল চরন সর্ব সৌখ্যনাভাসমুদ্রসৌ-
ব্রজ কম বসি কাম্যঃ সাদ সাদাম্রমেহু।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদনুসারে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীব্যাসপূজা ও জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণবের সম্প্রদায়ে, এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন শাখায়ও আজকাল যেক্রপ ব্যাসপূজা-

পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়, তাহা হইতে শ্রীবেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কলিযুগপাবনাবতীরী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীবাস-অঙ্কনে প্রথম এই ব্যাসপূজার প্রচলন করেন। কালে লোকসমাজে উক্ত পূজা-পদ্ধতি বিলুপ্ত হইলে পর প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরই বঙ্গদেশে এই ব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্তন করেন। শ্রীবেদান্ত সমিতি শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, মে অধ্যায়-প্রোক্ত এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ও প্রবর্তিত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিরই সর্বতোভাবে অনুসরণ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের স্ব-স্ব জন্মদিবসে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে পূজাপঞ্চক-সমন্বিত গুরুপূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। তদনুসারে গত ১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের প্রকট-বাসরে তাঁহারই পৌরোহিত্যে ও নির্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ কর্তৃক বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুসারে পূজাপঞ্চক-তত্ত্বপঞ্চকাদির ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ প্রভৃতি যথারীতি সম্পাদিত হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যপ্রবর স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংশোধিত-পরিবদ্ধিত “শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ” ব্যাখ্যামুখে সমাগত দর্শক, শ্রোতৃমণ্ডলীকে গুরুতত্ত্ব ও পূজাপঞ্চকাদি সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করেন। সুউচ্চ আসনোপরি বিরাজিত চন্দনচর্চিত পুষ্পমাল্য-বিভূষিত শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য-মূর্তির আরাট্রিক সম্পন্ন হইবার পর শ্রীমূর্তি গর্ভমন্দিরের সিংহাসনে শুভবিজয় করিলে, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ সর্বপ্রথমে পর পর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যবরের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং সমিতির আশ্রিত ও অনুগত ভক্তগণকে আচার্য্যবরের শ্রীচরণে পুষ্পাঙ্গুলি প্রদানের নির্দেশ দান করেন। অতঃপর দীক্ষিত ও নামাশ্রিত শ্রীমঠের ভক্তগণ, পরে সমাগত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যথাক্রমে পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করেন। মূল মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগুণের আরাট্রিক হইবার পর, সমাগত ভক্তগণকে পুরী-হালুয়া-ফল-মিষ্টান্নাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে আচার্য্যপ্রবরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে “গুরুপরম্পরা,” “গুরুষ্টক,” “নিতাই-পদকমল,” “গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া,” “ঠাকুর বৈষ্ণবপদ,” “এইবার করুণা কর”

প্রভৃতি গুরুবৈষ্ণব-মহাত্ম্যসূচক স্তব-স্তোত্র ও মহাজন-পদাবলী কীর্তিত হয়। সভাপতি-মহারাজ সভায় অধিষ্ঠিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। অতঃপর নিয়ামক-মহারাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন-স্থান হইতে প্রেরিত বিভিন্নভাষায় লিখিত অভিনন্দনাদি (৭৩ ও ৭৩) সভাস্থলে পাঠ করা হয়। প্রথমেই শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারীর সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত “পুষ্পাঞ্জলিঃ” পাঠ করেন। পরে শ্রীপত্রিকার কার্যাব্যক্ষ শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী-লিখিত “শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলি” ও খড়াপুর হইতে প্রেরিত শ্রীহরিদাস রায়-লিখিত “দীনের অর্থ্য” শ্রীপত্রিকার প্রকাশক-কর্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী-লিখিত “দীনের ভক্তি-কুসুমাজলি” তৎকর্তৃক পঠিত হইলে, শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রচার-সম্পাদক শ্রীগোরনারায়ণ ভক্ত-বান্ধব মহোদয় “আচার্য্য-প্রশস্তি” নামক হিন্দি ভাষায় লিখিত একটি উপদেশ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজের আদেশে শ্রীগোরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ সমিতির আচার্য্যপ্রবরর গুরু-মনোহীষ্ট-প্রচারময়ী জীবনী ও সদগুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে নিয়ামক-মহারাজ বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা ও অভিনন্দনাদির উত্তরে যে মূল্যবান সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা আগামী সংখ্যায় “নিয়ামক-মহারাজের বক্তৃতা” শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। মহামন্ত্র কীর্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদের আরাট্রিক সম্পন্ন হইলে অঙ্কুর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২রা ফাল্গুন, শুক্রবার—সকালে দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী অনুযায়ী পাঠ-কীর্তনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও শাস্ত্রযুক্তিমূলে উহার অত্যদ্বুত বাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ পরিতৃপ্ত হন।

৩রা ফাল্গুন, শনিবার—জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে অতি প্রত্যুষেই মঙ্গলারাত্রিকান্তে “গুরুপরম্পরা,” “পঞ্চতত্ত্ব,” “গুরুদেবে ব্রজবনে,” “শ্রীরূপমঞ্জরীপদ” প্রভৃতি কীর্তনের পর “শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী” ও তল্লিখিত বিবিধ প্রবন্ধ-উপদেশাবলী পঠিত ও আলোচিত হয়।

অুচ্চ সকাল হইতেই শ্রীব্যাসপূজার বিবিধ আয়োজন চলিতে থাকে। কেহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত পুষ্প সংগ্রহে বহির্গত হন, কেহ বা শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর ও বহিঃপ্রাঙ্গন ঘট-আম্রপল্লবাদি এবং বিচিত্রবর্ণের পতাকা প্রভৃতি মাঙ্গলিক

দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করিতে থাকেন। সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমন্দিরের জগমোহনে সুসজ্জিত মণ্ডপোপরি অর্চালেখ্য-মূর্তিতে শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করতঃ



কৃপাপূর্বক উপস্থিত ভক্তগণকে দর্শন দান করিতে থাকেন। তাঁহার অর্চন ও ভোগ-রাগাস্তে তদীয় শ্রীচরণ-কমলে অঞ্জলি-প্রদান আরম্ভ হয়। পূজনীয় নিয়ামক-মহারাজের অহরোধে পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজ সর্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের অহুকম্পিত জনগণের অঞ্জলি প্রদানের পর শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ সমিতির শিষ্যগণকে প্রকট-আচার্য্যের আহুগতো পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নির্দেশ দেন। তদনুসারে মঠবাসী ও গৃহস্থ দীক্ষিত, নামাশ্রিত ভক্তগণ এবং অবশেষে স্ত্রী-পুরুষ-নিবিশেষে সমাগত সজ্জনমণ্ডলী সকলেই আচার্য্যবরের আহুগতো জগদগুরু শ্রীল

প্রভুপাদের শ্রীপাদপদে অঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিকের পর মূল মন্দিরে আরতি সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে মহামহোৎসবের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। সমাগত শত শত দর্শক, ও ভক্তমণ্ডলীকে চতুর্বিধ রস-সম্বন্ধিত বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরায়ু ৪ ঘটিকার সময় শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ অভিনব বৃহৎ অর্চালেখ্য-মূর্তিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা করিয়া “শ্রীগুরুচরণপদ্ম,” “গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া,” “জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়” ইত্যাদি গীতিগুলি শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ সুললিত কণ্ঠে কীর্তন করেন।

অতঃপর সভাপতি-মহারাজের আদেশে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে বিভিন্নস্থান

হইতে ভক্তগণ-কর্তৃক প্রেরিত পুষ্পাঞ্জলি, অভিনন্দনাদি (গল্প ও পত্র) সভায় পঠিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-সজ্জের সভাপতি শ্রীপাদ অভয়-চরণাবিন্দ ভক্তিবাদান্ত মহোদয়-কর্তৃক এলাহাবাদ হইতে প্রেরিত, পুনঃ প্রকাশিত ইংরাজী পারমার্থিক মাসিক—“Back-To-Godhead” পত্রিকা পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ অঞ্জলি-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদকে অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ-লিখিত প্রবন্ধ “শ্রীশ্রীগুরুপূজা-প্রশস্তি” তিনি স্বয়ং পাঠ করেন। তল্লিখিত “দীনের পত্র-প্রসূনাঞ্জলি” শ্রীমজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী এবং কল্যাণপুর হইতে প্রেরিত শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত প্রবন্ধ “ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি” শ্রীগোরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী-কর্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর নারায়ণ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দাসাধিকারী-লিখিত “দীনের নিবেদন,” আনন্দপুরের শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী-লিখিত “সেবকের অনুবাচ্ঞা” শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমন্তকুমুদ সন্ত মহারাজ-লিখিত “দীনের প্রার্থনা” শ্রীগোর-নারায়ণ ভক্তবান্ধব পাঠ করেন। শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী-লিখিত “ভক্তি-কুসুমাজলি” ও বনগ্রাম-নিবাসিনী শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর “প্রার্থনা” তৎকর্তৃক পঠিত হয়। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকগণের পক্ষ হইতে শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী-লিখিত “অপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি” তিনি স্বয়ং পাঠ করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজের ইচ্ছা ও নির্দেশানুসারে নারায়ণ হইতে প্রেরিত শ্রীমতী রাধারাণী গুহরায়-লিখিত “সেবিকার কৃপা-প্রার্থনা” নামক কবিতাটি কুমারী আভারাণী দত্ত পাঠ করেন। উক্ত পুষ্পাঞ্জলি ও অভিনন্দনাদি আগামী সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

অভিনন্দনাদি পাঠ সমাপ্ত হইলে, পরিশেষে পূজনীয় সভাপতি ও নিয়ামক-মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাসপূজা-প্রসঙ্গ আলোচনামুখে যে গভীর তত্ত্বোপদেশপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহা সময়-স্বযোগমত প্রকাশের বাসনা রহিল। মহামন্ত্র কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জগদগুরুর আরাত্রিক সময়ে সভাপতি-মহারাজের স্বরচিত “শ্রীল প্রভুপাদের আরতি” গীতিটি মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে কীর্তিত হইয়াছিল। গীতিটি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে)। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই অভূতপূর্ব শ্রীবাসপূজা-পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান দর্শনে স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ চমৎকৃত হন এবং নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করেন।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬ ; চৈত্র—১৩৫৮

১ বিষ্ণু, ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ, বুধবার—কৃষ্ণ-প্রতিপদ রা ১২।২০ । পূর্বাহ্ন ৯।৪৮ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ । শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ও সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

৩ বিষ্ণু, ১ চৈত্র, ১৪ মার্চ, শুক্রবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া রা ১২।১৩ । কুমারহট্টে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীপাটে শ্রীমন্নমহাপ্রভুর আগমনোৎসব ।

৫ বিষ্ণু, ৩ চৈত্র, ১৬ মার্চ, রবিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী ১০।২২ । শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পঞ্চমী দোল । চম্পকহট্টে উৎসব ।

১১ বিষ্ণু, ৯ চৈত্র, ২২ মার্চ, শনিবার—কৃষ্ণ-একাদশী দি ৯।৪৪ । পাপ-বিমোচনী একাদশীর উপবাস ।

১২ বিষ্ণু, ১০ চৈত্র, ২৩ মার্চ, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৭।২৩ । দি ৭।২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ । শ্রীমন্নমহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভবিজয় স্মরণ-মহোৎসব ।

১৯ বিষ্ণু, ১৭ চৈত্র, ৩০ মার্চ, রবিবার গৌর-পঞ্চমী ১১।৩৭ । শ্রীল রামানুজাচার্যের আবির্ভাব ।

২৪ বিষ্ণু, ২২ চৈত্র, ৪ এপ্রিল, শুক্রবার—গৌর-নবমী প্রাতঃ ৬।৬ । শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব । শ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস ।

২৫ বিষ্ণু, ২৩ চৈত্র, ৫ এপ্রিল, শনিবার—গৌর-দশমী দি ৮।১০ । দিবা ৮।১০ মধ্যে শ্রীরাম-নবমীর পারণ ।

২৬ বিষ্ণু, ২৪ চৈত্র, ৬ এপ্রিল, রবিবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৫ । কামদা একাদশীর উপবাস ।

২৭ বিষ্ণু, ২৫ চৈত্র, ৭ এপ্রিল, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ১১।৪৪ । পূর্বাহ্ন ৯।৩৫ মধ্যে একাদশীর পারণ । শ্রীকৃষ্ণের দমনকারোপণ উৎসব ।

৩০ বিষ্ণু, ২৮ চৈত্র, ১০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—পূর্ণিমা দি ১।৫৯ । শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা ।

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীং মধুং মাধবমেব চ ।

রামঃ কপাস্থ ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন ।

পূর্ণচন্দ্র-কলামৃষ্টে কোমুদী-গন্ধ-বায়ুনা ।

যমুনোপবনে রেমে সেবিতো দ্বীপগৈবতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাসযাত্রা । শ্রীল বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর ও শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্বশ্চ ॥

অতঃ ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথাম রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৪র্থ বর্ষ

বাসুদেব, ৩ মধুসূদন, ৪৬৬ গৌরাক
রবিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৫৮; ইং ১৩৪৫২

২য় সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহ-স্তবঃ

[শ্রীল-শ্রীধরস্বামি-বিরচিতঃ]

- ১। জয় জয়াজিত জহগ-জঙ্গমাবৃতিমজামুপনীত-মৃগাপ্তম ।
ন হি ভবন্তমুতে প্রভবন্ত্যমী, নিগমগীত-গুণার্ণবতা তব ॥১॥
- ২। দ্রহিণ-বহি-রবীজমুখামরা, জগদ্বিদং ন ভবেৎ পৃথগুখিতম্ ।
বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজস্বমুর্জিত্তিরতো বিনিগতসে ॥২॥
- ৩। সকল-বেদগণৈরিত-সদগুণস্বমিতি সর্কমনীষি-জনা রতাঃ ।
অগ্নি স্তব্দগুণ-শ্রবণাদিভিস্তব পদ-স্বরগেন গতক্রমাঃ ॥৩॥

- ৪। নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি, শ্রবণ-বর্ণন-সংস্রবণাদিভিঃ ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং, দৃতিবহুচ্ছসিতং বিফলং ততঃ ॥৪॥
- ৫। অদংশশ্চ মমেশান ত্রায়ায়াকৃতবন্ধনম্ ।
অদজিষুসেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্তয় ॥৭॥
- ৬। ওষ্যাঅনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ ।
কদা মমেদৃশং জন্ম মাছুষং সম্ভবিষ্যতি ॥৯॥
- ৭। কাহং বুদ্ধ্যাদি-সংরুদ্ধঃ ক চ ভুগম্ন মহত্ত্বব ।
দীনবন্ধো দয়াসিদ্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ ॥১১॥
- ৮। যৎসম্বৃতঃ সদাভাতি জগদেতদসং স্বতঃ ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্ ॥১৩॥
- ৯। তপন্ত ত্যৈঃ প্রপত্তস্ত পর্কিতাদটন্ত তীর্থানি পঠন্ত চাগমান্ ।
যজন্ত যাগৈর্কিবদন্ত বাদৈহ র্নিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥১৪॥
- ১০। সংসারচক্র-ক্রকচৈর্বিদীর্ণমুদীর্ণ-নানাভবতাপতপ্তম্ ।
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং, ত্বমুদ্বর শ্রীনৃহরে ন্লোককম্ ॥১৬॥
- ১১। যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে, পদং মনো মে ভগবন্তভেত ।
তদা নিরস্তাখিল-সাধনশ্রমঃ, শ্রেয়সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥২০॥
- ১২। ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিদম্বনঃ ।
আঠৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছ-দার-স্বতাদিভিঃ ॥২১॥
- ১৩। মুকুটস্ত তদঙ্গসঙ্গমনীশং স্বামেব সক্ষিস্তয়ন্
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাপ্রমানাবসন্ ।
নিত্যং তন্মুখ-পঙ্কজাদিগলিত-ত্বংপুণ্যাগাথাযুত-
শ্রোতঃ-সংপ্রব-সংপ্রুতো নরহরে ন শ্রামহং দেহভূৎ ॥২২॥
- ১৪। উদ্বৃতং ভবতঃ সতোহপি ভুবনং সর্গৈব সর্পঃ শ্রজঃ
কুর্কং কার্ধ্যমপীহ কূটকনকং বেদোহপি নৈবৎপরঃ ।
অদৈতং তব সং পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা
বন্দে হৃন্দরমিন্দিরাহুত হরে মা মুকু মানানতম্ ॥২৩॥

১৫। মুকুট-কুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কণী,-পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ।
মহদহঙ্কৃতি-খ-প্রমুখং তথা, নরহরেন্ পরং পরমার্থতঃ ॥২৪॥

১৬। নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাদনগতা কাল-স্বভাবাদিভি-
ভীবান্ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ানুশীলয়ন্তী বহুন্।
মামাক্রম্য পদা শিরশ্চতিভরং সম্বদ্যস্ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোহস্মি নৃহরৈ ত্বমেব তাং বারয় ॥২৫॥

১৭। দণ্ড-শাসমিষেণ বঞ্চিত-জনং ভোগৈকচিত্তাতুরং
সমুহস্তমহনিশং বিরচিতোদ্যোগরূমৈরাকুলম্।
আজ্ঞালজ্জিনমস্তমস্তমতা-সম্মাননা-সম্মদং
দীনানাথ-দয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥২৬॥

১৮। অবগমং তব মে দিশ মাধব, ক্ষুরতি যম স্তম্বাস্তম্বসঙ্গমঃ।
শ্রবণ-বর্ণন, ভাবমথাপি বা-নহি ভবামি যথা বিধি-কিঙ্করঃ ॥২৭॥

১৯। ছ্যপতম্বো বিদুরস্তমনস্ত তে
ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রতিমৌলয়ঃ।
হুয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যাতো
জয় জয়েতি ভজে তব তৎপাদম্ ॥২৮॥

২০। সর্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-নিরাজিত-পদাম্বুজম্।
ভোগ-যোগপ্রদং বন্দে মাধবং কস্মি-নম্রয়োঃ ॥২৯॥

শ্রীনৃসিংহ-স্তবের বঙ্গানুবাদ

১। হে অজিত! আপনি স্থাবর-জঙ্গমের আবরণ-স্বরূপা অনিত্য-গুণাশ্রিতা
মায়ায় বিনাশ সাধন করিয়া আপনার জয় প্রদর্শন করান, বিজয় ঘোষণা করুন।
আপনি ব্যতীত এই বিশ্বের কেহই কোন কার্যে সমর্থ নহে। বেদসকল আপনারই
গুণার্ণবত্ব কীর্তন করেন ॥১॥

২। ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং এই বিশ্ব আপনা হইতে স্বতন্ত্র-
ভাবে উদ্ভূত হইতে পারে না। এইজন্যই বহুবিধ মন্ত্র আপনাকেই 'অজ' ও
'বিরাটমুষ্টি' বলিয়া বিশেষভাবে কীর্তন করেন ॥২॥

৩। নিখিল বেদ আপনার সদগুণ প্রচার করেন। 'এতাদৃশ আপনাতে সকল মনীষিজন আপনার পরমমঙ্গলময় গুণ-শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা অল্পরক্ত এবং আপনার শ্রীচরণ-যুগল স্মরণপূর্বক সর্বসম্ভাপরহিত হইয়া থাকেন ॥৩॥

৪। হে নৃসিংহদেব! যদি মানবগণ নরদেহ লাভ করিয়া শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি দ্বারা আপনার ভজন না করে, তবে তাহাদের এই শ্বাস-গ্রহণ বা জীবন-ধারণ 'ভস্মা'তুলা বিফল হইয়া থাকে ॥৪॥

৫। হে ঈশ্বর! হে পরানন্দ! আমি আপনার (অণু) অংশ। আপনি আপনার শ্রীপাদ-যুগলের সেবা প্রদান করত আমার ভবদীয়-মায়াকৃত বন্ধন দূর করুন ॥৫॥

৬। আপনি জগন্নাথ, আপনি পরমাত্মা। আপনাতেই আমার চিত্ত নিবিষ্ট হউক। কখন ভবদীয়-সেবাপর ঈদৃশ মনুষ্য-ভস্ম আমার লাভ হইবে? ॥

৭। হে ভূমন্! দীনবাক্ষ! দয়াসিকো! কোথায় আমি বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন, আর কোথায় আপনার তেজঃ বা মহিমাশি! হে নৃহরে! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন ॥১১॥

৮। ষাঁহার সম্ভাতে স্বতঃ অসং এই জগৎ সদরূপে প্রতিভাত হয়, এই অসং জগতে যিনি একমাত্র সদ্বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন, সেই ভগবান্কে আমরা ভজন করি ॥১২॥

৯। মানবগণ সূর্য্যতাপে তপ্ত হইয়া তপস্বী করুক, ভৃগুপাত করুক অর্থাৎ পরিত হইতে পতিত হউক, তীর্থসকল ভ্রমণ করুক, বেদ-বেদান্তসকল পাঠ করুক, বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যাগ করুক অথবা তর্কদ্বারা বাদ-বিশ্বাদই করুক; কিন্তু শ্রীহরির কৃপা-ব্যতীত কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥১৪॥

১০। হে নৃহরে! সংসারচক্ররূপ করপট্র (করাৎ) দ্বারা বিদীর্ণ ও উদীর্ণ এবং নানাবিধ ভবতাপতপ্ত, কোনও প্রকারে ভবদত্তিকে আগত ও আপনাতে শরণাগত নরগণকে আপনি উদ্ধার করুন ॥ ১১॥

১১। হে ভগবন্! হে পরানন্দগুরো! যখন আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার মন আশ্রয় লাভ করিবে, তখন আপনার কৃপাতেই অখিল-সাধন শ্রম বিদূরিত হইবে এবং পরম শান্তি-লাভে সক্ষম হইব ॥২০॥

১২। (হে নৃসিংহদেব!) ভজনকারিগণের নিকট আপনিই সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিহ্ন প্রাণ স্বরূপ; অতএব ইহার পর তুচ্ছ কলত্র-পুষ্পাদির প্রয়োজন কি? ১১॥

১৩। হে নরহরে! পুষ্প-কলত্রাদির অঙ্গসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক আপনাকেই

অহনিশ চিন্তা করিতে করিতে, বিগতাহঙ্কার সাধুগণ যেই যেই আশ্রম ও তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকেন, সেই সেই স্থানে বাসপূর্বক নিত্য সেইসকল সাধুগণের মুখপদ্ম-বিগলিত আপনার পবিত্র কথামৃত-শ্রোতৃজলে স্নান করিয়া হইয়া আমি পুনর্জন্মভাক্ত হইব না ॥২২॥

১৪। পুষ্পালিকা হইতে উদ্গত স্পর্শ যেরূপ অসং, তদ্রূপ সং-স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত হইলেও জগৎ সং নহে অর্থাৎ অনিত্য। কনকরাশি বিবিধ অলঙ্কার-রূপ কার্য্য করিয়াও যেরূপ অবিকৃত, বেদ কিন্তু তদ্রূপ নহে অর্থাৎ গোণার্থদ্বারা বেদার্থও কল্লিত হয়। পরন্তু, আপনার শুদ্ধ অদ্বৈত (অসমোদ্ধ) ভাবই সত্য, অতএব আনন্দের সহিত রম্য-সেবিত আপনার সুন্দর পরমানন্দপ্রদ শ্রীপদযুগল আমি বন্দনা করি। হে হরে! আমি আপনার চরণে প্রণত, আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥২৩॥

১৫। কনক অর্থাৎ স্বর্ণ মুকুট কুণ্ডল-বলয়-কিঙ্কীরূপে পরিণত হইলেও বস্তুতঃ কনকই বটে, তদ্রূপ মহৎ বা চিত্ত, অহঙ্কার, আকাশ প্রভৃতি শ্রীনৃসিংহ-বিষ্মু হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে ॥২৪॥

১৬। মায়া আপনার ঈক্ষণরূপ অঙ্গনগতা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কাল-স্বভাবাদি দ্বারা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় বহু ভাব প্রকাশ করত আতুর বা অসমর্থ আমার মস্তক অতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণপূর্বক আমাকে সম্মর্দিত করিতেছে; হে হরে! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আপনার মায়ার প্রভাব নিবারণ করুন ॥২৫॥

১৭। হে দীন-অনাথ-দয়ানিধান! হে পরমানন্দময় প্রভো! আমি দণ্ড ও সম্যাস-গ্রহণচ্ছলে কেবল ভোগচিন্তায় পীড়িত বঞ্চিত ব্যক্তি, আমি নিরন্তর অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইতেছি, আমি নিঃ-বিদ্রুচিত-কর্ম্ম-ক্লেশে আকুল, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী, অজ্ঞ এবং অজ্ঞানগণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অহঙ্কারযুক্ত; আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥২৬॥

১৮। হে মাধব! আপনার স্বরূপের জ্ঞান ও আপনার বিষয়ে শ্রবণ-কীর্তনাদিতে আসক্তি প্রদান করুন, যেন আমার বিষয়জনিত সুখ-দুঃখের সঙ্গম না হয়, যেন আমি কেবল প্রেমশূণ্য বিধির কিস্কর না হই ॥২৭॥

১৯। হে অনন্ত! দেবগণ আপনার অন্ত জানেন না, আপনিও আপনার অন্ত জানেন না, শ্রুতিসার-সকলও আপনার তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমর্থ নহেন। অতএব ‘আপনাকে নমস্কার’, ‘আপনার জয় হউক, জয় হউক’ ইত্যাদি বাক্যে আপনার সেই তুল্য চরণযুগল ভজন করি ॥২৮॥

২০। কক্ষী ও ভক্তের পক্ষে যাহার পদ-সুগল ভোগ ও যোগপ্রদ এবং যে শ্রীপাদপদ্ম নিখিলকৃতি-শিরোরত্নসমূহ দ্বারা নীরাঞ্জিত, সেই মাধবকে আমি প্রণাম করি ॥২৯॥

শ্রীজয়তীর্থ

শ্রীজয়তীর্থের পূর্ব-পরিচয়

ইনি শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের একজন সম্মানী আচার্য্য। ইহার পূর্বাশ্রমের নাম—
ধোগুরঘুনাথ পন্থ, পিতার নাম—রঘুনাথ রাও; মাতার নাম—কন্না বাই।
পাণ্ডুরপুরের নিকট মঙ্গলাবেড় নামক স্থানে ১১৪৮ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি রঘুনাথ ভীমাবাইর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত কলহ করিয়া
স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রীরঙ্গপত্তন-নামক স্থানে গমনপূর্বক তথায় অশ্বারোহী
সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করেন।

দীক্ষা ও সমাধি

একদিন অশ্বারোহণে নদী পার হইতে গিয়া অকোভোর সহিত সাক্ষাৎ লাভ
করিয়া অপূর্ব জ্ঞান লাভ করেন এবং নিজ বৃত্তি ত্যাগপূর্বক তাঁহার নিকট
১১৬৭ শকাব্দায় অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে সম্মাস গ্রহণ করেন।
ষিচত্বারিংশৎ বর্ষ-ব্যয়ক্রম-কালে হাইদ্রাবাদের ওয়াডি নামক স্থানের নিকটবর্তী
মালখেড়্‌গেট-ষ্টেশনে ১১৯০ শকাব্দার আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী দিনে সমাধি লাভ
করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গুরু-পরম্পরার মধ্যে তাঁহার নাম
দৃষ্ট হয়।

শ্রীজয়তীর্থের রচিত মূল ও টীকা-গ্রন্থ

মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ-লাভ করিয়া জয়তীর্থমুনি ২২ বৎসর ৭ মাসের মধ্যে
অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জয়তীর্থ-রচিত মূল গ্রন্থের মধ্যে :— ১। প্রমাণ-পদ্ধতি, ২। বাদাবলী,
৩। শতাপরাধ স্তোত্র ও ৪। পঞ্চমালা। ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত টীকা
তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে :—

১। মাধ্বভাষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকা, ২। সুধা, মাধ্বভাষ্যের
অনুব্যাখ্যান, ৩। ছায়-বিবরণ টীকা, ৪। প্রমেয়-দীপিকা টীকা, ৫। ছায়-
দীপিকা টীকা, ৬। তত্ত্বসংখ্যান টীকা, ৭। তত্ত্ববিবেক টীকা, ৮। উপাদি-

খণ্ডন টীকা, ৯। মাস্রাবাদ-খণ্ডন টীকা, ১০। মিথ্যাসাহুমান-খণ্ডন টীকা, ১১। তত্ত্বনির্ণয় টীকা, ১২। গ্রাহ-কল্পতরু প্রমাণ-লক্ষণ টীকা, ১৩। কথা-লক্ষণ টীকা, ১৪। তত্ত্বছোত টীকা, ১৫। কৰ্ম-নির্ণয় টীকা, ১৬। ঘটপ্রশ্ন-ভাষ্য টীকা, ১৭। দীশাবাস্ত-ভাষ্য টীকা, ১৮। ঋগ্ভাষ্য টীকা।

গুরু ও শিষ্য-পরম্পরা

পূর্বগুরু-পরম্পরা ১। শ্রীমদ্বাচার্য্য, ২। পদ্মনাভ ১১২০, ৩। নরহরি-তীর্থ ১১২৭, ৪। মাধবতীর্থ ১১৩৬, ৫। অক্ষোভ্যতীর্থ ১১৫০, ৬। জয়তীর্থ ১১৬৭।

শিষ্য-পরম্পরা (উদীপি মঠের তীর্থোপাধিক উত্তরাঢ়ী মঠের তত্ত্ববাদী শাখা)

১। বিজ্ঞানধিরাজ ১১২০, ২। কবীন্দ্রতীর্থ ১২৫৪, ৩। বাগীশতীর্থ ১২৬১, ৪। রামচন্দ্র ১২৬২, ৫। বিজ্ঞানিধি ১২২৮, ৬। রঘুনাথ ১৩৬৬, ৭। রঘুবর্ষ্য ১৪২৪, ৮। রঘুতম ১৪৭১, ৯। বেদব্যাস ১৫১৭, ১০। বিজ্ঞানীশ ১৫৪১, ১১। বেদনিধি ১৫৫৩, ১২। সত্যব্রত ১৫৫৭, ১৩। সত্যনিধি ১৫৬০, ১৪। সত্যনাথ ১৫৮২, ১৫। সত্যভিনব ১৫৯৫, ১৬। সত্যপূর্ণ ১৬২৮, ১৭। সত্যবিজয় ১৬৪৮, ১৮। সত্যপ্রিয় ১৬৫২, ১৯। সত্যবোধ ১৬৬৬, ২০। সত্যসঙ্ক ১৭০৫, ২১। সত্যবর ১৭১৬, ২২। সত্যধর্ম ১৭১৯, ২৩। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২, ২৪। সত্যসঙ্কুট ১৭৬৩, ২৫। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩, ২৬। সত্যকাম ১৭৮৫, ২৭। সত্যেষ্ঠ ১৭৯৩, ২৮। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪, ২৯। সত্যবীর ১৮০১, ৩০। সত্যদীর ১৮০৮।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা

১। জ্ঞানসিদ্ধ, ২। দয়ানিধি, ৩। বিজ্ঞানিধি, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। জয়ধর্ম, ৬। পুরুষোত্তম ও বিষ্ণুপুরী, ৭। ব্রহ্মণ্য, ৮। ব্যাসতীর্থ, ৯। লক্ষ্মীপতি, ১০। মাধবেন্দ্রপুরী, ১১। দীক্ষরপুরী, ১২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪২৬।

‘জয়তীর্থ-বিজয়’-নামক গ্রন্থে জয়তীর্থের জীবন-চরিত্র লিখিত আছে। পদ্মনাভাচার্য্য তাঁহার রচিত-গ্রন্থে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিজ্ঞানরায় ভারতী, বেদান্তদেশিক এবং জয়তীর্থ এক সময়ের লোক।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা-এস্থের বিচার সম্বন্ধে

প্রশ্ন ও উত্তর

কৃষ্ণলীলার কোন্টী ঐতিহাসিক ও কোন্টী সমাধিলব্ধ ?

কোন ভিক্ষাপ্রবর নিম্নলিখিত প্রশ্নটি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ।
অনেকের একুণ সন্দেহ হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া সাধারণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম ।

‘শ্রীকৃষ্ণসংহিতা’-পাঠ করিয়া জানিয়াছি যে, কৃষ্ণ-লীলা জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয় । ভাগবতে যে কৃষ্ণ-কথা আছে তাহা কি ঐতিহাসিক নয় ? মানবরূপধারী কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশদানে পূজনীয় ব্যাসদেব কি কোমলশ্রদ্ধাগণকে তুষ্ট করিয়াছেন ? ভাগবতের বর্ণন-মধ্যে কোন্ কোন্টী সমাধিলব্ধ-জ্ঞান ও কোন্ কোন্টী ঐতিহাসিক-বাস্তা তাহা জানিতে বাসনা করি ।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত ও সমাধিলব্ধ—ঐতিহাসিক নহে

উত্তর—সমস্ত বেদ-সাররূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত কিছু বর্ণিত হইয়াছে সে সমুদায়ই অপ্রাকৃত এবং সমাধিলব্ধ । তাহা কিছুই জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয় । শ্রীকৃষ্ণলীলায় জন্ম, কৰ্ম্ম, ধাম, রূপ ও গুণ সমস্তই অপ্রাকৃত, ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনার কাণ্ড নাই । ইহা নিত্যসত্য ও চিহ্নয় । দ্বাপরযুগে সেই পরমতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই নিত্যলীলা প্রপঞ্চমধ্যে প্রকটিত হয় । প্রপঞ্চে চিহ্নয়তত্ত্বের বিচিত্র ব্যাপার উদয়ের কোন প্রাকৃত বিধি নাই । কিন্তু পরমতত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তি কোন বিধির অধীন নয় এবং সর্বদা স্বতন্ত্র । অতএব প্রকৃতির নিয়মসকলকে অতিক্রম করত সেই নিত্যলীলা জড়জগতে উদ্ভূত হয় ।

কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি

উদিত হইলেও সেই প্রকটিত তত্ত্ব জীবগণের ত্রিবিধ অধিকার-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি বিস্তার করে । জীবের ত্রিবিধাধিকার এই,—(১) কৰ্ম্মাধিকার অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন জড়াক্ষয়তা, (২) জ্ঞানাধিকার অর্থাৎ নির্বিশেষ-লক্ষণ জড়শূন্যতা ও (৩) ভক্তাধিকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বানুভব-যোগ্যতা । ত্রিবিধ প্রতীতি এই,—(১) জড়প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তল্লীলাকে জড়বৎ উপলব্ধি হয়), (২) আধ্যাত্মিক প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মূলতত্ত্ববিচারে হৃৎকেন্দ্র ব্রহ্মতা ও প্রকট-লীলায় মায়া ও মায়িক বিষয়-রূপ দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হয়) এবং

(৩) অপ্রাকৃত প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্ত্ব স্বীকার ও অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমে সমস্ত চিন্ময়-তত্ত্বের প্রপঞ্চ-বিজয় পরিলক্ষিত হয়)। লীলাতত্ত্বকে ঐতিহাসিক বলিলে তাহা দেশ-কালাদীন ম্রায়িক-তত্ত্ব হইয়া পড়ে। কাল্পনিক বলিলে তাহা আধ্যাত্মিক হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ তদুভয়ের কোনটাই স্বীকার করেন না।

লীলাতত্ত্ব ‘আধ্যাত্মিক’ ও ‘সাক্ষাৎ’-ভেদে দ্বিবিধ সমাধি-লক্ষ

লীলাতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব সমাধিদ্বারা উপলব্ধ হয়। সমাধি দুই প্রকার—

(১) আধ্যাত্মিক ও (২) সাক্ষাৎ। আধ্যাত্মিক সমাধি দ্বারা চিন্ময় বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে নির্বিশেষ-প্রতিজ্ঞা প্রথম হইতেই চিন্ময়তার স্ফূর্তিকে থর্ক করে। সাক্ষাৎ-সমাধি জীবের চিচ্চক্ষুর সাক্ষাৎ-ক্রিয়াবিশেষ। তাহা কেবল শুদ্ধভক্তদিগের শুদ্ধচিৎত্ববিশেষ-দর্শন-প্রতিজ্ঞা হইতে লব্ধ হয়। ব্যাসদেব সাক্ষাৎ-সমাধিদ্বারা নিত্য মগত এবং প্রপঞ্চ-প্রকটিত লীলাতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব এবং নিত্যবৈচিত্র্য দর্শন করত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ষ যদপাশ্রয়াম্ ॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকর্তৃকাভিপদ্যতে ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিয়োগমধোক্ষজে ।

লোকস্তাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

যশ্চাং বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুংসে ।

ভক্তিরূপপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা ॥ (ভাঃ ১।৭।৪-৭)

[ভক্তিয়োগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সমাক্রুপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন ॥৪॥ সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সদ্ধ, রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাঁদৃশ ত্রিগুণাত্মক অহিমানজাত কতৃৎবাদিমূলে সংসার-বাসন লাভ কবে ॥৫॥ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অল্পাধিত হইলে, সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয় দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিধায়ে অনভিচ্ছ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পাপমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন ॥৬॥

যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয় ॥৭৥]

কর্মা-জ্ঞানীর অবিদ্বৎ-প্রতীতিতে 'লীলার' অযথা মায়িক কল্পনা এবং ভক্তের বিদ্বৎ-প্রতীতিতে 'লীলার' অপ্রাকৃতত্ব অনুভব

এবমিধ অপ্রাকৃত-লীলাস্মৃতি কর্মাদিগের বিষয়-বিদূষিত অন্তঃকরণে অথবা জ্ঞানাদিগের নিরীক্শেষ-প্রতিজ্ঞাহত চিত্তে কখনই সংঘটন হয় না। অবিদ্বৎ-প্রতীতিই তাহাদের উপলব্ধ হয়। চিন্ময়তত্ত্বে বিশেষ বৈচিত্র্য-জিজ্ঞাসু ভক্তদিগের মায়ী-বিমুক্ত নির্মলচিত্ত-দর্পণেই কেবল বিদ্বৎ-প্রতীতি উদ্ভূত হয়। কৃষ্ণলীলা প্রপঞ্চে উদ্ভূত হইলেও ভুক্তিহীন ব্যক্তিদের নিকট মায়িক লীলারূপে প্রতীত হয়। স্বর্ঘ্য উদ্ভূত হইলেও জন্মাক, তথা পীড়াচ্ছন্ন-চক্ষুবিশিষ্ট এক মেঘাবৃত গগনতলস্থ পুরুষদিগের নিকট তাহা পরিদৃশ্য হয় না অথবা বিপর্যয়রূপে লক্ষিত হয়। জগতের চক্ষে প্রপঞ্চে প্রকট কৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ।

স্বরূপ-সমাধির ক্রম

কর্মজড়দিগের ত' কথাই নাই, কেবল জ্ঞান-অন্বেষণকারীদিগের সম্বন্ধেও অপ্রাকৃতলীলা হৃদ্যুৎ। ভীষ যখন কর্ম-জ্ঞানকে অপার্থ জানিয়া ভক্তিবিষয়িনী শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন সাধু-গুরু-পদাশ্রয় করত তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। সেই উপদিষ্ট তত্ত্বের অনবরত অমুশীলনকে ভজন-ক্রিয়া বলা যায়। সাধন-দশায় যখন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্বস্মৃতি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভজন কেবল ভজনভাসরূপে থাকে। কিন্তু ফলভূতে চিত্তরসতত্ত্বে যখন গাঢ় আসক্তি সহকারে ভজন হয়, তখনই ভগবৎ-কৃপালব্ধ শক্তিসঞ্চারক্রমে স্বরূপ-মুভূতিরূপ সাক্ষাৎ-সমাধি উদ্ভূত হয়। তাহা হইলে

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহিষ্টিতন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চান্ত কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবান্বনীধরে ॥

এই প্রথাক্রমে জিজ্ঞাসুগণ সংশয়হীন হন। অতএব ভজনায়ত্তের পূর্বে প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নোত্তর-প্রাপ্তিতে কখনই স্বরূপানুভব উদ্ভূত হয় না। স্বরূপপ্রাপ্তির ক্রম অবলম্বন করিলেই প্রাপ্য বিষয় লব্ধ হয়।

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে যে সব লীলা বর্ণিত আছে সে সমুদায়ই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী। অধিকারভেদে সেই সমস্ত লীলার স্মৃতি-তারতম্য আছে, এইমাত্র। কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অগ্ন্যাণ্ড রাজাদিগের যত চরিত্র বর্ণিত

আছে সে সমুদায় ঐতিহাসিক বার্তা বটে, কিন্তু কৃষ্ণলীলা সমুদায় অপ্রাকৃত ; কখনই জ্ঞানীদিগের আধ্যাত্মিক কল্পনা বা কল্পীদিগের জড়ীয় বর্ণনাক্রম ইতিহাস নয়। প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াও কৃষ্ণলীলা স্বীয় অপ্রাকৃত-ধর্ম কিছুমাত্র ছাড়ে নাই অর্থাৎ দেশ-কালাদির অধীন হয় নাই। তবে যে জড়ীয় দেশ-কালাদির অধীনরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তল্লীলা-দর্শক জীবগণের অধিকার-ভেদে সমল আবিষ্টিক প্রতীতিমাত্র।

অনেকে ‘কৃষ্ণসংহিতা’র অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। তাহা নিরর্থক। অপ্রাকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমন্তকিসিন্ধান্ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের
অষ্টসপ্ততিতম শুভ প্রকট-বাসরে
দীনের পদ্ম-প্রসূনাঞ্জলি

(জয়) মঙ্গল-তানে ভক্ত-বিতানে
পতিত-পাবনী কথা।

নির্মূল প্রাণে ভক্ত-সমাজে
গাঁহিছে অমিয়-গাঁথা ॥

(অত) সারস্বত-জনে কৃপা বিতরণে
গোবিন্দ-পঞ্চমী শুভা।

শ্রীচৈতন্য-বানী কৃষ্ণ-সরস্বতী
মূর্ত্তিমন্ত কৃষ্ণকৃপা ॥

বিশ্বে উদিত তপন-স্বরূপে
কলি ঘোর তমো নাশি'।

নিত্যানুগ-জনে স্বরূপ-বিধান
(কৃপায়) শিখাতে সিন্ধান্ত রাশি ॥

জয়-গৌর-সরস্বতী, কৃপা-রসময় অতি,
জয় জয় পতিত-পাবন ।

জয় গৌর-প্রিয়তম, রূপানুগ মহাজন,
জয় জয় লীলা অগণন ॥

জয় ধাম নীলাচল, যথা তব সুমঙ্গল,
প্রকট-লীলার আবিষ্কার ।

নরোত্তমরূপে আসি' কৃষ্ণসেবা সুখরাশি,
বরষিলে জগৎ-মাঝার ॥

জীবের উদ্ধার-তরে, বিমুখ এ' ধরা' পরে,
কতভাবে কৃপা বিতরিল।

মায়া-ব্যাদি ছাড়াইতে, সবিশেষ যতনেতে,
নাম-মন্ত্র প্রচার করিলা ॥

দেশে দেশে গ্রামে-গ্রামে, বিঘোষিলে গৌর-কামে
জীব প্রতি সঙ্করণ হ'য়া ।

গৌর-কৃষ্ণ-অভিমত, ভকতি-সিদ্ধান্ত যত,
কৃপাবত্না দিলে বহাইয়া ॥

সুদূর প্রতীচ্য-ভূমি, সেখানেও দিলে তুমি,
আপনার জন পাঠাইয়া ।

চৈতন্য-বাণীর ধারা, শিরে ধরি' সুখী য়ারা,
কীর্তনেতে মাতিল আসিয়া ॥

কর্ম-জ্ঞান-অনাবৃত, বিমল ভকতি-তত্ত্ব,
গীতা-ভাগবত-কথাসার ।

বক্তৃতায়, পত্রিকায়, প্রবন্ধে ও গীতিকায়,
কত মতে করিলে বিস্তার ॥

নানাস্থানে জগতের শুদ্ধভক্তি কীর্তনের,
কেন্দ্রস্থান করিয়া স্থাপন ।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, বিতরিলে অবিরত
সদাচার করি' প্রবর্তন ॥

ছাড়ি অহ্ন অনুরাগ, অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ,
সাধুসঙ্গে সর্ববোত্তমা রতি ।

বাস্তব দৃষ্টান্ত-দ্বারে শিখায়েছ দয়া ক'রে,
সেবকেরে দিতে শুদ্ধমতি ॥

পরবিদ্যাপীঠ-তলে, আনিয়াছ দলে-দলে,
পরবিদ্যাকামী নিজজন । •

স্বকীয় চরণ-ছা'য় জানায়েছ তা' সবায়ে,
কৃষ্ণ—বিদ্যাবধূর জীবন ॥

ভকতিবিনোদ শিক্ষা, বাল্যে তাতে নিলে দীক্ষা,
আত্মবৃত্তি হ'বে বিকশিত,—
মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে, (পর) বিদ্যালয় সংস্থাপিয়ে,
জগতের কৈলে মহা হিত ॥

পরমার্থ তত্ত্বধন, ছিল অতি সুগোপন,
অন্বেষণ কেই বা করিত ?

দুরন্ত ভোগাশা-বশে, বিষম বিষয়-রসে,
জগজন সময় যাপিত ॥

অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ, পরম করুণা-কন্দ,
পতিত-পাবন মহাশয় ।

অনুদিন অনুক্ষণ, করিয়াছ স্মৃতিস্তন,
জগতের কিসে হিত হয় ॥

সিদ্ধান্ত রতন খড়ি, শত শত গ্রন্থ রচি'—
শিক্ষামৃত করি বরিষণ ।

মরণ-পথিক্ জনে, বাঁচাইয়া কৃপাশুণে,
সেবা-রসে কৈলে নিমগন ॥

তীর্থীভূত করি' যত, তীর্থস্থান শত শত,
গৌরবাণী গঙ্গা বহাইয়া ।

গৌর-প্রেমে মত্ত হ'য়ে, ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে
কৃষ্ণকথা ঘোষিলে ভ্রমিয়া ॥

শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত, সেবা-ভূমি আছে কত,
অষ্ট স্থানে স্থাপি 'পাদপীঠ' ।

শ্রীচৈতন্য-চরণ-স্মৃতি, জাগাইয়া অনুরক্তি,
তরাইতে চাহ মায়াকীট ॥

কুবিশয়-বিষে মন্দ, চিত্ত সদা কাম-অন্ধ
(মোরা) ভুলিয়াছি সেবা ভগবান ।

শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিয়া, সুপ্তভাব জাগাইয়া
জীবেরে করিলে পরিত্রাণ ॥

শ্রীধামের পরিক্রম, করি' পুনঃ প্রবর্তন,
গৃহকূপ হ'তে আকর্ষিয়া ।

কতেক পতকীগণে কৃপা কৈলে অভাজনে,
(কৃষ্ণ) শ্রীতিরস-সুখা পিয়াইয়া ॥

নিদ্রিত ভারতে উদয়-অচলে
সুদীপ্ত প্রভায় সূর্যাসম ।

উদিত হয়েছ, জীব-জগতের
দূর করিবারে অজ্ঞান-তমঃ ॥

গোলোকের ধন শ্রীনাম-রতন,
মৃতসঞ্জীবনী অমল সুখা ।

প্রপন্ন জনেরে অসীম কৃপায়
পিয়ালে সে মধু—হরিলে ক্ষুধা ॥

ভাগবত-ধর্ম শুদ্ধ সুনির্মল,
আচারিয়া তুমি আচার্য্যবর ।

অমৃতের বাণী গাহিয়া ভুবনে,
গৌর-মনোহরীষ্ট প্রচার কর ॥

তুরিতে ভেরিতে বাণী-বাঁশরীতে,
গায় সবে আজি তোমারি নাম ।

গোলোকের নিধি, বিতরিলে তুমি,
আচার্য্যদেব, সত্যকাম ॥

জয় জয় পরম করুণা নিধান !

শ্রীগৌরকৃপা-শক্তিধর ! ত্রিভুবন-পাবনবর !

জগতে নাহিক কেহ তোমার সমান ॥

তোমার পবিত্র মহিমা গাই, এমন শক্তি সেবকের নাই,
তবু চিত্ত চায় তব মহিমা-বর্ণন ॥

ভবদীয় অযোগ্য সেবকাধম

—শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

সেইপ্রকার ব্যক্তিগণ কেবল ত্র রাক্ষসস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জগতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার ভিখারী, মিছাভক্ত, বৃথাকর্মী, মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া বাস করে। সুতরাং তাহাদের জীবন বৃথাই বৃথা হইবে।

কিন্তু যাহারা মহাত্মা, তাঁহাদিগকে এইপ্রকার আত্মরিক স্বভাব কখনও আক্রমণ করিতে পারে না। এতদ্বারা ‘মহাত্মা’ উপাধিমাাত্রকে লক্ষ্য করা হইতেছে না। অত্মের শিষ্যত্ব করিয়া এবং কৃষ্ণবিদ্বেষ করিয়া নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তব মহাত্মাগণের স্বরূপ-লক্ষণ আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। যথা—

‘মহাত্মানন্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ (গীঃ ৯।১৩)

বাস্তব মহাত্মাগণ অনন্তমানসে মনকে ভুক্তি মুক্তি-বাঞ্ছাদিতে কোনপ্রকারে বিচলিত না করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তকেই একমাত্র লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের দৈবী-প্রকৃতিবশতঃ ভগবান্ ‘শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বকারণ-কারণম্’ বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন। দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত ব্যক্তিগণই সর্বগুণসম্পন্ন। দুর্লভ কৃষ্ণভক্তগণ দেবতাদুর্লভ সদ্গুণরাশিতে সর্বদাই বিভূষিত। সুতরাং জগতে সুখ-শান্তি আনিতে হইলে সেইপ্রকার দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মাগণের একান্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে আমাদের মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীমহোদয় একটি চিকিৎসক-বিধৎসভাতে বক্তৃতাকার নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন।—

“We go in for public health, sanitation and all kinds of preventive measures, rather than wait for him to fall ill and then treat him. Why not apply that in larger sphere and prevent something which you will have to deal with later in much more difficult form. That will take you to sociological and other place of human activity.... So perhaps, when

wise men like you gather together, you might think of the ills and diseases of humanity as a whole which create so many conflicts and troubles and come in the way of human progress.”

তাৎপর্য্য এই-যে, ডাক্তারগণ রোগী কখন রোগে পড়িলে তাহার জ্ঞাত অপেক্ষা না করিয়াই স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞাত বন্ধা উপায় ব্যবস্থা করেন। সেই প্রকার সমাজে যে মনোরোগের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার যদি কোন ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে মনুষ্য সমাজের স্বাভাবিক প্রগতি আর বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

বাস্তবিক, জগতে যত প্রকার জগজ্জঞ্জাল আরম্ভ হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণই ঐ মন। এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বহুপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন। অশ্বরৌষ মহারাজের আশ্রুগতো প্রজাগণ যদি “মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ” পালন করিতে পারেন, তবেই তাহার চিকিৎসা সহজে পারে, অত্থায়, ‘হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ’। তগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির তথাকথিত মহৎগুণের কোনই মূল্য নাই, কেন-না সে মনরূপ রথে আরোহণ করিয়া যথেষ্টাচার করিবেই করিবে। মনের রোগ সারাইতে হইলে শ্রীমদ্রূপ-প্রবর্তিত ‘চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনকারী কৃষ্ণ কীর্ত্তনের’ই একমাত্র প্রয়োজন। এই গুঢ় রহস্য যতদিন পর্য্যন্ত ভেদ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির মনোব্যাধির কোনই চিকিৎসা সম্ভবপর নহে—ইহা আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের বিবেচনা করা দরকার। জগতে কৃষ্ণভক্তের কিছু মাত্রা বাড়িলেই স্ব্থ-স্বাচ্ছন্দ্য আবার ফিরিয়া আসিবে। মনুষ্যকে দেবতা কারতে হইলে তাহার স্পষ্ট কৃষ্ণ ভক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই একমাত্র কার্য্য। ইহাই মনুষ্যজাতীর চরম উপকার বুঝিতে হইবে।

সেই প্রকার সদগুণসম্পন্ন মহাত্ম্যগণের আর একটি স্বরূপ লক্ষণ এইরূপ, যথা—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্ত্শ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।

নমস্তন্ত্শ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ (গীঃ ৯।১৫)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব কি-ভাবে হওয়া যায়, তাহারই আভাস কিছু এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। ‘সতত’ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চিত্তশুদ্ধি-করণাত্মক কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির এবং দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচারই অপেক্ষা করিতেছে না। যে যেখানে বা যে রূপ অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন, জীবমাত্রই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস—

এই অভিমান করিলেই তীব্র আর কোন দুঃখ নাই জানিতে হইবে। সেই-প্রকার কৃষ্ণদাস্তাভিমानी ব্যক্তির জন্ম-কৰ্ম্ম-চিন্তাদির শুদ্ধির নিমিত্ত অথ কোন উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। সৰ্ব্বেশ্বর হরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার ভজন করিবার লোভই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার লুক্কতাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র মূল্য। তীব্র ভগবদ্ভক্তি যাজনই মহাত্ম্যাগণের স্বরূপ-লক্ষণ। সেই প্রকার মহাত্ম্যাগণ দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য সৰ্ব্বদাই 'শ্রবণ-কীর্তনাদি' নববিধা ভক্তি-যাজন-মুখে আলোচনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভ করিবার জন্ত তাঁহারা সৰ্ব্বদাই যত্নবান্। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই অথবা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহারই সেবাহুকুল করিবার জন্ত সৰ্ব্বদাই চেষ্টিত। পূর্বে আমরা 'ভগবানের কথা' প্রবন্ধে 'যজ্ঞার্থে কৰ্ম্ম' আলোচনা-মুখে যে-সমস্ত কথা বিচার করিয়াছি, তাহা সমস্তই এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেই বুঝিতে হইবে। আমরা কুটুম্ব-পালনার্থ যে-ভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া শরীরযাত্রা নির্বাহ করি, ঠিক সেই ভাবেই কুটুম্বের পরিবর্তে শ্রীভগবানের সেবার জন্তই মহাত্ম্যাগণ সৰ্ব্বদা যত্ন করেন। কুটুম্ব-ভরণের জন্ত যে কষ্ট স্বীকার করা হয়, তাহা মায়িক, স্মৃতরাং ক্লেশদায়ক। কিন্তু ভগবানের সেবার জন্ত যে কষ্ট স্বীকার, তাহা অপ্রাকৃত, স্মৃতরাং তাহা আনন্দময় বা চিন্ময়। আরও জানা আবশ্যক যে, ভগবানের সেবার দ্বারা কুটুম্ব-সেবাদি আত্মস্বপ্নকভাবে হয়, কিন্তু কুটুম্বের সেবা ভগবানের সেবা নহে। ইহার তাৎপর্য্য মহাত্ম্যাগণই বুঝিয়া থাকেন। ভগবানের সেবা দ্বারা কেবল কুটুম্বাদির কেন, সমস্ত জগতের সেবা হয় অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম যতপ্রকার জীব-জন্তু আছে, সকলেরই সেবা হয় এবং তাহাই জগতের সুখ-শান্তির একমাত্র মূল। যথা—

যেনার্কিতো হরিস্তেন তর্পিতানি ভগন্তাপি।

রজ্যন্তি জন্তবন্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।১৮)

অতএব শ্রীভগবানের অর্চনাদি কার্য্যে জগৎ-প্রীণনাদি সমস্ত কার্য্যই সহজে সাধিত হয়। মহাত্ম্যাগণ সেই প্রকার অমুষ্ঠানাদিতেই সতত দৃঢ়ব্রত থাকেন। নিত্য লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বহুদিন পূর্বে তাঁহার হরিকথা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, যথা—

“শ্রীবিগ্ৰহের অর্চনকারী একজন কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব শ্রীবিগ্ৰহের কাছে যে ঘণ্টাবাদন করেন, এই ঘণ্টার একটিবার বাদনের সহিত

সহস্র-সহস্র কর্মবীরের অসংখ্য হাঁসপাতাল, দরিদ্র-সেবা, সেবাশ্রম, বিপুল কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-চেষ্ঠা এবং নির্ভেদ-জ্ঞানবীরের বেদ-বেদান্তানুশীলন, ধ্যান, কৃচ্ছ্র-তপোযোগ-সাধন অতীব নগণ্য।

মহাআগণের পদানুসরণ করিয়া যে ভগবৎ-সেবার পদ্ধতি আছে, তাহা বাদ দিয়া হাঁসপাতাল প্রভৃতি খুলিয়া যে পরোপকারের ছলনা হয়, তাহাতে পরোপকার কার্য-সাধন কোনদিনই হয় না, তবে হাঁসপাতালের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় মাত্র। সেই প্রকার দরিদ্র-সেবার ছলনা করিলে কোন দিনই দারিদ্র্য-মোচন হয় না বরং দরিদ্রেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আমরা হাঁসপাতাল খোলা, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি লোকহিতকর কার্যগুলির মোটেই বিরোধী নহি, কিন্তু আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, ভগবানের সেবা বাদ দিয়া কর্মবীরগণের এই সকল সেবার ছলনা সমস্তই ‘মোঘাশা’ মোঘ-কর্ম। এই ‘মোঘাশা’ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কৃষ্ণসম্বন্ধে হাঁসপাতাল খোলা বা কৃষ্ণসম্বন্ধে দরিদ্র-সেবা করা বিষয়টা একদিকে মোঘকর্মা এবং অত্রদিকে ‘নেড়ানেড়ী’ ইহার। কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কারণ উভয়েই মহাআগণের পদানুসরণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। শ্রীমন্নহাপ্রভুর ভাষায় ইহার। কেহই ‘তৃণাদপি স্ননীচ’ নহে। ‘তৃণাদপি স্ননীচ’ হইলে, নিজের কর্তৃত্ব, কর্মবীরত্ব, জ্ঞানবীরত্ব, ভক্তিবীরত্ব (?) ইত্যাকার ‘মোঘাশা’র গরীচিকায় পতিত হইতে হয় না।

মহাপুরুষগণের পদানুসরণ করিলে কৃষ্ণসেবাকার্যে কোনদিনই শিথিলতা আক্রমণ করে না। সেইপ্রকার কার্যে কৃষ্ণসেবার দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দৃঢ়তর মহাআগণ ভগবানের প্রীত্যর্থ পূর্ব-পূর্ব মহাজন-প্রবর্তিত জন্মাষ্টমী, একাদশাদি উপবাস প্রভৃতি কার্য দ্বারা ভগবৎসেবায় নিত্যযুক্ত হইয়া থাকেন। ‘তৃণাদপি স্ননীচ’ বলিয়া মহাআগণের নিকট কৃষ্ণ এবং কার্য সমস্তই নগ্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু ছুরাআ বা অসুরগণের যে কর্মবীরত্বের ছলনা, তাহাতে উল্লিখিত নিত্যযুক্ত-অবস্থা বা নগ্ন-স্বভাব নাই। তাহাদের জ্ঞানবীরত্বের পরিচয়—সাধনকালে কৃষ্ণসেবা করা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণের ‘ঘাড়ে চাপা’ও চলিতে পারে। স্ততরাং কৃষ্ণসেবাকার্যে তাহারা নিত্যযুক্ত নহে এবং কৃষ্ণ তাহাদের নিকট নগ্নও নহেন। এইপ্রকার পাষাণ-বিচার হইতে মহাআগণ সর্বদাই পৃথক অবস্থান করেন। তাহাদের বিচার দৃঢ় এবং তাহাদের সেবাকার্য, সাধন ও সিদ্ধিকালে একইভাবে নিত্যযুক্ত। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত, সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সম্ম

পরাদর ও পরনিন্দা

(২)

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠার পর)

পরনিন্দা

সাধুর কথা দূরে থাকুক, সাধারণ জীবকেও যাহারা অবজ্ঞা, নিন্দা বা হিংসা করে, সর্বান্তর্ধামী শ্রীহরি তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ সাধু-নিন্দার মত অপরাধ আর নাই। সাধারণ জীবের নিন্দা করিলেই ভগবান্ অসন্তুষ্ট হন, আর ভগবৎপ্রিয় সাধুর নিন্দা করিলে কি আর নিস্তার আছে? ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা বা অগ্নি কাহারও নিন্দা করা উচিত নহে। শ্রীহরি সর্ব্বারাধ্য হইলেও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ নিন্দা বা অবজ্ঞার পাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া অগ্ন্যাগ্নি শাস্ত্রের নিন্দা না করাই কর্তব্য। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ বলেন,—

গোপালং পূজয়েদ্ যস্ত নিন্দয়েদগ্নিদেবতাম্ ।

অস্ত তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মেহপি নশ্চতি ॥ (ভঃ সঃ ১০৫ সংখ্যা)

অর্থাৎ যিনি শ্রীগোপালের পূজা করেন অথচ অগ্নি দেবতার নিন্দা করেন, তাহার পরম-ধর্ম্ম লাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়।

যো মাং সমর্চয়েন্নিত্যমেকাশ্বাঃ ভাবমাশ্রিতং ।

বিনিন্দন্ দেবগীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ (ভঃ সঃ ১০৫ সংখ্যা)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়াও কেহ যদি মহাদেবের নিন্দা করিয়া আমাকে নিত্য পূজা করে, সে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর মনে করা অপরাধ হইলেও, শ্রীভগবানের সম্পর্কে তদীয় বিচারে তাহাদের পূজা অকরণীয় নহে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব, শিবাদির গ্রাম শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ প্রাণিগণের অবমাননাকেও নিন্দা করিয়াছেন। যথা—

অহং সর্কেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।

তমবজ্জায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিড়ম্ ॥ (ভাঃ ৩২৯২১)

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিতেছেন, আমি অন্তর্ধামিক্রমে সর্বদাই সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যে-সকল মর্ত্য মানব প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, আমার শ্রীঅর্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদের ঐরূপ অর্চনাাদি বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাদের শ্রীমূর্ত্তি-পূজার যে চেষ্টা, তাহা ভস্মে ঘূতালতি প্রদানের গ্রাম বৃথা।

যাহারা লৌকিক-প্রদ্বার সহিত ত্রিমূর্তি-পূজা করে, অথচ ভগবদ্ভক্ত ও অগ্র জীবকে আদর করে না, তাহারাই প্রাকৃত-ভক্ত বা কনিষ্ঠ-ভক্ত। অতএব অর্চনকার্য্যে কেবলমাত্র ভূতাদর-রহিত অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিরই ফলশ্রাভ হয় না। নতুবা পরম-কারুণিক অর্চাবতার স্থূলবুদ্ধি বদ্ধজীবকেও কৃপা করেন। যাহারা ভগবানের সন্তান জীবকে আদর করে না, তাহার কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের সংসার-মুক্তি অসম্ভব। যাহারা ভগবানের হৃথের জ্ঞাত ভগবৎ-সম্পর্ক-দৃষ্টিতে কোন জীবকে উদ্বৈগ্ন দেন না, শ্রীভগবান্ তাহাদের প্রতি শীঘ্রই প্রসন্ন হন। শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—“যাহারা জীবকে অবজ্ঞা করে, আমি তাহাদের পূজায় কখনও তুষ্ট হই না।” সাধারণ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবৎ-শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনদিনই সেইরূপ দাস্তিকের পূজা গ্রহণ করেন না। কেন-না সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন।

পরনিন্দা ও পরচর্চা সকলেরই পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা অপেক্ষা নিন্দিত কার্য্য আর কিছুই নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিন্দার কুফল এইভাবে বর্ণিত আছে,—

প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু-চরণারবিন্দে ।

সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে ॥

নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ ।

এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৪৪-২৪৫)

কাহারে না করে নিন্দা, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে ।

অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥

‘নিন্দায় নাহিক লভ্য’—সর্বশাস্ত্রে কয় ।

সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয় ॥ (মধ্য ১০.৩১৩-৩১৪)

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস ।

এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ ॥

সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে ।

অধঃপাতে যায়, সর্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে ॥

বাছ ‘তুলি’ জগতেরে বলে গৌরধাম ।

“অনিন্দক হই” সবে বল ‘কৃষ্ণ নাম’ ॥

অনিন্দক হই’ যে সকল ‘কৃষ্ণ’ বলে ।

সত্য সত্য মুক্তি তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ (মঃ ১৯২১০, ২১২-২১৪)

সাধুনিন্দা শুনিলে স্কন্ধুতি হয় ক্ষয় ।

জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয় ॥

বাটোয়ারে* সবে মাত্র এক জন্মে মারে ।

জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে ॥

অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী—বাটোয়ার ।

বাটোয়ার হইতেও অনন্ত ছুরাচার ॥

আব্রন্ধ-সুখাদি—সব কৃষ্ণের বৈভব ।

‘নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট’—কহে শাস্ত্র সব ॥

অনিন্দক হই যে স্কন্ধু ‘কৃষ্ণ’ বলে ।

সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥

চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে ।

জন্ম-জন্ম কুন্তীপাকে ডুবিয়া সে মরে ॥ (মঃ ২০।১৪৪-১৪৯)

ঐশ্বর্য-মতপেরে প্রভু অহুগ্রহ করে ।

নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে ॥ (মঃ ১২।২৫)

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয় ।

সর্ব-ধর্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয় ॥

সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম ।

মতপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম ॥

মতপের নিকৃতি আছে যে কোনকালে ।

পরচর্চকের গতি নহে কভু ভাল ॥ (মঃ ১৩।৪১-৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ ।

বিশ্বমেকা য়কং পশুন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥

পরস্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি ।

স আশু ব্রহ্মতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৮।১-২)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অস্ত্র্যামী পুরুষ-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব বা কর্ম্ম-সমূহের প্রশংসা বা

*‘ভগবানের সম্পত্তি যাহারা, বাটোয়ারা করে’—এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে ।—সম্পাদক

নিন্দা করিবে না। যিনি অপরের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বশতঃ সম্ভব পতিত হইয়া থাকেন।

শ্রীল রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্থামি-প্রভুর কথা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

গ্রাম্যবাস্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায় ।

কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥

বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম নাহি পাড়ে কাণে ।

সবে কৃষ্ণ-ভজন করে—এইমাত্র জানে ॥ (১৫: ৮: অঃ ১৪: ১৩২: ১৩৩)

— ত্রিদিগ্বিস্বামী-শ্রীভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর প্রবন্ধ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক-তারণের চেষ্টা

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে—“আহারাদি শুদ্ধি ও নৈতিক-চরিত্রের বিপর্যয় থাকিলেও, অনাত্মা হইতে আত্মা পৃথক্ হওয়ায়, অনাত্মার কার্যের দ্বারা আত্মা দায়ী নহেন।” বস্তুতঃ এইরূপ উক্তি স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের অবিবেচনা-প্রসূত। ভোগে অত্যাশক্তি-হেতু ঐরূপ অমঙ্গলজনক বিচারের ফল তাহারাই নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকেন।

“পাতকঃ ‘পাতয়তি’, ‘অধো গময়তি’ দুষ্কিয়াকারিণম্।” গৃহস্থাশ্রমীর ‘কাম,’ ‘ক্রোধ’ ও ‘লোভ’ নামে তিনটি প্রধান রিপু আছে। মানবগণ এইসকল শত্রু-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপসকল—‘অতিপাতক’ ‘মহাপাতক,’ ‘অনুপাতক,’ ‘উপপাতক,’ ‘জাতি-ভ্রংশকর,’ ‘সঙ্করীকরণ,’ ‘অপাত্রীকরণ,’ ‘মলাবহ’ এবং ‘প্রকীর্তক’-নামে অভিহিত। ইহাদের প্রত্যেকটির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।—

মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন—এই ত্রিবিধ পাপ ‘অতিপাতক’।

জগহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্তবর্ণ-চুরি ও গুরুপত্নী-গমন—এই চতুর্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গ ই ‘মহাপাতক’।

‘অনুপাতক’—(ক), (খ), (গ) সমষ্টিতে পঁয়ত্রিশ প্রকার :—

(ক) (১) নীচজাতি হইয়া দম্পত্বপূর্বক আপনাদি উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া,

(২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ

বলা। (৩) গুরুজনের মিথ্যা-দোষ রটনা করা—এই তিনটি ‘অনুপাতক’ ব্রহ্মহত্যার সমান।

(খ) (১) বেদ-ত্যাগ বিংবা বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া, (২) বেদের নিন্দা করা, (৩) কুটিল কথা বলিয়া ফিরে-ঘুরে সাক্ষী দেওয়া—(ইহা দুই প্রকার—(৩ক) কোন বিষয় জানিয়া তাহা গোপন রাখা এবং (৩খ) সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা), (৪) বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা, (৫) বিষ্ঠাদি-জাত দ্রব্য ভোজন করা, (৬) অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা—এই ছয় প্রকার “অনুপাতক” সুরাপানের সমান।

(গ) (১) গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া, (২) মাছুষ চুরি করা, (৩) গৃহপালিত পশু চুরি করা, (৪) সোণ-রূপাদি চুরি করা, (৫) ভূমি চুরি করা, (৬) হীরা চুরি করা, (৭) মণি চুরি করা—এই সাত প্রকার “অনুপাতক” স্তবর্ণ হরণ করার সমান।

(১) সহোদরা ভগিনী-গমন, (২) কুমারী-গমন, (৩) নীচজাতির স্ত্রী-গমন, (৪) বন্ধুর স্ত্রী-গমন, (৫) পুত্রের স্ত্রী-গমন, (৬) পুত্রের অসবর্ণী স্ত্রী-গমন, (৭) মাতৃস্বসা-গমন, (৮) পিতৃস্বসা-গমন, (৯) শাশুড়ী-গমন, (১০) মাতুলানী-গমন, (১১) পুরোহিত-স্ত্রী-গমন, (১২) ভগ্নী-গমন, (১৩) আচার্য্যের স্ত্রী-গমন, (১৪) শরণাগত স্ত্রী-গমন, (১৫) রাণী-গমন, (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন এগন স্ত্রী-গমন, (১৭) শ্রোত্রিয়-স্ত্রী-গমন, (১৮) সাক্ষী-স্ত্রী-গমন, এবং (১৯) উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচবর্ণের পুরুষের গমন—এই উনিশ প্রকার অনুপাতক’ গুরুপত্নী-হরণের তুল্য।

গো-বধ, অযাজা-যাজন, পরস্ত্রী-গমন, আত্মবিক্রয়, পিতা-মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলম্বদ্বারা অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্ম সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের কন্যাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পোরোহিত্য করা, অরজাঃ কন্যা-দূষণ, বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রী-সন্তোগাদি দ্বারা ব্রহ্মচ্যুতি, তড়াগ, উদ্যান কিম্বা স্ত্রী-পুত্রাদি বিক্রয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদ-অধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদ-অধ্যয়ন, অবিক্রয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজায় স্তবর্ণাদি খনিতে কাজ, বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ঔষধি নষ্ট, ভাৰ্য্যাদির উপপতি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, আভিচারিক যোগ বা মন্ত্রদ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট-করণ, জ্বালানি কাঠের ও অন্তঃস্থ বৃক্ষচ্ছেদন, দেব-পিতৃদিগর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিজের জগৎ পাক ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, লশুনাতি

নিন্দিত খাণ্ড ভোজন, অগ্নিধ্যান না করা, দেব-ঋষি-পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসংশাস্ত্রের আলোচনা, গীত-বাণে অত্যাশক্তি, শত্রু ও তাম্র-লৌহাদি এবং পশু চুরি, মত্তপায়িনী স্ত্রী-গমন, স্ত্রী-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এইসকল ‘উপপাতক’ ।

দণ্ডাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণকে বাথা দেওয়া, লশুন-পুরীষাদি বস্ত্র ও মত্ত আশ্রয় করা, কুটিলতা, পশু-মৈথুন এবং পুংমৈথুন—এইসকল পাপ ‘জাতিভ্রংশকর’ ।

গ্রাম্য ও আরণ্য-পশুহিংসা-রূপ পাপ—‘সঙ্করীকরণ’ ।

নিন্দিতের নিকট হইতে ধন-গ্রহণ, বাণিজ্য ও কুশীদ্বারা জীবিকা-নির্বাহ, অসত্য-ভাষণ এবং শূদ্রসেবা—এইসকল পাপ ‘অপাত্তীকরণ’ ।

পক্ষি-হত্যা, জলচর-হত্যা, মৎস্যাদি-জলজ-প্রাণিহত্যা ও কীট-হত্যা, মত্ত-সংশ্লিষ্ট দ্রব্য-ভোজন—এইসকল পাপ ‘মলাবহ’ ।

যে-সকল পাপ লিখিত হইল না, সেইসকল পাপ ‘প্রকীর্তক’-শব্দবাচ্য ।

এসম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে বিষ্ণু-সংহিতা, প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক এবং মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য ।

মহাভারত দানধর্ম্মে ‘পাপ’ দশবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে :—প্রাণিহত্যা, চৌর্য ও পরদার-হরণ—এই তিনপ্রকার পাপ ‘কায়িক’ ; অসৎ-প্রলাপ, পাক্ষ্য, পৈশুণ্য এবং মিথ্যাবাক্য কথন—এই চারিপ্রকার ‘বাচিক’ এবং পরধনে লোভ, সর্বজীবে দয়াশূন্যতা ও ‘কর্ম্মের ফল হউক’ এইরূপ চিন্তা—এই ত্রিবিধ পাপ ‘মানসিক’ ।

এই সমস্ত পাপের বিষয় ঋষি-মুনি-মুখনিঃসৃত পৌরাণিক প্রামাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থমধ্যে বহু বহু স্থলে বর্ণিত হইয়াছে । কাল-প্রভাবে বহিঃস্মৃৎ জীব মায়াকর্তৃক বদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া বদ্ধভাব ধারণ ও পোষণ করে । এই বদ্ধভাব-হেতু জীব ক্রমশঃ মায়িক জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উক্ত শাস্ত্রোপলিখিত পাপসমূহে নিমগ্ন হয় । ভগবান্ পরম দয়ালু, তাই নিজগুণে রূপাপূর্বক জীব-মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি যুগে-যুগে এই মর্ত্যধামে আবির্ভূত হইয়া জীবহৃদয় হইতে এইসমস্ত পাপের ধ্বংস সাধন করত ভগবত্তার নির্মল স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন । কোন কোন মাত্ত্বিক শাস্ত্রে, যথা গীতায় (৪।৭-৮) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণের) প্রপঞ্চে অবতরণ-কাল ও কার্য্য-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (গাঃ ৪।৭)

অর্থাৎ যে-সময়ে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়েই নিজকে প্রকটিত করিয়া থাকি অর্থাৎ জগতে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই।

আমাদের পূর্ববর্তী মহাজন-গুরুবর্গের নিকট হইতে ক্রম-পন্থায় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এইরূপ—

‘ধর্ম’-শব্দে বেদোক্ত ধর্ম ; ‘গ্লানি’-শব্দে বিনাশ ; ‘অধর্ম’-শব্দে ধর্ম-বিরুদ্ধ পাতকাদি ; ‘অভ্যুত্থান’-শব্দে অভ্যুদয় ; সৃষ্টি করি অর্থাৎ প্রকটিত করি, কিন্তু ক্ষুদ্রব্যবং নির্মাণ করি না ; যেহেতু আমি সৃষ্টির পূর্বেই স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া আমা হইতে সমুৎপন্ন কালের প্রভু বা প্রভাব আমার উপর থাকিতে পারে না।

জীবের পাপময় গ্লানি নিরসন-হেতুই শ্রীভগবানের অভ্যুদয়। অতএব প্রকটকালে তাঁহার নিত্যসঙ্গী পার্শ্বদগণকেও প্রকটিত করাইয়া, সেইসমস্ত পার্শ্বদ-পরম্পরায় শ্রীমুখবাক্য-সকলের প্রচারদ্বারা জীব-হৃদয়ের পাপ-মল দূরীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে যুগধর্ম-সংরক্ষক স্বয়ং ভগবান্ নিতাই-গৌরের কৃপার ও তাহার ফলের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।

তমো নাশ করি’ করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৯৫)

তত্ত্ববস্তুরও পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।

নামসংকীর্ণন সর্ব আনন্দস্বরূপ ॥ (আঃ ১৯৬)

তমোনাশ সম্বন্ধে চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও তাঁহাদের উপাদেয়তা বর্ণিত হইয়াছে—

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।

বহির্কান্ত ঘট পট আদি সে প্রকাশে ॥

তুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।

তুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥

এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।

আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস পাত্র ॥

তুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তরস।

তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ (আঃ ১৯৭-১০০)

উল্লিখিত পদগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিংকণ-স্বরূপ তত্ত্ব। জীবের স্বধর্ম—কৃষ্ণভক্তি ও প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম। শুভ ও অশুভ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি ভোগ-মোক্ষাভিসন্ধি জীবের ধর্মরূপে প্রবেশ করত তাহার স্বরূপ-ধর্মকে

আবৃত করিয়াছে ও উহাকে তমো-ধর্মময় করিয়া ফেলিয়াছে। চৈতন্য ও নিত্য-
নন্দের উদয়ের পূর্বে সেই তমোধর্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। শ্রীগৌর-
নিতাই প্রকটিত হইয়া সেই তমোধর্মকে জীবের চিত্তগুহা হইতে বিদূরিত
করিয়া তত্ত্ববস্তু প্রদান করিলেন।

উপসংহারে, আমি আমার চিত্তসংশোধনার্থ মনোভাব ব্যক্ত করিলাম—
এজগতে পরবর্তী যে কয়েকটি দিন থাকিতে হইবে, ইহার মধ্যে যদি মহা-
ভাগবতগণের আলোচনা-প্রসঙ্গে “শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক-
তারণের চেষ্টা”-রূপ মহাবদান্ততার কথা আমার উপলব্ধির বিষয় না হয়, তাহা
হইলে পূর্বকথিত পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া বহুযোনি পরিভ্রমণ করিব—ইহাতে
সংশয় কি? “স্বকর্ম-ফলভুক পুমান্”। (ক্রমণঃ)

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী, (মথুরা)

রিপুর বশে

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-

মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

একঃ প্রমাথী স কথং ন ঘাতো।

যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ (পদ্মপুরাণ)

কাল কেলি-প্রপূরিত ইঁহ ত্রিভুবন।

কলি-কবলিত বিমোহিত জীবকুল,

করত ক্রীড়ক অভিমান ॥

শুনইতে ব্যাধ মুরলী-রব-মাধুরী

ধাওয়ে মোহিত কুরঙ্গিনী।

দরশণ মোহে পতঙ্গা অনলোপরি,

মধুলোভে ভ্রমরা বন্দিনী ॥

বিমোহিত মীন বড়শী-রস-সৌরভে,

পরশে লুবধ করি-রাজ।

এক এক রূপ-রসে হোয়ই হতজ্ঞান,

ধাওত শমনকি পাশ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়-বশে পঞ্চ যো সেবত,

কহবুঁ কি তাঁকর বাত।

দাস ধরম স্মরি' ভয়ভীত অনুখণ,

যাচয়ে প্রভু-পরসাদ ॥

—ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠার পর)

মথুরা পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

২৪শে অক্টোবর, ৬ই কার্তিক, বুধবার—সকালে নগরসঙ্কীর্তন-শোভা-যাত্রাযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের অমুগমনে যাত্রিগণ পরিক্রমামুখে শ্রীগতশ্রমদেব, কংসটীলা, কংসভবন, ভূতেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি দর্শন ও স্থান-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

কংস-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ‘গতশ্রমদেব’ নামে পরিচিত হন এবং স্নেহস্থানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাও ‘বিশ্রামতীর্থ’ নামে অভিহিত হয়। ভগবান্ দীর্ঘাকার শ্রীমূর্তিতে চাণুর ও মুষ্টিক-নামক মল্লগণকে এবং তাহাদের প্রভু কংসরাজকে যে-স্থলে নিহত করেন, তাহাই কংসের ‘রঙ্গস্থল’ বা ‘কংসটীলা’।

শ্রীমথুরাপুরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল নগরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় সবক মহাদেব। পূর্ব-দিকে—পিঙ্গলেশ্বর, পশ্চিমদিকে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে—রঙ্গেশ্বর মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বনভ্রমণ কালে গতশ্রমদেব, ভূতেশ্বর, প্রভৃতির দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। “স্বস্তু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর। মহাবিভা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর॥”

উল্লিখিত স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি ব্যতীত স্মদামাগৃহ, রজকবধ-স্থান, ধনুর্ভঙ্গ-স্থান, কুবলয়াপীড়-বধস্থান, কুজার মন্দির, কুজাকূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী, শ্রীগোপালস্থান, বলদেব-ক্ৰীড়াস্থলী প্রভৃতিও দর্শনীয় ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অদ্যকার দর্শনাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ পূর্বের ন্যায় “হেলনগঞ্জ নয়্য ধর্মশালায়” প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যার পর আরাত্রিকান্তে তাঁহারা পাঠ-কীর্তনাদি শ্রবণের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

দ্বাদশ-বনের অগ্ন্যতম গোকুল-মহাবন দর্শন ও পরিক্রমা

২৫শে অক্টোবর, ৭ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার—অতি প্রত্যুষে পরিক্রমা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদেবের অর্চাবিগ্রহের আমুগত্যে সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রাযোগে মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া ৮ মাইল দূরবর্তী গোকুল-মহাবনে উপস্থিত হন। এখানে

যাত্রিগণ শ্রীনন্দমহারাজের গৃহ; উদ্বল, যোগমায়াদেবী, পুতনা-বধস্থান, শকটাসুর-বধস্থান, যমলার্জুন-ভঞ্জনস্থান, পরে যমুনাতীরে ব্রহ্মাণ্ডঘাট দর্শন করেন।

‘যোগমায়া’—উন্মুখমোহিনী মায়া ‘গোকুলেশ্বরী,’ তিনি অন্তরঙ্গা-লীলা-শক্তি; আর বিমুখমোহিনী মায়া ‘ভুলোকেশ্বরী’ বহিরঙ্গা-শক্তি ‘মহামায়া’ নামে কীর্তিতা। যে শক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয়বিধ জগৎ মুক্ত, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে যোগমায়াস্বরূপে দেবকীর সপ্তম-গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রা আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং ‘মহামায়া’-স্বরূপেই কংসাদি-বধনরূপ কার্য্য-সাধনার্থ আবিভূতা হন। ব্রজগোপীগণ নন্দস্নাতকে পত্ররূপে পাইবার জন্ত এই যোগমায়ারই পূজা করিতেন, মহামায়ার নহে।

সাতদিনের শিশু কৃষ্ণ, কপটতার প্রতীক বালঘাতিনী পুতনা-রাক্ষসীকে বধ করিয়াও ভাহাকে ধাক্কাচিহ্ন গতি প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ তিনমাস বয়ঃক্রমকালে শকটাসুরকে নিহত করিয়া জগৎকে অসংস্কার, জাড্য ও বৃথা-অভিমানজনিত ভারবাহিত্যের নৈফল্য প্রদর্শন করেন। এক বৎসরের শিশু শ্রীকৃষ্ণ কুতর্ক ও শুষ্ক-যুক্তিজালরূপ তৃণাবর্তাসুরকে বধ করিয়া সাধক-জীবের ভঞ্জন-কটক দূরীভূত করিয়াছেন। বালকৃষ্ণ দুইবৎসর তিন মাস বয়ঃক্রমকালে যমলার্জুন-ভঞ্জন লীলাদ্বারা ব্রজ হইতে জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-মদমত্ততা ও তজ্জনিত ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ-আসব-পানাদি জিহ্বালাম্পট্যরূপ অনর্থ বিদূরিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে ব্রজেশ্বরী মাতা যশোমতীকে স্বীয় মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐস্থান ‘ব্রহ্মাণ্ডঘাট’ নামে অভিহিত। এস্থলে বিগুহ্ব-বাৎসল্যের মুর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ মাতা যশোদার নিম্নলিখিত শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমের নিকট ঐশ্বর্য্য-প্রভাব শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাত্রিগণের সুবিধার জন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই শ্রীমন্নহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-ভোগের বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। দর্শনাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ প্রসাদ সেবাস্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মথুরায় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্তন করেন।

২৬শে অক্টোবর, ৮ই কার্তিক, শুক্রবার—গতকল্যাকার-পরিক্রমায় যাত্রিগণ পরিশ্রান্ত হওয়ায়, তত্পরি অষ্ট একাদশী বিধায় বিশ্রাম করা হয়। অতঃপরে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-আরতিকাতে পাঠ-কীর্তন-তুলসী-পরিক্রমাদি এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর কীর্তনান্তে যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন।

পরিক্রমা-সঙ্ঘের মধুবন যাত্রার আয়োজন

২৭শে অক্টোবর, ২ই কার্তিক, শনিবার—পরিক্রমা-সঙ্ঘ আজ মথুরা হইতে মধুবনে যাত্রা করিবেন। যাত্রীগণ যথাসময়ে পারণ করিয়া দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদের সম্মান করেন। এবং পরে মধুবন পরিক্রমায় বহির্গত হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শ্রীবেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য

অত্যাশ্চর্য সম্প্রদায়ের পরিক্রমাকালে যাত্রীগণকে নিজেদের খরচে নিজ-নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক পাকা দিয়া ভোজন করিতে হয়। স্বতন্ত্রভাবে আহাৰাদির ব্যবস্থা করিতে গিয়া অসাবধানতাবশতঃ নানারূপ অথাচ্ছ, কুথাচ্ছ গ্রহণ করিয়া অনেক সময় তাঁহারা মারাত্মক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইতে বাধ্য হন। সমিতি এইসকল অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া পরিক্রমাকালে যাত্রীগণকে আহাৰাদি চিন্তায় বাহ্যতে বিব্রত হইতে না হয় তজ্জন্ত সমিতিই এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১) ইহার সুবিধার জন্ত সমিতি-কর্তৃক একটি অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবক-দল গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরিক্রমার পরবর্তী নিদিষ্টস্থানে পূর্বাঙ্কেই পৌছিয়া শ্রীবিগ্রহের ভোগরক্ষণ করিয়া রাখিতেন। যাত্রীগণ পরিক্রমা হইতে ফিরিয়া আসাদি-কৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহের অর্চন ও ভোগান্তে যথাসময়ে মহাপ্রসাদ প্রস্তুত পাইতেন।

(২) ব্রজমণ্ডলের প্রায় সর্বত্রই লবণাক্ত বা দূষিত জল বিধায়, স্তমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর জল বহুদূরবর্তী স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল। তজ্জন্ত যাত্রীগণের কোথাও কোনপ্রকার দূষিত জলপানের ক্রেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

(৩) বন-পরিক্রমাকালে যাত্রীগণের অবস্থানের নিমিত্ত সমিতির নিজস্ব তাঁবু ব্যতীত মথুরা-সহর হইতে আরও বহুসংখ্যক তাঁবু সংগৃহীত হইয়াছিল। অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবকগণ পূর্বেই যাইয়া এইসকল তাঁবু খাটাইয়া রাখিতেন।

(৪) পরিক্রমাকালে যাত্রীগণের স্বাস্থ্যাদি সংরক্ষণকল্পে সমিতি হোমিও-প্যাথিক, এলোপ্যাথিক, কন্নিরাজী ঔষধপত্রসহ প্রাথমিক চিকিৎসার যাবতীয় বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন।

(৫) যাত্রীগণ বাহ্যতে স্বচ্ছন্দে পথভ্রমণ করিতে পারেন, তজ্জন্ত পরিক্রমার স্থান পরিবর্তন সময়ে তাঁহাদের বিছানাপত্র ইত্যাদি স্থানান্তরিত করিবার যাবতীয় দায়িত্বও সমিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৬) যাত্রিগণ যাহাতে নিরুপদ্রবে বিশ্রাম করিতে পারেন, তজ্জন্ত বন-পরিভ্রমণকালে দস্তা-তস্করের উপদ্রব থাকায়, দারুণ শীতের মধ্যেও ঘণ্টার ব্রহ্মচারী ও উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকগণ পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত রাত্রিই ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিবির পাহারায় নিযুক্ত থাকিতেন।

(৭) পরিভ্রমণকালে ভোগরক্ষন, ভাণ্ডার রক্ষণ, বাজার হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় ডাল, তরী-তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ, তাঁবু খাটান, চিকিৎসা, আলোক-প্রদান, পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতা প্রভৃতি বিভিন্ন সেবাকার্যের ভার পৃথক্ পৃথক্ভাবে সেবকগণের প্রতি অর্পিত হওয়ায় সকল কাৰ্য্যই বেশ স্তম্ভুভাবে সম্পন্ন হয়।

(৮) বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, অত্যান্য বনযাত্রায় কেবল স্থান দর্শন, আমোদ-প্রমোদ ও দেশভ্রমণজনিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্য লইয়াই যাত্রিগণ স্বতন্ত্র-ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সমিতি-অনুষ্ঠিত বন-ভ্রমণকালে যাত্রিগণ যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গের বাণী সর্বতোভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্তম্ভুভাবে ব্রজ-পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তদ্রূপ অনুকূল-অনুশীলনের সম্ভাব্য সকলপ্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছিল। ভক্তগণ যাহাতে অনুক্ষণ ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনের সুযোগ পান, তজ্জন্য নিয়মিতভাবে প্রত্যহ বক্তৃতা, পাঠ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর”—‘প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হয় না—প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামাদির দর্শন অসম্ভব, কর্ণের দ্বারাই অপ্রাকৃত বস্তুর স্তম্ভুদর্শন সম্ভব’ প্রভৃতি মহাজন-বাণীই পরিভ্রমণ-পরিচালক-সজ্জের বিশেষ প্রচার্য্য বিষয় ছিল এবং তাঁহারা যাত্রিগণকে সেইভাবেই অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশেষ স্থানের বিষয় এই যে, পরিভ্রমণ-সজ্জের সকলপ্রকার সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরিভ্রমণকালে দেশের ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজনাদির চিন্তা-বিবহিত হইয়া সর্বদা হরিকীর্তন-মুখরিত শ্রীমঠ-মন্দিরেই বাস করিতেছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে, শ্রীব্রজমণ্ডলের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, নিরপেক্ষ জনসাধারণের অনেকেই পরিভ্রমণের সকলপ্রকার সুবন্দোবস্ত লক্ষ্য করিয়া পরিভ্রমণ-পরিচালক-সজ্জের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পরিভ্রমণ-পথের যতই দূরত্ব হউক না কেন, সারা রাত্তা ধরিয়াই উচ্চ-সঙ্গীত ও মৃদঙ্গ-বাত্তাদি-যোগে পরিভ্রমণ হওয়ায় যাত্রিগণ পরমানন্দে বন-ভ্রমণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

—প্রকাশক

নিয়ামক-মহারাজের বক্তৃতা

গত ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—সমিতির আচার্য্যপ্রবরের প্রকট-বাসর উপলক্ষে চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে, একটা মহতী সভার আয়োজন হয়। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে যে-সমস্ত বক্তৃতা ও অভিনন্দনাদি পাঠ হয়, তাহার প্রত্যুত্তরের পূর্বে তিনি যে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম নিয়ে যথাসম্ভব বর্ণিত হইল—

যাঁহারা ত্রিদণ্ডিস্বামী, তাঁহারা নিজ-নিজ জন্মদিবসে শ্রীব্যাসপূজার দিনে গুরুপূজা করিবেন। ব্যাসপূজার প্রথম দিবস পূজাপঞ্চক অনুষ্ঠিত হয়—ইহা সন্ন্যাসী আমার নিজস্ব কৃত্য। পূজাপঞ্চক বলিলে—(১) কৃষ্ণপঞ্চক, (২) ব্যাসপঞ্চক, (৩) সনকাদিপঞ্চক, (৪) আচার্য্যপঞ্চক ও (৫) গুরুপঞ্চক বুঝায়। ইঁহারা সকলেই পূজ্যতত্ত্ব। ইঁহারা পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে পঞ্চতত্ত্ব হইলেও বস্তুতঃ একই। ব্যাসপূজা, গুরুপূজা, আচার্য্যপূজা প্রভৃতি এক তত্ত্বেরই পূজা। এই পূজা নিত্যকালই বিহিত। তবে আমাদের স্মৃতিপটে উদয় করাইবার জন্ত বিশেষ কোন তিথিকে উপলক্ষ্য করিয়াই উহা অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—কৃষ্ণ এক, অদ্বিতীয় ও অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, অথচ পদ্ধতি-গ্রন্থে ‘কৃষ্ণপঞ্চক’ শব্দের উল্লেখ থাকায় পাঁচ প্রকার কৃষ্ণের কথা বুঝাইবে না। একই কৃষ্ণের পঞ্চপ্রকার প্রকাশ বা বিলাসকেই লক্ষ্য করে। এমন কি, যাঁহারা শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী, তাঁহারাও ব্যাসপূজায় এই কৃষ্ণপঞ্চকের পূজা করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা কৃষ্ণের অদ্বয়ত্ব ও তাঁহার বিলাস-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করের ব্যাসপূজা প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে, উহা ব্যাসপূজার ভাগ মাত্র। ভারতে বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। হুতরাং ব্যাস-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে না পারিলে তাঁহার অলীক ‘মিথ্যা’-বাদ ধর্ম্মাত্মসন্ধিস্ব ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিবেন না, তজ্জন্তই আচার্য্য শঙ্করের এই ব্যাসপূজার অভিনয়। আমরা তাঁহার শারীরক-ভাঞ্জে ‘আনন্দময়াধিকরণে’ ব্যাসের সূত্র-রচনার বিরুদ্ধে তাঁহার ‘কটাক্ষপাত’ লক্ষ্য করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্যাসরচিত পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি অধিকাংশ শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি ঐদাসীক প্রদর্শন করিয়া স্বমত-স্থাপনে চেষ্টাপর হইয়াছেন। ইহা তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থেই স্পষ্ট। আচার্য্য শঙ্কর যে কয়েকখানি উপনিষদ অবলম্বন করিয়া স্বমত-স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন,

তাহারই অশ্রুতম ছান্দোগ্যোপনিষদ্ পুরাণ-ইতিহাসের প্রচুর প্রাধান্য দিয়াছেন* । এবং এই পুরাণাদি শাস্ত্রেই বেদ-উপনিষদাদির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া উক্ত উপনিষদ্ উল্লেখ করিয়াছেন । অথচ শঙ্কর-মতবাদে এই পুরাণ সর্বতোভাবে উপেক্ষিত । একুপস্থলে তাঁহার ব্যাসপূজাকে কি ব্যাসপূজার অভিনয় বলা হইবে না ? আমরা বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত সুধীমণ্ডলীকে এবিষয় অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি ।

শ্রীব্যাসপূজায় কৃষ্ণপঞ্চক বলিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধকে বুঝাইতেছে । শঙ্কর-সম্প্রদায়ে এই কৃষ্ণ-পঞ্চকেরই পূজা হইয়া থাকে । বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য্য শঙ্কর বাসুদেবাদি এই চতুর্ভুজ-তত্ত্বে নানাপ্রকার আপত্তি উঠাইয়া পাঞ্চরাত্রিক ভাগবত-মার্গকে আক্রমণ করিয়াছেন । (তাঁহার শারীরক-ভাষ্যের ২য় অধ্যায়, ২য় পাদের শেষ অংশই ইহার প্রমাণ) তিনি সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধকে জীব, মন, অহঙ্কারের অধিদেবতা-স্বরূপ বিচার না করিয়া তত্ত্বস্বরূপ বিচার করিয়া উৎপত্তি-বিনাশশীল মনে করিয়াছেন । ইহা অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ । যদি উক্ত সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ-তত্ত্বকে ঐরূপ উৎপত্তি ও বিনাশশীল তত্ত্ব বলিয়াই বিচারিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপঞ্চকের অন্তর্গত করিয়া তাঁহার পূজা প্রতিষ্ঠা করিবার তাৎপর্য্য কি ? বাসুদেব হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিলে তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর কবলিত—এরূপ বিচার সম্ভব নহে । ‘উৎপত্তি’-অর্থে—আবির্ভাব । উপনিষদে দেখা যায়—“পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্ট্যতে ।” ইহার দ্বারা পরমাত্মা বাসুদেব হইতে উৎপন্ন, তাঁহারই অংশস্বরূপ সঙ্কর্ষণাদি বাহ্যতত্ত্বের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে । যেস্থলে চতুর্ভুজ-তত্ত্বের খণ্ডন-প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, সেস্থলে বা সেই সম্প্রদায়ে কৃষ্ণপঞ্চকের নাম করিয়া চতুর্ভুজ-তত্ত্বের পূজাকে ছলনা ব্যতীত অশ্রু কি বলা যাইতে পারে ? পূজ্যবস্তুর অনিত্যতা-চিন্তন নিতান্ত হেয় ।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও দুই একটি কথা বলিতে চাই । কেহ বলিতে পারেন, শঙ্কর-সম্প্রদায়ে ব্যাসপূজা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা

*ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ বেদানাং বেদম্ । (ছান্দোগ্য ৭ম অধ্যায়, ২য় খণ্ড)
ইহার পাঠান্তর, যথা—“ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ ।”

ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতং আপঃ ।

এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্তাভিতপ্তম্.....ব্রীধ্যমগ্নাত্মং রসোহজ্জায়ত ।

অতি বিপুলভাবে নানা উপচারে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে কি অদ্বৈতবাদীর ব্যাশঙ্ক্য প্রকাশিত হইতেছে না? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত অনুষ্ঠান—“অসতী নারীর পতিসেবার ছায়।” অসতী নারী তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছে। তাহার সর্বদাই ভয়—তাহার প্রকৃত স্বামী তাহার দুশ্চরিত্রতার কথা কখন ধরিয়া ফেলে! তজ্জন্ত সে সর্বদাই পতিসেবা এমন সূচাক্রমে করিয়া থাকে, যাহাতে সে ধরা না পড়ে। এমন কি, পতিব্রতা সতী নারী তাহার স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষাও অধিক কর্তব্যপরায়ণতা স্বামীজী-প্রীতি অসতী নারীর ক্রিয়া-কলাপে প্রকাশ পায়। ইহাই জগতে সুস্পষ্ট। তাই আমি এস্থলে জানাইতে চাই—অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ব্যাসপূজার পরিপাটি ও আড়ম্বর কেবল ব্যাসকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জগুই কল্লিত হইয়াছে মাত্র। ইহা প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে বা পতিসেবাও নহে।

অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসেই সত্যযুগের উৎপত্তি। সত্যযুগে সমস্তই যোলআনা ‘সত্য’ বলিয়া বিচারিত হইত। তখন ‘মিথ্যার’ কোন প্রচার ছিল না। সত্য-যুগের লোকের নিকট ‘জগৎ সত্য’ বলিয়াই প্রতিভাত হইত। তাঁহারা ‘জগন্মিথ্যাবাদ’ স্বীকার করিতেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সত্যযুগোৎপত্তি-দিবসে অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ায় **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অক্ষয়-তৃতীয়ায় যাবতীয় ধর্ম পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল*। অধর্মের মিথ্যাবাদ তখন বিলুপ্ত ছিল। তজ্জন্ত উক্ত সমিতি জগতের সত্যতা প্রচারকল্পে এবং মিথ্যাবাদ ধ্বংসের নিমিত্ত ব্রতী হইয়াছেন।

তত্ত্ববস্তু একই—যেরূপ দশবিধ-রূপধ্বক্ কেশব। সেই কেশব বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন লীলায় বিভিন্ন বিলাসে প্রকাশিত হইয়াছেন। ‘এক’ বলিলে নির্বিশেষ এক নহে—সবিশেষ এক বুঝায়। “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলিলে নির্বিশেষ ‘এক’কে লক্ষ্য করা হয় না। নির্বিশেষ ‘এক’ের কল্পনা ও অনুভব সম্ভব নয়; কারণ অবিজ্ঞা-নিষ্পৃক্ত মায়াভীত চিহ্নজগতে সবিশেষ একেরই অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ব্রহ্ম ‘এক’বস্তু। এস্থলে মুক্তজীব বা অবিজ্ঞার দ্বারা আবৃত জীব একের বিরূপ ধারণা করিবে—তাহাই বিচার্য। এক বলিতে বাংলা-ভাষার ‘এ,’ ‘ক’—এই দুই অক্ষরের সম্মিলিত শব্দকে অথবা গণিতের অঙ্কের দ্বারা লিখিত ‘১’ বা ইংরাজী-ভাষার ‘O’-‘N’-‘E’=one অথবা mathematical ‘1’ বা বিভিন্নভাষায় প্রকাশিত যে ‘এক’ দেখা যায়, ইহার মধ্যে কোন এককে লক্ষ্য করা হইবে?

মাতৃষ ‘এক’ বলিতে কি বুঝিবে? বিভিন্ন চিন্তাশ্রোতে একের বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নির্বিশেষ চিন্তা লইয়া একের কোন ধারণা কল্পিত হয় নাই। “ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় বস্তু” বলিলে—বহুত্বের জনক বা সৃষ্টিকর্তা এককেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। “অদ্বৈতং ব্রহ্ম”—ই “জন্মান্তর্য যতঃ” শূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ‘এক’ বলিতে আমরা নির্বিশেষ এককে বুঝিয়া, অজ্ঞান হইয়া না পড়ি। সুতরাং পূজাপঞ্চক বলিলে ‘এক’ বস্তুরই পূজা বুঝাইবে। সেব্য-সেবক, শক্তি-শক্তিমান্ একই বস্তু—তাহা ছই নাই।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীম আচার্যদেব শ্রীব্যাসের প্রতি বর্তমান শিক্ষিত-সমাজের অনাদর লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন ও বলেন পাশ্চাত্য-জগৎ শ্রীব্যাস-রচিত গ্রন্থের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই উন্নতি পাইন করিয়াছে ও করিতেছে। পরন্তু ভারত ইহার প্রতি উপেক্ষা করিতেই শিথিয়াছে। তজ্জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিশেষ আগ্রহ-সহকারে এই চুঁচুড়া-নহরের মধ্য শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ী মঠে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আপনারা প্রতি ঘরে-ঘরে “ব্যাসপূজা-পদ্ধতি-গ্রন্থ” লইয়া প্রতিবৎসরই ব্যাসপূজা করুন।

শ্রীম প্রভুপাদ পুরীর ‘গোবর্দ্ধন মঠ’ হইতে এই “ব্যাসপূজা-পদ্ধতি” গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। আমিও ধারকা-পুস্তিকার প্রাক-কালে পুস্তকে ‘ব্রহ্মমঠে’ ও গোমুতি-দ্বারকার ‘সারদা মঠে’ ব্যাসপূজা-পদ্ধতির সন্ধান পাইয়াছি। এই পদ্ধতি-গ্রন্থখানি শীঘ্রই এ পত্রিকায় প্রকাশিত* হইবে।

—প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত—

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত শ্রীনবদ্বীপধাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব অত্যন্ত বৎসর অপেক্ষা সর্বতোভাবে বিপুল আতনের সহিত অভিনবভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির পূর্বপ্রচারিত পত্রানুসারে ২২শে ফাল্গুন হইতে সেবাপদী নিয়মিতভাবে পালিত হয়। ২২শে ফাল্গুন—শ্রীগৌড়দ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ, ২৩শে ফাল্গুন—শ্রীকোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ, ২৪শে

*শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় “ব্যাসপূজা-পদ্ধতি” গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

ফাল্গুন—শ্রীজহ্ন দীপ ও শ্রীমোদকমদীপ, ২৫শে ফাল্গুন—শ্রীকৃষ্ণদীপ এবং ২৬শে
ফাল্গুন—শ্রীসীমন্তদীপ ও শ্রীঅমৃতদীপ পরিক্রমা হইয়াছে। ২৭শে ফাল্গুন—
শ্রীগৌরজন্মোৎসব এবং তৎপরদিবস সাধারণ মহামহোৎসব স্তূভভাবে
সম্পন্ন হয়।

বর্তমান বৎসরে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যাবর্ষ্য
ত্রিদিগুস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ স্বয়ং পরিক্রমাকালে উপস্থিত
না থাকিলেও, তাঁহার শুভেচ্ছায় প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানে রীতিমত পাঠ, বক্তৃতা
এবং সমস্ত পথেই উদ্ভব নৃত্য-কীর্তন-সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চা-আলেখ্য-
মূর্ত্তির আনুগত্যে পরিক্রমা হইয়াছে। কোথাও ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রাপণ
দামোদর মহারাজ, কোথাও বা পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাস অধিকারী (বর্তমান
নাম—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ), কোথাও বা শ্রীপাদ
অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রীজী গ্রন্থাদি পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। অধিকাংশ
দিনই উক্ত সমিতির প্রবীণ সন্ন্যাসী ত্রিদিগুস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিকুশল নারসিংহ
মহা রাজ পরিক্রমা পরিচালনের নেতৃত্ব করিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহ-দেবপল্লী শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত
বলিয়া যাত্রিগণের শ্রান্তি, ক্লান্তি নিবারণের জন্য মধ্যপথে অলকনন্দাতীরে
শ্রীহরিহরক্ষেত্রে ঠাকুরের বাল্যভোগ প্রসাদ বিতরণের স্বেচ্ছা হইয়াছিল।
জহ্নদীপেও অল্পরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সময়ে নবদীপমণ্ডলে আকাশ-
বাভাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকিলেও সমিতির পরিচালনা-
কৌশলে কোঁর্ন যাত্রীরই কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

২৬শে ফাল্গুন, সোমবার—অজহ্নদীপ পরিক্রমা-দিবসে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর
বিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে বিপুল যাত্রীসহ পরিক্রমা-সজ্জা শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীগৌরজন্মভিটায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গঙ্গার খেয়াঘাটে পার হইবার দৃশ্য
অতীব মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দূর হইতে বিচিত্রবর্ণের পতাকা-
সমূহ ও স্তম্ভজিত শিবিকা দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। অত্যাশ্র
বৎসর অপেক্ষা এবং অত্যাশ্র পরিক্রমা-সজ্জা অপেক্ষা এবার শ্রীবেদান্ত সমিতির
যাত্রীসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সকনেই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন।

যাত্রিগণ শ্রীগৌর-জন্মস্থান, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীচৈতন্য মঠ, জগদগুরু শ্রীল
প্রভুপাদের সমাধি, ঠান্ডকাজীর সমাধি, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীমুরারি-গুপ্তের পাঁট
পাভূতি দর্শন করিয়া পুনরায় শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

তথায় তাঁহাদের শ্রম ও ক্লান্তি নিবারণের জন্ত শ্রীবৈদ্য সমিতি-সংগৃহীত ও ব্যবস্থিত বাল্যভোগের প্রচুর প্রসাদ সকলকেই বিতরণ করা হয়।

প্রতি বৎসর মাননীয় শ্রীযুত অনন্তদেব ব্রহ্ম ও শ্রীযুত ভূদেব ব্রহ্ম মহোদয়গণের আগ্রহে তাঁহাদের বাস-ভবনে বৈদ্য সমিতি শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস মহোৎসব করিতেন। এবংসরও তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ করা সত্ত্বেও তথায় অধিবাস-উৎসব করিতে না পারায় তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রাম ভক্তগণের হৃদয় সর্বদাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিমগ্ন আছে। এই বাৎসরিক উৎসব না হওয়াতে তাঁহারা যে দুঃখিত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, সমিতির সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের আশ্রিত, দৈন্ত ও সহৃদয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। দৈব-দুর্ঘটনা-হেতুই এবংসর আমরা তথায় উৎসবাদি করিয়া তাঁহাদের আনন্দবিধান করিতে পারি নাই, তজ্জন্ত বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীগৌড়ীয় বৈদ্য সমিতি পরিক্রমা লইয়া যে সমস্ত দর্শনীয় মঠ-মন্দির ও সেবাস্থান দর্শন করিয়াছেন, সর্বত্রই সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা ও সাদর আহ্বান পাইয়াছেন। তজ্জন্ত সমিতি সকলকেই ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পরিক্রমা-সম্ব উক্ত ২৬শে তারিখেই কুলিয়া-সহরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বিপ্রহরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস-মহোৎসবে প্রসাদ সেবাস্তে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তৎপরদিবস ২৭শে ফাল্গুন—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব অর্থাৎ শ্রীগৌর-জন্মস্তীর উপবাস। এইদিন অরুণোদয়-কাল হইতেই স্নান, দান, পূজা, পাঠ সমস্তই আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থ অবিরাম পাঠ চলিতে থাকে। স্থানীয় ও বিদেশী যাবতীয় সজ্জনমণ্ডলী এই অস্থানে বিশেষ আগ্রহ-সহকারে যোগদান করেন। আনন্দের বিষয় এই যে, স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশী হইতে কীর্তনসম্বও শ্রীমন্নহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখ-প্রাঙ্গণে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্তনাদি করেন। সমিতির সভ্যবৃন্দ তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শুদ্ধ কীর্তনের অধিকার লাভের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

এবংসর শ্রীগৌর-জন্মবাসরে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার তিনজন বিশিষ্ট সেবক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যাত্রিগণ ইহা সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাদের জীবন সার্থক করিয়াছেন। এবং তাঁহারা সাংসারিক জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া চতুর্থাশ্রমের পরমোৎকর্ষতা বুঝিতে পারেন।

আজকাল শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত্ বিগুহ্ হরিকীৰ্ত্তন প্রচার করিতে গিয়া কেহ কেহ ইঞ্জিয়তর্পণপর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ, ভূমুষ্ঠান ও অভিনয়াদির আবাহন করিতেছেন। সত্যবস্তুর অভিনয় সত্য নহে। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির থাকিলেও তাহা অভিনয়-ক্ষেত্র নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-লীলায় অভিনেতৃত্বের কার্য্য তাঁহার সাধারণ সেবকগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। এমন কি, স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও তাহা হইতে দূরে থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানে তাখুল ও অঙ্গুষ্ঠি দ্রব্যাদি ভোগ্যবস্তু অর্পিত হইলেও অনর্থযুক্ত মর্ত্য্য জীব ঐরূপ ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিবেন— ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ ও শিক্ষা। আমরা সকলকেই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত দেখিলে আনন্দিত হইব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবৈদ্যান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগোর-জন্মবাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির নবদ্বীপ-শাখা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ১০৮ শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক শ্রীপাদ সঙ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীপত্রিকার কার্য্যাদ্যক্ষ শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীপত্রিকার প্রচার-সম্পাদক শ্রীপাদ গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব ত্রিদণ্ডী যতিবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবৈদ্যান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবৈদ্যান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবৈদ্যান্ত নারায়ণ মহারাজ নামে সর্বজন-সমক্ষে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সন্ন্যাসের নামকরণ অতুতপূর্ব্ব। উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজ ব্রহ্মহুত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের ‘অভিন্ন-স্বরূপে গৌড়ীয়-বেদান্ত-ধারা পৃথিবীতে প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। ‘গৌড়ীয়-বেদান্ত’ শব্দের তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মহুত্রের অকুত্রিম-ভাষ্য পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব নির্ম্মংসর সারগ্রাহী অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ইহাতে পরম গম্ভীর-ব্রহ্মহুই অবগত হইয়া থাকেন।

ଉପରିଊକ୍ତ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ମହୋଦୟଗଣ ପୂର୍ବ ହୈତେହି ସ୍ବ-ସ୍ବ ସ୍ବଭାବ-ସ୍ବଭାବ ଦୈନ୍ତେ କାୟ, ମନ
ଓ ବାକ୍ୟକେ ଦଣ୍ଡିତ କରିয়া ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଭଗବନ୍-ସେବାୟ ଚିରତରେ ଆତ୍ମାନିଯୋଗ କରିয়াଛନ୍, ଯତରାଂ ତାହାରା ପ୍ରକୃତ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଯତି ଓ ପରମ-ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ।

ସାହାରା ଏହି ଅନିତ୍ୟ-ସଂସାରେ ଜନ୍ମ-ପରିଗ୍ରହ କରିয়া ତ୍ୟକ୍ତ୍ୟାଶ୍ରମୀ ବୈଷ୍ଣବେର ବାହ୍ୟିକ
ଚେହାରାୟ ‘ଅନୁଚାନମାନୀ’-ବିଚାର ଅବଲମ୍ବନେ, ବାସ୍ତବ-ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗୋସ୍ବାମୀର କୃପାଭୁକ୍ତେ
ସନ୍ନାସ-ଧର୍ମେର ପ୍ରତି ଅସ୍ତ୍ରା-ପରବଶ ହୈୟା ନିଜଦିଗକେ ‘ପାକା ବୋଷ୍ଟମ’ ଅଭିମାନ
କ୍ରେନ, ତାହାଦେର ହୃଦୟ ଅଭୁଦାର ଓ ନ୍ୟୁନାଧିକ ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥାକାଞ୍ଛାୟ ଭରପୁର ଓ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ । ଯତରାଂ ତାହାରା ପରମହଂସ ମହାଭାଗବତଗଣେର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅଭୁଦାଗ-
ମାର୍ଗେର ଗତି-ବିଧିତେ ଅସ୍ତ୍ରା-ମୂଳେ ପ୍ରକୃତ ଭଜନ-ରହସ୍ତେ ଅନବଧାନତା-ବଶତଃ ବାସ୍ତବ
ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀର ଆଦର୍ଶେ ବିଦ୍ବେଷ-ପରବଶ ହୈୟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିତ୍ତ-ବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିୟା
ଥାକେନ; ତାହାଦେର ସେହି ବିଚାର ଅଞ୍ଜରୁଟି-ବୃତ୍ତିର ପରିଚାୟକ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ
ଯତିଗଣହି ଜଗଦୁଦ୍ଧାର-କାର୍ଯ୍ୟେ ବ୍ରତୀ; ଯତରାଂ ତାହାରାହି ଜଗତେର ମଞ୍ଜ-ସ୍ବରୂପ ।
ତ୍ରିଦଣ୍ଡିପାଦଗଣହି ହରିଭଜନେର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ଅବଗତ ହୈୟା ନିତ୍ୟକାଳହି ହରିଭଜନ-
ପରାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀହରିସେବାୟ ସର୍ବତୋଭାବେ କାୟ, ମନ ଓ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟେ
ଆତ୍ମକୂଳୋ କୃଷ୍ଣାତ୍ମଶୈଳନ-ତଂପର ।

ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ତତ୍ତ୍ବଗଣ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୈତେହି ଉପବାସ-ମୁଖେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ-
ସହଯୋଗେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୌରଜୟନ୍ତୀ-ତିଥିବରାର ଆରାଧନାୟ ଯଗ୍ନ ଥିଲେନ । ଏ ଦିବସ ଅହୋରାତ୍ର
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହୈୟାଛିଲ । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୈବାର ୧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବେହି
ଊକ୍ତ ମହାଆଗଣେର ସନ୍ନାସ-ଗ୍ରହଣୋପଲକ୍ଷେ ବୈଷ୍ଣବ-ସ୍ମୃତି ସଂସ୍କାର-ନୌପିକାର ବିଦାନାଭୁସାନ୍ତୀ
ସଞ୍ଜ ଓ ହୋମାଦି ଅଭୁଷିତ ହୟ । ପୂଜାପାଦ କେଶବ ମହାରାଜେର ଆଚାର୍ଯ୍ୟତ୍ବେ ଓ ନିୟାୟକତ୍ବେ
ବିପୁଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଜୟଧ୍ବନିତେ ଦିଙ୍ଂମଣ୍ଡଳ ମୁଖରିତ ଓ ନିନାଦିତ ହୟ । ସେହିକାଳେ
ସର୍ବଜନ-ସମକ୍ଷେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମହାଆତ୍ରୟ ଗୋବିନ୍ଦ-ବେଦାନ୍ତ-ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା-ସଭାପତି
ତ୍ରିଦଣ୍ଡି-ଗୋସ୍ବାମୀ ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିପ୍ରାଞ୍ଜନ କେଶବ ମହାରାଜେର ନିକଟ
ହୈତେ ସନ୍ନାସ-ଯଗ୍ନ ଓ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ-ନାମେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭକ୍ତି-ସୂଚକ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈୟା
ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଯତିବେଶ ଧାରଣ କରେନ । ପରେ ତାହାରା ଶ୍ରୀଘରୁଦେବେର ଅଭୁଯୋଦନେ ସନ୍ନାସୋଚିତ
ଭିକ୍ଷା-ବିଧାନେ ବହିର୍ଗତ ହୈୟା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଘରୁ-ଗୋରାଦେର ସେବାୟ ଭିକ୍ଷୁକାଶ୍ରମୋଚିତ ବୃତ୍ତିର
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ ।

ସନ୍ଧ୍ୟାୟ ଊକ୍ତ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ମହୋଦୟଗଣ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ-ବେଦାନ୍ତ ସମିତିର ଅଧିବେଶନେ
ଅସଂଖ୍ୟ ତୀର୍ଥ-ବାତ୍ରିଗଣେର ସମ୍ମୁଖେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ବକ୍ତୃତାମୁଖେ ଗବେଷଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ବେର
-ସମାଲୋଚନା କରେନ । ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ବକ୍ତୃତା ଶ୍ରବଣ କରିୟା ପରମାନନ୍ଦିତ ହନ ଓ ପରେ
ବିପୁଳ ଜୟଧ୍ବନିତେ ସଭା ମୁଖରିତ କରିୟା ହର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରେନ ।

—ତ୍ରିଦଣ୍ଡିସ୍ବାମୀ ଶ୍ରୀଭକ୍ତିପ୍ରାପଣ ଦାମୋଦର ମହାରାଜ

এলাহাবাদে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

এবৎসর এলাহাবাদে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের শুভ-জন্মমহোৎসব মাননীয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের আগ্রহে **সহরে** এবং স্বামী চিগ্গয়ানন্দজীর আগ্রহে **জর্জ টাউনে** দুই স্থানেই মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতৎ স্পর্কে মৃতবাজার-পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল—

“To-day (Saturday) at 5-30 P. M. lecture on ‘Contribution of Lord Chaitanya to the people of the world’ by Shri Abhaycharanarvinda Bhaktivedanta. Shri Tusharkanti Ghose will preside” etc.

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সহ-সম্পাদকসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবৈদ্য মহোদয় দুইদিন (শনিবার ও রবিবার) শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্ত-অবতারের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবং জর্জ টাউনে সোমবার এবং মঙ্গলবার দুইদিন তাঁহারই পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাব-তিথির অধিবাস, অর্চন, পূজা, উদযান্ত পর্য্যন্ত মহামন্ত্র-কীর্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পারায়ণ এবং বিশেষে ভোগারত্রিক কীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যমুগ্ধান সাধিত হইল। বহু শিক্ষিত গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই অমুগ্ধানে যোগদান করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীপাদ রাখাল চন্দ্র বসাক মহোদয় সকল সময়েই ভক্তিবৈদ্য প্রভুর সহায়তা করিয়াছেন।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড-টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬ ; বৈশাখ—১৩৫৯

৭ মধুসূদন, ৪ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণাষ্টমী রা ১২৭। শ্রীল-অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

৯ মধুসূদন, ৬ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল, শনিবার—কৃষ্ণ-দশমী রাত্র ৮৩৮। শ্রীল-বৃন্দারন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মধুসূদন, ৭ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল, রবিবার—কৃষ্ণেকাদশী রা ৬৫২। বরুণিণী একাদশীর উপবাস।

১১ মধুসূদন, ৮ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৪২৫। দি ৯২৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১৭ মধুসূদন, ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল, রবিবার—গৌর-তৃতীয়া দি ১২।৩৭।
অক্ষয় তৃতীয়া—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস। শ্রীউদ্ধারণ
গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দন-যাত্রা আরম্ভ।

২১ মধুসূদন, ১৮ বৈশাখ, ১ মে, বৃহস্পতিবার—গৌর-সপ্তমী রা ৬।৫৮।
জহ্নু সপ্তমী।

২৩ মধুসূদন, ২০ বৈশাখ, ৩ মে, শনিবার—গৌর-নবমী রা ১০।৫৫।
শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর ও শ্রীরামশক্তি শ্রীশীতাদেবীর আবির্ভাব।

২৫ মধুসূদন, ২২ বৈশাখ, ৫ মে, সোমবার—গৌরৈকাদশী রা ১।৪৫।
মোহিনী একাদশীর উপবাস।

২৬ মধুসূদন, ২৩ বৈশাখ, ৬ মে, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী রা ২।৩০। দিবা
৭।৫৬ গতে ৯।২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।

২৮ মধুসূদন, ২৫ বৈশাখ, ৮ মে, বৃহস্পতিবার—গৌর-চতুর্দশী রা ২।২৭।
শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীর ব্রত ও উপবাস।

২৯ মধুসূদন, ২৬ বৈশাখ, ৯ মে, শুক্রবার—গৌর-পূর্ণিমা রা ১।৪২। দিবা
৯।৪৬ মধ্যে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীর পারণ। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর
আবির্ভাব, শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব ও কাহারও মতে শ্রীল
মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব।

• ৫ ত্রিবিক্রম, ৩১ বৈশাখ, ১৪ মে, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৪।২৯। শ্রীল
রামানন্দ রায়ের তিরোভাব।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৯

১১ ত্রিবিক্রম, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১।৪৬। অপরা
একাদশীর উপবাস।

১২ ত্রিবিক্রম, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২১ মে, বুধবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ১২।৪৮।
দি ৯।২০ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১৪ ত্রিবিক্রম, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে, শুক্রবার—অমাবস্যা রা ১২।১৯। শ্রীল
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৪ ত্রিবিক্রম, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন, সোমবার—গৌর-নবমী দি ১।৪৯। শ্রীল
বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব, মতান্তরে—পর্যাহে।

২৫ ত্রিবিক্রম, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন, মঙ্গলবার—গৌর-দশমী দি ২।৩৫। শ্রীগঙ্গা-
দেবীর আবির্ভাব। শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব।

২৬ ত্রিবিক্রম, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন, বুধবার—গৌরৈকাদশী দি ২।৪৯। পাণ্ডবা
নির্জলা একাদশীর উপবাস।

২৭ ত্রিবিক্রম, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ২।৩৩। দি
৯।২১ মধ্যে একাদশীর পারণ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কেজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসাদসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্কেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অত্র ধর্ম স্পষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পাও সেই শ্রম ॥

৪র্থ বর্ষ } অনিরুদ্ধ, ৫ ত্রিবিক্রম, ৪৬৬ গোরাঙ্গ
বুধবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৫৯; ইং ১৪১৫।৫২ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকম্

[শ্রীমদ-রূপ-গোঙ্গামি-বিরচিতম্]

শ্রীকৃষ্ণনামৈ নমঃ

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজাস্তু ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্তমানং
পরিতত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥১॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলৌং বিলুপ্তসি ॥২॥

ଯଦାଭାସୋଽପ୍ୟୁଦ୍ଧନ୍ କବଳିତ-ଭବନ୍ଧାନ୍ତବିଭବୋ
 ଦୃଶ୍ୟଂ ତଦ୍ଭାସ୍କାନାମପି ଦିଶାତି ଭକ୍ତି-ପ୍ରଣୟିନୀମ୍ ।
 ଜନନ୍ତୁଶ୍ରୋଦାତ୍ତଂ ଜଗତି ଭଗବନ୍ନାମ-ତରଣେ
 କୃତୀ ତେ ନିର୍ବନ୍ଧୁଂ କ ଇହ ମହିମାନଂ ପ୍ରାଭବତି ॥୩॥

ଯଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୀଂକୃତିନିର୍ଠୟାପି
 ବିନାଶମାୟାତି ବିନା ନ ଭୋଗେଃ ।
 ଅପୈତି ନାମ-ସ୍ଫୁରଣେନ ତନ୍ତେ
 ପ୍ରାରବ୍ଧ-କର୍ମେତି ବିରୋତି ବେଦଃ ॥୪॥

ଅସଦମନ-ସଶୋଦାନନ୍ଦନୋ ନନ୍ଦସୂନୋ
 କମଳନୟନ-ଗୋପୀଚନ୍ଦ୍ର-ବନ୍ଦାବନେନ୍ଦ୍ରାଃ ।
 ପ୍ରଣତକରୁଣ-କୃଷ୍ଣାବିତ୍ୟନେକସ୍ଵରୂପେ
 ହୃଦି ମମ ରତିଃଶ୍ଚୈର୍ବଦ୍ଧତାଂ ନାମଧେୟ ॥୫॥

ବାଚ୍ୟଂ ବାଚକମିତ୍ୟୁଦେତି ଭବତୋ ନାମ-ସ୍ଵରୂପଦ୍ଵୟଂ
 ପୂର୍ବସ୍ତ୍ରୀଂ ପରମେବ ହନ୍ତୁ କରୁଣଂ ତତ୍ରାପି ଜାନୋମହେ ।
 ଯନ୍ତ୍ରାସ୍ମିନ୍ ବିହିତାପରାଧ-ନିବହଃ ପ୍ରାଣୀ ସମନ୍ତାନ୍ତବେ
 ଦାନ୍ତେନେଦମ୍ପାସ୍ତ୍ର ମୋହପି ହି ସଦାନନ୍ଦାନ୍ତୁଧୋ ମଞ୍ଜଜାତି ॥୬॥

ସୂଦିତାନ୍ତ୍ରିତ-ଜନାର୍ତ୍ତିରାଶୟେ
 ରମ୍ୟଚିଦୟନ-ସୁଖ-ସ୍ଵରୂପିଣେ ।
 ନାମ ଗୋକୁଳ-ଗହୋଽସବାୟ ତେ
 କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବପୁଷେ ନମୋ ନମଃ ॥୭॥

ନାରଦବୀଣୋଞ୍ଜୀବନ ଅଧୋଷ୍ଠିନିର୍ବାସ-ମାଧୁରୀପୁର ।
 ଶ୍ଵଂ କୃଷ୍ଣନାମ କାମଂ ସ୍ଫୁର ମେ ରସନେ ରସେନ ସଦା ॥୮॥

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ-রত্নমালায় প্রভা-নিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাঞ্জিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব, হে হরিনাম ! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

মুনিবৃন্দ সর্বদা তোমাকে কীর্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোকবর্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষরাকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-রূপ) ধারণ করিয়াছ । সাক্ষেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা,—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) বিনষ্ট করিয়া থাক । অতএব হে নামধেয় ! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥

হে ভগবনাম-স্বৰ্ঘ্য ! তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসারান্বকার-নিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞান-তমঃ বিনষ্ট করে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভক্তি-বিষয়িনী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাকে । অতএব এই জগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সূম্যক্ৰূপে কীর্তন করিতে পারে ? ॥ ৩ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ত্রায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কৰ্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম ! জিহ্বাগ্রে তোমার ক্ষুণ্ণভিমাংগ্রেই সেই কৰ্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায় ;—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দস্বনো, হে কমলনয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেজ, হে প্রণত-করণ, হে কৃষ্ণ,—ইত্যাদি বহুস্বরূপে তুমি আবিস্কৃত হইয়াছ । অতএব হে নামধেয় ! তোমাতে আমার রতি প্রচুর-পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক ॥ ৫ ॥

হে নাম ! ‘বাচ্য’ অর্থাৎ বিভূচৈতন্ত ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং ‘বাচক’ অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচক-স্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি ; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার ‘নাম’ উচ্চারণ করিযামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেম-সুখে নিমজ্জিত হন ॥ ৬ ॥

হে নাম ! হে কৃষ্ণ ! তুমি আশ্রিত-জনগণের পীড়া-(নামাপরাধ) সমূহ নাশ কর ; তুমি—পরমসুন্দর চিদ্বনস্বরূপ গোকুলবাসিনীর মূর্তিমান্ আনন্দস্বরূপ । অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণনাম ! তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবন-স্বরূপ এবং মাধুর্য্য-প্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশ-স্বরূপ । অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্বদা অমুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফুর্জিতলাভ কর ॥ ৮ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা

লালসাময়ী গীতি

গৌরান্দ 'বলিতে' হ'বে 'পুলক' শরীর ।

হরি হরি বলিতে 'নয়নে ব'বে নীর' ॥

আর কবে 'নিতাই চাঁদ' করুণা করিবে ।

'সংসার'-'বাসনা' মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন ।

কবে হাম্ হেরন 'শ্রীবৃন্দাবন' ॥

'রূপ-রঘুনাথ' বলি' হইব আকৃতি ।

কবে হাম্ বুঝব সে 'যুগল-পীরিতি' ॥

রূপ-রঘুনাথ-পদে র'ছ মোর আশ ।

প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

প্রার্থনা-রস-বিবৃতি :-

বৈধ ও রাগানুগ-ভেদে প্রার্থনা দ্বিবিধ

চতুষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্ততম বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা । বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার সাধন-ভক্তিতে বিজ্ঞপ্তি আছে । শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাগুলি রাগানুগ ভক্তেরই বিশেষ উপযোগী । যেখানে শাস্ত্র-শাসনভয়ে শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধিত হয়, উহাই বৈধ-সাধন । রাধাকৃষ্ণ-সেবালাভের দ্বারা শ্রবণাদি সাধিত হইলে উহাই রাগানুগ সাধন ।

প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তির প্রকার-ভেদ-সম্প্রার্থনাত্মিকা

সাধারণতঃ বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, যথা :- সম্প্রার্থনাময়ী, দৈগ্ধবোধিকা ও লালসাময়ী । এতদ্ব্যতীত নিষ্ঠাময়ী, মনঃশিক্ষাময়ী, বিরহময়ী, উপলক্ষিময়ী

প্রভৃতি নানাপ্রকার বিজ্ঞপ্তি হইতে পারে। কৃষ্ণে, ভগবদ্ভক্তে, নিজের মনের প্রতি ও কোথাও বা আশ্রিত জনের প্রতি বিজ্ঞপ্তিসমূহ দেখা যায়। অমুৎপন্ন-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাধারণভাবে প্রার্থনাই সম্প্রার্থনাত্মিকা। অজাত-ভাব জনগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় প্রার্থনার প্রথম গীতিটী কেহ কেহ সম্প্রার্থনাময়ী মনে করেন, কিন্তু উহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত লালসাময়ী প্রার্থনা।

লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি

যেখানে জাতভাব ব্যক্তি নিজ প্রতিষ্ঠা ভয়ে সৌভাগ্যপূর্ণ প্রকৃত অবস্থা আবরণ করিয়া অজাত-ভাব প্রদর্শন করেন, তথায় এক্রপ লালসাময়ী প্রার্থনা সম্প্রার্থনাত্মিকা বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে। শিক্ষাষ্টক-লিখিত—

“নয়নং গলদক্রোধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিহ্নং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥” অথবা

“কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।

উদ্বাপ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥” প্রভৃতি লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি এই জাতীয় গীত। শ্রীচরিতামৃত অন্ত, বিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত,—

“প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।

সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ ॥” ২৮,

আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অমুরাগ !” ১৯,

“প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।” ৩৭, এবং মধ্য দ্বিতীয়

৪৫ সংখ্যার “ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ” প্রভৃতি ভাবসমূহ জাতভাব নির্দেশ করিতে বিশেষভাবে আলোচ্য।

বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ

ভাগবতগণের সঙ্কল্প-তালিকা, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ-শাস্ত্রসমূহে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও আগরা অনেকগুলি ভক্ত্যঙ্গের কথা দেখিতে পাই। শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানে নবধা ভক্তির কথা ভক্ত-সমাজে সর্বদাই আলোচিত হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ-গ্রন্থে শ্রীমদ্রূপপ্রভু-কথিত চতুষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে। “সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ॥” আবার এই পাঁচ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের চারি প্রকার, কীর্তনোপাখ্যা-ভক্তির যোগেই সাধিত হইবার কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশেষভাবে

আজ্ঞা করিয়াছেন। “কীর্তনীয়ঃ সদা হরি”-শ্লোকে ‘সদা’-শব্দে অন্য অঙ্গ-সাধনের স্বতন্ত্রতার কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কীর্তনযোগেই অন্য অঙ্গের স্বীকরণ জানিতে হইবে। শিক্ষাষ্টকের আদিতে সংকীর্ণনের সর্বশ্রেষ্ঠাভিধেয়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে। রাগানুগ ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন।

শ্রীগৌর-নামই সর্বাগ্রে কীর্তনীয় ও তন্নামেই রূপ-গুণাদির স্ফুরণ

কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। শ্রীগৌরনাম অগ্রে করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাই মহাজনের পথ। শ্রীগৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম-ভজনের কথা শুদ্ধ-ভক্তগণ স্বীকার করেন না। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ বলেন—

“নমো মহাবদাত্মায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈততনু নামে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

নাম-ভজনেই প্রয়োজন-সিদ্ধি। নামকীর্তন হইতেই রূপ-গুণ-লীলা-স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হন। সেবার উন্মুখতা হইলেই নাম কীর্তিত হন। নাম কীর্তিত হইলে অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি অগৌকিক বিষয় সমাগমে সাধক-দেহে পুলক এবং নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। ‘কৃষ্ণচৈতন্য’-নাম সাক্ষাৎ অভিন্ন কৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্যের রূপ গৌর অর্থাৎ তিনি গৌরাঙ্গ। তাঁহার গুণ—মহাবদাত্ত এবং তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। গৌরনামে রূপ-গুণ-লীলোদয়ে গৌর-নামোচ্চারণ-কারী অপ্রাকৃত হন, তখন গৌরাভিন্ন হরিনামে হরির অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশমান হন। নামে রূপাদি স্ফূর্তি হইলে জীব অপ্রাকৃত আনন্দে নিজ প্রাকৃত অমুভূতি তৎকালের জন্ত বিস্মৃত হইয়া পুলক ও নয়ন-ধারায় আপ্লুত হন। নামভজন-ফলে অশ্রু-পুলকাদি অবশ্যস্তাবী।

শ্রীনামবলে কপটতাচরণ

নামে অশ্রু-পুলকাদি ভক্তে দৃষ্ট না হইলে তাঁহার অপরাধ আছে জানিতে হইবে—এরূপ জানিয়া অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ-মানসে নিজ কপট সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন; তজ্জন্তই শ্রীমদ্ভাগবতের—

“তদশ্মদারং হৃদয়ং বতেদং, যদগৃহ্মাণৈহ রিনামধৈর্যৈঃ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররূহেষু হর্ষঃ ॥” শ্লোক দ্বারা-

তাঁহাদিগের আচরণ নিতান্ত গহর্ণযোগ্য জানাইয়াছেন। অপরাধযুক্ত কৃষ্ণনামে তাঁহাদের হৃদয় দ্রব না হয়, অথচ নৈসর্গিক পিচ্ছিলতা বা কপটতা-বশে অশ্রু-পুলকাদি প্রদর্শন করিয়া যাহারা জাতভাব প্রকাশ করেন, তাদৃশ হৃদয়

বাস্তবিকই লোহ-সদৃশ কঠিন। সর্বোত্তম প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি আপনাকে হীন-জ্ঞানে রাগ সম্বন্ধহীন প্রেমধন-রহিত বলিয়াই প্রচার করেন। মূঢ় প্রতিষ্ঠাশা-প্রিয় দর্শক জাতভাব ব্যক্তিকে কঠিন-হৃদয়, বিচার-প্রবণ, অপ্রাপ্ত-ভাব জানিয়া নিজের অমঙ্গল সংগ্রহ করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিক্ষেপট আচরণ-শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপানুগগণের মধ্যে অত্যাচ্ছ আসন লাভ করিয়াও, তাঁহার অমুগতজনের কল্যাণের জন্ত জাতরতি ভক্তের কীর্ত্তন প্রয়োজন-লাভ-লালসাবিণিষ্ট ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান-সমমিত ভক্ত গৌর-কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনেই অভিধেয় ভজন জানিয়া নাম-কীর্ত্তন-ফলে আনন্দাশ্রু-‘পুলকাদি’ প্রয়োজন লাভ করেন—এইরূপ বস্তুনির্দেশ, মঙ্গলাচরণাদি করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র লীলাস্মরণ রূপানুগ-ভজন নহে—উহা কীর্ত্তনাধীন

শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামই শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর সম্বন্ধ, শ্রীনামকীর্ত্তনই অভিধেয়-ভক্তি এবং প্রাপ্ত-কৃষ্ণপ্রেম ব্যক্তির আনন্দাশ্রু-পুলকাদিই প্রয়োজন-লাভ। বলা বাহুল্য (মূল পক্ষারে) ‘বলিতে’-শব্দ প্রয়োগদ্বারা নাম-কীর্ত্তনই অভিপ্রেত। রূপ-দর্শন, গুণ-শ্রবণ বা লীলা-স্মরণ নামকীর্ত্তন হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে অভিধেয়-ভক্তি নির্ণয় করা শ্রীপাদের অভিপ্রেত নহে। ‘শ্রীনামই সর্বদা কীর্ত্তনীয়’—এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শিক্ষায় জগজ্জীবকে নিরন্তর উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য উপদেশ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত-জনের নাই বলিয়াই শ্রীরূপানুগ-গণ বিশ্বাস করেন। ‘নাম-কীর্ত্তন’ ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-ভক্ত্যঙ্গ-জ্ঞানে লীলা-স্মরণ রূপানুগগণের ভজন-পদ্ধতি নহে। ঐগুলি কীর্ত্তনাধীন। শ্রীনামই সেবোন্মুখ সেবকের অপ্রাকৃত বদনে কীর্ত্তনীয়। শ্রীরূপ, গুণ, লীলা সেব-কের সাধনকালীয় ওষ্ঠের দর্শনীয়, শ্রবণীয় বা মননীয় নহেন। পরন্তু অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই সেবনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোকে লিখিত “শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্” শ্লোকের অর্থে শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

“সোহপি স্মরণ-প্রযত্নঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনবতো ভক্তস্য আবশ্যক ইত্যাহ। শৃণ্বত ইতি স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।”

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বোপলব্ধিতে সংসার-বাসনা-নাশ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অভিন্ন বলদেব, শ্রীগৌরসুন্দরের বৈভব-প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণক্রমে কারণ-সমুদ্রে কারণশায়ী, গর্ভ-সমুদ্রে হিরণ্যগর্ভ অন্তর্ধামী পরমাত্মা এবং ক্ষীর-সমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি-মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও রক্ষণ-পালনাদি করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে বদ্ধজীব-সমস্ত 'সংসার' হইতে বিমুক্ত হন। পুরুষাবতারগুণের সহিত মায়ায় সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা মায়াধীশ। বদ্ধজীব স্থায়ী অবিদ্যাবন্ধনে মায়িক সংসারে হরিসেবা-বিশ্বত হইয়া নিজভোগময় 'বাসনা'-বিশিষ্ট হন। শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাঁহার কৃপায় জীবের সংসারে ভোগ-বাসনা থাকে না।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় বৃন্দাবন দর্শন

শুদ্ধজীব, নিত্যানন্দের সেবকাভিমাণে বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া নিশ্চল হন। অপ্রাকৃত নিত্য-সেবকাভিমান প্রবল হইলে ভোগময় প্রাকৃত রাজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনি প্রেম-নয়নে অপ্রাকৃত ভূমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী দর্শন লাভে যোগ্য হন। শ্রীনিত্যানন্দের 'করুণা'ই জীবের অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভের মূল।

• নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্তের কাম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৫৬)

আরে আর কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।

বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্বগভ্য হয় ॥ ৫।১৯৫ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।

যাঁহার কৃপাতে পাইলু বৃন্দাবন-দাম ॥ ৫।২০০ ॥

যাঁহা হৈতে পাইলু রূপ-সনাতনাত্ম্য।

যাঁহা হৈতে পাইলু রঘুনাথ-মহাশয় ॥ ৫।২০১-২০২ ॥ প্রভৃতি

শ্রীচরিতামৃতোক্ত কবিতা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যাঁহারা সাধকরূপে 'বৃন্দাবন' দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়-সুখান্বেষণ করেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভূমি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস্তেই শ্রীবৃন্দাবনীয় রাধা-কৃষ্ণপ্রেম-লাভ

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরপার্ষদ 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ'দাস গোস্বামীদয় আছেন। রাগাভুগ ভক্তগুণের পরম আরাধ্যবস্তু শ্রীরূপ-গোস্বামী এবং রূপাভুগ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ইহঁরাই গৌর-পদাপ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগুণের সেব্য অপ্রাকৃত

বৃন্দাবনের অধিকারী। তাঁহাদের পাদপদ্ম-সেবায় অতোৎসুক্য হইলে রূপানুগ-চরণোপজীবীগণের ‘রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিচিত্রতা’র উপলব্ধি ঘটে।

সাধক ও সিদ্ধ-রূপে সেবা দুই প্রকার

“সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্ত্বি হি।

তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৫১)

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্রমুখ ব্রজবাসীগণের অনুগমনে অন্তর্নিহিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজভাবলুক রূপানুগগণ রাধা-গোবিন্দের ‘মানস-ভাব-সেবা’ করিয়া থাকেন। আবার শ্রীরূপ ও শ্রীরতিমঞ্জরীর অনুগত্যে সেবাভিলাষপর হইয়া ব্রজবাসী গৌর-পার্বদ্বয়ের প্রদর্শিত আদর্শ-জীবনে সাধকরূপে শ্রবণ-কীর্তনপর হন।

শ্রীরূপানুগত্যই লাসসাময় ভজন

শ্রীনিত্যানন্দের করুণায় জীব অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া বিষয়মুক্ত হন এবং অপ্রাকৃত ভূমিতে কৃষ্ণাশ্রিত মঞ্জরী-দ্বয়ের কপালাভ করিয়া ধৃত হন—ইহাই শ্রীরূপানুগগণের জীবিকা। রূপানুগের কৈরুখ্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের “শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ” প্রভৃতি গীত এই আশার প্রস্ফুট-বিকাশ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্ন ও উত্তর

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি ?

শ্রীযুত অমৃতলাল বহু মহাশয় আমাদেরকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেই প্রশ্নটি উত্তর-সহিত প্রকাশ করিতেছি—

প্রশ্ন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা নিগুণ ও ভগবান্ সগুণ অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ভগবান্ নিগুণ, ব্রহ্ম তাঁহার ‘অঙ্গকান্তি’ ও পরমাত্মা ‘অংশ’ বলিয়া উক্তি করেন। ইহার বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি, আপনার পরা পত্নী সজ্জন-তোষণীতে অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করিলে চিরবোধিত হইব।

শাক্ত-বেদান্তই বেদান্ত নহে

উত্তর—প্রশ্নকর্তা উক্ত প্রশ্নের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের নাম ‘বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত’। ‘বেদান্ত’ কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকেব অনেক সন্দেহ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্ত-মত পরস্পর পৃথক। সাধারণে এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন। পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক শাস্ত্রবিশেষ। তাহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ‘বৈদান্তিক মত’। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক। আকুরা প্রথমেই সেই ভ্রম দূর করিতে যত্ন পাইব।

উপনিষদ্ বা বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই বেদান্ত, তাহা জানা

সাধারণের দুঃসাধ্য

বেদের শিরোভাগকে ‘উপনিষৎ’ বলে। উপনিষৎ অনেক। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, খেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি দশটি ‘উপনিষদ্’ বলিয়া সর্বকালে স্বীকৃত আছে। সেই ‘উপনিষদ্’-বাক্যের নামই ‘বেদান্ত’। ‘বেদান্ত’ শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

‘উপনিষদ্’-বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। ‘উপনিষদ্’-গ্রন্থে বিবিন্ন বিভাগপূর্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতদ্বিবন্ধন অল্পসমাধাৰী ব্যক্তির পক্ষে ‘উপনিষদ্’-বাক্যে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-বাক্য

পরম-দয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমত বেদসকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ ‘উপনিষদ্’-বাক্যের তাৎপৰ্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ সংগ্রহ করত প্রায় সাড়ে-পাঁচশত সূত্র নির্মাণ করিয়া ‘বেদান্ত-সূত্র’ বা ‘ব্রহ্মসূত্র’ বলিয়া নামকরণ করিলেন। তাহার শিষ্যগণ এই সূত্রসকলের স্বার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস-সংহিতাক্রমে ‘শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ’ নির্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই স্বার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ স্বার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবত-রূপ ‘ভাষ্যই’ জীবের পক্ষে ‘বেদান্ত-বাক্য’ বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই নিগুণ

আমাদের প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে বেদান্তসূত্র-ভাষ্য-স্বরূপ ভাগবতে এইরূপ
লিখিত হইয়াছে—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১.২।১১)

[যাহা—অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই
'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ
সংজ্ঞায় সজ্জিত অর্থাৎ কথিত হন।]

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানই
'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে,
অদ্বয়-তত্ত্বই সমস্ত সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রামস্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যখন
সেই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ
ন'ন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই 'নিগুণ'।

অদ্বয়-জ্ঞান বলিতে অভেদ-বাদ নহে ; অভেদবাদ বেদবিরুদ্ধ

'অদ্বয়জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন
যে, 'কেবল অভেদ-বাদ'কে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলে। তাহা নয়। 'কেবল অভেদ-
বাদ' সমস্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে
'নিত্যভেদ' উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন
বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই।

অদ্বয়-তত্ত্বের অর্থ—যুগপৎ ভেদ ও অভেদ এবং তাহা অচিন্ত্য

বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ
নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্
হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' একই কালে সত্য, অতএব
অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্ম-তত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য
জীব হইতে প্রমথের নিত্য পার্থক্য আছে। এই 'ভেদাভেদ-তত্ত্ব' যিনি জানিতে
পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-
তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া
থাকে।

অদ্বয়জ্ঞানের ১ম 'ব্রহ্ম', ২য় 'পরমাত্মা' এবং ৩য় বিকাশ

নিগুণ 'ভগবান্'

দ্রষ্টৃ স্বরূপ জীব সেই পরম-তত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার 'কেবল ভেদ' দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্ রূপে ভাসমান হয়। ইহারই নাম "দ্বৈতজ্ঞান"। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম-জ্ঞানময়। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনই ঐ অদ্বয়-জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের 'দ্বিতীয় প্রতীতি'। পরমাত্ম-তত্ত্ব দৃষ্টীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম-চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম 'ভগবান্'। ভগবদ্-দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরম বস্তু আর পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায়, তাহার স্বরূপ প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব ভগবান্‌ই অদ্বয়তত্ত্বের চরম প্রকাশ, পরম নিগুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাহারা ভগবান্‌কে 'সগুণ' ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে 'নিগুণ' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্ত-বিচারে পটু ন'ন, অদ্বয়তত্ত্বের যথার্থ লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্র (১১।২।৩) সূত্রের শঙ্করভাষ্য অসার এবং

ভাগবত-সিদ্ধান্তই সার

পাঠক মহাশয় যদি 'ব্রহ্মসূত্রের' তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, দ্বাদশ সূত্রটি বিচার করিয়া দেখেন, তবে আমাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। সূত্রটি এই :—

'ন ভেদাদিতি চেম্ম প্রত্যেক-মতদ্বচনাৎ।'

—এই সূত্রের 'কেবল অদ্বৈতভাষ্যে' কোন প্রকার ভাল সিদ্ধান্ত নাই। রামানুজাদি পরমপণ্ডিতগণ এই সূত্রটির ভাষ্যবিচারে যে সূত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সমুদায় বিচার করিলে স্থানাভাব হয়। অতএব আমরা কেবল এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইব।—

মণিধ্বা বিভাগেন নীলপীতাদিভিধূতঃ ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদান্তথাচ্যুতঃ ॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন)

[বৈদুৰ্ঘ্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ-স্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অধিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয় ।]

সেই অদ্বয়-জ্ঞানরূপ অচ্যুত-তত্ত্ব স্বরূপতঃ একমাত্র ভগবান্ । জীব দৃষ্টিভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন । ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই ‘বৈদুৰ্ঘ্য মণি’ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে । তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ ‘তত্ত্বমণি’ জীবের অধিকারভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান হয় । এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের অধিকার ভেদ কত প্রকার ?

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিভেদে জীবের ত্রিবিধ অধিকার

জীবের বুদ্ধি, দক্ষতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার । সেই অধিকারসমূহ স্থূলবিচার দ্বারা তিনপ্রকারে বিভক্ত হয় । সেই তিনটি অধিকারের নাম—‘জ্ঞান’, ‘যোগ’ ও ‘ভক্তি’ । জ্ঞানাদিকারে অবস্থিত পুরুষ সেই তত্ত্বমণিকে ‘ব্রহ্মস্বরূপে’ দৃষ্টি করেন । যোগাদিকারে অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে ‘পরমাত্মাস্বরূপে’ দৃষ্টি করেন । ভক্ত্যাদিকারে অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির ‘ভগবৎস্বরূপ’ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন ।

সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ছিল না ; সৃষ্টির পর ‘ব্রহ্ম’ অঙ্গকান্তি এবং

‘পরমাত্মা’ অংশবিশেষ-রূপে প্রতিভাত

ভগবৎস্বরূপই ‘পূর্ণস্বরূপ’, যেহেতু তাহাই ‘বিশেষ্য তত্ত্ব’ । ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই ‘বিশেষ্য’র ‘বিশেষণদ্বয়’ । যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না । তখন ব্রহ্ম ছিল না । জগৎ সৃষ্টি হইলে “সর্বং ব্রহ্মগয়ং জগৎ” এইভাবে ভগবানের একটা বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয় । ‘ব্রহ্ম’ সম্বন্ধে দুইটা ভাব আছে । একটা “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” । দ্বিতীয়টা সমস্ত সৃষ্টি বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তাবিশেষ । উভয় ভাবই বিশ্বসম্বন্ধীয় ভাব । অতএব ‘ব্রহ্ম’ই ভগবানের “জ্যোতিঃ-স্বরূপ” বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত । এস্থলে ‘ব্রহ্ম’কে ‘ভগবানের ‘অঙ্গকান্তি’ বলিলে যথার্থ্যের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে । ‘পরমাত্মা’কে ভগবানের ‘অংশ’ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না । জীব-সৃষ্টির সহিত ভগবানের যে অংশাবির্ভাব, তাহা ভগবদগীতায় স্বীকৃত হইয়াছে ।—

অপরেয়মিতস্তৃৎ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৫) .

[এতদ্ব্যতীত আমার একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে ‘পরা-প্রকৃতি’ বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা ; সেই শক্তি হইতে সগন্ত জীব-নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিচ্ছগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত এই জড়জগৎ,—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে ‘তটস্থা শক্তি’ বলা যায়।]

বোধ হয়, অমৃত বাবুর আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যদি কোন সন্দেহ হয়, তবে লিখিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীমন্ত্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামি-চরণে দীনের নিবেদন

সুবাসিত বিষ্ণুভক্ত-কুসুম-কাননে ।

তারার-হার-মধ্যমণি শীতেন্দু-সমান

বৈষ্ণব-মুকুটমণি কলিজীব-প্রাণ

বিরাজিত “প্রভুপাদ” প্রসন্ন-আননে ॥১॥

মরি মরি কি সুন্দর রূপের মাধুরী ।

অমর, কিন্নর, নর মুগ্ধ রূপ হেরি ॥

হিমোজ্জ্বল সৌম্য রম্য প্রশান্ত মুরতি ।

সুধা-ধাম শশী হেরি হ’ল ম্লান জ্যোতি ॥

পুরট-মৃগাল-নিন্দি শ্রীভুজ-যুগল ।

কৃষ্ণের বসতি-স্থল রম্য বক্ষঃস্থল ॥

সুরভিত কুসুমের মালা দোলে গলে ।

কোমল কমল-দল চরণ-কমলে ॥২॥

কৌমুদী-তুষার-শুভ্র দিব্য উপবীত ।

শোভিছে সুন্দর কণ্ঠ মালিকা-সহিত ॥

আখিতে আনন্দ-ভাতি, করে বরাভয় ।

চরণ-কমল-কুঞ্জ, পতিত-আশ্রয় ॥

জীব-দুঃখ হেরি আঁখি করে নিরন্তর ।

জীবে বিতরিতে কৃপা আনন্দ অন্তর ॥

জীবের মলিন মুখ হেরি অকাতরে ।

বিলাইছ মহামন্ত্র প্রতি ঘরে ঘরে ॥৩॥

আলেয়ার আলো-সম মায়ার ছলায়

ভ্রান্তপথে ছুটে ছুটে দিশেহারা হ'য়ে ।

ভুঞ্জিয়া নরক-ব্যথা করি হায় ! হায় !

রক্ষা কর প্রভুপাদ ! করুণা করিয়ে ॥

আমি অতি হীন, মায়ার অধীন,

ভাসি ভব-জলধির অন্তহীন নীরে ।

তুমি প্রভুপাদ ! প্রদান' শ্রীপদ-

কমলের ধূলি-কণ এদাসের শিরে ॥৪॥

আমি সে দুর্দৈবগ্রস্ত, মোর মত ভাগ্যহত,

এ মর্ত্য ভুবনে দ্বিতীয় নাই ।

মনুষ্য-জনম পায়্যা, সেবি সদা দৈবীমায়া,

মত্ত আছি সংসারে সদাই ॥

সেবন-বিমুখ আমি, মুঢ়মতি দুষ্কামী,

সদা আছি সেবাতে বঞ্চিত ।

তেয়াগিয়া নিত্যধনে, যত্ন করি হীনধনে,

যাহে আছে অনর্থ জড়িত ॥৫॥

আপন দুর্দৈব-বশে, শ্রীগৌর-কীর্তন-রসে,

মগন না হ'য়ে নিশিদিন ।

মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে, নিত্য ভাবি অনিত্যে,

হয়েছি কুকুর হ'তে হীন ॥

তাজিয়া চৈতন্য-ধর্ম্য, করি কদাচর-কর্ম্য,

কৃষ্ণপদে নাহি প্রীতি মোর ।

কৃষ্ণ-কাঞ্চ-সেবা তাজি, সদা মায়া-পদ ভজি,

অসভ্যতাতে সদা ভোর ॥

দয়া করি দেহ মোরে কৃষ্ণভক্তি দান ।

তোমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥৬॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়), পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

পরাদর ও পরনিন্দা*

(৩)

সুদুরাচার অনন্যভক্ত নিন্দনীয় নহে

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তয়! প্রতিজানীহি ‘ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি’ ॥ (গী: ৯।৩০-৩১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—যিনি অগ্নাভিলাষ, কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও দেবতাপূজাদি না করিয়া গুরুতর অপরাধশূন্য হইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোমলশ্রদ্ধ হইলেও এবং তাঁহার হঠাৎ পাপাসক্তি দেখা গেলেও তাঁহাকে নিন্দা করিতে হইবে না। তবে তিনি সঙ্গযোগ্য নহেন, একথা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি অকস্মাৎ সুদুরাচারও হন, তথাপি সাধু বলিয়া মাথ। সেই অনন্যভজনকারী অবিলম্বে ধৰ্ম্ম-পরায়ণ হইয়া নিত্য-শান্তি লাভ করেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল। ভক্তের প্রতি তাঁহার আসক্তি বা প্রীতি স্বাভাবিকী। ভক্ত কদাচিৎ দুরাচার-গ্রস্ত হইলেও ভগবানের এই সহজ প্রীতি নষ্ট হয় না। পরন্তু তিনি ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষাই করিয়া থাকেন। ‘অনন্য-ভক্ত’ পূৰ্ব্ব-সংস্কার ও দুৰ্ব্বলতাবশতঃ পরহিংসা, পরদার ও পরদ্রব্যাদি গ্রহণ-পরায়ণ হইলেও কৃষ্ণভজন কিছুতেই ছাড়েন না; এবিষয়ে সাধু-গুরু-কৃপায় তিনি দৃঢ়নিশ্চয়। তাঁহার এইসকল দোষ দেখা গেলেও তাঁহার ভজন-নিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিন্দা করা উচিত নহে—ইহাই ভগবদাদেশ। এই আদেশ-লঙ্ঘনে প্রত্যাবায় অবশুস্তাবী! “দুস্ত্যাজ্য পাপের ফলে আমার নরক-বাস বা পক্ষী-জন্ম লাভ হউক, তথাপি আমি কৃষ্ণভজন কিছুতেই ছাড়িব না”,—তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতা লাভের সৌভাগ্য সাধুগুরু-কৃপায় হইয়াছে বলিয়া তিনি সাধু। অনন্যভক্তের তথাকথিত পাপ-ক্রিয়া ভজিত-বীজ বা শস্যের ছায়। অর্থাৎ electric switch off

হইয়া গেলেও fan-এর কিছুক্ষণ ধরিয়া যে ঘূর্ণন দৃষ্ট হয় এবং অল্পক্ষণই উহা যে বন্ধ হইবে তাহার সহিত “Switch on” অর্থাৎ—যাহাতে বন্ধ হয় না, চলিতে থাকে তাহার অবস্থা এক নহে। ‘অনন্ত-ভাক্’ ভক্তের স্তূহরাচারত্ব সম্বন্ধে তদ্রূপই বুদ্ধিতে হইবে। অনন্তভক্ত শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজন করিতেছেন এবং প্রথম-মুখে দুর্বলতাবশতঃ বিষয়ত্যাগে সম্পূর্ণ সমর্থ না হওয়ায় গর্হণমুখে বিষয়ভোগ করিতেছেন। “নিন্দামি চ পিবামি চ”—তাহার হৃদয়ের এই অবস্থা হইয়াছে। বিষয়ে তাহার অত্যাশক্তি নাই। আবার বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও আসে নাই, অথচ হরিনাম ও হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা ও রুচি প্রচুর পরিমাণে ভগ্নিমাছে। তিনি ভগবৎ-কৃপায় নিশ্চয়ই শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্।

ন নির্বিশেষো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।১৮)

এই স্তূহরাচার-পরায়ণ ‘অনন্য-ভক্ত’ ভগবৎ-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে অনু-তপ্ত হইয়া শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হন। ভগবৎকৃপায় তাহার নির্বেদ না আসিয়া পারে না। ভগবান্ যাঁহার নিত্য রক্ষক, সেই ভক্তের কি কোন অসুবিধা হইতে পারে? ভগবচ্চরণাশ্রিত ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না। ভক্ত কৃতার্থ হইবেই হইবে।

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ অপি চেৎ স্তূহরাচারঃ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

“স্বভক্তেষ্বাসক্তির্মম স্বাভাবিক্যেব ভবতি ; সা তুরাচারেহপি ভক্তে নাপযাতি, তমপ্যুক্তষ্টমেব করোগীত্যাহ,—অপি চেদিতি। স্তূহরাচারঃ পরহিংসা-পরদার-পরদ্রব্যাদি-গ্রহণপরায়ণোহপি মাং ভজতে চেৎ ; কিদৃগ্ভজন-বানিত্যত আহ—‘অনন্তভাক্’ মত্তোহন্যদেবতাস্তরম্, মত্তোক্তোক্ত্যং (কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকম্, মংকামনাতোহন্যাং রাজ্যাদিকামনাং ন ভজতে স সাধুঃ। নম্রতাদৃশে) কদাচারে দৃষ্টে সতি কথং সাধুত্বম্? তত্রাহ—মন্তব্যো মননীয়ঃ, সাধুত্বেনৈব স জ্ঞেয় ইতি যাবৎ ; মন্তব্যমিতি বিধিবাক্যম্, তত্ত্বা প্রত্যবায়ঃ স্তাৎ ; অত্র মদাজ্জৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ। নমু হ্যং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ, পরদারাদি-গ্রহণাংশেনাসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ—এবেতি। সর্ব্ব-পাপাংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তস্তাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। সম্যগব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্ত সঃ। দুষ্টাজ্জৈন স্ব-পাপেন নরকং তিষ্ঠ্যগ্ঘোনীবা যামি, ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনম্ নৈব জিহামামীতি সঃ শোভন-মধ্যবশাৎ কৃতবানিত্যর্থঃ।

নহু তাদৃশশ্রাদ্ধর্মিণঃ কথং ভজনং তং গৃহ্যাসি, কামক্রোধাদি-দুষিতান্তঃকরণেন
 নিবেদিতমন্ন-পানাদিকং কথমশ্নাসীত্যত আহ—ক্ষিপ্ৰং নীষ্মমেব স ধর্মাত্মা
 ভবতি । অত্র ক্ষিপ্ৰং ভাবী স ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতীতি । অগ্রযুক্ত্য ভবতি
 গচ্ছতীতি বর্তমান-প্রয়োগাৎ অধর্ম-করণানন্তরমেব মামকুশ্ল্যত্ব কৃতান্তুতাপঃ
 ক্ষিপ্ৰমেব ধর্মাত্মা ভবতি । হস্ত হস্ত ! মন্তুল্যঃ কোহপি ভক্তলোকং
 কলঙ্কয়ন্নধমো নাস্তি, তদ্বিদ্ভামিতি শশ্বৎ পুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্কেদং নিতরাং
 গচ্ছতি ; যথা, কিয়তঃ সময়াদনন্তরং তস্তাভাবি ধর্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ
 বর্তত এব ; তন্মনসি ভক্তেঃ প্রবেশাৎ যথা পীতে মহোষধে সতি তদানীং কিয়ং কাল-
 পর্যন্তং নশ্চদবস্থো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্তমানোহপি ন গণ্যতে ইতি ধ্বনিঃ ।
 ততশ্চ তস্তা ভক্তস্তা দুরাচারত্বগমকাঃ কামক্রোধাত্মা উৎখাত-দংশ্ট্রোরগ-দংশ্বদ-
 কিঞ্চিৎ-করা এব জ্ঞেয় ইত্যনুধ্বনিঃ । অতএব শশ্বৎ সর্বদৈব শান্তিং কাম-
 ক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছত্যতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি দুরাচারত্ব-দশায়ামপি স
 শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ । নহু যদি স ধর্মাত্মা স্তান্তদা নাস্তি কোহপি
 বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদ-দুরাচারভক্তো জন্মপর্য্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহতি, তস্ত কা
 বার্হেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ—কৌন্তেয়েতি । মম
 ভক্ত ন প্রণশ্চতি, তদপি প্রাণনাশে অধঃপাতং ন যাতি । কুতর্ক-কর্কশবাদিনো
 নৈতন্মন্তোরয়িত্তি শোকশঙ্কা-ব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় ! পটহ-
 কাহলাদি-মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গজা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশব্দং
 প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু । কথম্ ? মে মম পরমেশ্বরস্ত ভক্তো দুরাচারোহপি
 ন প্রণশ্চতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতি ।”

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের তাৎপর্য উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন । কদাচিৎ
 পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ অথবা আকস্মিক দুর্ব্বলতাবশতঃ কোনও সাধনপর ভক্ত বিশেষের
 পাপকার্যের কথাই উক্ত টীকার বক্তব্য বিষয় । ইহা না বুঝিয়া পাটোয়ারী
 বুদ্ধিক্রমে নিজ অসৎ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্ত সাধুতার ভাগ করা
 সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত ও সাধু-নিন্দার প্রধানতম পথ । কাহারও প্রতি কঠিন বাক্য
 প্রয়োগই নিন্দা নহে, কারণ শাস্ত্র বলেন—‘সন্ত এবান্ত ছিন্দন্তি মনো-
 ব্যাসদমুক্তিভিঃ ॥’ সাধুসকল কঠিন উক্তিধারা জীবের অসাধুপ্রবৃত্তিগুলি ছেদন
 করিয়াছেন । ‘ছেদন’ অর্থে ইন্দ্রিয়-স্বথকর নহে । এতৎ-ব্যতীত লোকের
 অসৎ-বৃত্তিগুলিকে কখনও বহমানন করিতে হইবে না । যাহারা সাধনমার্গে
 বিচরণশীল, তাহারা সদসদ বিচার করিয়া সর্ব্বদাই অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন ।

‘ততো হঃসদৃশং সৃজ্য সংস্র সজ্জত বুদ্ধিমান্’ । একপক্ষেত্রে কেহ যেন বোকা সাজিয়া না যান । যিনি ঐরূপ দুরাচারের জগ্ন নিজেকে পাপী জ্ঞান করিয়া সর্বদা লজ্জিত থাকেন ও আপনাকে হীন মনে করেন, তাহাকে তাহার অনন্তভাকু-বৃত্তির প্রীতি লক্ষ্য করিয়া সাধু মনে করিবে । নিন্দা করিবে না ।

সাধু-শাস্ত্র ও ভগবান্ সকলেই নিন্দাকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন । পরনিন্দক কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না । এজন্ত বুদ্ধিমান্ জনগণ সর্বনাশকর পরনিন্দা হইতে দূরে থাকিয়া সাধু-গুরুর আনুগত্যে ভগবন্মাম ও ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন । পরনিন্দা অত্যন্ত ভক্তি-প্রতিকূল ব্যাপার । এই বিপদ হইতে সকলেই সাবধান হইবেন, ইহাই প্রার্থনা ।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিমমুখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত বাণী

সম্বন্ধ-জ্ঞান ও শ্রীগুরুতত্ত্ব

সম্বন্ধ-জ্ঞান কাহাকে বলে ?—তাহা আমরা জানি না ; ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

“সে সম্বন্ধ নাহি ধার, বুঝা জন্ম গেল তার,

সেই পশু বড় দুরাচার ।

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,

বিজ্ঞাকূলে কি করিবে তার ॥”

ইহ-সংসারে দুইটি সম্বন্ধ—একটি মায়িক সম্বন্ধ, আর একটি ভগবৎ-সম্বন্ধ । ঠাকুর মহাশয়ের কথিত ‘সে সম্বন্ধ’ বলিতে ভগবৎ-সম্বন্ধই বুঝায় । সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব—অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীবলদেব । চিদ্বলদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জীব দুর্জয় মাম্বাপাশ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে । ‘দ্বিবাং জ্ঞানং যতো দত্তাং কুর্যাং পাপশ্চ সংক্ষয়ম্’ । যাহা হইতে দ্বিবাং-জ্ঞানের উদয় হয়, পাপ, পাপবীজ এবং পাপ-বীজের মূল অবিদ্যা সমূলে ধ্বংস হয়, তিনিই গুরু অর্থাৎ সদগুরু—গুরুত্ব নহেন । যাহাকে ‘সম্বন্ধ-জ্ঞান’ বলে, তাহাই ‘দ্বিবাংজ্ঞান’ ও দীক্ষা । আমাদের কি ঐরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে ?—ইহাই বিচার্য বিষয় ; আমাদের কি সত্যসত্যই প্রকৃত দীক্ষা ও দ্বিবাংজ্ঞানের উদয় হইয়াছে ?—তাহার প্রকৃত পরিচয় অবশ্যই আছে ।

মায়ার স্বরূপ :—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—‘অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া’ (অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া) ‘অসত্যেরে সত্য করি’ মানি । অষ্টটন-বটন-পটীয়াসী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, চতুর্দশ-ভুবনাত্মক দেবী-ধামের ঈশ্বরী মহামায়ার সৃজিত ধ্বংসশীল, পরিবর্তনশীল, নশ্বর জগৎকে জীবসকল ষাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া ইচ্ছজালের ন্যায় সত্য মনে করিতেছে, ষাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীব মরুভূমিতে মরীচিকা ভ্রমে পতিত হইতেছে এবং পরিণামে নিশ্চয় দুঃখদায়ক, ত্রিতাপ-জালা-প্রদায়ক এই অনিত্য মায়িক জেলখানা-রূপ সংসারকেই আরামপ্রদ নন্দনকানন-সদৃশ স্থলের আগার বলিয়া মনে করিতেছে, তিনিই প্রকৃত মায়া ।

ত্রিতাপজালা :—প্রশ্ন হইতেছে, ত্রিতাপ-জালা কি ? তাহার পরিণাম কি ? তাহার উত্তর আমরা শাস্ত্রমুখে শুনিতে পাই—(১) অধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক, (৩) আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-জালা । **আধ্যাত্মিক তাপ** আবার দুইভাগে বিভক্ত :—শারীরিক এবং মানসিক জালা । শারীরিক তাপ, যথা—জ্বর, বসন্ত, কলেরা, কুষ্ঠ ইত্যাদি বহুবিধ রোগ । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি মানসিক ক্লেশ । **আধিভৌতিক তাপ**, যথা—মামলা, মোকদ্দমা, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বৃশ্চিক, সর্প ইত্যাদি হিংস্র জন্তু-কর্তৃক তাপ । **আধিদৈবিক তাপ**, যথা—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বত্মা, ভূকম্পন, বজ্র-পতন । কি ধনী, কি দরিদ্র—কিবা রাজা, কিবা মহারাজা—কেহই এই ত্রিতাপ হইতে নিজ-চেষ্টায় নিজকে রক্ষা করিতে পারেন না—ভীষণ মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধার-লাভে অক্ষম । শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কাহারও এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই । এই নিদারুণ ভব-ভয় ও ত্রিতাপ হইতে একমাত্র শ্রীগুরুদেবই রক্ষা করিতে পারেন ।

জীবের স্বরূপ ও বিরূপ :—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অপ্রাকৃত দার্শনিক কবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

জীবের ‘স্বরূপ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’ ।

কৃষ্ণের ‘তটস্থ শক্তি’ ‘ভেদাভেদ-প্রকাশ’ ॥

কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব—অনাদি-বহিস্মৃৎ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮, ১১৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—বিভূচৈতন্য, জীব তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ অণুচৈতন্য । কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করিয়া, পুনরায় তাহার একভাগকে যদি শত ভাগ করা

যায়, সেই পরিমাণ অণুই জীবের স্বরূপ ও ভগবদংশ। ভগবান্ স্বর্ঘ্য-সদৃশ, জীব তাঁহার কিরণ-কণ; ভগবান্ বৃহৎ-অগ্নিস্বরূপ, জীব ক্ষুদ্রিক কণ। ভগবান্ জীবের নিত্য প্রভু, জীব ভগবানের নিত্যদাস। দাসের কর্তব্য প্রভুর সেবা করা এবং উহাই ভক্তি। এই ভগবদ্ব্যক্তি লুপ্ত হওয়ায় জীবের মায়িক কারাগারে দারুণ দুর্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। জীব—তটস্থ-শক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ এবং মায়িক জগতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। স্বতন্ত্রতাবশতঃ জীব যদি ঈশ্বর-বিমুখ হয়, তবে মায়াদেবী তাহাকে লিঙ্গদেহ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-রূপ সূক্ষ্মশরীর প্রদান করেন, এবং পরে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত-নির্মিত স্থলদেহ প্রদান করিয়া সংসার-কারাগারে বদ্ধ করেন। •

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৮)

জীব কর্মফলে কখন স্বর্গে যাইয়া নন্দন-কানন, পারিজাত, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি স্বর্গ-নারী ভোগ করত পুণ্য ক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে; আবার কখনও পাপকার্য্য করিয়া অধোগতি নরকে গমন করে। নাগর-দোলার ত্রায় একবার উর্দ্ধে, একবার নীচে গমন করিয়া থাকে। ‘পুনরপি জননং, পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী-জঠরে শয়নম্ ॥’—এই প্রকার জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া জীবসকল নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

বদ্ধজীবের জঠর-যন্ত্রণাঃ—এইরূপে জীব মাতৃগর্ভে হেটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে বিষ্ঠা-গর্তরূপ পুতিগন্ধময় কুমিকুল-সঙ্কুল স্থানে দারুণ যন্ত্রণা পায়। শাস্ত্র বলেন,—

“জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।

ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যাকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।

ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুল্লক্ষাণি মানবাঃ ॥”

মকর, কুম্ভীর ইত্যাদি জলজন্তু নয় লক্ষবার, বৃক্ষলতা-প্রস্তরাদি বিশ লক্ষবার, কুমি-কীট, পোকা-মাকড় ইত্যাদি এগার লক্ষবার, ধোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি তিন লক্ষবার এবং মানব-জন্ম চার লক্ষবার হইয়া থাকে। মানব-জন্মেই জীবের হরিভজন হয়,—ভজন করিয়া এই ভীষণ মায়ার জেল হইতে জীব মুক্ত হইতে পারে।—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১১।১১৯)

পশু-পক্ষীজন্মে জীব জিহ্বা পাইয়াও শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে না এবং অন্য জন্মেও হরিভক্তনের স্মরণ নাই; কিন্তু মনুষ্য-জন্মেই ইহা একমাত্র সম্ভব। তজ্জনাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ। জীব বহু জন্মের পর এই মুক্তি-লাভের পথ-স্বরূপ মনুষ্যজন্ম বহু সৌভাগ্যবশতঃ পাইয়া থাকে। দুর্দৈববশতঃ এই জন্মে জীব যদি হরিভক্তনে উদাসীন হয়, তবে তাহার আর দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। নীচ কৰ্ম্ম-ফলেই উচ্চ গতি লাভ হয়। অহল্যাদেবী মুনী-কোপানলে প্রসূত-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে মানবী-তম লাভ করেন। কুবের-তনয়—নলকুবর এবং মণিগ্রীব শ্রীনারদের অভিষাপে বহুকাল শ্রীবৃন্দাবনে যমলার্জুন বৃক্ষরূপে ছিলেন; পরিশেষে শ্রীবাল-কৃষ্ণ ঐ অজ্জুনবৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিয়া দুই ভ্রাতাকে উদ্ধার করেন।

শ্রীভগবানের স্বরূপ কি :—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥” শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ—সং, চিং এবং আনন্দময়। তাঁহার দেহ চেতন ও নিত্য, মায়িক বস্তুর ত্রায় নথর নহে। তিনি সকলের আদি, সকল কারণের কারণ; তাঁহার কারণ আর কেহ নাই, তিনি স্বয়ং বস্তু।

ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীর্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যশাং ভগ ইতীদৃশা ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য, সমগ্র জ্ঞান যাহাতে পরিপূর্ণতমরূপে বিদ্যমান, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ‘ভগবান্’-পদবাচ্য। তিনিই সর্বশক্তিমান। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা প্রধান। অচিন্ত্য-ভাব তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া বর্তমান আছে। শ্রীভগবানের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিন্ময়। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানকে এই বলিয়া স্তুব করিয়াছিলেন,—

অঙ্গানি যন্ত সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি

পশুন্তি পাস্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।

আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্ত

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২)

শ্রীভগবানের সকল অঙ্গ চিন্ময়; তিনি চক্ষুতে স্তুনিতে পান, কর্ণে দেখিতে পান; তিনি নির্দোষ ও পূর্ণ। (১) ভ্রম (২) প্রমাদ (৩) করুণাপাটব (৪) বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয় বদ্ধজীবে আছে, কিন্তু ভগবানে নাই।

জীবের অনর্থ কি ?—(১) স্বরূপভ্রম, (২) অসতৃষ্ণা, (৩) হৃদয়-দৌর্বল্য, (৪) অপরাধ—এই চারিটি অনর্থ। শ্রীশঙ্কর-বৈষ্ণব-কৃপায় ভজন-বলে জীব এই অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। ক্রমে ক্রমে শ্রীনাথে নির্ণা, কুচি, ভাব-ভক্তি প্রভৃতি উদ্ভিত হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-ধিকারকারী পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। কলিযুগ-পাবনাবতারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব জগৎকে এই শিক্ষাদ্বারা ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব’ বুঝাইয়া জীব-উদ্ধার-লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব দয়াময়; তাঁহার দয়া-সমুদ্রের তুলনাই নাই। ‘কালারম্ভঃ ভক্তিব্যোগঃ’—কালে যে ভক্তিব্যোগ নষ্ট হইয়াছিল, শ্রীগৌরাজ-মহাপ্রভু পুনঃ তাহা প্রকট করেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ও মায়িক জগতে প্রভেদ কি ?—ভূঃ, ভুবঃ, স্বয়ং, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সাতটি উর্দ্ধলোক এবং অতল, বিতল, স্তূতল, মহাতল, রসাতল, তলাতল, পাতাল—এই সাতটি নিম্নলোক। ইহারা চিঞ্জতেরই ছেয় প্রতিফলন। “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং, নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহ-ন্নয়িঃ।”—ইহলোকের চন্দ্র-সূর্য্য সেই চিঞ্জগতে আলোক প্রদান করিতে পারে না। এইসকল সেই চিঞ্জগতেরই প্রতিবিম্ব। সেই চিহ্নামে সকলই আসল, এই জগতে সবই নকল। সেখানে বিশ্ব, এখানে প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়া। সেই ভগবদ্ধামে শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস আছে—এখানেও ঐ পঞ্চরস ছায়ারূপে বিদ্যমান। এখানে সকলেই স্বার্থপর, সেখানে সকলই পরার্থপর ও আনন্দময়। এখানে দেবীধাম মায়িক জগৎ বলিয়া সকলই দুঃখময়।

প্রাকৃত বন্ধু কে ?—আমরা মায়ার কুহকে পড়িয়া ভ্রমবশতঃ যাহারা নিত্যবন্ধু, সেই শ্রীহরি-শঙ্কর-বৈষ্ণবকে পর বলিয়া মনে করি। “উন্টা বুঝি রাম।”—ইহাই মায়ার মোহিনী-শক্তি। আমরা আপন জনকে ‘পর’ ভাবি, পরকে ‘আপন’ ভাবিয়া দুঃখ পাই। অথচ আত্মীয় কাহাকে বলে ?—এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন—আত্মার সম্বন্ধেই ‘আত্মীয়’ হয়, আর অনাত্মার সম্বন্ধেই ‘পর’ হয়। ইহ জগতে যে আমাকে মৃত্যু-ভয় হইতে—যমদণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে না পারে, সে আমার কে ?—মিত্র, না অমিত্র ?

গুরুন স স্ত্রাং স্বজনো ন স স্ত্রাং

পিতা ন স স্ত্রাজ্জননী ন সা স্ত্রাং।

দৈবং ন তং স্ত্রান্ন পতিশ্চ স স্ত্রাং

ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

সে গুরু গুরু নহেন, সে স্বজন স্ব-জন নহেন, সে পিতা পিতা নহেন, সে মাতা মাতা নহেন, সে দেবতা দেবতা নহেন, সে পতি পতি নহেন, যিনি আমাকে এই উপস্থিত শমন-ভয় হইতে ত্রাণ করিতে না পারেন। এই বাক্যাগুলির উদাহরণ শাস্ত্রে দেখিতে পাই—**শ্রীবলিরাজ** তাঁহার গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই, **শ্রীবিভীষণ** তাঁহার ভ্রাতা রাবণের কথা মানেন নাই, **শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজ** তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর কথা গ্রাহ করেন নাই, **শ্রীভরত-মহারাজ** তাঁহার মাতা কৈকেয়ী দেবীর কথা গ্রহণ করেন নাই। **খট্ভাঙ্গ-রাজা** দেবতাদের কথা পালন করেন নাই ও **যাজ্ঞিক পত্নীগণ** তাঁহাদের পতির কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সেই সাধ্বী যাজ্ঞিক পত্নীগণ তাঁহাদের পতির সম্মুখেই ভক্তিব্যোগ-বলে পরম-পতির সঙ্গে মিলিত হইয়া ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—**শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব**ই জগতের প্রকৃত বন্ধু।

শ্রীভাগবত বলেন,—যাহার কর্ণে গদাগ্রজ শ্রীহরির কথা প্রবেশ করে নাই, সে পশুর সমান—

শ্ব-বিড়্‌বরাহোষ্ট্র-খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।

ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ (ভাঃ ২।৩।১২)

গর্দভের মত আমরা জগতে মায়ায় বোঝা-ই বহিয়া মরি তহি। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—“গর্দভের মত আমি করি পরিশ্রম। কার গালি এত করি না ঘুচিল ভ্রম ॥” ভগবদ্ভিষ্মক জীব শূকরের মত বিষয়-বিষ্ঠাভোজী, কুকুরের গ্রাম অকারণ ক্রোধযুক্ত, উষ্ট্রের মত কণ্টক-পত্র-চর্কণে মুখবিবর রক্তাক্ত, ষড়বিস্তৃত। কণ্টক-চর্কণে এত যন্ত্রণা, তথাপি উষ্ট্র ঐ আসক্তি ছাড়িতে পারে না। এই মান্বিক জগতে আমরাও ঐ প্রকার নানা দুঃখ-বষ্ট পাইলেও, জাগতিক সম্বন্ধ প্রবল থাকায় মায়া ত্যাগ করিতে পারি না। তাই “শ্রীকুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।” নচেৎ আর অন্য উপায় নাই। অতএব সর্বতোভাবে সদগুরু-পদাশ্রয়ে ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

নববিধা ভক্তি :—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে আমরা (৬৪) চৌষটি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের কথা জানিতে পারি। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নয়টি প্রধান। এই নয়টির মধ্যেও আবার সর্গশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। তথাপি “এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু

অঙ্গ—বিচারে দেখা যায়, এক এক মহাজন এক একটী অঙ্কেই অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে উদাহরণ, যথা—শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ, কীর্তনে শ্রীব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ, পাদসেবনে শ্রীলক্ষ্মীদেবী, অর্চনে শ্রীপৃথুরাজা, বন্দনে শ্রীঅক্রুর ভক্ত, দাস্ত্রে শ্রীবজ্রাজী, সখে শ্রীঅজ্ঞান, আত্ম-নিবেদনে শ্রীবলি মহারাজ পরম-মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারাই পরাভক্তি লাভ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

একান্তী বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

সহস্র ব্রাহ্মণ হ'তে একজন—
সাবিত্র-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ।

সহস্র সাবিত্র- ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
বেদান্তবিদ বরিষ্ঠ ॥

কোটি বেদবিদ ব্রাহ্মণ হইতে
এক বিষ্ণুভক্ত বড় ।

সহস্র বিষ্ণুর ভকত হইতে
একান্তিক এক দঢ় ॥

একান্তিক জন কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ হন,
অন্য আশা নাহি য়ার ।

কৃষ্ণের চরণ হৃদয়ের ধন,
করি' সেবে অনিবার ॥

হেন বৈষ্ণবের দর্শন জীবের—
সুদূর্লভ বলি' কয় ।

লভয়ে যে-জন তাঁর দরশন,
সৌভাগ্য ঘাহার হয় ॥

এহেন বৈষ্ণব- চরণে পড়িয়া,
আজি এই মুঢ় জনে ।

করে নিবেদন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
স্থান দেহ শ্রীচরণে ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিক্তান্ত সন্ন্যাসী প্রভুপাদের

অষ্টমপুত্রিতম শুভাবিভাব-বাসরে—

শ্রী শ্রীগুরুপূজা-প্রশস্তি

(পূর্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীব্যাসের কার্য—হরিকীর্তন । ব্যাসত্ব ও রূপানুগতের স্বত্বলভ মণিকাঞ্চন-সংযোগ আচার্য্যের চরিত্রে দেদীপ্যমান ছিল । সাহিত্য-সম্প্রদায়সমূহের বিভিন্ন তথ্য, ইতিহাস, ভজন-প্রণালী, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ, দার্শনিক বিচার, ভজনের রহস্যাবলীর উদ্ঘাটন ও তুলনামূলে শ্রীরূপানুগ-বিচারের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন এই আচার্য্যের আদর্শে যেক্রপ মৌলিক গবেষণার সহিত সম্প্রকাশিত, জগতে সেক্রপ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ তুল্য ; বিপরীত-ভাবাপন্ন সংসার-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণও অনেক সময় ইহা অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন । কাহারও কাহারও ধারণা,—“রূপানুগ ভজন-কারিগণের পক্ষে বিভিন্ন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সম্প্রদায়ের ইতিহাসের আলোচনা অনাবশ্যক, কারণ উহা চিত্তবিক্ষেপের হেতু ।” বস্তুতঃ রূপানুগবর শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ও অস্মদীয় আচার্য্যবর্ষ্যের আদর্শ ঐক্রপ বিচারকগণের অজ্ঞতা প্রতিপাদন করিয়াছে ।

অকাল-পকাবস্থায় কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণের চেষ্টা ও কল্পিত সিদ্ধ-প্রণালী-যোগে নির্জ্ঞান-ভজনরূপ প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাকাজ্ঞার প্রশয় না দিয়া তিনি সজাতীয়াশ্রম ব্যক্তিগণের সঙ্গে শ্রীরূপানুগত্যা শ্রীরাধা-দাস্ত্রে বহু-গোপীবল্লভ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টাপর হইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তার আচার ও প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন ।

অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে নৈশ-লীলাপেক্ষা মাধ্যাহ্নিক-লীলা অধিকতর শ্রেষ্ঠ, ভজনীয় ব্যাপার—এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাক্যের মধ্যে শুনিতে পাইয়াছি । শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিষাদিত্যের ভজন-প্রণালী ‘সজ্ঞান-তোষণী’তে বর্ণন করিয়া তাঁহার সহিত নিমানন্দ শ্রীপৌরন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও ভজন-প্রণালীর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন ; নিষাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ—‘চিন্ত্য’, আর শ্রীগৌর-সুন্দরের দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—‘অচিন্ত্য’ । নিষাদিত্যের কথিত ভজন-প্রণালী—নৈশ-বিহারের কথা, কিন্তু শ্রীমম্বহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী—মাধ্যাহ্নিক লীলার কথা । সূর্য্য-পূজার প্রাধান্ত,

রাধাকৃষ্ণে মিলন, দোলা-খেলা, বংশীস্বতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সন্তোগের অধিকতর চমৎকারিতা একমাত্র মধ্যাহ্ন-লীলাতেই দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ যখনই যে-স্থানে শুভ-বিজয় করিয়াছেন, উদ্দীপক বস্তু-দর্শনে তখনই তথায় অকৃত্রিম শ্রীকৃষ্ণানুগ-ভজন-বিচারে উদ্দীপ্ত, বিভাবিত ও পরিপ্লুত হইয়া একবারে বহিজ'গতের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া মহাভাবের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন—ইহা আমরা তাঁহার বিচিত্র শ্রীকৃষ্ণাষেষণ-লীলার মধ্যেই প্রদর্শন করিয়াছি । শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততত্ত্ব শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কিত স্থান-সমূহ দর্শন করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩০।২৭-২৮)

কস্তাঃ পদানি চৈতানি মাতায়া নন্দস্থানা :

অংসন্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করণোঃ করিণা যথা #

অনয়ায়াধিতো নৃনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যমো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥”—এই শ্লোক-

দ্বয়ের তাৎপর্য বর্ণনমুখে জানাইয়াছেন যে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণদেব গোবামী-কর্তৃক শ্রীমতী রাধারাগীর কথা অত্যন্ত গভীর ও সাবধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীরাধার এই প্রোজ্জ্বল-মহিমার কথা, শ্রীমদ্ভাগবতে গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার পদাঙ্ক-স্মৃতিতে বিভাবিত অন্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সব হৃদ্যাত নিগূঢ়-রহস্য স্বভজন-বিভজন-কৃপা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ অগ্রকোনও আচার্য্য সেই সব অপ্রাকৃত ভাবের রহস্যোৎকর্ষ প্রকট করেন নাই বা করিবেন না ।

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের বেণু সরল ও সোজা ; কিন্তু কৃষ্ণের বপু বক্ষিম—ত্রিভঙ্গিম । বেণু কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়কে মথিত করে । অতএব বেণুর অবতার কর্ণাঞ্জলির মধ্যেই হয় । জগতেও দেখা যায়—যাহা অত্যন্ত ক্রুর বলিয়া বিবেচিত, অর্থাৎ কুটিল-গতি হিংস্র-সর্পকেও সাধারণ বেণুধ্বনি বশীভূত ও মুগ্ধ করিতে পারে । যে সর্প বপু-বিশেষকে দেখিয়া শত্রুজ্ঞানে অহিংসকেও হিংসা করিয়া থাকে, সেই ভীষণ হিংস্র প্রাণীই আবার সেই ব্যক্তির বেণু-ধ্বনি শ্রবণ-পূর্বক আকৃষ্ট হয়,—তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে ও চিরতরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে । প্রাকৃত বপুকে আমরা জড়-চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পারি, কিন্তু প্রাকৃত মাংস-চক্ষু লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বপু দেখা যায় না । কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শৃগাল-বাহুদেব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি কৃষ্ণের বাণী বা বেণু শ্রবণ করিতে না পারিয়া কেবল মাংস-চক্ষু লইয়া অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের কোটি-কন্দর্প-নিরাজিত বপু-মাধুর্য্য দর্শন

করিতে পারে নাই। কাজেই কেবল বপু-দর্শন করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা প্রাকৃত সহজিয়া-বিচারে আক্রান্ত হইয়া ধাম-ভোগী, গুরু-ভোগী, নাম-ভোগী, বিষয়-ভোগী ইত্যাদি ভোক্তার পোষাকে ‘মীয়তে অনয়া’-বিচারে সেইসকল বস্তুর নায়ক হইবার স্পর্ধা হৃদয়ে পোষণ করি। যাহারা শ্রবণের ক্রিয়া বাণীকে পরিত্যাগ করিয়া বপু বা রূপ-দর্শন ও ভোগের স্পৃহায় লালায়িত, তাহারাই বাস্তব-সত্যের বিমুক্ত-মার্গকে বিকৃত-রূপে পরিণত করায় আশ্রয়-পারম্পর্যে বিমুক্ত ভাগবতগণ-কর্তৃক “প্রাকৃত সহজিয়া” নামে অভিহিত হন। তাহারাই নিজদিগকে ‘পাকা বোষ্টম্’ মনে করিয়া অপরের ভোক্তা হইতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তত্ত্ববিদ আচার্য্যগণ সর্বপ্রথমে শুদ্ধ-বর্ণে চিন্ময়-মস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই, শ্রীগুরুদেবের বেণুধ্বনি—শব্দশক্তি বা বাণী।

“কিবা মস্ত্র দিলা, গোসাঁঞি, কিবা তার বল।

জপিতে জাপিতে মস্ত্র করিল পাগল ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮১)

এইপ্রকার অপ্রাকৃত ভাব শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমতী রাই কান্থর বেণুধ্বনিতে নিত্য আকৃষ্টা। শ্রীল রায়-রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় বেণুধ্বনি নিত্যই শ্রবণ করিয়া থাকেন,—বেণু-মাধুর্য্য ও বপু-মাধুর্য্যে তাঁহার ভেদ-জ্ঞানের অবকাশ নাই। তিনি প্রাকৃত বপুদ্বয়ের ত্রায় অগ্রে বপু ও পরে বেণু শ্রবণের ছলনা প্রদর্শন করেন নাই। তাই তিনি শ্রীগৌরহৃদয়কে বলিয়াছেন,—

“মোর জিহ্বা—বীণামস্ত্র, তুমি—বীণাধারী।

তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮.১৩২)

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী—ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী, তাহাতে বন্ধনা-বিছা নাই। সেই বাণীর মৃতিমস্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্বোক্ত বিষয়-সমূহের গূঢ়-গম্ভীর অকপট হরিভক্তন-প্রয়াসী ভাগ্যবান্ অন্তরঙ্গ জনগণের জন্য কথারূপে গচ্ছিত রাখিয়া মহাবদান্তের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

রূপাঙ্গুগপ্রবর পরমারাধ্যদেব তাঁহার নিত্য-চিহ্নিলাসপর দিব্য অহুভবের মধ্যে যে-সমস্ত অপ্রাকৃত গম্ভীর বিভাব, অহুভাব, সঞ্চারী, ব্যভিচারী প্রভৃতি সামগ্রীর মিলনে পরমোপাদেয় নিজ নিত্যসিদ্ধ আদ্যরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের স্বভাব প্রদর্শন করিতেন, সেই সর্বোৎকৃষ্ট ভাব চেষ্টা-সত্ত্বেও অত্যন্ত অদম্য হইলেও স্নান-নিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ তাহা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বিজাতীয় লোক-লোচনে সংগোপন করিতেন, কিন্তু তাঁহার দিব্যোন্মাদ-দশায় সেই উচ্ছলিত ভাব-তরঙ্গের

অত্যধিক-রূপে উদ্বেলন হওয়ায় আদিরসের আচার্য্য মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিণীর ভাব-সেবাস্বতীতে কখনও কখনও লোক-লোচনে গুঞ্জাফল-দর্শনে তদীয় ঈশ্বরী শ্রীবাব্ধভানবীর রক্তোৎপল শ্রীচরণ-কমল-ধ্যানে বিভাবিত হৃদয়ে একাকী নির্জনে বনের মধ্যে কঁচ ফল অব্বেষণ-লীলা—পরম সৌভাগ্যবান্ নিজ জনগণের কোমল হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীরাধার নিত্য নিজজন শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোষাঙ্গি-প্রভুকে শ্রীমম্বহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা-প্রদানের তাৎপর্য্য কর্মজড়-স্মার্ত্তগণ মায়াবিমূঢ় ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে অবধারণ করিতে না পারিয়া অপরাধের আবাহন করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রভু-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলাকে ভাবসেবায় ‘গিরিধারী’ এবং গুঞ্জামালাকে —‘গান্ধর্বা’ বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের রাধা-নিত্যজনত্বের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীধাম-মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে Theistic Exhibition আদির দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্ববাসিগণকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ জনগণের দ্বারা বিভিন্ন-ভাষায় বক্তৃতা ও গ্রন্থাদি-সাহায্যে লক্ষ-লক্ষ নর-নারীগণের অপূর্ব্ব আত্ম-কল্যাণের বিধান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক-হৃদয়ে প্রবর্তিত প্রাণাধিক শ্রীগৌরান্ন-সমন্বিত আরাধ্যগুণ—বিনোদ-প্রাণ, বিনোদানন্দ, বিনোদ-বিনোদ, বিনোদ-রমণ, বিনোদ-বিলাস, বিনোদ-মাধব, বিনোদ-কান্ত, বিনোদ-বৈভব, বিনোদিনী-বিনোদ, গোপী-গোনাপীথ প্রভৃতি হৃদয়-নয়ন-মনোভিরাম অভিনব সংজ্ঞায় শ্রীবিগ্রহগণকে, শ্রীল শুক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতিতে, ভারতের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদি প্রচার-ক্ষেত্রে স্থাপন-পূর্ব্বক একাধারে পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অপূর্ব্ব সমন্বয় সংস্থাপন করিয়া সমগ্র বিশ্বে প্রেম-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ারাধ্য শ্রীবিগ্রহগণ ক্রমাগত সন্থক, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের অধিদেব। তিনিও সেই যুগপৎ তত্ত্বত্রয়ের আশ্রয়াদিদেব। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে আগত বিরহ-বিধুরা ব্রজাঙ্গনাগণ ও তাঁহাদের কোটি-প্রাণসর্ব্বস্ব বৃন্দাবনেশ্বরী হরি-হৃৎক-মঞ্জরী শ্রীমতী রাধিকা দীর্ঘ-বিপ্রলস্তে দিব্য দশম-দশার চরম দিব্যোন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হন। দ্বারকা হইতে আগত ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্য-বিলাসাদি দর্শন করিয়া ব্রজবাসি-গণ ও শ্রীমতী রাধিকার যে অপ্রাকৃত-ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবের অমুকুলে যাহারা অমুকুল শ্রীরাধার সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদের এবং শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত-তম্বু শ্রীশ্রীশচীসুহুর বিপ্রলস্তে মিলনের সহায়তার নিমিত্ত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্য-ক্ষেত্র দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্র হইতে মাধুর্য্যময়

ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবার অপূর্ব কৌশল আবিষ্কারপূর্বক যিনি সেই অস্থান কুরুক্ষেত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, অসংখ্য তীর্থ-যাত্রীগণের সমাগমে নিজজনগণদ্বারা এবং স্বয়ং অহর্নিশ হরিকথার বচা প্রবাহিত করিয়া অভূতপূর্ব মহাবদান্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরহৃন্দরের অন্তরঙ্গ-ভাববেত্তা শ্রীকৃষ্ণ-লিখিত “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিতস্তথাহং সা রাধা” শ্লোকের অপূর্ব রহস্য সমগ্র ভগতে যিনি বিভিন্ন ক্রিয়াস্থানের মধ্য দিয়া প্রকটপূর্বক সর্বভুবনবন্দ্য জগদ্বৈষ্ণব স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীবার্ধভানবী-দায়িতদাস প্রভু সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন !!!

গৌর-নাগরীগণ শ্রীরাধা ও ভূশক্তি-স্বরূপিণী গৌরনারায়ণের লক্ষ্মী—বিষ্ণুপ্রিয়ায় তত্ত্ব-বিরোধ করিয়া থাকেন। তাহারা রাধাভাব-বিভাবিতত্ব শ্রীগৌরহৃন্দরকে ‘নাগর’ কল্পনা করিয়া কদর্য রসভাস দোষের আবাহন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌর ও শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরম-কারুণিক আচার্য্য লীলার এতদ্বিষয়ে অসংখ্য সাহিত্য প্রকাশ করিয়া গৌর কৃষ্ণ-লীলার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও প্রচার করিয়াছেন। মাঘী ‘শ্রীপঞ্চমী’ তিথিতে প্রেম-ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নবদ্বীপে আবিভূতা হন। তিনি নবদ্বীপে ভক্তি-স্বরূপা—তত্ত্বতঃ ‘ভূ’-শক্তিরূপিণী শ্রীগৌরনারায়ণের বৈধ-পত্নীরূপে প্রকটিতা। তাঁহার কৃপায় জীবের বিশুদ্ধা ভক্তি বা পরাবিভা লাভ হয়। অজ্ঞগতে যে সরস্বতীর পূজা হয়, তিনি সেই ‘ভূ’ শক্তিরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ছায়া-স্বরূপা। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধার ‘নয়ন-তারা’-স্বরূপে কৃষ্ণা সরস্বতী। বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব ও শ্রীবার্ধভানবী-দায়িতা-দাস প্রভুতে তত্ত্বতঃ গভীর রহস্য বিদ্যমান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তার হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব ॥”

শ্রীহরির অন্তরঙ্গ নিজজন পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকট-বাসরে এ দীনাতিদিন অকিঞ্চনের সর্ববিষয়ে অযোগ্যতা-নিবন্ধন যাহা কিছু পাষণ-হৃদয়ে উদ্ভিত হইল, তাহা সামান্য নৈবেদ্যের দ্বারা উপাসনরূপে অদোষ-দরশী অতীষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-কমলে নিবেদিত হউক—ইহাই প্রার্থনা।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিশ্রাপণ দামোদর

দুই বন্ধুর আলাপ

দেবেন্দ্র ও নরেন্দ্র বাল্যবন্ধুদ্বয় সায়ংকালে জাহ্নবীতটে পাশাপাশি উপবিষ্ট। পুত-সলিলা জাহ্নবী-দেবী উভয়কেই পবিত্রতা প্রদান করিতেছেন। দেবেন্দ্র তাহা অনুভব করিতে করিতে সর্ব পবিত্রতার আকর-বস্তু শ্রীনাম-গ্রহণে অধিকতরভাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেছেন—এমন সময় নরেন্দ্র আবেগভরে বনিয়া উঠিল—

“ভাই দিবাকর! ঐ যাঃ, ক্ষমা করো ভাই; আমি তোমায় পূর্বনামেই ডেকে ফেললাম। দেখ ভাই, তুমি যদি দুঃখ না কর, তবে তোমায় পূর্বনামে ডাকলেই আমার আনন্দ হয়।”

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তোমায় আনন্দ দিতে আমি সব কষ্টই স্বীকার কর্তে পারি; কিন্তু তুমি যে আপাতঃ আনন্দ লাভ কর্তে গিয়ে পরিণামে অশুবিধা বরণ করবে, তা আমি চাই না। তাই তোমায় ব’লছি—শ্রীগুরুদেব রূপা করে আমাকে দীক্ষাকালে ভগবদাশ্র-স্বচক যে নাম প্রদান করেছেন, সে নাম যদি তুমি উপেক্ষা কর, তা’ হ’লে তোমার গুরুবস্ত্র দোষ ঘটবে এবং তোমার ঐ ব্যবহার অশ্রুমোদনের দ্বারা আমিও ঐ দোষে দোষী হব। সুতরাং মানসিক সুখকে ব্যাহত করেও আত্মোন্নতি বরণ করাই আমাদের শ্রেয়ঃ ব’লে আমি বিচার করি।

নরেন্দ্র—আচ্ছা, তোমার এই নাম পরিবর্তন না করলে কি কিছু দোষ হ’ত? বা এই নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা কি?

দেবেন্দ্র—দেখ, ইহ-জগতে পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন যে নাম রক্ষা করেন, তাহা কাল্পনিক—বাস্তব নহে। যেমন, কানাছেলেকে “পদ্মলোচন” নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রীগুরুদেব যে নাম প্রদান করেন, তাহা তদ্রূপ নহে। শ্রীগুরুদেব তত্ত্বদর্শী ব’লে অগুচৈতন্য জীবের সহিত পূর্ণচৈতন্য শ্রীভগবানের যে সম্বন্ধ, তাহা দর্শন কর্তে সক্ষম। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত নাম কাল্পনিক নহে, তাহা চেতনের স্বভাব-ব্যঞ্জক—নিত্য-সত্য। অতএব কল্পনা পরিত্যাগ করে বাস্তবের আদর করাই আমাদের কর্তব্য।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ভাই, বুঝেছি, এখন থেকে আমি আর তোমার পূর্ব নামে তোমাকে ডাকব না। এখন নামের কথা যাক। আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন সর্বদাই জাগে; যদি তুমি সাহস দাও, তবে তা’ তোমায় জানাই।

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমার কথায় আমি কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে যে-টুকু সামান্য জ্ঞান লাভ ক'রেছি, তা' দ্বারা জগতের যদি কিছুমাত্র কল্যাণ হয়—তা' ক'র্ত্তে আমি কখনও কার্পণ্য ক'রব না। সুতরাং তুমি নিঃশঙ্কোচে মনোভাব আমার নিকট প্রকাশ কর।

নরেন্দ্র—দেখ, আমি শু'নেছি ধারা নাকি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাঁরা কখনও লোকের কাছে নিজেকে জাহির করেন না। তাঁরা সর্বদা নিজেকে গোপন রাখতে চান। কিন্তু তোমরা সর্বদা তিলক, গলায় মোটা মোটা মালা, মাথায় মোটা শিখা, হাতে একটা সাদা ধবধবে ঝোলা নিয়ে একরূপ জাহির কর কেন? একরূপ না ক'রে মনে মনে ভগবানকে ডাকলে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না?

দেবেন্দ্র—ভাই, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। একরূপ প্রশ্ন, আমার মনে হয়, অনেকেরই মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্র ও যুক্তিসম্মত উত্তর শ্রবণ কর।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত কেন, কোন ভক্তই নিজেকে জাহির করেন না। কিন্তু—

“প্রতিষ্ঠার স্বভাব হয় জগতে বিদিত।

যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥”

তাই ভক্ত না চাহিলেও তিনি সর্বত্রই জাহির হইয়া যান। ভক্ত নিজেকে যতই লুকাইয়া রাখিতে চান না কেন, কোন-প্রকারেই তাহা সম্ভবপর হয় না। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহার আলোক সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিলক, মালা, শিখাদি ধারণ করেন না—ইহা সত্য নহে। শ্রীনারদ গোস্বামী একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সবল সম্প্রদায়ই তাঁহাকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাকে উক্ত প্রকার বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করিতে সর্বদাই দেখা যায়। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকাদি সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত প্রকার বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিয়া আপনি আচরণ করিয়া অমুগত জন ও জগজ্জনকে তাহা গ্রহণ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কোথাও এ কথা বলেন নাই—এই চিহ্নগুলি কেবল আমরা ধারণ করিব, তোমাদের ইহা ধারণ করিতে হইবে না। পরন্তু ইহা ধারণ না করিলে তোমাদের ভক্তি লাভ হইবে না—এই প্রকার শিক্ষাই তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেবেরও নির্দেশ এই প্রকার—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থায়া রক্ষার্থে চতুরানন ।

মৎপূজা-হোমকালে চ সাযং প্রাতঃ সমাহিতঃ ।

মন্ত্ৰোক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৭১ শ্লোকধৃত পান্দোক্ত শ্রীভগবদ্বচন)

[হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্ত ব্যক্তি, চিত্ত স্থির করিয়া সাযং ও প্রাতঃকালে আমার পূজা এবং হোম-সময়ে আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত অথবা মঙ্গল ও রক্ষার জগ্ৰ ভয়-নিবারক উর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবে ।]

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ ।

ব্যর্থং ভবতি তৎসর্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৭২ শ্লোক-ধৃত পান্দোক্ত শ্রীনারদবাক্য)

[উর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতিরেকে যজ্ঞ, দান, তপশ্চা, হোম, বেদপাঠ বা পিতৃ-লোকের তর্পণ প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, সে সমুদায়ই বৃথা হইয়া থাকে ।]

উর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্বিহীনস্ত কিকিৎ কৰ্ম্ম করোতি যঃ ।

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সৰ্ব্বং নিষ্ফলং শ্রাম সংশয়ঃ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্বিহীনস্ত সন্ধ্যাকৰ্ম্মাদিকং চরেৎ ।

তৎ সৰ্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥ (ঐ)

[যে ব্যক্তি উর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া ইষ্ট ও পূর্ত্ত প্রভৃতি যে কোন কৰ্ম্ম করে, তাহার সে সমুদায়ই বিকল হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । যদি উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া সন্ধ্যাদি কৰ্ম্ম করে, তৎ সমুদায় নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় এবং নরকে গমন করে ।]

যচ্ছরীরং মহুৰ্ভ্যাগামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ।

দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥ (ঐ ৭৩ শ্লোক)

[মহুৰ্ভ্যাগের যে শরীর উর্দ্ধপুণ্ড্রহীন, তাহাতে দর্শন করিবে না, তাহা শ্মশানের তুল্য ।]

যুস্তোৰ্দ্ধপুণ্ড্রং দৃষ্টেত ললাটে নো নয়শ্চ হি ।

তদ্বর্শনং ন কৰ্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥

(ঐ ৭৫ শ্লোকধৃত স্বান্দোক্ত কার্ত্তিক প্রসঙ্গ)

তুলসীমালা গলদেশে ধারণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ।

নরকায় নিবর্ত্তন্তে দন্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥

(ঐ ১২০ শ্লোকধৃত গারুড়-বচন)

[যে-সকল হেতুবাদ-রত, পাপবুদ্ধি মনুষ্য মালা ধারণ না করে, তাহারা বিষ্ণুর কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয় এবং নরক হইতে আর ফিরিয় আইসে না ।]

তুলসীকাণ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থং বহতে তু যঃ ।

অপ্যশৌচোহপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥

(ঐ ১২৫ শ্লোক-ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তরে ভগবদ্বচন)

বৈদিক মাত্রেরই শিক্ষা ধারণ কর্তব্য—ইহা বলা বহুল্যমাত্র । রাজ্য-বিহীনের যেমন রাজা-নামের সার্থকতা হয় না, তদ্রূপ যাহারা সনাতন-ধর্মের আচার ও বিচার পালন করেন না, তাহাদের সনাতনী বলিয়া অভিমানও নিরর্থক ।

যাহা নিন্দিত কর্ম তাহাই গোপনে আচরণের নির্দেশ শাস্ত্রে দেখা যায় । শ্রীহরিনাম-গ্রহণ কি তদ্রূপ নিন্দিত কর্ম ? শ্রীহরিনাম-গ্রহণ যদি সর্বোত্তম বস্তু হয়, তবে ইহার প্রচার হওয়ায় সমাজের সর্ববিধ মঙ্গল । তজ্জন্তু সাদা ধব্ধবে মালিকা হস্তে লইয়া নির্দম্ভ ভক্তগণ সর্বত্র বিচরণ করিবেন । তাহাদের আদর্শে স্নকৃতিশালী ব্যক্তিগণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে স্বেচ্ছা লাভ করিবেন । ভাই, আমাদের শাস্ত্রে পাপী ব্যক্তিকে দর্শন করিতে নিষেধ আছে এবং দর্শন-কারীকে গজান্নান ও শ্রীবিষ্ণু-স্মরণাদি দ্বারা পবিত্র হইবার বিধানও প্রদত্ত হইয়াছে । ইহার কারণ পাপীব্যক্তিকে দর্শন দ্বারা সাধারণতঃ তাহার আচরিত পাপানুষ্ঠান স্মৃতিপটে উদ্ভিত হয়, তজ্জন্তু চিত্ত কলুষিত হইয়া পড়ে । আবার ভক্তগণের এবং ভক্ত্যানুষ্ঠানের বাহ্য দর্শনেও তদ্রূপ বিপরীতভাবে হৃদয় পবিত্রতা লাভ করে । সেই হেতু সিদ্ধাবস্থা অথবা সাধকাবস্থা যে-কোন অবস্থাতেই ভক্তির অনুষ্ঠান হউক না কেন, তাহার গোপন আচরণ অপেক্ষা প্রকাশ্য আচরণ সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক ।

কনিষ্ঠাধিকারী সাধক তাহার ভজনের অমুকুল-জ্ঞানে বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিয়া থাকেন । যে-যে বস্তু তাহার ভজনের অমুকুল, তাহবার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ভজন-পথে উন্নতি লাভ ঘটে না । ভজনের অমুকুল বস্তু স্বীকার ও প্রতিকূল বস্তু বর্জনই তজ্জন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ । যথাঃ—

আমুকুল্যস্য সংঘঃ প্রাতিকূলাবিবর্জনম্ ।

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোষ্ঠ্বে বরণং তথা ।

আত্মনিষ্কেপকার্পণ্যে-ষড়্-বিধা শরণাগতিঃ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪৯ শ্লোক-ধৃত বৈষ্ণব-স্ববাক্য)

[কৃষ্ণ ভক্তির অমুকুল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল বস্তু বর্জনে সঙ্গত, তাহা

আমাকে রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈত্ব—এই ছয়প্রকার শরণাগতি ।]

সর্ব্বাঙ্গে তিলকাদি ধারণ ও বৈষ্ণব-চিহ্নাদি গ্রহণ করিলে সাধক নিজকে “মায়ার দাস”এর পরিবর্তে “ভগবদ্দাস” বলিয়া অভিমান করিতে সহায়তা লাভ করেন । গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কাশায় বস্ত্র পরিধান ও ত্রিদণ্ড সম্মাসাদি গ্রহণ তাঁহাদের ভক্তনের অমূল্য বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করেন । যথা—

এতাং স আচার্য পরায়নিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈমর্ষিভিঃ ।

অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দা জ্য নিষেবয়ৈব ॥ (ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

[অবস্থী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরায়নিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব ।]

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন ।

মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নিক্কারণ ॥

পরায়নিষ্ঠা-মাত্র বেষ ধারণ ।

মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ (চৈঃ চঃ-মধ্য ৩৭-৮)

সংসার হইতে নিষ্কৃতি-লাভের যে একমাত্র উপায় মুকুন্দ সেবা, তাহাতে নিষ্ঠা উৎপন্ন করার জন্যই সাধক বেষ গ্রহণ করিবেন । বেষ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সিদ্ধাবস্থা লাভ ঘটিয়াছে এরূপ যদি কেহ মনে করেন, তিনি শাস্ত্রমর্ম্ম-বিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচয় দিবেন অথবা মায়াদেবীর প্রাধান্য সহচরী যে মাৎস্যর্য্য তদ্বারা তিনি বিশেষভাবে কবলিত হইয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে ।

কেবলমাত্র সাধক-ভক্তই যে বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করেন তাহা নহে, সিদ্ধ-ভক্তও তাহা ধারণ করিয়া থাকেন—ইহা পূর্ব্বকই বলিয়াছি । ভাই, চিত্ত যাহাকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করে, তাহার আচার-ব্যবহার, বেষ-ভূষা ও স্বভাবাদি সমস্তই তাহার আকর্ষণের বিষয় হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে তিলক শোভা পাইতেছেন এবং এই তিলক দর্শনে এবং তাঁহার প্রিয় তুলসীর সন্মাননা দর্শনে তাঁহার অতীব সন্তোষ হয় । এই জগুই সর্ব্বপ্রকার ভক্ত ঐ চিহ্নাদি ধারণ করেন । ভাই, তোমরা কেন পাশ্চাত্য-দেশীয় পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতেছ, বল দেখি ? তোমরা পাশ্চাত্য-দেশীয় ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর—ইহাই কি তাহার কারণ নহে ? কিন্তু ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত-দ্বিগকে তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে পারিতেছ না দেখিয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাদের

জ্ঞাত দুঃখ বোধ করিতেছি। বাহা হউক, শ্রেষ্ঠের অনুসরণ অথবা অনুকরণ উভয়ই স্বাভাবিক ধর্ম। শ্রীগীতা বলেন :—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ (গীতা ৩।২১)

[শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুসরণ করেন। তিনি বাহা প্রমাণ স্বীকার করেন, লোকে তাহাতে অনুবর্তী হয়।]

ভাই, ভগবদ্ভক্তগণ দান্তিক নহেন। তাঁহারা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ “সোহং” বিচারে দম্বপরায়েণ হইয়া ভগবানের ভগবত্তা গ্রাস করিতে গিয়া আত্মরিক প্রবৃত্তির পরিচয় দেন না; পরন্তু তাঁহারা “সোহং”-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য “তৃণাদপি স্তনীচতা”র স্তূষ্টতা সাধনের জন্তই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন-ধারণও ঐরূপ তৃণাদপি স্তনীচতাব-সাধক। ভাই, তুমি ভক্তের প্রতি মৎসর-ভাব পরিত্যাগ কর। মৎসরতার জ্বাল অস্ত-কর এবং ক্রেশদায়ক বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। তৃণাদপি স্তনীচতাই সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ। ‘যতদিন পর্য্যন্ত না জীবের তাহাতে অধিকার লাভ ঘটে, ততদিন তাহার জিহ্বা কখনও শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না। অন্তরে দান্তিকতা পোষণ করত মুখে যে নাম-গ্রহণের চেষ্টা, তাহা ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাই কুন্তীদেবী শ্রীভগবান্কে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

‘জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।

নৈবাহ ত্যভিধাতুং বৈ স্বামকিঞ্চন-গোচরম্ ॥ (ভাঃ ১।৮।২৬)

[হে কৃষ্ণ! সংকুল, বিজ্ঞা এবং রূপাদিসাথে বাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিকামভক্তের লভ্য তোমার ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ‘গোবিন্দ’ ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না।]

ভাই! উচ্চকূলে জন্ম-জন্মিত মদ, ঐশ্বর্য্য-মদ, বিজ্ঞা-মদ ও রূপ-মদ—এই চারিপ্রকার মদে যতদিন জীব মত্ত থাকে, ততদিন সে একমাত্র অকিঞ্চনগণের কীর্ত্তনীয় শ্রীভগবান্কে কীর্ত্তনে কখনই অধিকার লাভ করিতে পারে না। তত্তৎ-মদ তাহাকে দান্তিক করিয়া নিকিঞ্চন সাধুদের নিকট প্রপত্তি স্বীকার করিতে দেয় না। স্তবরাং আমার একান্ত অনুরোধ—তুমি এই প্রকার মদ হইতে মুক্তিসাধের জন্ত চেষ্টা কর। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীল-প্রভুপাদেন সংগ্রহীতা, শ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংশোধিতা পরিবদ্ধিতা চ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রীশুকতোয় নমঃ ।

অথ শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতির্নিখ্যতে ।

আষাঢ়্যাং পৌর্ণমাস্যাং ক্ষৌরং কৃত্বা স্নাত্বা আচম্য পূজা-দ্রব্যানি সংপাতি
ব্রাহ্মণৈঃ প্রার্থিতঃ সংহাসী বিধিবৎ প্রাণানামম্য প্রণবতাসপূর্বকং প্রাণানামত্রয়ং
কৃত্বা ব্যাসপূজা করিষ্য ইতি সংকল্পঃ । ওঁ প্রণবতাস্তুর্ধামী ভগবান্ ঋষিঃ
ইত্যাদি । প্রণবেন ব্যাপকত্রয়ং, তাপত্রয়ং, অষ্টদিগন্ধনম্ । অগ্নিপ্রাকারাঃ,
জলপ্রাকারাঃ, করতাসং অঙ্গতাসম্ । বিষ্ণুভাস্বত ইতি ধ্যানম্ । তদনন্তরং
কুন্তপূজা—“কলসস্ত মুখে ব্রহ্মা কণ্ঠে রুদ্র-সমাপ্রিতঃ । কুক্ষৌ তু সাগরাঃ সর্কৈ
সপ্তদ্বীপবসুন্ধরা ॥” ‘গন্ধার্যৈঃ নমঃ’, ‘গোদাবর্যৈঃ নমঃ’ ইত্যাদি সর্বনদীনামভিঃ
গন্ধপুষ্পাঙ্কতাভিঃ কলসমত্যর্চ্য শঙ্খপূজাং করিষ্যে । আবাহনাদি মুদ্রাং
প্রদর্শয়েৎ । শঙ্খমাপূজ্য ‘ওঁ পুরা সর্গরোংপন্নানি’ ইত্যাদি শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শ্য
শঙ্খজলার্ঘ্যং কুন্তে নিষ্কিপ্য পুনরর্ঘ্যজলেনাগ্নানং পূজোপকরণানি চ প্রোক্ষ্য
পীঠার্চনং কর্ণ্য্যৎ । পীঠমধ্যে, শুভবস্ত্রাণি প্রসার্য শুভতণ্ডুলৈশ্চতস্রং স্থণ্ডিলং কৃত্বা
পীঠমধ্যে পুষ্পাঙ্কতৈঃ কুর্মায় নমঃ, মণ্ডুকায় নমঃ, কালাগ্নিকুন্ডায় নমঃ, আধারশক্তয়ে
নমঃ, মূলপ্রকৃত্যৈ নমঃ, ভূম্যৈ নমঃ, অনন্তায় নমঃ, গয়োনিধয়ে নমঃ, শ্বেতদ্বীপায়
নমঃ, কল্পবৃক্ষবাটিকায়ৈ নমঃ, রত্নমণ্ডপায় নমঃ—ইতি আসনং সংপূজ্য, ধর্ম্মায়
নমঃ অগ্নিকোণে, জ্ঞানায় নমঃ নৈঋত-কোণে, বৈরাগ্যায় নমঃ বায়ব্য-কোণে,
ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ঈশান-কোণে, অধর্ম্মায় নমঃ ঐন্দ্রে, ‘অজ্ঞানায় নমঃ’ যাম্যে
অবৈরাগ্যায় নমঃ পশ্চিমে, অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ উত্তরে, পদ্মায় নমঃ পীঠমধ্যে ; এবং
ধর্ম্মকন্দায় নমঃ, জ্ঞানলীলায় নমঃ, বৈরাগ্যকণিকায়ৈ নমঃ, ঐশ্বর্য্য-অষ্টদলায় নমঃ,
দ্বাদশকলায়ানে সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ষোড়শকলায়ানে চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ, দশকলায়ানে
বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ রজোগুণায় নমঃ, ওঁ সত্ত্বগুণায় নমঃ, ওঁ তমোগুণায় নমঃ,
ওঁ আত্মনে নমঃ, ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং নমঃ, ওঁ বিমলায়ৈ
নমঃ, ওঁ কমলায়ৈঃ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়াশক্ত্যৈ নমঃ,
ওঁ যোগশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রভবায়ৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশাত্মৈ নমঃ, মধ্যে
অনুগ্রহায়ৈ নমঃ । ওঁ নমো ভগবতে মহাবিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাণ্য-
সংযোগ-যোগপদপীঠাত্মনে নমঃ ।

পীঠমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্তা-পীঠমধ্যে **শ্রীকৃষ্ণাদি-পঞ্চকং**—ওঁ ইতি শ্রীকৃষ্ণং
খ্যাত্না আবাহনাদি-ষোড়শোপচারং কুৰ্ব্বাৎ । অল্পষ্টানবং দশমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।

কৃষ্ণস্ত পুরতঃ 'ওঁ বাহুদেবায় নমঃ' ইতি ষোড়শোপচারপূর্ব্বিকাং পূজাং কৃৎস্না,
কৃষ্ণস্ত দক্ষিণতঃ 'ওঁ সর্ষপায় নমঃ' ইতি কৃষ্ণস্ত পশ্চিমতঃ 'ওঁ প্রহ্লাদায় নমঃ', কৃষ্ণস্ত
উত্তরতঃ 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ'—ইতি **শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্** ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত দক্ষিণে **শ্রীব্যাসপঞ্চকং**—মধ্যে ওঁ শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ, পুরস্তাং
পৈলায় নমঃ, দক্ষিণতো বৈশম্পায়নায় নমঃ, পশ্চিমতো জৈমিনয়ে নমঃ, উত্তরতঃ
হুমন্তবে নমঃ,—ইতি **শ্রীব্যাসপঞ্চকম্** ।

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্তর-ভাগে **আচার্য্যপঞ্চকম্**—মধ্যে শ্রীশুকাচার্য্যেভ্যো নম ইতি
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমতম্ । পূর্ব্বতঃ শ্রীরামানুজাচার্য্যেভ্যো নমঃ, দক্ষিণতঃ শ্রীমধ্বা-
চার্য্যেভ্যো নমঃ; পশ্চিমতঃ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদেভ্যো নমঃ; উত্তরতঃ শ্রীনিম্বাদিত্যা-
চার্য্যেভ্যো নমঃ—ইতি **শ্রীআচার্য্যপঞ্চকম্** ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত পশ্চিমভাগে **সনকাদিপরম্পরা-পঞ্চকম্**—ওঁ সনকায় নমঃ, ওঁ
সনৎকুমারায় নমঃ, ওঁ সনাতনায় নমঃ, ওঁ সনন্দনায় নমঃ, ওঁ বিশ্বকসেনায় নমঃ—
ইতি **শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্** ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্ব্বভাগে **গুরুপরম্পরাপঞ্চকম্**—শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরম-
গুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরমেশ্টিগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরাংপরগুরুভ্যো নমঃ, ব্রহ্মবিদ্যা-
সম্প্রদায়-কর্ত্তারঃ—ইতি **শ্রীগুরুপঞ্চকম্** ।

অগ্নিকোণে অগ্নিঃ, নৈঋতকোণে নিঋতিঃ, বায়বাকোণে বায়ু, ঈশানকোণে
ঈশানঃ, ঐন্দ্রে ইন্দ্রঃ, যাগ্যে যমঃ, বারুণ্যে বরুণঃ, সৌম্যে সোমঃ, উর্দ্ধে ব্রহ্মণে
নমঃ, অধস্তানদত্তায় নমঃ । নৈঋ ত্যাং গণপতয়ে নমঃ, বায়ৌ দুর্গায়ৈ নমঃ, আগ্নেয়ো
সরস্বতৌ নমঃ, ঈশাত্মাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, সর্কেষাং সগানম্ ।

*

*

*

*

এবং পূজায়া উদ্ঘাপনে বিক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণপৰ্য্যন্তং নির্ঘাণমুদ্রয়া বিশ্বকসেনমারভ্যা
হৃদয়কমলমধ্যে উদ্ঘাপয়েৎ । শ্রীকৃষ্ণস্ত মহানৈবেদ্যং কৃৎস্না পুষ্পাঞ্জলিং দত্তা তৎপুরতঃ
দন্তকাষ্ঠং গোপীচন্দনং মুদাদি দৌরকাদি নিধায় গরুড়াসনে হিষ্টা সংকল্পং কুৰ্ব্বাৎ ।
আয়ন-প্রারুণী প্রাণি-সংকুলং বর্দ্ধমদৃশ্যতে । অতন্তে শ্রামহী সার্থং পক্ষা বৈ
সৃষ্টিচোদনাং, পক্ষা বৈ মাসাঃ স্থাস্থায়, চতুরো মাসা নাত্রৈবাস্তী বাধকে ব্রাহ্মণা
নিবসন্ত হুথেনাত্ৰ গমিষ্যাম কৃতার্থতাম্ । যথাশক্তি চ শুক্লাং করিষ্যামো বয়ং
মুদা । যাত্রৌ পূজা । পুনঃ প্রাতঃকালে পূজায়া উদ্ঘাপনম্ । ইতি ব্যাস-
পূজা সমাপ্তা । শ্রীরামার্ণবমস্ত । শ্রীরামঃ ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমন্তুক্তি-বিনোদ-ঠাকুর-লিখিতা গৌড়ীয়- বৈষ্ণবাশ্রিতানাং শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি :-

(ক) বৈষ্ণবাশ্রিতানাং সামান্যতঃ—

- (১) শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্,
- (২) শ্রীব্যাসপঞ্চকম্,
- (৩) শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চকম্,
- (৪) শ্রীমনকাদিপঞ্চকম্,
- (৫) শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চকম্—ইতি পূজা-পঞ্চকম্ ।

(পূর্বলিখিতং দ্রষ্টব্যম্)

(খ) একান্তিনাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাশ্রিতানাং তত্ত্বপঞ্চকং—(১) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-

(২) শ্রীনিত্যানন্দ- (৩) শ্রীঅদ্বৈত- (৪) শ্রীগদাধর- (৫) শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দেভ্যো
নমঃ—ইতি যথাবিধি অর্চনীয়ম্ । (ততঃ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতানা-
মস্মাকন্ত বিশেষতঃ— শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীমনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-ভট্টযুগ-
কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি-শ্রীমদভক্তিবিনোদ-শ্রীমদগৌরকিশোরদাস-শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী-গোআমিপাদান্ত সর্বেভ্যো গুরুভ্যো নমঃ—ইত্যাচারয়েৎ ।) চরমে শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য গলদেশে পুষ্পমালাং শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলিং দত্তাং । একান্তিবিরক্ত-
বৈষ্ণবানাং—“পক্ষা বৈ মাসাঃ স্থাস্ত্রামঃ । চতুরো মাসা নাট্রেবাসতী বাধকে ।
বৈষ্ণবাঃ নিবসন্ত স্ত্রুথেনাত্ৰ গমিষ্ঠ্যামঃ কৃতার্থতাম্ ; যথাশক্তি চ শুক্রবাং করিষ্ঠ্যামো
বয়ং মুদা ।” “পুনঃ ভাদ্রে মাসি পূর্ণিমায়্যং” পূজাং কৃত্বা ক্ষৌরং সমাপ্য বিশ্ব-রূপাধ্যায়ং
পঠিষ্য স্ত্রুগং হরিং বদ হরিং বদ ইত্যাদি কীর্তয়েৎ । ইতি ব্যাসপূজা সমাপ্তা ॥

চুঁচুড়ায় প্রচার

হরিসভায় (দেপাড়া) পাঠ ও বক্তৃতা

স্থানীয় দেপাড়াস্থিত “ত্রিতাপশান্তি নিকেতন” হরিসভার পক্ষ হইতে
ইহার সম্পাদক শ্রীযুত রামরতি দে, যুগ্ম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ দে
ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ়া মহোদয়ের উদ্যোগে গত ২৫শ ফাল্গুন, রবিবার
হইতে ১৭ই চৈত্র রবিবার পর্যন্ত দ্বাবিংশ দিবসব্যাপী বিভিন্ন অল্পষ্ঠানযোগে উক্ত
সভার বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয় । তন্মধ্যে
হরিসভার মুদ্রিতপত্রের অল্পষ্ঠানপঞ্জী অল্পসারে গত ৫ই চৈত্র, মঙ্গলবার
হইতে ১১ই চৈত্র, সোমবার পর্যন্ত সপ্তাহকাল মধ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তি-
প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ হরিসভার অত্যন্ত আগ্রহে প্রথম ৩দিবস শ্রীমদ্ভাগবত
পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । পাঠের মুখে তিনি বর্তমান শিক্ষিত-সমাজের
ধর্মের প্রতি অবহেলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিহীন নিরীক্ষর শিক্ষাপ্রণালী
ও তজ্জগৎই দেশের তথা জাতির পতনোন্মুখতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃ-

মণ্ডলীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রকৃত পিতামাতা হইবার জন্ত অনুরোধ জানান। "শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাঁহার গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও দার্শনিক বিচারাদি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং আগামী কয়েকদিবসে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ছায়াচিত্রে আরও হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্ত বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ৮ই, ৯ই চৈত্র ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা আলোচিত হয়। তাহার পর আকাশের অবস্থা অল্পকূল না হওয়ায় গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতে পারে নাই।

যাহা হউক, আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে হরিসভার উদ্বোধনগণকে তাঁহাদের এই শুদ্ধ-জ্ঞান-প্রচারের চেষ্টার প্রশংসা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছি।

— প্রচার সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৩৬৬; জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৯

২৮ ত্রিবিক্রম, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন, শুক্রবার—গৌর-ত্রয়োদশী দি ১।৪৮। শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহোৎসব।

৩০ ত্রিবিক্রম, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন, রবিবার—পূর্ণিমা দি ১।১০। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা। শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১ বামন, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, সোমবার—কৃষ্ণ-প্রতিপদ দি ২।৫। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, গোপীবল্লভপুরে উৎসব।

৪ বামন, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ১।১৩৯। শ্রীল বক্রেস্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

আষাঢ়—১৩৫৯

৯ বামন, ৩ আষাঢ়, ১৭ জুন, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দশমী দি ১।৪২। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১০ বামন, ৪ আষাঢ়, ১৮ জুন, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১২।৪১। যোগিনী একাদশীর উপবাস।

১১ বামন, ৫ আষাঢ়, ১৯ জুন, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১২।৮। দি ৯২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১৪ বামন, ৮ আষাঢ়, ২২ জুন, রবিবার—অমাবস্যা দি ১।৩৩। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব। নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিরহ মহোৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাগো জয়তঃ

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষে ।	*
ধর্মঃ সমুদ্ভিতঃ পুংসাং বিধকুসেন-কথাশ্রু যঃ ।		নোংপায়েয়েযদি রতিঃ শ্রমএব হি কেবলম্ ।
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধ ॥

অতঃ ধর্ম স্মৃষ্টিরূপে পালে যেই জন ।
হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪র্থ বর্ষ	ক্ষীরোদশাখী, ৬ বামন, ৪৬৬ গোরাক শনিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯; ইং ১৪১৬।৫২	৪র্থ সংখ্যা
-----------	--	-------------

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

[কলিযুগপাবনাবতারী-শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-বদমাজ-
বিগলিত-বাক্যবেদম্]

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবগহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং ।
 শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্ ।
 আনন্দানুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
 সর্ববাত্মসম্পত্তং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥১॥

নাশ্বামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-

স্তুত্রাৰ্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

দুর্দ্দেবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

তৃণাদপি স্তূনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদুক্তিরহেতুকী ত্বয়ি ॥৪॥

অয়ি নন্দতমুজ কিস্করং পতিতং মাং বিষমে ভবান্মুখৌ ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিস্তয় ॥৫॥

নয়নং গলদশ্রুখারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।

পুলকৈর্নিচিৎ বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

যুগায়িতং নিমেষণে চক্ষুষা প্রাবুধায়িতম্ ।

শৃণায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৭॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-

মদর্শনান্মুগ্ধতাং করোতু বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পাটো

মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥৮॥

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাণকারী, জীবের
মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিছাবধুর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের
বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন-স্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্গীর্জন বিশেষরূপ জয়সংকটন ॥১॥

হে ভগবন্ ! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্ত তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে স্মৃত করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাদ্রুপ হৃদৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার স্মৃত নামেও আমার অহুরাগ জন্মিতে দেয় না ! ২ ॥

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর তায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর-লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্তনের অধিকারী ॥৩॥

হে জগদীশ ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না ; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥৪॥

ওহে নন্দনন্দন ! আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম-রিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি ; তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর ॥৫॥

হে নাথ ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রদ্ধারায় শোভিত হইবে ? বাক্যানিঃসরণ-সময়ে বদনে গদগদ-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঙ্কিত হইবে ? ৬ ॥

হে গোবিন্দ ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'মকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে ; চক্ষু হইতে বর্ষার তায় জল পড়িতেছে ; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে ! ৭ ॥

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মগ্নাহতাই করুন, তিনি—সম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥৮॥

Publish

গুরুদাস

গুরুদাস হইবার যোগ্যতা

সদংশে জ্ঞাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী শুদ্ধাচারী, মহাবুদ্ধিমান, দয়াহীন, কাম-ক্লেশশূন্য, গুরুভক্তি-বিশিষ্ট, সর্বকাল কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবা তৎপর, রোগ-বর্জিত, নিষ্পাপ, শুদ্ধাচারী, হরি-গুরু-পূজামুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমান-শূন্য, নিঃসংসর, আলস্য-রহিত, জড় বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতা-বিশিষ্ট, বৎসরবাদী, গুরুসেবাপর অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজ্ঞার ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন।

গুরুদাস হইবার অযোগ্যতা

অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কুপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরহিদ্ভাষেয়ী, মৎসরতা-বিশিষ্ট, বঞ্চক, কুস্বাক, অত্যাচারে ধনোপার্জক, পরদার-রত, ভক্ত-বিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ষষ্ঠব্রত, অস্ত্রের দোষ সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রুরকর্ম্ম, দুরাশ্রয়, নির্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত, এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয়দাস্য দিবেন না। জৈমিনী, জুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম—এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের সাক্ষাৎ-গুরু-সেবা সম্বন্ধে কর্তব্য

গুরুদাসের কর্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ (সাক্ষাৎ-গুরুসেবা সম্বন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে:—(ক) প্রতিদিন গুরুর জলকুস্তানয়ন, কুশপুষ্প-যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ, গুরুর শরীর মার্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যামুষ্ঠান করিবে। গুরুর গুরুকে গুরুর আশ্রয় ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সন্তোষণ করিবে। সর্বত্রই গুরু দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম, মনঃ, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্ভুক্তিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব সম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে

সমর্পণ করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু-শরীরে অবস্থিত জানিবে।
হরিবাসরে উপবাস করিবে।

গুরুদেবের সাক্ষাৎ-সেবা সম্বন্ধে গুরুদাসের নিষিদ্ধ

(খ) গুরু-সমীপে পদ-প্রসারণ, অমুমতি ব্যতীত অগ্রজ গমন, আফালন,

উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন বচন ও ক্রিয়ার অমুকরণ নিষিদ্ধ।

গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাছুকা, বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ।

গুরু-সমীপে পৃথক পূজা করিবে না। আমি যাহা, গুরুও তাহা—এরূপ

অহংভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং

তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু

গ্রহণ করিবে না। তাহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাহার আগমনে

উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাহার অমুগমন করিবে, তাহার শয্যায় উপবেশন করিবে

না। গুরুর তাড়না ও ভৎসনায় তাহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলিবে

না। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। গুরু-নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ

ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্ত, মাংস, শূকর, কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাছুকা

লইয়া দেব-গুরু-গৃহে যাইবে না।

গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যানুসারে গুরুদাসের পাসনীয় ৫২টি অমুষ্ঠান

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ২। ভগবৎ-প্রবোধন ৩। সবাণ্ড আরাট্রিক

৪। প্রাতঃস্নান ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ৬। অভীষ্টদেবার্চন

৭। উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ ৯। চরণামৃত পান ১০। তুলসী-

মণিমালাদি ভূষা ধারণ ১১। নির্ম্মাল্য পরিহার ১২। নির্ম্মালা-চন্দন শরীরে

লেপন ১৩। শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তি পূজা ১৪। নির্ম্মাল্য-তুলসী সমাদর

১৫। তুলসী-চয়ন ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিখাবন্ধন ১৮। চরণামৃতে

পিত্ততর্পণ ১৯। মহোপচারে ভগবৎ পূজা ২০। ভক্তির অমুকূলে নিত্য-

নৈমিত্তিকামুষ্ঠান ২১। ভূতশুদ্ধি ও গ্রাস ২২। নব পুষ্পফলাদি দান ২৩।

তুলসী পূজা ২৪। ভক্তিগ্রন্থ পূজা ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন ২৬। পুরাণ

শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ ২৮। ভগবদাজ্ঞা জ্ঞানে সদমুষ্ঠান (২৯।

গুরুর অমুমতি গ্রহণ ৩০। গুরুবাক্য বিশ্বাস) ৩১। মন্ত্র-দেবানুসারে মুদ্রা-রচন

৩২। ভজনোদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্খধ্বনি ৩৪। লীলামুকরণ

৩৫। হোম ৩৬। নৈবেদ্যর্পণ ৩৭। সাধু সমাদর ৩৮। সাধুপূজা

৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বুলাবশেষ গ্রহণ ৪১। বৈষ্ণব সঙ্গ ৪২।

বিশিষ্ট ধর্ম জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়মদ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা ও সন্তোষ
৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫। দেবমন্দিরে গমন ৪৬। অষ্টমহাঋদনী
পালন ৪৭। সকল ঋতুতে মহোপচারে হরিপূজা ৪৮। বৈষ্ণব-ব্রত পালন
৪৯। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি ৫০। সদা তুলসী সংগ্রহ ৫১। শয্যা-পাদসম্বাহনাদি
উপহার প্রদান ৫২। ঝামাদি চিন্তা। এই বায়ান্ধটী অমুষ্ঠানে গুরুদাসের
কর্তব্যতা আছে।

গুরুদাসের ৫২টী নিষিদ্ধাচার বর্জনীয়

গুরুদাস নিষিদ্ধ ৫২টী অবশ্যই বর্জন করিবেন। ১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন
২। মৃত্তিকাহীন শৌচ ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু-সমক্ষে পদ প্রসারণ
৫। গুরু-ছায়ালাভজন ৬। সমর্থপক্ষে স্নানবর্জন ৭। দেবার্চনে শৈথিল্য
৮। দেব-গুরুর অনভ্যর্থন ৯। গুরুর সনে উপবেশন ১০। গুরু-সমক্ষে
পাণ্ডিত্য-প্রচার ১১। উরুর উপর পদ সংস্থাপন ১২। বিষ্ণুর নৈবেদ্য উল্লেখন
১৩। মস্তকহীন তিলক ও আচমন ১৪। নীল বসন পরিধান ১৫। ভগবদ্ভিমুখ
বৈষ্ণব-বিদেষীর সহ বন্ধুতা ১৬। অসংশয় সেবন ১৭। তুচ্ছ সঙ্গস্বাসক্তি
১৮। মদ্য-মাংস সেবন ১৯। মাদক-ঔষধ সেবন ২০। মসুরী সহ অন্ন-
গ্রহণ ২১। শাক, লাউ, বেগুন, পেঁয়াজ ভোজন ২২। অবৈষ্ণবের নিকট
অন্নগ্রহণ ২৩। অবৈষ্ণব-ব্রতামুষ্ঠান ২৪। অবৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ ২৫। মারণ-
উচাটনাদি অমুষ্ঠান ২৬। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে চরিসেবা ২৭। শোকের
অধীন ২৮। দশমীবিক্রা একাদশী-ব্রত গ্রহণ ২৯। গুরু-কৃষ্ণ একাদশীতে ভোগ
বুদ্ধি ৩০। দ্যুতক্রীড়া ৩১। সমর্থ-পক্ষে অমুকুল স্বীকার ৩২। একাদশীতে
শ্রাদ্ধ ৩৩। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণু স্নান
৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্ন বস্ত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ ৩৬। বুদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী
৩৭। অবৈষ্ণব বা রাক্ষসশ্রাদ্ধ ৩৮। চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জ্ঞাত
অন্ন জলে আচমনাদি ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা ৪০। পূজাকালে
অসদালাপ ৪১। গৃহ-করবীর এবং আকন্দাদি দ্বারা পূজা ৪২। আয়স ধূপ-
পাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রমাদবশতঃ তিথ্যাক্ষ, পুণ্ড্র ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা
পূজা ৪৫। চঞ্চলচিত্তে অর্চন ৪৬। একহস্ত প্রণমন ও একবার মাত্র
প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্তি দর্শন ৪৮। পণ্যবিত্ত অন্ন নিবেদন ৪৯।
অসংখ্য জপ ৫০। মন্ত্র প্রকাশ ৫১। মুখ্যকালভাগ ও গৌণকাল স্বীকার
৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুদাস-তত্ত্ব

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনান্য মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তুবিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য-গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্যজ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্য শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের পরিবর্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে, আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ উদ্ভিত হয়। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মত্বের প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে হেয়ত্ব নাই। হেমচন্দ্রের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বরূপে ‘কৃষ্ণদাস’। গুরুদাস ক্রতির উল্লিখিত ‘তত্ত্বমসি খেতকেতো’ মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিস্তর ‘চিংকণ’ বা অগুচিং বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন,—

“শ্রীচৈতন্য-মনোহরীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

শ্রীকৃপং হি কদা মহং দদাতি স্বপদাস্তিকম্ ॥”

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন, গৌরান্দ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, শ্রীগৌরান্দলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরান্দ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত পাঠ করা যায়, ততই শ্রীগৌরলীলা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌর ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগৌরকে পরোপাশ্রয় বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরান্দের শ্রীকৃষ্ণলীলার সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়।

কৃষ্ণ ভজিয়া গৌর-ভজন না করা দৌরাভ্য-বিশেষ

এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে

হইতেছে। ‘আমরা শ্রীগৌর ভজিব আর শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিব না’—একথা একটি দোরাছোর মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ ‘শ্রীকৃষ্ণ ভজিব, শ্রীগৌরকে স্মরণ করিব না’—ইহাও মহা-দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত—

কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাহকৃষ্ণং সাদ্ধোপাদ্ধান্তপার্ষদম্।

যজ্ঞেঃ সন্ধীর্তনপ্রাদৈর্ঘ্যজন্তি হি স্তুমেষদসঃ ॥

শ্রীগৌরান্দ-তত্ত্ব ; কৃষ্ণোপাসনাদ্বারা গৌর-তোষণ

শ্রীগৌরান্দ কে ? যে শ্রীগৌর, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌর হইয়া নিজে শ্রীকৃষ্ণরস আশ্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য শ্রীগৌর-উপাসনা একটি নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরান্দের অহুমোদিত নহে। দেখুন ! শ্রীগৌরান্দের পরিকরণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরান্দকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধীর্তনের দ্বারা শ্রীগৌরান্দকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, যাহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না।

স্মার্ত ও তান্ত্রিকের কৃষ্ণ-ভজন নিরর্থক

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা নিতান্ত সত্য। যাহারা স্মার্তমতে বা তান্ত্রিকমতে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত ও তান্ত্রিকের কৃষ্ণভজনে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব, স্তুরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। শ্রীগৌরান্দদেবের চরণাশ্রয় করত শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরান্দের উদয়কালের পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্ গৌরান্দদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর নিত্য ; তাঁহাদের আবির্ভাবের অগ্র পশ্চাৎ নাই

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে শ্রীচৈতন্য ছিলেন, পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ হইলেন,—আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, এ কথাই তাৎপর্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্ষ্য অষ্টোত্তরশতত্ৰী
 শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
 অষ্ট-সপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে
 দীনের প্রার্থনা

তব পদে নমি আমি প্রণত হইয়া ভূমি

ওহে বরা শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমী ।

মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষে এ মর জগত-বক্ষে

প্রকাশিলা প্রভুপাদে তুমি ॥

সর্ব্ব সুলক্ষণ-যুত পরম কল্যাণ পূত

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ।

তব পদ দেবগণ করে সদা আরাধন

সেই তুমি গুহ্যতম অতি ॥

আমি অতি মুঢ় জন নাহি ভক্তি, নাহি জ্ঞান

তাই হুদে চিস্তি বার বার ।

ওহে তিথিবরা মোরে শক্তি দেহ বর্ণিবারে

গুরুপদ-মহিমা অপার ॥

কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতারী গোলোক-বিহারী হরি

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ ।

তঁাহার দ্বিতীয়দেহ বলদেব কায়-বৃহ

নিজ-ইচ্ছ-পূর্তির কারণ ॥

বলদেবাভিন্ন হন নিত্যানন্দ মহাজন

দয়াময় পতিত-পাবন ।

নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু তন্ত্রবাহু-কল্পতরু

‘গুরুদেব’ এই তত্ত্ব হন ॥

সমস্ত শাস্ত্রেতে কয় গুরু সর্ব্বদেবময়

গুরু কৃষ্ণাভিন্ন বলি’ মান ।

বিষয়-আশ্রয়-ভেদে কৃষ্ণ আর গুরুদেবে

‘ভগবান্’ শব্দ আখ্যা জান ॥

সেব্য-কৃষ্ণ ভগবানে সেবিবারে জীবগণে

আকর্ষিয়া সেবক-ভগবান্ ।

কৃষ্ণপদে সমর্পিয়া গোলোকেতে যায় লইয়া

গুরুত্ব এত বড় হন ॥

অপার করুণা করি’ হেন গুরুরূপ ধরি’

ধরাধামে তুমি প্রভুশাদ ।

তোমার আরাধ্য ধনে জানায়েছ সযতনে

যুচাইয়া সর্ব অবসাদ ॥

হেন গুরু-শ্রীচরণ যে করয়ে বিনিন্দন

মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহারে ।

নাহিক নিস্তার তা’র এই শাস্ত্রমর্ম্ম-সার

নরকেতে মজে চিরতরে ॥

জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস ভুলিয়া মায়ার বশ

ভোগতরে লভে গতাগতি ।

জড়ানন্দ লভিবারে বহু দুঃখ লাভ করে

তবু তার নহিল স্মৃতি ॥

শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে মতি প্রভু মোরে দেহ শক্তি

ছাড়ি যেন বিষয়ের আশা ।

কি আর বলিব মুই কিছুই যোগ্যতা নাই

তব পদ আমার ভরসা ॥

কোটিচন্দ্র সুশীতল তব চরণ-কমল

সর্বতাপ নাশিতে প্রবল ।

বলহীনে বল দান করিতে না আছে আন

কৃপা করি দেহ মোরে বল ॥

সংসার-দুঃখ-জলধি ভাসি তাহে নিম্নবধি
কাম-নক্র গ্রাসে অশুষ্কণে ।

কুবাসনা বাঁধি মোরে বহু দুঃখ দান করে
তীয়ে লয় কেবা তোমা বিনে ॥

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা কনক-কামিনী-আশা
মোর দুই চিন্তে ভরপুর ।

করিয়া শোধিত প্রভু কৃপা কর ওহে বিভু
চিন্ত যেন নাহি চাহে আর ॥

তব আবির্ভাব-দিনে পূজিতেছে একমুখে
আজি সারস্বত তত্ত্বগণ ।

ব্যাসপূজা করি' তাঁ'রা আনন্দেতে আত্মহারা
উচ্চরবে করে জয় গান ॥

(ওহে) প্রভুপাদ, অন্তর্যামি ! তব শিষ্যধম আমি
পাপিষ্ঠ অধম দুরাচার ।

আশীস্ করহু মোরে নিত্য তোমা সেবিবারে
(যেন) অশ্রু আশা না হয় আমার ॥

পত্নী ধরা, মসী সিন্ধু হিমাদ্রি লেখনী, বিন্দু
তব গুণ না পারে বর্ণিতে ।

কেমতে এ ক্ষুদ্র জন করে তব গুণ গান
শক্তি নাই তবু আশা চিতে ॥

তব পদে করি নতি ওহে প্রভু সরস্বতী
নিবেদন করি শ্রীচরণে ।

জন্মে জন্মে শ্রীচরণ (তব) তত্ত্ব-সঙ্গে সেবি যেন
কৃপা মাগে এই অভাজনে ॥

—ত্রিদণ্ডিতিকু শ্রীভক্তিকুন্দের সন্ত

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৮ পৃষ্ঠার পর)

আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় বিচার করেন যে, সদাসর্বদা কৃষ্ণসেবার জন্ত ব্যস্ত থাকিলে পেট চসিবে কি করিয়া? পেটকে বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবার জন্ত সময় নষ্ট করিয়া আধ্যাত্মিকগণ মহাত্মা হইতে রাজি নন। বরং পেটের অবস্থা উন্নত হইতে উন্নততর করিবার জন্ত যে-সমস্ত উপায় আছে, তাহারই অল্পশীলন করিয়া মহাত্মা হওয়াই একমাত্র ধর্ম—ইহাই তাহাদের বিবেচ্য। জড় অর্থনৈতিক যে ভুল করিয়াছেন তাহারই ফলে আজ জগতে “হা-অন্ন” সমস্তা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেইসকল জড় অর্থনৈতিকগণ ভগবদগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া লইতে পারেন। যথা—

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ (গী: ৯।২২)

কোন এক পাশ্চাত্য নাস্তিক-সম্প্রদায়ের দেশে, তদেবীয় নিরীহ ব্যক্তিগণকে নাস্তিক-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্ত যেরূপ প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহা এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। নাস্তিক-সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক গ্রামে-গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—“তোমরা ভগবান্কে কি উদ্দেশ্যে ভজনা করিবার জন্ত গির্জায় যাও?” গ্রামবাসিগণ সহজেই বলিল—“ভগবান্ খাইতে দেন।” নাস্তিক তখনই তাহাদের গির্জায় লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে ভগবানের নিকট খাদ্য-দ্রব্য চাহিতে বলিল। নিরীহ গ্রামবাসিগণ স্ব-স্ব প্রার্থনামুযায়ী ভগবানের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা-শেষে নাস্তিকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—“তোমরা খাদ্য পাইয়াছ কি?” তাহারা ‘না’ বলিয়া উত্তর দিল। তখন নাস্তিকগণ বলিল—“খাদ্যের জন্ত আমাদের নিকট প্রার্থনা কর।” গ্রামবাসিগণ তাহাই করিল এবং তৎক্ষণাৎ ঐ নাস্তিকগণ বহু কুটি তাহাদিগকে প্রদান করিল। গ্রামবাসিগণ খুব উৎফুল্ল হইল এবং নাস্তিক-সম্প্রদায়কেই ভগবান্ অপেক্ষা “প্রাকৃতিক্যাল” বা কার্যোপযোগী ভাবিল। কিন্তু হায়! সেখানে যদি কোন তত্ত্ববিৎ ভগবদ্ভক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এই ভগবদ্ভক্তি নাশ হইত না। প্রাকৃত, কনিষ্ঠ-অধিকারী ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণের এই প্রকার পতনের সর্বদাই সম্ভাবনা আছে। কারণ এই সকল প্রাকৃত ভক্তগণ যদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে বুঝিতে পারিত যে, ঐ কুটিগুলি ভগবানেরই

প্রসাদ এবং তাহা ভগবানই পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে নাস্তিক-সম্প্রদায়ের আর অধিক উৎকর্ষ হইত না। কিন্তু তাহারা নিরীহ এবং বুঝে না যে, ঐ রুটি কোনদিনই নাস্তিকগণ দিতে পারে না। মাঠে যদি ধান, চাউল, গম প্রভৃতি না জন্মায়, তাহা হইলে ঐ নাস্তিকগণ তাহাদের জড় বিজ্ঞানাগারে কোনদিনই ঐ ধান, চাউল, গম উৎপন্ন করিতে পারিবে না। অনেকে বলিবেন—আধুনিক প্রক্রিয়ায় বহু বেশী ধাতাদি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা জড়বৈজ্ঞানিকের আছে। কিন্তু আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, এই নাস্তিকতার প্রভাবেই আজ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া ‘হা অন্ন’ সমস্তা হইয়াছে এবং এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যে-দিন বৃক্ষের ফল চন্দ্রসার হইবে, গাভী দুগ্ধ দিবে না, মাঠে ধাতের পরিবর্তে তৃণই হইবে, বাহা কলিকালের লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে।

বাস্তবিকপক্ষে ভগবানই আমাদের সর্বদা রক্ষা করেন। জেলখানার কয়েদীগণকে শাস্তি দিলেও যেমন তাহাদের খাদ্যাদি দেওয়ার ভার রাজা স্বয়ংই গ্রহণ করেন, সেইপ্রকার অভক্তহীন ছার ব্যক্তিগণ ভগবৎ-শক্তি ভগবতী দুর্গাদেবী-কর্তৃক শাসনযোগ্য হইলেও, তাহাদের উদরায়ের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া থাকেন। শাসনযোগ্য, হীন, অভক্ত, ছার ব্যক্তিগণের যদি আহারের সংস্থান তিনিই করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার পাদপদ্মে যাহারা অনন্তভাবে নিত্য অভিযুক্ত তাঁহাদের ত’ কথাই নাই। রাজা যদি সাধারণ প্রজাদেরই এরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বীয় অপত্যাদির সম্বন্ধে আর কথা কি?

সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, যাহারা ধর্ম্মাদির দ্বারা নিজ-চেষ্টায় জগতের সুখৈশ্বর্য ভোগ করেন তাহারাই যে কেবল সুখ ভোগ করেন, আর কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত তাঁহার ভক্তগণই যে কষ্ট পান এমন কথা নহে; ভগবানই তাহাদের প্রতিপালন করেন। ভগবানের পরিবারবর্গই তাঁহার ভক্তগণ। সাধারণ ব্যক্তিগণ যেমন নিজের পরিবারবর্গের সুখ-সুবিধা করিয়া নিজ নিজ সুখানুভব করেন, ভগবানও তদ্রূপ ভক্তগণকে প্রতিপালন করিয়া নিজে নিজে সুখানুভব করেন। ভগবান্ তাই ‘ভক্তবৎসল’-নামে বিখ্যাত, কিন্তু ‘জ্ঞানবৎসল’ বা ‘কর্ম্মবৎসল’ বলিয়া তাঁহাকে কেহ সম্বোধন করেন না।

শ্রীভগবানের ভক্তসকল অনন্তরূপে তাঁহারই ভরসা রাখেন এবং দেহবাত্মা নির্বাহের জন্ত যে-সমস্ত কার্য করেন, তাহা সমস্তই ভক্তির অঙ্গুষ্ঠ। তাই ভক্ত-ভক্তগণকে নিত্য্যভিযুক্ত বলা হয়। অর্থাৎ সেইসকল অনন্তভক্তগণ এক

মুহূর্তও ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কাৰ্য্য করেন না। তাঁহাদের কোনই কামনা নাই, সকলই কৃষ্ণসেবার জন্য, সেইজন্যই তাঁহারা নিকাম এবং শাস্ত।

ভগবৎ-সেবার জন্য যে পরিমাণে অর্থাদির প্রয়োজন হয়, তত্ত্ব স্বয়ংই তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগ-বিহিত বিষয় স্বীকার করিলে সাধারণ-দৃষ্টিতে বিষয়ভোগই হয় বটে (?), কিন্তু ভক্তগণ নিকাম হইলেও ভগবান্ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কামনাদি পূর্ণ করিয়া নিজে সুখানুভব করেন। পিতার নিকট সন্তান সন্তান নিজ ভোগ্যবস্তু কিছু না চাহিলেও, পুত্রবৎসল পিতা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুত্রের সুখ-বিধান করিয়া নিজেই সুখী হন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের যথাযোগ্য বিষয়-ভোগের ত' কোন অভাবই হয় না, পরন্তু দেহাবসানে তাঁহারা নিত্যানন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবদ্ভক্তের অসমোর্ক লাভ জানিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ কৰ্ম্ম-জ্ঞানী বা অগ্ৰাণ্ণ দেবতাগণের উপাসক-সম্প্রদায়ের সে সুবিধার সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি 'সম' হইয়াও ভক্তবাৎসল্যেতু ভক্তগণের সুখের বিশেষ সুবিধা করেন—ইহা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নহে। তিনি পূর্বেই বলিয়াছেন—আমাতে যে যে-ভাবে প্রপত্তি করে, আমিও তাহাকে সেই সেইভাবে প্রতিপালন করি। কৃষ্ণ-ভক্ত শাস্ত এবং নিকাম হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কোন দ্রব্যেরই অভাব রাখেন না। এইপ্রকার ভগবৎপ্রসাদ লাভ করায়, ভক্তগণে সর্বদাই আনন্দ এবং তাহা গ্রহণে কোন প্রকারই অপরাধ নাই।

এইস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণভক্তই কেবলমাত্র সেই পরমধামে যাইবেন কেন? যাহারা অগ্ৰাণ্ণ দেবতাগণের পূজক, তাঁহারা সেই কৃষ্ণের শক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। 'শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ-বিচারে কৃষ্ণের শক্তিরূপে অগ্ৰাণ্ণ দেবতাগণের পূজক-সম্প্রদায় পরমধামে কেন যাইবেন না? এসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ—

যেহপাশ্চদেবতাভক্তা যজন্তে অক্ষয়াম্বিতাঃ ।

তেহপি গামিব কৌন্তয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ (গী: ৯।২৩)

ভগবান্ ব্যতীত অগ্ৰাণ্ণ ইত্যর দেবতাগণের উপাসনার মূলে অনিত্য কামনাই প্রধানতঃ অবস্থান করে। এবং সেই সেই দেবতাগণের প্রদত্ত ফলও অনিত্য—ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। অগ্ৰাণ্ণ দেবতাগণ যে ভগবানের বিভূতিরূপ—ইহা যাহাদের জ্ঞান আছে তাঁহাদের দেবতাস্বর পূজা বৈধ; কারণ সেই সেই বিভূতির পূজকগণ ক্রমে ক্রমে ভগবানেরই ভক্ত হইতে পারিবেন।

কিন্তু যাহারা সেই দেবতাগণকে পৃথক্ ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, তাঁহাদের পূজা অবৈধ। বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর—ইহা আমরা পূর্ব পূর্ব পাঠে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অল্প কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই—যে রূপ রাজা ও রাজ-কর্মচারী রাজ-কর্মচারী অনেক সময় রাজারই মত আসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিলেও তিনি মূল রাজা হইতে স্বতন্ত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপে সর্বদাই প্রপঞ্চাভীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব। সাধারণ ব্যবহারিক জগতে যেমন এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা কিছু ছোট-বড় দেখা যায়, সেইপ্রকার দেবতাবিশেষ উচ্চাচ হইলেও, তাঁহারা কেহই বিষ্ণু বা ভগবৎ-তত্ত্ব নহেন। তাঁহারা সকলেই ভগবানের গুণাবতার জীবতত্ত্ব। জীবতত্ত্ব ভগবানের পরা প্রকৃতি-সম্ভূত তটস্থশক্তি। সুতরাং ঐসকল সাময়িক ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবনিচয়কে স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়া যাহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্বক যজ্ঞনা করেন। কোন উচ্চ, রাজকর্মচারীকে স্বয়ং ‘রাজা’ বলিয়া ভুল করিলে, রাজা ও রাজকর্মচারী কখনও এক হইবেন না। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত্যা’। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অগ্ন্যাগ্ন দেবতাগণের সহিত পরস্পর কি সম্বন্ধ, ‘ব্রহ্মসংহিতা’ পাঠে তাহা সম্যক বুঝা যাইতে পারে। বিষ্ণুতত্ত্বই যে সর্বোচ্চ ‘আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাদ্যধনং পরম’—এ বিষয়ে প্রমাণ সহজেই বুঝা যায়। ভারতবর্ষে হিন্দু-সমাজে বহীশ্বরবাদিগের মধ্যে সূর্য্যাদি অগ্নি দেবতাগণের যে পূজা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে সর্বপ্রথমেই বিষ্ণুপূজার বিধি সর্বদাই বর্তমান। এবং পরিশেষে সমস্ত পূজার বা সমস্ত যজ্ঞের ফল সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মেই অর্পণ করার বিধি আছে, কেন-না বিষ্ণুই পরমপদ। বিষ্ণুর পরমপদ ব্রাহ্মণমাত্রেই সর্বাগ্রে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” স্বীকার না করিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত পূজাই ব্যর্থ হয়। আবার সেই বিষ্ণুই যাহার প্রাতঃ-বিলাসরূপে সর্বত্র দীপ্তিলাভ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই গোবিন্দ সর্ব-কারণকারণ আদিপুরুষ। সুতরাং তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যজ্ঞার্থের চরম অর্থ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই সাধুসম্মত সিদ্ধান্ত। যথা—

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্যবন্তি তে ॥ (গী: ৯।২৪)

শ্রীকৃষ্ণের অগ্ন্যাগ্ন দেবতাগণের পূজার সময়ে নারায়ণের অর্চা যজ্ঞেশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব শক্তিমান্ পুরুষ। তিনিই দেবতাসত্ত্ব দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র প্রভু বা ভোক্তা এবং ফলপ্রদাতা।

দেবতান্ত্রধারা তিনিই সেই সেই পূজকের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সেই দেবতান্ত্র-পূজকসম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়া, তাঁহাদের অত্যাধিক উপাসনাবশতঃ তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব হইতে চ্যুত বা পতিত হইয়া যান।

“আমি অমুক দেবতার উপাসক, তিনিই আমাকে কৃপা করিবেন, তিনিই আমার মনোভীষ্ট ফলপ্রদান করিবেন, সুতরাং তিনিই পরমেশ্বর (?)” ইত্যাদি বুদ্ধিই অজ্ঞান ইতর দেবতা-উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রবল। কিন্তু শাস্ত্র-বিচারে তাঁহারা সকলেই অত্যাধিক বাস্তবজ্ঞানহীন বলিয়াই বৃষ্টিতে পারেন না যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শক্তিমৎ-তত্ত্ব দেবতারূপে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত। অজ্ঞান দেবতাগণের বিধি-পূর্বক পূজা হইলে সেই সেই দেবতাগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অধীন-তত্ত্ব, তাহা উপলব্ধি হয় এবং তাহা দ্বারা সেই সেই দেবতার পূজকগণ মোহমুক্ত হন। সুতরাং যাহারা অজ্ঞান দেবতার উপাসক, তাঁহারা যদি সেই সেই দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়া ভুল না করেন এবং ভগবানেরই বিভূতি জানিয়া উপাসনা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের বাস্তব মঙ্গল লাভ হয়। সেই-প্রকার পূজা-অর্চনাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছান যাইবে, অত্যাধিক তত্ত্ববস্ত হইতে চ্যুত হইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবৈদ্য
এডিটর, ব্যাক-টু-গড্ হেড্

ভক্তির অধিকারী কে ?

শ্রদ্ধাই ভক্তির আদি। ভক্ত্যধিকারীর প্রাথমিক লক্ষণ শ্রদ্ধা। সাধুসঙ্গে যাহার এই শ্রদ্ধা লাভ হয়, সেই ভাগ্যবান্ জীব ভগবত্ত্বক্তির অধিকারী হন। শ্রীমদাতন-শিকায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দেব বলিয়াছেন—

“কোন ভাগ্যে কোন জীবের ‘শ্রদ্ধা’ যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩৯)

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস কহে স্পষ্ট নিশ্চয়।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম্য কৃত হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২৬২)

যথা তরোমূলনিষেচনেন তপ্যন্তি-তৎস্বকভূজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্বস্বার্থমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩।১৪)

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।

‘উত্তম’, ‘মধ্যম’, ‘কনিষ্ঠ’—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥

শাস্ত্রযুক্তো অনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যার ।

‘উত্তম-অধিকারী’ সেই তার সমসার ॥

শাস্ত্র-যুক্ত নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্ ।

‘মধ্যম-অধিকারী’ সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—‘কনিষ্ঠ’ জন ।

ক্রমে ক্রমে তিহো ভক্ত হইবে ‘উত্তম’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২৬৪-৬৭)

জগদ-গুরু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে জানাইয়াছেন । তন্মধ্যে উত্তম-লক্ষণ, যথা—

শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

প্রৌঢ়শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্তাবৃত্তমো মতঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৭)

বৈদ্য-ভক্তিতে তিনিই উত্তম-অধিকারী, যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ, সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয় এবং প্রৌঢ়শ্রদ্ধা । মধ্যমের লক্ষণ, যথা—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্মনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৮)

মধ্যম-অধিকারী ব্যক্তি শাস্ত্র-যুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ শাস্ত্র-যুক্তিতে কথঞ্চিৎ যোগ্যতা থাকিলেও যখন বলবান্ কৃতক উপস্থিত হয়, তাহা সমাধান করিতে সক্ষম নহেন । তথাপি মনে দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত গুরুপদটি তদ্ব্যেতে প্রতিষ্ঠিত ও শ্রদ্ধাবান্ থাকেন । কনিষ্ঠের লক্ষণ, যথা—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠা নিগচ্ছতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৯)

কনিষ্ঠ-ভক্ত শাস্ত্রাদিতে কিছুনিপুণ ; কিন্তু তাহার শ্রদ্ধা অতি কোমল । শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা অথবা তাহার শ্রদ্ধাকে কিছু ভেদ করিতে পারে অর্থাৎ বহিঃস্থ হইতে প্রবল বাধা উপস্থিত হইলে তাহার চিত্তচাকলা দেখা যায় এবং পরে স্বকৃত বিবেকের দ্বারা গুরুপদেই স্থিত হয় ।

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু ও শ্রীল চক্রবর্তীঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—
“নিপুণঃ প্রবীণঃ, সর্বথেতি তত্ত্ব-বিচারেণ, সাধন-বিচারেণ, পুরুষার্থ-বিচারেণ চ দৃঢ়-নিশ্চয় ইত্যর্থঃ” । যুক্তিচাত্ত শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া । এবমুত্তো যঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ, স এবোত্তমো অধিকারীত্যর্থঃ । (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৭ শ্লোকটীকা)

অনিপুণ ইতি নিপুণ-সদৃশঃ, বলবদ্ বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থঃ ; তথাপি শ্রদ্ধাবান্ গুরুপদিষ্ট-ভগবৎকথাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয় এবোত্যর্থঃ । কোমল-শ্রদ্ধো যৎকিঞ্চিৎ নিপুণঃ, শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ তেভ্যং শক্যো, ন তু সর্বথা ভিন্নঃ,— তথাহে ভক্তস্থানোপপত্তেঃ । বহির্মুখকৃত-বলবদ্বাধে সতি ক্ষণমাত্রং চিত্তস্ত দোলয়মানত্বমেব কোমলত্বম্; পশ্চাৎ স্বকৃতবিবেকেন গুরুপদিষ্টার্থমেব নিশ্চিনোতি ।” (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৮-১৯ শ্লোকটীকা)

ষে-পর্ধ্যস্ত কৰ্ম্মে নিৰ্বেদ না হয়, অথবা ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্ধ্যস্ত কৰ্ম্ম করার কথা । কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র কৰ্ম্মত্যাগের আধিকার হয় । শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবত ।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ম জায়তে ॥ (ভাঃ ১।১২০২)

আকস্মিক মহৎকৃপা-জনিত শ্রদ্ধার পূর্বে কৰ্ম্মাধিকার এবং শ্রদ্ধার পর শুদ্ধ-ভক্তিতে অধিকার । ‘বৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা মঙ্গলের আশা নাই, কেবলমাত্র ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীৰ্ত্তন দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব’—শুদ্ধভক্তের সঙ্গফলে জাত এইরূপ দৃঢ় আন্তরিকতা বা বিশ্বাসই শ্রদ্ধা । ভাগ্যক্রমে সংসঙ্গফলে ভগবৎকথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিই ভক্তিব্যোগে অধিকারী । বিষয়ে অত্যাশক্তি নাই, তাহাতে সম্পূর্ণ বিরক্তিও আসে নাই, অথচ ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিই ভজন করিতে করিতে সিদ্ধি লাভ করেন । ‘ন নির্বিঘ্নো নাতিসক্তো’—এই অবস্থা হইতেই জীবের ভক্তিপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায় । জ্ঞানাদিকারে যেক্রপ সম্যক্ বৈরাগ্য দরকার হয়, ভক্তি সর্বশক্তিশালিনী, স্বতঃ-প্রকাশিনী, ও অণু-নিরপেক্ষা ও সমর্থ বলিয়া ভক্ত্যাধিকারে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য না থাকিলেও ভক্ত্যাধিকার প্রকাশিত হয় । সংসঙ্গ-প্রভাবে ভগবানে ভক্তি বা রাগ হইলে, বিষয়ের প্রতি বিরাগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে । ‘নাতিসক্ত’ বলিতে কলত্রাদি-আসক্তিরহিত, আর ‘নির্বিঘ্ন’ বলিতে বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত । নির্বিঘ্নে জ্ঞানে অধিকার, অত্যাশক্তিতে কৰ্ম্মে অধিকার, আর অত্যাশক্তি-রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার । নিজাম বৰ্ম্মজনিত অন্তঃকরণ-শুদ্ধিই নিৰ্বেদের কারণ । অনাদি-অবিদ্যাই অত্যাশক্তির মূল । আর যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গই অত্যাশক্তি-রহিত্যের মূল কারণ । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এই সব কথা টীকায় জানাইয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিঘ্নো নাতিসক্তো ভক্তিব্যোগোহস্ত সিদ্ধিঃ ॥ (ভাঃ ১।১২০৮)

[অর্থাৎ—যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে আমার কথাতে শ্রদ্ধাবান, যিনি অত্যন্ত নির্বিকলও নহেন এবং অতিশয় আসক্তিবুদ্ধও ন'ন, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।]

আমরা গীতাপাঠে জানিতে পারি, বহু-পুণ্যফলে জীব আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা জ্ঞানী হইয়া শ্রীভগবানকে ভজ্ঞন করে। এই চতুর্বিধ স্কৃত-পুরুষকেই শ্রীকৃষ্ণ ভজ্ঞনের অধিকারী করিয়াছেন।

চতুর্বিধা ভক্তন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহঙ্কু ন।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ (গী: ৭।১৬)

স্বীয় দুঃখ নাশ করিবার জন্য যাহার ইচ্ছা জন্মে, সে আৰ্ত্ত। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যাহার হৃদয়ে উদয় হয়, সে জিজ্ঞাসু। সুখ-লাভের ইচ্ছা যাহার হয়, সে অর্থার্থী। অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি-সহকারে যিনি তত্ত্ব দর্শন করেন, তিনি জ্ঞানী। আৰ্ত্তই হউন বা জিজ্ঞাসুই হউন, অর্থার্থীই হউন বা জ্ঞানীই হউন, স্কৃতি না থাকিলে ভজ্ঞনে-প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে শ্রীজীব-গোহমিপ্রভু 'স্কৃতি' শব্দের অর্থ "ভক্তিবাসনাহেতু মহৎ-সজ্জাদিময় কার্য্য" এরূপ লিখিয়াছেন। এতন্মধ্যে আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী—এই তিন জনের স্কৃতি থাকা না থাকায় সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী স্কৃতি-বশতঃ জ্ঞাতজ্ঞান হইয়া ভজ্ঞন করেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণগোহমি-প্রভু বলিয়াছেন—

তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।

মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা শ্রান্ততঃপ্রিয়স্ত বা ॥ -

স ক্ষীণতত্ত্বদ্বাবঃ শ্রাস্কৃত্যধিকারবান্।

যথোভঃ শৌনকাদিচ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ ॥ (ভ: র: সি: ১।২।১৪)

গীতাদি শাস্ত্রে যে চারিটী ভক্ত্যধিকারীর নির্দেশ আছে, তন্মধ্যে যাহার যাহার প্রতি ভগবানের বা ভগবদ্ ভক্তের কৃপা হয়, সেই সেই ব্যক্তির আৰ্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে শুদ্ধভক্ত্যধিকার লাভ হয়। উদাহরণ-স্থলে গজেন্দ্র, শৌনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব ও সনক-সনাতনাদির চরিত্র উল্লিখিত হয়। (ক) গজেন্দ্র কুন্তীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহজ-আৰ্ত্ত হইয়াছিলেন। কুন্তীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবৎ-কৃপাবলে তাহার আৰ্ত্তভাব দূর হইলে সে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইল। (খ) শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ কলির আগমনে ভীত হইয়া 'বর্ষের দ্বারা কিছু হইতে পারে না'—এইরূপ

নিশ্চয় করত মহাত্মভব শ্রীশ্রুত গোস্বামিকে জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা দ্বারা শুদ্ধভক্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্মৃত-কৃপাবলে শুদ্ধভক্তি লাভ করেন ।

(গ) শ্রীধ্রুব-মহারাজ প্রথমে পৈত্রিক-সম্পত্তি লাভের জন্ত অর্থার্থী হইয়া ভগবান্কে উপাসনা করেন, কিন্তু যখন শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ প্রকটিত হইলেন, তাঁহার কৃপাবলে ধ্রুবের অর্থ-বাচ্চনা দূর হইল এবং শুদ্ধ-ভক্ত্যধিকার উপস্থিত হইল । (ঘ) সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার—এই চারিজনকে চতুঃসন বলে । তাঁহারা প্রথমে জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান্ ও ভগবদ্বক্তের কৃপালাভ করিলেন, তখন শুদ্ধ-ভক্তির অধিকার লাভ করিলেন । ফলকথা এই যে, যে-পর্য্যন্ত আর্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ কষায় তাঁহাদের চিন্তে ছিল, সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে নাই । অতএব শুদ্ধভক্তির অধিকার-বিচারে শ্রীরূপপ্রভু বলিয়াছেন—

যঃ কেনাপ্যতিভাগেন জাতশ্রদ্ধোহস্ত সেবনে ।

নাতিসংক্কা ন বৈরাগ্যভাগস্ত্যামধিকার্যমৌ ॥ (ভাঃ রঃ সিঃ ১।২।৯)

সংসারে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির যখন অতি ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-সেবায় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন । তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী পুরুষ নানাপ্রকারে আর্ক, প্রপীড়িত এবং প্রয়োজনীয় পদার্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের চরম-গতি বুঝিয়া তাহাতে অনাসক্তভাবে বর্তমান থাকেন এবং চরম জিজ্ঞাসা দ্বারা ‘ভগবান্ ব্যতীত জীবের অস্ত গতি নাই’—এই কথাটিতে চূড়-নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্বক্ত্রের প্রবর্ত্ত হন, তখন সর্বশাস্ত্রের অভিধেয় যে কৃষ্ণভক্তি তদবধারণারূপা শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয় । এই শ্রদ্ধাই শুদ্ধ ভক্ত্যধিকারিত্বের একমাত্র হেতু । অতএব, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য—

জাতশ্রদ্ধা মৎকথাস্থ নিকিঞ্জঃ সর্বকর্ম্মস্থ ।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহ পানীশ্বরঃ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধামুদৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুষ্মাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ (ভাঃ ১।১।২০।২৭-২৮)

উক্ত শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাস্থলে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—
“ভদ্রেবমনন্তভক্ত্যধিকারে হেতুঃ শ্রদ্ধামাত্রমুক্তা স যথা ভজেত তথা শিক্শয়তি” অর্থাৎ এই শ্লোকদ্বয়ে অনন্তভক্তির অধিকার-হেতু একমাত্র ‘শ্রদ্ধা’—ইহা বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ যেরূপ তজ্জনা করেন, তাহা কহিতেছেন । ‘আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মফলে নিকিঞ্জ হইয়া অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করত

অপাপাকার কামসকলকে জীবের দুঃখদায়ক বলিয়া জানিতে থাকেন, অতঃ পরে দেহ-
ষাট্রার নিমিত্ত এবং পূর্ব-বাসনারূপ অনর্থের কিয়ৎ পরিমাণ বশীভূত হইয়া সেই-
সকল কর্মজাল ও কর্মফল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া
সেইসকল কামকে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন এবং আমাকে
ভজন করিতে থাকেন।’ (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিমমুখ ভাগবত মহারাজ

ভবিষ্য

কেমনে কাটাবি ভাবী-কাল ।

অঙ্কিত জীবন-পথ ... শঙ্কিত ক’রেছে হার !

ছিন্ন-মতি-তমসা প্রবল ॥১॥

অদূর সে মুহূর্ত্তে ... ডাকিতেছে বারে বারে

মাগিতেছে লেখা-যোখা খাতা ।

কেমনে কি ভাবি’ মনে ... আসিলি এখানে রণে

কোথা বা বিকালি নিজমাথা ॥২॥

ক্ষুণ্ণ-তটিনীর মত ... চলেছ স্বজিয়া মত

মতি তোর লভেছে বিকারে ।

কি কু-ক্লেবে এ’ভুবনে ... জনমি’ উদাস প্রাণে

মন-তরী ছেড়েছ অপারে ॥৩॥

কণেকিতে দম্ব করি’ ... ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠারী,

মহামায়ে’ কর তুচ্ছ-জ্ঞান ।

কণে কাম-ক্রোধ-মোহে ... ভজি’ অতি দীন হ’য়ে

কর তার দাস অভিমান ॥৪॥

দীপে-দীপে দীপ জালি’ ... সিরজি’ সুবমা মাস্তি !

গড়িলে সমিতি বড় সাধে ।

সমিতি, সমিতি চাহে ... সমিতি ত্যজিয়া, বাহে

পরশি ‘সু’ লভে বিনা বাধে ॥৫॥

নিবেদি দুঃখের গুর' নি-বেদী ক'রেছে, তোর
হৃদি-ভূমি, কঠোর কু-জ্ঞান ।

কোথা এবে প্রাণমালি ! দানিবি কুসুমাজলি
দেবতারে কোথা দিবি স্থান ? ৬॥

কালদূতে ধরি' কেশে কবলিয়া কালশেষে
ল'বে যরে শমন-সকাশে ।

না রবে' মনন-ক্ষণ, অতএব শুন প্রাণ,
না ধাইও অনিশ্চিত আশে ॥৭॥

ছাড়ি' 'ছন্ন-ছাড়া' পথে সাধু প্রদর্শিত বস্ত্রে
চলিবারে করহ যতন ।

যুচিবে সকল দ্বন্দ্ব লভিবে পরমানন্দ
সাম্রানন্দ-লাভ সে' কারণ ॥৮॥

—ত্রিদত্তী শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিসিক্ত সন্ন্যাসী প্রভুপাদের
আবির্ভাব-বাসরে শ্রীভ্যাসপূজোপলক্ষে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

“সংসার-দাবানল-লীড়-লোক-ত্ৰাণায় কারুণ্যধনায়নম্ ।

প্রাপ্তস্ত কল্যাণ-গুণার্ণবস্ত, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥”

সংসার-রূপ দাবানলে নিম্নত দগ্ধীভূত জীব-নিচয়ের উদ্ধার-মানসে নিত্যকাল
যিনি রূপা-বারি বর্ষণ করিতেছেন ও দুস্পার ভবাম্বুধি হইতে বদ্ধ জীবসকলকে
পরিত্ৰাণ করিয়া, নিত্য পরম প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর শ্রীচরণ-
সেবায় যিনি নিরন্তর নিযুক্ত করিতেছেন, সেই পরম কারুণিক অপার-সংসার-
সমুদ্র-তরণ-দেতু পতিত-পাবন পরম-দয়াল আচার্য্য্যর শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-
কমল সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করি ।

হে নিত্যরাধ্য প্রভো ! আপনি অষ্টোত্তর-শতশ্রী-সমন্বিত অর্থাৎ
জগতে যতপ্রকার 'শ্রী' বা সম্পৎ বিরাজিত, সেই সমূহ সম্পৎ বা শোভা

আপনাতে পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। কারণ, সর্বৈশ্বর্যের অবীশ্বর—
শ্রীশ ও অধিশ্বরী - শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী ; ইহারা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন
হইলেও গুণগত, ধামগত ও লীলাগত ভেদ-হেতু কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎনান-গুণ-
বিশিষ্ট ; এবং পরিপূর্ণতম বস্তু পরম-ব্রহ্ম যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরির সেবা লাভ
করিবার জন্ত লক্ষ্মীও তপস্যা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই পূর্ণতম
বস্তুকে আপনি হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তজ্জগৎ আপনি অষ্টোত্তর-
শতশ্রীর প্রতীক বলিয়া জগতে প্রকাশিত।

আপনি ভক্তি-সিদ্ধান্তের অফুরন্ত পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। ঐহিক
পদার্থসমূহের যতপ্রকার আকর রহিয়াছে, তাহা হইতে যে পরিমাণ খনিজপদার্থ
উদ্ধৃত হয় সেই পরিমাণ পদার্থই তাহা হইতে কমিয়া যায়—ইহা সত্য ; কিন্তু
'হরিনাম'-রূপ অমৃতের আকর এমনই অক্ষয় ও অফুরন্ত যে, তাহা হইতে যতই
নামামৃত বিতরণ করা হউক না কেন, উহা উদ্ধারোত্তর বৃদ্ধি বাতীত কণামাত্রও
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আপনি সেই হরিনাম-রূপ ভাণ্ডারের অফুরন্ত উৎস। কারণ
অক্ষয়, পরিপূর্ণতম বস্তু শ্রীকৃষ্ণ আপনার হৃদয়-কুঞ্জে চির-বিরাজিত রহিয়াছেন।

আপনি ভক্তি-সিদ্ধান্তে সরস্বতী-সম অর্থাৎ বান্ধেবী যেমন সর্ব বিদ্যার
প্রতীক, তদ্রূপ আপনিও ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর মূর্ত্যবিগ্রহ-স্বরূপ এবং আপনিই
একমাত্র জগদগুরু 'গোস্বামী' পদবাচ্য। আপনি স্বীয় প্রভাবে কামাদি ষড়্রিপু
এবং বাকা, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ প্রভৃতি বেগকে আয়ত্তে
রাখিয়াছেন ও জগতের প্রত্যেক জীবকে সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া ভগবন্তজনের
নিয়তই উপদেশ দিতেছেন। তথাকথিত বিবেকহীন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, 'গোস্বামী'-
নামধারী গুরুরূপগণের আধ্যাত্মিক মতবাদকে স্বীয় প্রভাবে ও শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা
খণ্ডন করিয়া, জগজ্জীবগণকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর অমৃত-ধারায় সিক্ত করিয়াছেন
ও জগতে আপনার আচার্য্যত্বের শ্রেষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন।

'হে ঐনিত্যানন্দাভিন্ন জগদগুরো ! "স্বুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"
—এই ব্যাসবাণীর আপনিই একমাত্র উদ্দিষ্ট পুরুষরূপে শ্রীনীলাচল-ক্ষেত্রে
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-কুঞ্জে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করত ভক্তি-রাজ্যের
উদীয়মান সূর্য্য-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। নবরূপোদয়ে জগতের ধ্বাস্তরাশি
নিরাকৃত হইয়া নূতন রাগে রঞ্জিত জগৎ যেরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ
আপনার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই জগতের কুসিদ্ধান্ত-ধ্বাস্তরাশি দূরীভূত হইয়া
সমগ্র জগৎ ভক্তিরূপ নবরাগে রঞ্জিত হইয়া অদ্বাবধি শোভা পাইতেছে।

আপনি নীলদ্রিতে আবির্ভূত হইয়া তথা হইতে আসমুদ্র হিমাচল ও পাশ্চাত্যের বহু বহু স্থানে শুদ্ধাভক্তি-মন্ডাকিনী-দ্বারা প্রবাহিত করিয়াছেন ও “পৃথিবীতে আছে ষত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥”—শ্রীম্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আপনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, কারণ আপনি প্রাপঞ্চিক জীবকুলকে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ অতিম ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিত্য-আনন্দময় সেবা-সুখের বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—ইহা আমরা সাক্ষাৎরূপে বুঝিতে পারিতেছি।

হে রূপানুগ আচার্য্য-ভাস্কর! আপনি ইহ জগতে প্রকটিত হইয়া স্বরূপ-রূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-দাসরঘুনাথ প্রভৃতি গোস্বামী-বর্গের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেম-ধর্ম্মের কথা, প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং গিয়া ও নিজ-জনগণকে প্রেরণ করিয়া রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

হে বার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভো! আপনি গোকুল-তরুণীগণ-মণ্ডিতা ও মাধব-দয়িতা বৃষভানুরাজ-নন্দিণীর একমাত্র প্রেষ্ঠজন। স্মতরাং তাঁহার একান্ত নিগূঢ় ভক্তনের কথা আপনার একমাত্র রসিক ভক্তগণের নিকট পরিবেশন ও তাঁহাদের সহিত আশ্বাদন করিয়া ‘আশ্বাশ্ব রসিকৈঃ সহ’ বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

হে পতিতপাবন প্রভো! আপনি ষাট পতিত জীবের প্রতি রূপা-পরবশ হইয়া নাম-মন্ত্রোপদেশপূর্ব্বক ‘পতিত-পাবন’ নামের সফলতা করিয়াছেন। তাই আজ এই শুভ প্রকট-বাসরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বাণী শ্রবণ করিয়া বলিতে চাই—

“জগাই মাধাই হৈতে মুক্তি সে পাপিষ্ট।

পুরীষের কীট হৈতে মুক্তি সে লঘিষ্ঠ ॥

এমন নিষ্প্রাণ মোরে কেবা দয়া করে।

একা প্রভুপাদ বিহু জগৎ-মাকারে ॥”

আমি অতি অভাজন, ভজন-পূজনহীন, অবিবেকী ও নিতান্ত পতিত। অতএব আমা-হেন ঘৃণ্য জনে আপনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—আমি এই আশা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।—“এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি’ নিরন্তর।”

অযোগ্য দীন সেবক—

—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

নিত্যশীলাপ্রবিষ্টে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রী শ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধান্ত সন্ন্যাসী শোশামীর
অষ্ট-সপ্ততিতম শুভাবিভাব-বাসরে
প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

আচার্য্যদেব ! আমরা কি দিয়া আজিকার এই পুণ্য-বাসরের অভিনন্দন করিব ? আপনি আমাদের শুষ্ক-মরুতুল্য হৃদয়-ক্ষেত্রে মদীয় শ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিশ্রদ্ধা কেশব মহারাজ-কর্তৃক শুদ্ধভক্তি-নতার বীজ রোপণপূর্বক তথায় নিয়ত হরিকথারূপ জল সেচন করতঃ যে ভক্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত করাইবার প্রযত্ন করাইতেছেন, তাহা লইয়াই আমরা পার্থিব গন্ধ-পুষ্পাদির দ্বারা পৃথিবী-পূজার ন্যায় অথবা গন্ধোদকে গন্ধা-পূজার ন্যায় ভবদীয় শ্রীচরণ বুগলে অঞ্জলি দিতে উপস্থিত হইয়াছি।

হে পরমগুরুদেব ! আপনার অদ্ভুত নিরবচ্ছিন্ন মহাত্মভবরাশি আমাদের ন্যায় কোমলশ্রদ্ধ সর্বতোভাবে অবধারণ করিতে অযোগ্য, তাই আমাদের ন্যায় সেবাবিমুখ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে আপনার পরম পবিত্র মাহাত্ম্য অচিন্ত্য ও অগম্য। আপনার শক্তিতেই আমাদের ন্যায় মুক ও কবিশ্ব-শক্তি লাভ করিতে পারে, পশু গিরি-লজ্জন করিতে সমর্থ হয়। অনভিজ্ঞ বালক পরস্পর বিবদমান নানামতবাদ-রূপ হিংস্র-ব্রহ্ম-সঙ্কুল অপসিদ্ধান্তসমূহ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, ইহা আপনার প্রবর্তিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় ও নানাবিধ গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

হে প্রভো, আপনি ভগবদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তের এবং লোক-কল্যাণের সমুদ্র-স্বরূপ। আপনি বদ্ধ-জীবকুলের উদ্ধারেব জ্ঞাত কারুণ্য বারিধি-স্বরূপ বহুরূপে রূপাপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ন্যায় চির ভগবদ্বিহীন প্রাণীকুলের উপর যে শাস্তি বর্ষণ করাইতেছেন, তদ্বারা বহু স্কৃতি-সম্পন্ন জীবগণ অভিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিবেন। মলয়ানিল সর্বত্র সমভাবে প্রবাহিত হইলেও তদ্বারা যেমন একমাত্র সারবান্ বৃক্ষসমূহই সারচন্দনে পরিণত হয়, তদ্রূপ ভবদীয় রূপা-বায়ু স্কৃতিব ন জীবগণকেই সুখময় করে। শ্রুতি তাহাই সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—

শ্রবণায়াপি বহুভিষো ন লভ্যঃ, শৃণ্বতোহপি বহুবো যং ন বিদুঃ।

আশ্চর্য্যোহস্ত বক্তা কুশলোহস্ত লেক্তা, আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ (কঠ ১২।৭)

চে দেব! বর্তমান-যুগে আপনার আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, আপনার আবির্ভাবের পূর্বে জীবমাত্রেরেই একমাত্র নিত্য সনাতন আত্মধর্মরূপ শুদ্ধভক্তি এই ধরাধাম হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কলিযুগ-পাবনাবতারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতন-ধর্ম তদীয় চরণানুচর শ্রীল রূপ-সনাতন-জীবপাদাদি আচার্য্যবৃন্দ এবং তৎপরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীমানন্দ-প্রমুখ আচার্য্যগণ-কর্তৃক প্রচারিত হইলেও, কালের কুটিল গতিতে জড়লোক-সমূহ তাহার বিকৃত ভাবেই যখন সনাতন ভক্তি-ধর্ম বলিয়া গ্রহণপূর্বক বঞ্চিত হইতেছিল এবং যখন তথাকথিত সভ্যজগৎ বিকৃত-ধর্মের পুতিগন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তদানীন্তন কর্মচারি-গণের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আপনি একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় পারদ্রুত হইয়া এবং বৈরাগ্যযুক্ত প্রেম-সাধনার আদর্শরূপে জগতের সমুখে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত স্নানির্মল সনাতন-ধর্মের প্রসুতিত প্রেম-সৌরভ পুনরায় জগজ্জনের হৃদ-নাসিকা-মার্গে প্রবেশ করাইয়াছেন। প্রভো, আপনার আবির্ভাবে জগতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য পুনরায় প্রকাশিত হইল; বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিরোধী শ্মার্ভ-পদলেহী, অসদাচারী, বৈষ্ণব-নামধারিগণ, ধার্মিক-নামধারিগণ, ব্রাহ্মণ-শূর-নামধারিগণ দুরন্ত কলির ত্রায় বিভ্রাটে পড়িয়া দূরে চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গেল। আপনি নিজে শ্রীমহাপ্রভুর গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিয়া বহির্দৃষ্ট লোকের চীৎকারে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করিয়া অপ্রতিহতা গতিতে নিজকার্য্যে চলিয়া যাইতেছেন। কারণ—

“হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার।

সাধুনকো দুর্ভাব নহি, ষণ্ড বিন্দে সংসার ॥”

আর্য্য! আপনি শুদ্ধভক্তি প্রচারকার্য্যে আচার্য্য শ্রীল জীবপাদের ত্রায় সিদ্ধান্তে নিপুণতা, ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ত্রায় দৃঢ়তা, গৌরপার্ষদবর শ্রীল প্রবোধানন্দের ত্রায় শ্রীশূর-গৌরাজ ও শ্রীগৌরজন-নিষ্ঠা, শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের ত্রায় নিরপেক্ষতা ও সংখ্যে, শ্রীল রূপ-সনাতনের ত্রায় দৈন্ত, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ত্রায় পরদুঃখ-দুঃখিতার মূর্ত্য-বিগ্রহরূপে অশ্রদ্ধাশূন্য অজ্ঞ বালকগণের হস্ত ধরাইয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের পথে অগ্রসর হইবার জগু নিয়ত আপনার অমুকম্পিত সেবকগণের দ্বারা উৎসাহ প্রবর্তিত করাইতেছেন।

প্রভো! আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলী অতবৃজ ক্ষুদ্রজীব আমরা কি ইচ্ছা

করিব? বহিস্মুখ জগৎ আমাদের এ' সকল প্রয়াস দেখিয়া হাস্য করিবে—
অনেক কিছু বলিবে, কিন্তু প্রভো, বিষ্ণু, হারীত, পরাশর, জৈমিনাদি প্রথিতনামা
ধর্মশাস্ত্রকারকগণ পর্য্যন্ত যখন শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের ও হরিজনের অধোক্ষজ-চরিত্র
বুঝিতে সক্ষম হন নাই, তখন আমাদের মত কোমলশ্রদ্ধ জড়-লোকসকল যে ঐরূপ
আচরণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

“বিষয়-মদ্যাক্ত সব কিছুই না জানে।

বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥”

“বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শক্তি।

মুণ্ডি কোন্ ছার হও শিশু অল্পমতি ॥”

“বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজে না বুঝয় ॥”

দেব! আপনি শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর ও তদীয় পার্শ্ববৃন্দর প্রকটস্থলী এবং লুপ্ত-
তীর্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও তাহাদের সংস্কার-কাণ্ড সম্পাদন করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলের
লুপ্ততীর্থ ও লুপ্ত-শোভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা
এবং ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে ভক্ত ও ভগবানের শুভ-আবির্ভাব ও তিরোভাব
উপলক্ষে তাহাদের মহিমা-স্মারক উৎসবাদিরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহ প্রবর্তন করিয়া
শত শত জীবকে স্ব-চরণান্তিকে আগমন করিবার সুযোগ প্রদান এবং বহু বহু
জীবের নিত্য কল্যাণোপযোগী তত্ত্বানুযায়ী স্বকৃতি সঞ্চয়ের পথ হুঁগম করিয়া
দিয়াছেন।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ পরমগুরুদেব! উপসংহারে আমাদের এই প্রার্থনা, যেন আমরা
কোটি কোটি জন্মেও ভবদীয় অমুকম্পিত সেবকাহুসেবকের পাদপদ্ম লাভ করিয়া
আপনার নিত্য সেবকগণের প্রীতি-কাগনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি। কারণ,
আপনার কাম-মনো-বাক্যজনিত যাবতীয় চেষ্টা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়েই হরিদান্তে
নিযুক্ত; স্মরণ্য একমাত্র আপনার সেবা দ্বারাই আমাদের অধোক্ষজ শ্রীমুকুন্দ-
দেবের সেবা-লাভ হইবে—ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা যেন
নিষ্কপট হইয়া আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি।

শ্রীপাদপদ্মে সেবাপ্রার্থী—

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকাহুসেবকবৃন্দ-পক্ষে

—শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (সেবা-সুহৃদ)

আমি কে ?

মানবমাত্রেয়ই চিরন্তন জিজ্ঞাসা—আমি কে ? আমার দুঃখ হই কেন ? দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ই বা কি ? শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ত্রিতাপ-সন্তপ্ত জীবের নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-সকাশে এই অশেষ মঙ্গলকর প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন :—

কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয় ?

ইহা নাহি জানি কেমনে 'হিত' হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

প্রশ্নটি অতি গভীরতম দার্শনিক নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। সংসারক্লিষ্ট ত্রিতাপদগ্ন জীবমাত্রেয় হৃদয়ে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। 'আমি'-বিষয়ে অনুধাবন করিতে গেলে, আমি কে ? দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির সমষ্টি-পিওই কি আমি ? যদি তাহাই হয়, তবে মৃত্যুবস্থায় বাহু-ইন্দ্রিয়াদি থাকি সত্ত্বেও, সেই বস্তুগণ 'আমি' বলিয়া আ 'হিত' হয় না কেন ? ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে উদ্ভূত কার্য-বিশেষ কি আমি ? তাহাই বা কিরূপে হয় ? ইন্দ্রিয়াদি বস্তুগত অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দৈহিক পদার্থগুলি অচেতন। অচেতন পদার্থ হইতে চেতনার উদ্ভব অসম্ভব। অজড়পদার্থ হইতে চেতনার উদ্ভব হয় না। মনন, চিন্তন, অনুধাবন ইত্যাদি চেতনা-পরিচায়ক ; এই চেতনা দেহের বর্ষ নয়। কোন চেতন বস্তুর সংযোগেই দেহ সচেতন হয়। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকাশ করেন—Liquid, Solid, Gas, Ether, Electron, এর সমন্বয়ে জীবের উৎপত্তি, 'কিন্তু এ' পর্য্যন্ত ঐ সকল বস্তুর সংমিশ্রণে জীব-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। বেদান্তকারের মত—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি দেহ বা কোষের বিত্তাস। তবে আমি কে ? না দেহের অতিরিক্ত জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট অপর কোনও বস্তু আমি ? দেহের সঙ্গে মন ও অপর ইন্দ্রিয়াদি সংশ্লিষ্ট আছে। মনই অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইতেছে। মনের জ্ঞানশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মে। মন কিছু ইচ্ছা করিলে, জ্ঞানশক্তির দ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণের উপায় স্থির করিয়া, অপর ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করে। এখন আবার সন্দেহ হয়—শুধু দেহটি আমি, না—ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত মনই আমি ? দেহ যদি আমি হয়, তবে কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি মনের বৃত্তি হইত দেহ কষ্ট পায় কেন ? আর ইন্দ্রিয়-সমন্বিত মনই যদি আমি হয়,

তবে বায়ু-পিত্তাদি দেহের বিকার মনকে পীড়া দেয় কেন ? যদি দেহ ও মন ব্যতীত অপর কোনও বস্তু আমি হয়, তবে রোগাদি ও কাম ক্রোধাদি দেহ ও মনের তাপ-আমাকে পীড়া দেয় কেন ? তবে আমি কে ? আমি আছি, আমি যাই, আমি থাই—মনীষীদের মতে এইটী ছোট আমি—বা কাঁচা আমি ! তবে খাঁটি বা পাকা আমি কি ? যে চেতনের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি এবং যাহা দ্বারা আমাদের দেহের, মনের ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি অনুভব করি, সেই চৈতন্যই আমি। এই ‘আমি’ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে কর্মক্ষম করে এবং সচল করে। সেই শক্তি চলিয়া গেলে সবই অচল হয় ; শাস্ত্রকার ইহাকে আত্মা-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গীতার দেহের নশ্বরত্ব ও আত্মার নিত্যত্ব ও অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণাত্মানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকারোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাত্মশোচিতুমর্হসি ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা যত্নসে যতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ (গীঃ ২।২২-২৬)

এইসকল যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া করুণায় মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

“জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’।

কৃষ্ণের ‘তটস্থা-শক্তি’ ভেদাভেদ-প্রকাশ” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম—জীব কৃষ্ণদাস, জীবের এই কৃষ্ণদাসত্ব একদিন বা দুইদিনের সম্পর্ক নয়, এই সম্পর্ক নিত্য ও শাস্বত। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিল প্রেম-রসানন্দমূর্ত্তি। তিনি নিত্য রসস্বরূপ, নিত্য প্রেমস্বরূপ, নিত্য আনন্দস্বরূপ। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন—সূর্য্যের কিরণের দ্বারা বা অগ্নিস্থলিঙ্গের দ্বারা জীব। জীব এই অখিল প্রেম-রসানন্দ-মূর্ত্তির

শক্তি-জাতীয় অংশ। সুতরাং বিস্তৃত প্রেমরসানন্দ দাণ্ডাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা প্রকৃত স্বভাব। আনন্দই ব্রহ্ম এবং পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। এই আনন্দেরই সন্তানস্বরূপ জীব; এই আনন্দেই জীবের স্থিতি। অতএব প্রশ্ন হইল—এই আনন্দের অংশ-স্বরূপই যদি জীব হয়, তবে সংসারে তাহার এত নিরানন্দ কেন? এত হাহাকার কেন? ত্রিভাপের তাড়নায় জীবের এত জালা ও সন্তাপ কেন?

এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জগু শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু বলিয়াছেন—জীব কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি। জীব অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ-শক্তির মধ্যে অবস্থিত। অন্তরঙ্গ-শক্তির আকর্ষণ প্রাপ্ত হইলে, জীব তন্মুখী হইয়া থাকে; তখন জীব নিত্যানন্দে ও নিত্যস্থখে মগ্ন হইয়া থাকে। অপর পক্ষে বহিরঙ্গা মায়ার আকর্ষণ মায়ামুগ্ধ হইয়া অশেষ সংসার-ক্লেশ ভোগ করে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্মুখ।

অতএব মায়ী তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কতু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুবায়।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ (চৈ: চ: ম: ২০।১১৭, ১১৮)

জীব কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইলেই মায়ীশক্তি জীবকে আক্রমণ করিয়া সংসারে নানাক্লেশ দেয়। যদি জীব কৃষ্ণের শরণাগত হয়, মায়ীশক্তি তাহার উপর কোন আধিপত্য করিতে পারে না। জীব-শক্তিকে তটস্থা-শক্তি বলা হয় কেন? তটস্থা অর্থাৎ মধ্যবর্তিনী। জীবশক্তিকে মধ্যবর্তিনী শক্তি কেন বলে? কৃষ্ণের তিনটি শক্তি, যথা:—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়ীশক্তি ॥ (চৈ: চ: ম: ২০।১১১)

এই তিন শক্তিই পৃথক পৃথক শক্তি। কোনটির সহিত কোনটির সম্পর্ক নাই। চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, উহা কৃষ্ণের স্বরূপে বা লীলার সংশ্লেষে বর্তমান থাকে। ইহার অপর নাম—স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গ-শক্তি। আর মায়ী-শক্তি হইল জড় শক্তি; ভগবানের লীলাস্থল ধামাদিতে মায়ীশক্তির প্রবেশ নাই। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার কার্যস্থল। সেইজগু ইহাকে বহিরঙ্গ-শক্তি বলে। জীবশক্তি মায়ীশক্তি ও স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া উহাকে তটস্থা-শক্তি বলে। কারণ, স্বরূপশক্তি জীবশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি মায়ীশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা; এইজগু ইহাকে মধ্যবর্তিনী শক্তি বলে। সুতরাং জীব শ্রীকৃষ্ণের চিংকণ

অংশ, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাসক্তি-ভেদাভেদ-প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। এই হইল—
‘আমি কে’ প্রশ্নের মীমাংসা।

জীব কৃষ্ণের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া মায়িক উপাদি অঙ্গীকারপূর্বক মায়ার দাসত্ব করিতেছে বলিয়া আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ তাহাকে দুঃখ দিতেছে। উক্ত ত্রিতাপ সাধারণতঃ দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির তাপ। জীব দেহ-মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। দেহ-মন ও ইন্দ্রিয়ের অভিনিবেশ না থাকিলে এই ত্রিতাপ জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু জীব, দেহ ও ইন্দ্রিয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ত্রি তাপ ভোগ করে। এই ত্রিতাপ-জনিত দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ই বা কি?

দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন :—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২০)

শ্রীভগবদগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ এই উপদেশ দিয়াছেন—

দৈবী ছেবা গুণময়ী মম মায়া দুরতায়।

মামেব ঘে প্রপদন্তে মায়াযৈতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

করুণাময় ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির জগুই এবং অজ্ঞ জীবের অজ্ঞান-নাশের জগুই সাধুগণের হৃদয়ে তত্ত্ব স্ফুরণ করেন, তাঁহারা শাস্ত্রাকারে তাহা প্রকাশ করেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।

জীবের কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা’—জীবের হয় জ্ঞান ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-১২৩)

যে-সকল জীব জন্ম-জন্মান্তর হইতে স্কৃতি-লব্ধ কিম্বা যাহারা এই জন্মেই মহৎ কৃপাতিশয়-প্রাপ্ত, তাঁহারা শাস্ত্র শ্রবণমাত্রই ভগবৎসামুখ্য ও ভগবদনুভব যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদের হৃদয় স্কৃতির অভাবে ও পাপে মলিন থাকে, তাহাদের হৃদয়ে শাস্ত্র-উপদেশ বা গুরু উপদেশ সত্ত্বেও প্রতিকলিত হয় না। সংসদ ও শাস্ত্রবাক্য-শ্রবণে বহু জন্মের ভাগ্যফলে গুরু-কৃপায় তাঁহার নির্দেশক্রমে ভজন করিতে করিতে স্বয়ং ভগবানের প্রতি প্রীতি বা প্রেম জন্মে। এই প্রেম-উদয়ে সর্বপ্রকার দুঃখ-নিবৃত্তি হয়।

প্রশ্ন হইল, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে জীবের দুঃখ দূর হইতে পারে সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে 'শ্রীকৃষ্ণ কে?'—তাহা জানা দরকার। এইসকল কথা জানিতে না পারিলে ভজনেই বা প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব অনাদি কাল হইতে এইসব কথা ভুলিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে কে স্মরণ করাইবে? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ পরম কৃপালু। বস্তুতঃ “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।”

শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে আমরা কি পাই? শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের একমাত্র কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণে অমুরাগ ব্যতীত সুষ্ট কৃষ্ণসেবা হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু—রাগমার্গে ভক্তি-সাধনা। ইহা ব্যতীত প্রেম পাওয়া যায় না।

বেদশাস্ত্র কহে—‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’।

‘কৃষ্ণ’ প্রাপ্য-‘সম্বন্ধ’, ‘ভক্তি’ প্রাপ্তের সাধন ॥

অভিধেয়-নাম ‘ভক্তি’, ‘প্রেম’-প্রয়োজন।

পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪-১২৫)

ভগবৎ-তত্ত্বের পরম বিকাশ—প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ; সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় ভক্তিই—অভিধেয় এবং প্রেমই—প্রয়োজন-তত্ত্ব। অন্ধাবান্ ব্যক্তিই অধিকারী।

ফলকথা ভগবদৈমুখ্যই জীবের দুঃখের কারণ। তৎসামুখ্যই মায়ার প্রভাব হইতে নিস্তারের উপায়। ভগবৎ-সামুখ্য-লাভের জন্ত শাস্ত্র অমুরাগে যে-সকল কার্য্য করিতে হয়, তন্মধ্যে ভক্তি-পথের কার্য্যগুলি সর্বাপেক্ষা হৃদয়প্রদ এবং ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য উপায়। ভগবৎ-অনুভবই প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজন অন্তর্কর্ষিঃ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-স্বরূপ। এই অন্তর্কর্ষিঃ ভগবদনুভবই প্রেম-স্বরূপ। এই প্রেমোদয়েই দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। যদিও অভিধেয় ও প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ উপদেশেই অভিপ্রেত হইয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে উপদেশের আবশ্যক। যেমন দরিদ্রের গৃহে লুক্কায়িত অর্থনিধির সন্ধান পাইয়া উহা পাইতে প্রযত্নশীল এবং তাহা প্রাপ্ত হয়; তথাপি শৈথিল্য নিরসনের জন্ত উপদেশ আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে :—

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।

‘সর্বজ্ঞ’ আসিয়া দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে ॥

‘তুমি কেন এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।

তোমারে না কহিলে, অশ্রু ছাড়িল জীবন ॥’

সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে ।

এছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥

সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অতুবন্ধ ।

সর্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥

বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায় ।

সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥

'এই স্থানে আছে ধন' বলি 'দক্ষিণে' খুদিবে ।

'ভীমকুল-বরুণী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥

'পাশ্চিমে' খুদিবে তাই, 'যক্ষ' এক হয় ।

সে বিস্ম করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥

'উত্তরে' খুদিলে আছ কৃষ্ণ 'অজগরে' ।

ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥

পূর্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে ।

ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥

এতে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ তাজি' ।

'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি' ॥ (মধ্য ২০।১২৭-১৩৬)

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় ।

'অভিধেয়' বলি' তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ (মধ্য ২০।১৩৯)

তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ।

প্রেমে কৃষ্ণাশ্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥

দ্বারিদ্ৰ্য-নাশ, ভব-ক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয় ।

প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য-প্রয়োজন হয় ॥

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥

বেদাদি সকল-শাস্ত্রে, কৃষ্ণ—মুখ্য-সম্বন্ধ ।

তাঁর জ্ঞানে আত্মরূপে যায় মায়াবন্ধ ॥ (মধ্য ২০।১৪১-১৪৪)

ভগবৎ-প্রাপ্তির বহুবধ সাধনা আছে, অনেকে বলিলেও সকল প্রকার সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি ও তাহার সেবা-সৌন্দর্য-মাধুর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না । এমন কি কোন কোন সাধনার পথ এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাতে নাস্তিকতার পথেই পতিত হইতে হয় । নির্বিশেষ জ্ঞানের সাধনা অতি ভীষণ । উহাতে অবশেষে

প্রায়শঃই অন্ধকার দেখিতে হয়। কর্মকাণ্ডের সাধনা বহু-ক্লেশকর, ভীমরুল-বোলতার দংশনের মত সেই সাধনায় ক্লেশ ভিন্ন স্মৃতি নাই। পশ্চিমে ‘বক্ষ’ ষোণের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। বক্ষ কেবল ধনই রক্ষা করে, নিজে আশ্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, অতঃকণ্ড দেয় না। ভক্তি-সাধনাই শ্রেষ্ঠ পথ; ইহাতে অল্লায়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়, সহজেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। এই ভক্তি ‘অভিধেয়’ নামে শাস্ত্রে অভিহিত, ভক্তিতে কৃষ্ণ-প্রেম জন্মে। প্রেম হইলেই আত্মসদ্বিকভাবে দুঃখ দূর হয় ও সংসারের সকল যাতনা তিরোহিত হয়। অবশ্য দারিদ্র্য-নাশ, ভব-ক্ষয়াদি প্রেমের ফল নহে। প্রেমসুখই মুখ্য প্রয়োজন। সংসারের বাসনা ক্ষয়—প্রেমের আত্মসদ্বিক ফল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাশ্বাদনই প্রেমের ফল। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞানেই মায়াবন্ধ ছিন্ন হইয়া স্বায়ু এবং যাবতীয় দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

—ডাঃ শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার (H. M. B.)

পুরাণ-ভক্তি-কাব্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

বেলঘোরিয়া (২৪ পরগণা)

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জবত

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭০ পৃষ্ঠার পর)

পরিক্রমা-সঙ্ঘের মধুবন যাত্রা

২৭শে অক্টোবর, ২ই কার্তিক, শনিবার—একাদশীর পারণ করিবার পর অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় সুসজ্জিত শিবিকাবাহিত শ্রীশ্রীগুরুদেবের অর্চনা-প্রগ্রহের অনুগমনে নগর-সঙ্কীর্্তন-শোভাযাত্রাযোগে ভক্তগণ মধুবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনमध्ये মধুবনই প্রথম বন। মধুবন নগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। মধুবনের বর্তমান নাম ‘মহোলি’; এই গ্রামের ১ মাইল ব্যবধানে পূর্বদিকে উচ্চ টিলার উপর ক্রবের তপস্কা-স্থান। যাত্রীগণ ক্রব-টিলায় ক্রবের তপস্কা-স্থান, চতুর্ভুজ নারায়ণ-মুর্তি ও ক্রবজীকে দর্শন করিলেন।

মধুবনে পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ক্রব শ্রীমদ্রামায়ণের উপদেশে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীচরিত্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। মধুদৈত্যের বাসস্থান ও তাহার নিধন-স্থান ছিল বলিয়া এস্থানের নাম ‘মধুবন’ হইয়াছে। কৃষ্ণ ইহাকে এখানে বিনাশ করেন। এই মধুবনেই শ্রীবলদেব মধুপানে মত্ত হইয়াছিলেন। এজন্যও ইহাকে মধুবন বলে।

মধুবনে প্রথম রাত্র

ঋষটিলা হইতে পরিক্রমা মধুকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া মধুকুণ্ড, মধুবনবিহারী, দাউজী প্রভৃতি দর্শন করেন। মধুকুণ্ডের পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণকুণ্ডতীরে পরিক্রমা-সজ্জের শিবিরশ্রেণী স্থাপিত হওয়ায় একটি সুন্দর সুসজ্জিত পল্লীরূপে প্রতিভাত হইতেছিল এবং ইহা এক মনোরম দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল। পরিক্রমা-সজ্জের এইরূপ বৈভব দর্শনে তাদ্ধিশবাসী জনসংগারের অনেকেই ইহাকে রাজকীয় সৈন্তবাহিনীর শিবিরশ্রেণীর আয় ধারণা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে যাত্রিগণ শ্রীবিগ্রহের আরতি দর্শন, পাঠকীর্তন শ্রবণ ও পরে প্রসাদসেবান্তে পূর্ণনির্দেশমত স্ব-স্ব তাঁবুতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রত্যহই প্রসাদ বিতরণের সময় ঘণ্টা বাজাইয়া যাত্রিগণকে আহবান করা হইত। শেষরাত্র ৪টার সময় ঘণ্টাধ্বনি করিলে সকলে শৌচাদি সমাপন করিয়া পরিক্রমায় বাহির হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেন। যেদিন স্থান পরিবর্তন করিতে হইত, সেদিন সকলই অতি প্রত্যাষে নিজ নিজ বিছানাপত্র, দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া পরিক্রমায় বহির্গত হইতেন। এইরূপ নিয়মাদি প্রবর্তিত হওয়ায় যাত্রিগণ প্রচুর সময় পাইতেন এবং সকল কার্যই বেশ সুশৃঙ্খলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইত।

‘মধুবনে দ্বিতীয় দিবস ; তালবন ও কুমুদবন দর্শন

২৮শে অক্টোবর, ১০ই কার্তিক, রবিবার—অতি প্রত্যাষে ময়ূরের কেকাধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রাযোগে তালবনে উপস্থিত হন। মধুবন হইতে প্রায় ২১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তালবন অবস্থিত। তালবনের বর্তমান নাম ‘তারুসী’। তন্তুগণ এস্থলে বলভদ্রকুণ্ড ও তাহার উত্তর-পশ্চিমকোণে শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, রেবতীজী ও শ্রীবলরামকে দর্শন করেন। এস্থলের স্থানমাহাত্ম্য ভক্তিরত্নাকর হইতে পাঠ করিয়া যাত্রিগণকে শ্রবণ করান হয়। এই তালবনে শ্রীবলদেব স্থলবুদ্ধি, মূর্ততাজনিত তদ্বাদ্বতা ও অজ্ঞানতার প্রতীক দেখুকাসুরকে বধ করিয়া শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণাদি সখাগণের অহুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

তালবন হইতে প্রায় ২১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাত্রিগণ কুমুদবনে উপস্থিত হন। কুমুদ-বনের ডাক-নাম—‘কুদর বন’। এস্থলে কুমুদ-শোভিত স্বচ্ছসলিল মনোহর সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সাহিত জলকেলি-লীলা করিয়া-

ছিলেন। ভক্তগণ কুমুদ-সরোবর দর্শন ও ইহার পবিত্র বারি শিরে ধারণ করিয়া এখানকার স্থানমাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করেন। সরোবরের তীরেই শ্রীবল্লভাচার্য্যের গাদি ও বৈঠক আছে। এস্থান হইতে পরিক্রমা ষ্ঠাসময়ে মধুবন-শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রসাদ সেবাস্তে বিশ্রাম করেন। মধুবন হইতে তালবন ও কুমুদবন হইয়া পুনরায় মধুবন আসিতে প্রায় ৫ ক্রোশ পথ।

আগামীকলা বহুলাবন যাত্রা করা হইবে জানিয়া, সঙ্ঘ্যারতির পর পাঠ-কীৰ্ত্তনাদি শ্রবণান্তে প্রসাদ পাইয়া যাত্রিগণ সকাল সকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

বহুলাবন যাত্রা ; পশ্চিমধ্যে শান্তনুকুণ্ড দর্শন .

১৯শে অক্টোবর, ১৯ই কার্তিক, সোমবার—প্রত্যুষে পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দের আনুগত্যে সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে মধুবন হইতে যাত্রা করিয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় ৩০ মাইল অতিক্রম করিবার পর পশ্চিমধ্যে ‘শান্তনুকুণ্ডে’ উপস্থিত হন। শান্তনুকুণ্ডের প্রচলিত নাম—‘সাতোঙা’। উচ্চ টিলার উপর শান্তনুবিহারীর মন্দির অবস্থিত। এই টিলাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে কুণ্ড রহিয়াছে। এস্থলে শান্তনু রাজ্য তপস্যা করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। ভক্তগণ বহু সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উচ্চ টিলার উপর শ্রীমন্দিরে মুরলীধর শান্তনু-বিহারী ও শ্রীরাধিকার দর্শন লাভ করেন।

ভক্তগণ এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া উত্তরদিকে ৪ মাইল দূরবর্তী বহুলাবনে উপস্থিত হন। স্থানীয় জনসাধারণ এই বহুলাবনকে ‘বাটী’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ‘বাটী’র উত্তরে বহুলাকুণ্ড বা কৃষ্ণকুণ্ড অবস্থিত এবং কুণ্ডের দক্ষিণতটে বহুলা গাভীর মন্দির।

‘বহুলা’ নামক গাভী ব্যাঘ্র-কর্তৃক আক্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া উক্ত গাভীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীচরিতামতে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীমম্বহাপ্রভু বনভ্রমণকালে এই বহুলাবনে যখন শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন অসংখ্য গাভী উর্ধ্বপুচ্ছে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লেহন করিয়াছিল। ময়ূর-ময়ূরী, কোকিলাদি নৃত্য ও কুঞ্জনদ্বারা তাহাদের প্রেমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিল এবং বৃক্ষলতাসমূহ পুষ্পবর্ষণ দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদ-পাণ্ডে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিল।

এই বহুলাকুণ্ডের তীরেই পরিক্রমা-সঙ্ঘের শিবিরশ্রেণী স্থাপিত হইয়াছিল। কুণ্ডটী বর্তমানে শুষ্কপ্রায় হওয়ায় জলকষ্ট পরিলক্ষিত হইলেও পরিক্রমা-পরিচালক-সঙ্ঘের ব্যবস্থায় জলের জন্ত যাত্রিগণের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। দুওতটে

একটি বৃহৎ ইন্দারা বর্তমান। যাত্রিগণ দ্বিপ্রহরে প্রসাদাদি পাইয়া স্ব স্ব তাঁবুতে স্থান গ্রহণ করেন। সন্ধারতির পর পাঠ কীর্ত্তনাদি ও স্থান মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রসাদ-সেবান্তে ভক্তগণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। (ক্রমশঃ) —প্রকাশক

শ্রীপুরীধামে রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীপুরীধাম-জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন উপলক্ষে শ্রীশ্রীরেমুণা, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, আলাল-নাথ প্রভৃতি পরিক্রমামুখে দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী ৩রা আষাঢ় ১৩৫৯, ইং ১৭৬।৫২-তারিখে রাত্র ১০টা ২০মিঃ এর গাড়ীতে হাওড়া ৯নং প্ল্যাটফর্ম হইতে যাত্রা করিবেন। আমরা ধর্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে তত্ত্বরোধ করি। ইতি— ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, ইং ৮৬।৫২ ; নিঃ—সভ্যবৃন্দ

নিয়মাবলী :—

(১) দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে পুরী প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেনভাড়া ইত্যাদি খরচের জন্ত প্রতি যাত্রীপক্ষে ৬৫ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

(২) যাত্রিগণ অতি সংক্ষেপে স্ব-স্ব বিছানা ও আবশ্যক হইলে ১টা ঘটা ও ১টা বাটী সঙ্গে আনিবেন।

(৩) দেয় ভিক্ষার টাকা ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন, মঙ্গলবার যাত্রার পূর্বে শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন অথবা ঐ দিন বেলা ৫টা হইতে রাত্র ৮টার মধ্যে হাওড়ায় ৯নং প্ল্যাটফর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৪) সমিতি ২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, শনিবার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্তন করিতে আশা করেন।

আসাম-প্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যাবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ বিগত ৭ই বৈশাখ
১৩৭৯, ইং ২০ ৪।৫২, রবিবার—আসাম-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্ন্যাসপ্রভুর
প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া গত ১৪শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ৭।৬।৫২ শনিবার নবদ্বীপে
প্রত্যাবর্তন করেন। তথা হইতে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ
গৌড়ীয় মঠে পৌছেন। তাঁহার সঙ্গে উক্ত সমিতির প্রসিদ্ধ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক), ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদভক্তিব্যোমসুত্র ত্রিবিজয়
মহারাজ (কার্য্যাধ্যক্ষ), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদভক্তিব্যোমসুত্র বামন মহারাজ (প্রকাশক),
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদভক্তিব্যোমসুত্র নারায়ণ মহারাজ (প্রচার-সম্পাদক), শ্রীপাদ
পরমধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত সত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী,
শ্রীদীপকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সেবা-সুহৃদ, শ্রীমধুবিজয় ব্রহ্মচারী এবং শ্রীসত্যধ্যান
ব্রহ্মচারী অমুগমন করিয়াছিলেন।

প্রচারকমহোদয়গণ সর্বপ্রথমে গোলোকগঞ্জে শ্রীমতী সূচিগ্রাবালা দেবীর গৃহে
৯ই বৈশাখ শুভবিজয় করিয়া, পরে ধুবড়ী সহরে পরলোকগত শ্রীশ্রীনিমানন্দ
সেবাভীর্থ প্রভুর ভজন-কুটারে (বাস-ভবনে) ১৩ই বৈশাখ পৌছিয়া প্রবলভাবে
প্রচার করেন। তথা হইতে সাপটগ্রামে ২২শে বৈশাখ ডাঃ শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র
দাস মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ সাত্তাল মহাশয়ের বাসভবনে
প্রচারোদ্দেশ্যে অবস্থান করিয়া ২৬শে বৈশাখ অভয়াপুরীগ্রামে বিজনী-রাজভবনে
শুভবিজয় করেন। এখানে বিজনীবাজের দণ্ডয়ান বাহাদুর মাননীয় শ্রীযুত
জে, এন্, নিয়োগী মহোদয়ের যত্ন ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার
চেষ্টায় অভয়াপুরীতে অভিনবভাবে সনাতন-ধর্মের প্রচার হয়। ২২শে জ্যৈষ্ঠ
স্বধামগত শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে 'আসাম-
বৈষ্ণব-সম্মিলনী'র পক্ষে শ্রীযুত কালাচাঁদ দাস প্রভৃতি সভ্যবৃন্দের আগ্রহে
প্রচারকগণ ভাটীপাড়া গ্রামে উপস্থিত হন। বিগত ৩০শে বৈশাখ বঙ্গাইগাঁও
হাইস্কুলের হেড্-মাষ্টার শ্রীযুত বিনন্দচন্দ্র পাঠক মহাশয়ের চেষ্টায় গান্ধী-ময়দানে
বিরাট সভায় বক্তৃতা দি হয়। তথা হইতে শ্রীযুত যাদবেন্দ্র দাস ও শ্রীযুত
প্রেমানন্দ দাস প্রভৃতির বিশেষ আস্থানে শ্রীচৈতন্যমত-বিরোধী সম্প্রদায়ের

হিতসাধনের জন্ত মলিগাঁও নামক গ্রামে প্রবলভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুত ধরণীকান্ত নাথ ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহোদয়গণের বিশেষ আগ্রহে বাঁশবাড়ী গ্রামে গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায়ের পার্থক্য সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ বক্তৃতা হয়। তৎপরে বঙ্গাহাঙ্গাও ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া ৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রচারকগণ আসামের প্রধান নগর গোহাটী-সহরে পৌঁছেন। এই সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দি হয়। গোহাটী-প্রচার-প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (আসাম রেলওয়ের ডিভিসাঞ্চাল মেডিক্যাল অফিসার), শ্রীযুত এম্ সলই (গোহাটী কলেজের অধ্যাপক) ও ডাঃ জি, কে, ঘোষ মহোদয়গণের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। সমিতির প্রচারকবৃন্দ ২২শে জ্যৈষ্ঠ গোহাটী হইতে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে নবদ্বীপ হইয়া চুঁচুড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

—প্রচার-সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬ ; আষাঢ়—৩১৫৯

১৫ বামন, ৯ আষাঢ়, ২৩ জুন, সোমবার—গৌর-প্রতিপৎ দি ২৫৮।

শ্রীশুণ্ডিচা-মার্জ্জন।

১৬ বামন, ১০ আষাঢ়, ২৪ জুন, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বিতীয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভুর তিরোভাব।

২০ বামন, ১৪ আষাঢ়, ২৮ জুন, শনিবার—গৌর-ষষ্ঠী রা ১২। ১৩৭ হেরা-পঞ্চমী, শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়।

২৪ বামন, ১৮ আষাঢ়, ২ জুলাই, বুধবার—গৌর-দশমী রা ২। ১৬। শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের পুনর্ঘাট।

২৫ বামন, ১৯ আষাঢ়, ৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী রা ১। ৩০। শয়নৈকাদশীর উপবাস।

২৬ বামন, ২০ আষাঢ়, ৪ জুলাই, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১২। ২২। দি

৭।১৫ গতে দি ৯।২৬ মধ্যে একাদশীর পারণ । দ্বাদশারস্তপক্ষে চাতুর্দশ্য ব্রতরস্ত ।

২২ বামন, ২৩ আষাঢ়, ৭ জুলাই, সোমবার—পূর্ণিমা রা ৬।৪৩ । পৌর্নমাস্যারস্ত-পক্ষে চতুর্দশ্য ব্রতরস্ত । শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও ত্রিদণ্ডি-সংগ্ৰাসিগণ-পক্ষে চাতুর্দশ্য ব্রতরস্ত । শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব ।

৫ শ্রীধর, ২৮ আষাঢ়, ১২ জুলাই, শনিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৬।৪৪, পরে বধী রা ৪।৩২ । শ্রীল গোপাল-হট্ট গোস্বামীর তিরোভাব ।

৭ শ্রীধর, ৩০ আষাঢ়, ১৪ জুলাই, সোমবার—কৃষ্ণাষ্টমী রা ১।২৪ । শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব ।

৯ শ্রীধর, ৩২ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, বুধবার—কৃষ্ণ-দশমী রা ১।১৪৬ । কর্কট সংক্রমণারস্তপক্ষে চাতুর্দশ্য-ব্রতরস্ত ।

শ্রাবণ—১৩৫৯

১০ শ্রীধর, ১ শ্রাবণ, ১৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণেকাদশী রা ১।১৪২ । কামিকা একাদশীর উপবাস ।

১১ শ্রীধর, ২ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই, শুক্রবার—কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১২।৮ । প্রাতঃ ৫-৪৮ গতে পূর্বাহ্ন ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ ।

২৬ শ্রীধর, ১৭ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট, শনিবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৩৩ । পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস । শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ ; চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব ।

২৭ শ্রীধর, ১৮ শ্রাবণ, ৩ আগষ্ট, রবিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৮।৪০ । দিবা ৮।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ । শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব । শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব ; মতান্তরে পরাহে ।

২৯ শ্রীধর, ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ১।৪৬ । শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত । শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্নমাসীর উপবাস । খণ্ডগ্রাস চলগ্রহণ । স্পর্শ—রা ১২।৩ গতে, মোক্ষ—রা ২।৩১ গতে ।

১ জ্যৈষ্ঠ, ২১ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট, বুধবার—কৃষ্ণ-প্রতিপদ রা ১।১১৭ । দিবা ৯।৩১ মধ্যে শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্নমাসীর পারণ ।

৮ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট, বুধবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ১।১৩৩ । শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস । শ্রীশ্রীজয়ন্তী ।

৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-নবমী দি ১।১২৮ । পূর্বাহ্ন ৯।৩ মধ্যে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর পারণ । শ্রীনন্দোৎসব ।

১১ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট, শনিবার—কৃষ্ণেকাদশী দি ১২।৪৮ । অম্লদা একাদশীর উপবাস । (আগামী-কল্য পূর্বাহ্ন ৯।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ) ।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দগো জয়তঃ

<p>* ধর্মঃ সমুদ্ভিতঃ পুংসাং বিধক্‌সেন-কথাশু যঃ ।</p>	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্‌ক্ষে ।</p> 	<p>* নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥</p>
<p>* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা- স্প্রপ্রসীদতি ॥</p>	<p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা- স্প্রপ্রসীদতি ॥</p>	<p>* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা- স্প্রপ্রসীদতি ॥</p>

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্‌ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

<p>৪র্থ বর্ষ</p>	<p>অনিরুদ্ধ, ৯ শ্রীধর, ৪৬৬ গৌরাক্ষ বৃধবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৫৯; ইং ১৬৭৭৫২</p>	<p>এম সংখ্যা</p>
------------------	--	------------------

শ্রীশ্রী উপদেশামৃতম্

Publisher
for 3/6

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্থামি-বিরচিতম্ ।

রাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং

জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিখ্যাৎ ॥ঃ ॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজ্ঞানো নিয়মাগ্রহঃ ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ যদ্‌ভিত্তিক্তির্বিনশ্যতি ॥ঃ ॥

উৎসাহান্নিশ্চয়ান্ধৈর্য্যাং তত্ত্বংকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাং ।

সঙ্গত্যাগাং সতো বৃত্তেঃ যদ্‌ভিত্তিক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥গা ॥

দদাতি প্রতিগৃহাতি গুহমাখ্যাতি পুচ্ছতি ।

ভুঙ্ক্রে ভোজয়তে চৈব ষড়্ বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥৪॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দাক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিচ্চ তজস্তুমীশম্ ।

শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনশ্চমশ্চ-

নিন্দাদিশূণ্ণহৃদমীপিত-সঙ্গলক্যা ॥১॥

দৃষ্টেঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষচ্চ দোষৈ-
ন প্রাকৃতহুমিহ তত্ত্বজনশ্চ পশ্যেৎ ।

গঙ্গান্তসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈ-

অক্ষদ্রবত্মপগচ্ছতি নীরধশ্মৈঃ ॥৬॥

স্মাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিজ্ঞা-

পিত্তোপতপ্ত-রসনশ্চ ন রোচিকা নু ।

কিন্তাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টি

স্বাদী ক্রমাস্তবতি তদগদমূলহস্তী ॥৭॥

তন্মাম-রূপ-চরিতাদি-স্বকীৰ্ত্তনামু-

স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ।

তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুরাগী

কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্ ॥৮॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্

বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ ।

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতান্নাবনাৎ

কুর্যাদশ্চ বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

কস্মিন্ভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুক্তানি-

স্তোত্র্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ ।

তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোহপি সা রাধিকা

প্রার্থা তদদিয়েং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

কৃষ্ণস্তোচৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোহপি রাধা
 কুণ্ডং চাস্তা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি ।
 যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যুলমস্থলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
 তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিক্রোতি ॥১১॥

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতের বঙ্গানুবাদ

যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপহ্ববেগ—এই ছয় বেগ দমন করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন ॥১॥

(কোন বস্তুর) অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি অত্যধিক আদর ও অগ্রহণ বা অপালন, কৃষ্ণভক্তিবিমুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত ভাব—এই ছয় দোষে ভক্তি নষ্ট হইয়া যায় ॥২॥

(ভক্তিসাধনে) উৎসাহ, দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকূল-কর্মের অনুষ্ঠান, আসক্তি ও অসংসঙ্গ-ত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারের অবলম্বন—এই ছয়টির দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

(পরস্পর) দান ও গ্রহণ, গোপন-বিষয়ের কথন ও জিজ্ঞাসা, আহার ও আহার-প্রদান—এইরূপে প্রীতির লক্ষণ ছয় প্রকারই হয় ॥৪॥

যাহার বাক্যমধ্যে অর্থাৎ মুখে 'হে কৃষ্ণ !'—এই শব্দ (বা কথা) বর্তমান (বা শুনা যায়), [মধ্যম অধিকারী] তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। যদি শ্রীসদগুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শ্রীভগবদ্ভজন-কারীকে যদ্রূপ মনে মনে, তদ্রূপ প্রণতিদ্বারাও আদর করিবেন। অনন্ত অর্থাৎ একান্তী বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতিরহিত, অতএব অপরের নিন্দা প্রভৃতি হইতে মুক্তহৃদয় অর্থাৎ সর্বত্র সমদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিজ্ঞ মহাভাগবতকে অভীষ্ট-সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রসন্ন ও সেবা-সহকারে সমাদর করিবেন ॥৫॥

এই অগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাত দৃষ্ট দোষসমূহের নিমিত্ত তাঁহার (সেই শুদ্ধ-ভক্তের) প্রাকৃত-ভাব দর্শন করা (অর্থাৎ তাঁহাতে মর্ত্যবুদ্ধি করা) কাহারও উচিত নহে। জলের ধর্ম—বুদবুদ, ফেন ও পঙ্কের

বিঘ্নমানতা-হেতু গঙ্গাজলের দ্রবব্রহ্মভাব (দ্রবীভূত ব্রহ্মবস্তুত্ব) কখনও লোপ পায় না ॥৬॥

অহো! শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিতাদি-রূপ মিছরিও অবিচাররূপ পিত্তের দ্বারা অতিশয়-তপ্ত জিহ্বার রুচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাই (শ্রীকৃষ্ণনামাদি) প্রত্যহ শ্রদ্ধা বা অপ্ৰাকৃত-বুদ্ধির সহিত সেবিত হইলে, নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে স্বাদু হইয়া সেই রোগমূল-বিনাশক হইয়া থাকেন ॥৭॥

(সাধুশাস্ত্রোপদিষ্ট) ক্রমের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদির স্মৃষ্ট কীর্তন ও অনুসরণে জিহ্বা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া, শ্রীব্রজে বাস-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া নিখিল-কাল যাপন করিবে—ইহাই উপদেশ-সার ॥৮॥

মথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ-হেতু (অজ শ্রীনারায়ণের ধাম) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন উদারপাণির (শ্রীকৃষ্ণের) রমণ বা কেলিবশতঃ শ্রেষ্ঠ; এই গোবর্দ্ধন-প্রদেশেও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীগোকুলপতির প্রেমায়ত্তের পরিপূর্ণ প্লাবনহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ। (অতএব) কোন্ ভজন-বিচার-নিপুণ জন শ্রীগোবর্দ্ধন-তটে বিরাজমান এই শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিবেন ? ॥

(সর্বগুণী কস্মিগণ অপেক্ষা (গুণত্রয়বর্জিত) জ্ঞানিগণ শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত। তাদৃশ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্ৰাকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ, তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা একান্ত প্রেমনিষ্ঠগণ, তাদৃশ প্রেমৈকনিষ্ঠগণ অপেক্ষা সেই গোপসুন্দরীগণ, গোপীগণ অপেক্ষাও সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এই সরোবর (শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।, অতএব, কোন্ স্মৃতিমান্ জন সেই শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় না করিবেন ? ১০॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল-প্রেমসী অপেক্ষাও অধিকতর প্রেম-পাত্র। ইহার কুণ্ডও অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডও সর্বতোভাবে সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম প্রীতিপাত্র—ইহা মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। অত্যাশ্রিত ভক্তিসেবিগণের (সাধক-ভক্তগণের) কথা আর কি বলিব—শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-গণের পক্ষেও যে প্রেম অতি দুর্লভ, এই শ্রীরাধাকুণ্ড একবারমাত্র স্নানকারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া থাকেন ॥১১॥

কৰ্ম্মীর কাণাকড়ি

স্থূলদেহ, চিদাভাস মন ও চেতন আত্মা

মানবের অধিষ্ঠানে ত্রিবিধ সত্তার অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাঁহার মন, ও তিনি স্বয়ং দেহী। এই দেহীটী অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার মন স্বয়ং চেতন হইলেও অচিৎএর ধারণায় সৰ্ব্বদা ব্যস্ত এবং তাঁহার স্থূল দেহটী বিশুদ্ধ অচিৎ।

জীবের আত্ম-প্রতীতিতে সবিশেষ ভক্তি ও নিৰ্ব্বিশেষ জ্ঞান
এবং অনাত্ম-প্রতীতিতে নশ্বর কৰ্ম্ম

চিন্ময় দেহীর বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী নিৰ্ব্বিশেষপর—জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্থূলক, অপরটী আত্মার নিত্য সবিশেষ-ধৰ্ম্মে—সেব্য-সেবক-ভাবে অত্মোত্তাপ্রাপ্ত। দেহ ও মনের কবল হইতে যে-সময় আত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি নির্ভেদ-ব্রহ্মাত্মসম্ভানপর অথবা নিত্য হরিসেবাময়। সে-কালে মানবের দেহ ও মনের অধিষ্ঠান সুপ্রবল হইয়া অনাশ্ব-বিচারে প্রমত্ত, সে-কালে তিনি জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গের কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাকে অশান্তিময় রাজ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। আত্মা বা দেহী অনিত্য ফল কামনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্ম-প্রতীতি প্রবল হইয়া আত্মধৰ্ম্মের বিপর্যয়ে নশ্বর দেহ ও মনকে ‘আত্মা’ বলিয়া সনাক্ত করে—ইহাই জীবের বিবর্ত বা ভ্রান্তি। শক্তির পরিণামফলে নশ্বর-ধৰ্ম্ম দেহ ও মনে পরিদৃষ্ট হয়—ইহাই আত্মার বিবর্ত-ভাব।

হরিসেবা দেহ-মনের চেষ্টাস্বরূপ কৰ্ম্ম নহে

অনাশ্ব দেহ বা মন ফলভোগ করে। নিত্য হরিসেবার ক্রিয়াগুলিকেও কৰ্ম্মফলের অন্ততন জ্ঞান করে। বাস্তবিক হরিসেবা কখনও দেহ ও মনের কৰ্ম্মজাতীয় চেষ্টা নহে। বাহ্যদর্শনে সমস্তের উপলব্ধি হইলেও একত্বের নিদর্শন নহে। দেহ ও মন লইয়া ঐহারা বিব্রত, তাঁহাদের কৰ্ম্মপথ ব্যতীত অণু গতি নাই। তাঁহারা আত্মাকেও দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন ; সুতরাং হরিসেবাকেও একটী কৰ্ম্মবিশেষ জ্ঞান করেন। জড় কৰ্ম্মের সহিত হরিসেবার পার্থক্য এই যে, জড়-কৰ্ম্ম নশ্বর এবং কৰ্ত্তার উদ্দেশে ফল প্রসব করে, কিন্তু হরিসেবা নিত্য ও হরিপ্রেম আনয়ন করে। কৰ্ম্মের ফল—সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত,

হরিসেবনের ফল—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হরির নিত্য আনন্দ। হরির আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্মফল অনন্ত বাধাময় দুঃখরাহিত্য ধর্মবৃত্ত।

কর্ম দ্বিবিধ—সত্ত্বগুণে সংকর্ম ও রজস্তমোগুণে অসং-কর্ম

কর্মী দুই শ্রেণীর—কুকর্মী ও সংকর্মী। সত্ত্বগুণে জীব সংকর্মপর হ'ন, রজস্তমোগুণে তিনিই অসং বা কুকর্মপর হ'ন। সংকর্মপর দেহ ও মন দয়াবিশিষ্ট, অসং-কার্যতৎপর প্রবৃত্ত অহঙ্কারী জীব পরহিংসাপর। স্বীয় স্বার্থ-সাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ রজস্তমোগুণ দ্বারা নানা কদর্য কার্যে আমরা দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। তাদৃশ কুকার্য পোষণের জন্ত তাঁহাদের অসংখ্য যুক্তি অবতারণিত হয়, পরিশেষে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া কুকর্ম হইতে সংযত হন ও পুণ্যময় সাত্ত্বিক কর্মাদিগের দ্বারা লাঞ্চিত ও দণ্ডিত হন। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য-নিরত হন, তদবধি তাঁহার যথেষ্টাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেষ্টাচার প্রশমনের জন্ত সত্ত্বগুণের আবাহন কর্মবীরের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি রজস্তমোগুণকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্তে গোপনে তাদৃশ গুণদ্বয়ের সাবধানে সেবা করিয়া থাকেন। একরূপ ঘৃণিত কার্য সত্ত্বগুণের নামে প্রচলিত থাকিলেও উহা যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া নহে, তাহা জানিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই নিত্য-ধর্মের প্রতিযোগী

পূর্বোক্ত আলোচনাকালে আমরা জানিতে পারি যে, প্রবৃত্তি ও অহঙ্কার-বশে জীব সত্ত্বগুণ হইতে পরিত্রষ্ট হন, কিন্তু তিনি সর্বদা সত্ত্বগুণেই অধিষ্ঠিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই-দুইটাই সত্তার নিত্য-ধর্মের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহারা স্ব-স্ব নিত্য সংরক্ষণে অসমর্থ। অনিত্য গ্রহণ বা অনিত্য সত্তার বিলোপ-সাধন—উভয়ই নশ্বর ধর্মবিশিষ্ট। তাহাদের দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। রজস্তমঃ পরিহার করাই সংকর্মপর ব্যক্তির ধর্ম। যেখানে তাহার বিপত্তি ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা অনিত্য-গ্রহণ-প্রবৃত্তি, সেইখানেই অসং কুকর্মিগণের রজক্ষেত্র।

নিবৃত্তি-পথে ত্রিবিধ সম্যাস, যথা—কর্ম-সম্যাস, জ্ঞান-সম্যাস
ও ভক্তি-সম্যাস

কুকর্মবীরদিগের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্মের চতুর্থাশ্রমের উপযোগিতা সাই। চতুর্থাশ্রমী বলিতে গেলে নিবৃত্ত-

জীবনবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত—
কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। উভয়েই তাত্ত্বিকর্ম্ম, কেন-না—দেহ বা মনের
চাঞ্চল্যে উভয়েই বাস্তব নহেন। কর্ম্ম-সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া ফলভোগ হইতে
অদূরে বাস করেন, তাঁহার বাসনায় কর্ম্মের কোনপ্রকার অশান্তি নাই, স্তবরাং
শান্তিময় জীবনই তাঁহার লক্ষ্য। জ্ঞানী বলেন,—কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অবস্থা
নশ্বর-ধর্ম্মে আবদ্ধ, স্তবরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মাহুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। ভগবদ্-ভক্ত
বলেন,—ভেদ-জ্ঞানময় জ্ঞানী নির্ভিন্ন হইবার বাসনায় অশান্ত মাত্র। তাঁহার
বৃত্তিমাাত্রই তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করিতেছে। নিত্য-হরিসেবা-পরায়ণ-
তাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষ্য। তাদৃশ হরিসেবকেই ভক্ত বলে। তিনি
জড়ের সকল আশা-ভরসা ছাড়িয়াছেন, নির্ভেদ-ব্রহ্মাহুসন্ধানের ফলত্ব উপলব্ধি
করিয়াছেন, স্তবরাং বদ্ধাবস্থায় ভোগ বা বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উভয়েই
পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন ভক্তই প্রকৃত সম্যক ও নিঃসংশয়রূপে
বিষয় ত্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসীসকল কর্ম্মী বা বিষয়ীর চেষ্টালক্স জীব্যের মালিক,
তাহাদের অধীন নহেন

‘সন্ন্যাসী’ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যিনি বিষয়-সেবায় ক্লান্ত হইয়া তাহার
ফলত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্ত তাঁহার বিবেচনায় প্রচুর কার্য্য
করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের ফল-লাভ করিয়া যে
অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কুকর্ম্মী শিশুর গর্হণের বিষয় নহে। কোন কুকর্ম্মী
‘কর্ম্মবীর’ নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়
তত্ত্ববায়গণের শ্রমলভ্য ফলসকল অত্যাশ্রয়রূপে উপভোগ করিয়া থাকেন।
তাঁহাদিগকে তত্ত্ববায়গণের শ্রমসিদ্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করা কর্ম্মবীরগণের
কর্তব্য। কিন্তু সেই শিশু কুকর্ম্মবীর জানেন না যে, কর্ম্মালানে কর্ম্মক্লান্ত
মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ শ্রমসিদ্ধ ফল-স্বরূপে পেনসন্ পাইয়া থাকেন।
তাঁহাদের সঞ্চিত সমাজ-ক্রোড়ে রক্ষিত বিত্ত হইতে তত্ত্ববায়গণ অন্নজলাদি
প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্তই জীর্ণ-বাসসমূহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়
তত্ত্ববায়গণের কেবল সেবা হইয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমাজের স্বার্থে
চাপিয়া থাকেন না। যদি অপবাদকারী কুকর্ম্মী-সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জিত
বিত্ত উপার্জনকারীর কার্য্যে না লাগিয়া দুর্ভিক্ষ-সমাজে বাটওয়ারা হউক, এবং
উপার্জনকারী পুনরায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ববায়ের ‘টানা-প’ড়েন’

লইয়া ব্যস্ত হউন, তাহা হইলে নির্বুদ্ধিতার চরম সীমা আর কি হইতে পারে।

ত্যাগের দ্বারা সমাজের যে হিতসাধন হইয়া থাকে, তজ্জন্য

সমাজ ত্যাগীদিগের সেবা করিতে বাধ্য

নৈতিক-হিসাবে ধরিতে গেলেও ত্যাগী-সম্প্রদায়ের দ্বারা গোণভাবে সমাজ যে ফললাভ করেন, তাহার পরিমাণে তাঁহাদিগকে অন্ন-জীর্ণবাসাদি প্রদান করা সমাজের অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া সম্ভূত হইতে হইবে না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্। (গীঃ ৩।২৬)

দেহ ও মনের উদ্যম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন কৰ্ম্মবীর-সম্প্রদায়ের মূৰ্খতা অপনোদন করিবার জন্ত কোন চেষ্টাই করিও না।

কৰ্ম্মী-সঙ্ঘ ও মিশনের বহুমাননকারী-সকল খাজা বোকা

তত্ত্ববায়ের মোক্তারগণকে আমরা বলি, তাঁহারা তত্ত্ববায়-সম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতা-বিবৰ্দ্ধনের জন্ত স্বীয় নিষ্পণ্য কাম-চেষ্টায় যেন মত্ত না হন; সেই মোক্তারগণ চতুর্থাশ্রমের প্রতিকূলে যে খাজা বোকার যুক্তি লইয়া মূৰ্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান মনে করিবে না। যদি সভ্য-সমাজে কৰ্ম্মের প্রচণ্ডতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তিপথ পৃথিবীর চিত্রপট হইতে এতদিন মুছিয়া যাইত।

কৰ্ম্মবীরের কৰ্ম্মের নিষ্ফলতা

কৰ্ম্মবীরের প্রাপ্য-ফলই সন্ন্যাস, অর্থাৎ সৰ্বস্বত্যাগ। জড় ভগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, ‘মৃত্যু’ এবং ‘নিষ্ফল’ বলিয়া অবস্থাদ্বয়ের অধিষ্ঠান আছে, উহাই কি ত্যাগের বা সংত্বাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয়-ভোগের সঙ্কোচকেই ‘সংত্বাস’ বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না, যে বিষয়টী অমৃত নহে, তাহাকে ‘বিষ’ বলিয়া নির্বিষয়ী-সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন।

সমাজ ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য

নির্বিষয়ী বা সন্ন্যাসীকে বিষয়-যুক্ত বলিলেই সমাজ-সেবক বলা হয়। সমাজ-সেবক মাত্রেরই সমাজের ন্যূনাধিক ফল-লাভের যোগ্য। সুতরাং কুকৰ্ম্মবীরের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের জীর্ণ-বাস-বঞ্চিত করিবার প্রয়াস—নিজ যুক্তিদ্বারাই খণ্ডিত হইল, আর প্রকৃত ত্যাগীর আবর্তিত যন্ত্রিকা-ঘূর্ণনে বাধা

দেওয়া তত্ত্ববায়-মোক্তারগণের নির্বুদ্ধিতার চরম-নীমা। এইরূপ চিন্তাপ্রোত কোনও কৰ্ম্মবীরের বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া উচিত নহে। ইহা পাশব-বলের ক্রীড়া মাত্র। বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা পরিশ্রমের জন্ত শ্রমজীবির প্রাপ্য দিবার পদ্ধতি যে-কাল পর্য্যন্ত সভ্য মানব-সমাজে আদরে গৃহীত হইবে, তৎকালাবধি চতুর্থাশ্রমীর ব্যয়ভার-পীড়িত সমাজ তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

ভক্ত-সন্ন্যাসী সমাজের মঙ্গলকারী

বিরক্ত হরিপরায়ণগণ সমাজের কিরূপ মঙ্গলকারী, তাহা আসক্ত বিষয়ী তাঁহার সর্গীর্ণ বিচারেও বুঝিয়া লইতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসা করা বিরক্তের ধর্ম্ম নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতটি এবিষয়ে তাঁহাদিগের দুঃস্বপ্নভিত্তি দমনের ঔষধি-স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে।—

গোরা প'ছ না ভজিয়া মৈলু। প্রেম-রতন-ধনে হেলায় হারাইলু ॥
অধনে যতন করি' ধন ত্যাগ কৈলু। আপন করম-দোষে আপনি ডুবিলু ॥
সংসঙ্গ ছাড়ি' কৈলু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগল মোর কৰ্ম্মবন্ধ-কাঁস ॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইলু। গোঁর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈলু ॥ -
কেনবা আছয় প্রাণ কি-সুখ লাগিয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি

নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি দশনামাপরাধের অন্ততম

জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থায় শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। সংসারী বদ্ধজীবগণ যখন জীব-গতি বিচার করিতে সমর্থ হন, তখন স্মৃতরাং হরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। অপরাধ-শূন্য হইয়া 'নাম' না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় ঘটে না। দশটি নামাপরাধ মধ্যে 'নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি'ও একটি বৃহদপরাধ। স্মৃতরাং নামাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তির পক্ষে এই অপরাধটি বহু যত্নে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

পাপ কাহাকে বলে?

'পাপ' কাহাকে বলে? সংসারী জীবের পক্ষে যে-সকল অন্তঃ কৰ্ম্ম বেদে

নিষিদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছে, সেইসকল কর্মকে ‘পাপ’ বলা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ-শিষ্যায় শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিকে নিষিদ্ধাচার-রূপ-দোষ পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র পাপকে বিকর্ষ্য বলিয়া কোন কোন স্থলে উক্তি করিয়াছেন। পাপকে অনেকস্থলে পাতক বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

পাতক ত্রিবিধ, যথা—মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক

সংসারী জীবের স্বধর্ম হইতে যে কর্ম মানবকে নিপাতিত করিয়া নিরয়গামী করে, তাহাই পাতক। পাতকসমূহ গুরু-লঘু-বিচারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক এই তিন শ্রেণী। মনু মহাপাতককে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং শ্বেদ্যং গুরুজনাগমঃ ।

মহাস্তি পাতকান্নাহঃ সংসর্গচাপি তৈঃ সহ ॥ (মনু-সংহিতা ১১।৫৫)

—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য, গুরুপত্নী-গমন—এই চারিটি মহাপাতক। মহাপাতকীয় সহিত সংসর্গ করাও একটা মহাপাতক।

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামী চ পৈশুনঃ ।

গুরোশ্চালীকনির্ভঙ্কঃ সমানি ব্রহ্মহত্যায়া ॥ (মনু-সংহিতা ১১।৫৬)

—পরের অপকর্ষমূলক স্বীয় উৎকর্ষসাধক মিথ্যা-ভাষণ, অপকার উদ্দেশে রাজদ্বারে পরের নিন্দা, গুরু সম্বন্ধে সরল ব্যবহার পরিত্যাগ—এইগুলি ব্রহ্মহত্যার সদৃশ মহাপাতক। অতএব এই প্রকার পাতকসকল অনুপাতক।

মনুর মতে গোবধ, পরদারগমন, পরপীড়ন, গুরু, পিতা ও মাতার অবহেলন প্রভৃতি পাতকসকল উপপাতক। যে-সকল পাপের জন্ত সমাজচ্যুতি ও রাজদণ্ড বিধান আছে, সে-সমুদায় পাপই উপপাতক।

বেদের নিষিদ্ধই পাপ এবং বিধিই পুণ্য ; ভক্ত

পাপ-পুণ্যের অতীত

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে পাতকসকলকে পৃথক পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। মূল কথা এই যে, যাহাতে পুণ্যময় স্বধর্মের হানি হয়, সে-সমুদায়ই পাপ। নাস্তিক্য, পরের অপকার ও স্বীয় মনুষ্যতা-হানিজনক সকল ক্রিয়াই পাপ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদ যাহাকে ‘নিষেধ’ বলিয়া বলিয়াছেন, তাহাই পাপ। সংসারী বহির্মুখ জীবের পক্ষে পাপ-নিষেধক প্রায়শ্চিত্তও পৃথক পৃথক। ইষ্টাপূর্ত-ব্রত-যাগাদিরূপ পুণ্য কর্মের বিধান দেখা যায়। পুণ্যজনক কাম্যমুষ্ঠানই বিধি।

জীব যখন বহিস্মুখতা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন তিনি সহজেই পুণ্য-পাপের অতীত। কেননা, তখন তাঁহার সংসারী ব্যক্তির ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। তখন একমাত্র কৃষ্ণদাত্তই নিত্য স্বধর্মরূপে উদিত হয়।

কৃষ্ণোন্মুখ-জনের প্রায়শ্চিত্ত-কর্মের আবশ্যক নাই

সংসারী বহিস্মুখ জীবের পক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম কর্মকাণ্ডাস্তর্গত। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির কর্মস্বাধিকার থাকে না। শ্রীভাগবতে—

তাৎ কৰ্ম্মাণি কুর্বাণীত ন নির্বিঘ্নেত যাবতা।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-পর্যন্ত জীবের পুত্রৈষণা, বিভৈষণা ও লোকৈষণা-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইয়া নির্বেদ না জন্মে অথবা হরিকথা-শ্রবণাদিতে নিক্রপাধিক শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্যন্ত জীব অবশ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না।

হরিভক্তির “অনুকূল-ক্রিয়া গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জন” কর্ম্ম নহে

দেহযাত্রাদি নির্বাহের জন্ত শরীর, মানস, দৈহিক ও সামাজিক ক্রিয়াসকল হরিভক্তির অনুকূল হইলে অঙ্গীকার এবং প্রতিকূল হইলে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়া-সকলের অঙ্গীকার-পূর্বক অনুষ্ঠান করিলেও ঐ সকল ক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ড-লক্ষণ কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ তাহারা কর্ম্ম-নাশক ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং ঐ অবস্থায় পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না এবং প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজনতা নাই। লোকোদ্দেশে বা প্রতিষ্ঠোদ্দেশে কোন কর্ম্ম তখন কৃত হয় না, কেবল নিষ্পাপে জীবন-যাত্রা নির্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কৃত হয়। সুতরাং যখন পুণ্যকর্ম্মই নাই, তখন অধম পাপকার্য্য কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে না।

কর্ম্মীর আয়াস-লব্ধ সদ্গুণগুলি ভক্তের স্বভাবে স্বতঃই বর্তমান

“কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়ো নৃপ।”

হে নৃপ, কর্ম্মকাণ্ডী লোকেরা বহু যত্ন করিয়া যে যম-নিয়মাদির অভ্যাস করে এবং শৌচবিধি পালন করে, সে যম-নিয়মাদি সদ্গুণ ও সদ্ভাচার এবং শৌচ স্বয়ং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিকে যত্ন করিয়া তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয় না। আবার ননি

এতে ন হৃদুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।

হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা য়ে ন তে জ্ঞাঃ পরতাপিনঃ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

হে ব্যাধ, তুমি পূর্বে যখন বহিস্মুখ সংসারী ছিলে, তখন তোমার হিংসা-প্রবৃত্তি নৈসর্গিকরূপে তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। এখন তুমি হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। স্মৃতরাং জীব-হিংসাদি পাপ-প্রবৃত্তি আর তোমার থাকিতে পারে না। জীবের স্বভাব যে কৃষ্ণদাস্ত, তাহা তোমার নিত্য স্বধর্ম। সেই স্বধর্ম যে পরিমাণে উদিত হইতেছে, তোমার নৈমিত্তিক স্বধর্মরূপ পুণ্য-প্রবৃত্তি সেই পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে। এখন তোমার নিত্য স্বধর্মদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তুমি যাহা যাহা করিবে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক স্বধর্ম-বৃত্তিরূপ পুণ্য হইতে অতি উচ্চ মহা-পুণ্যরূপ বৈষ্ণব-সংসার করিতে থাকিবে, স্মৃতরাং তোমার সামান্ত পুণ্যই যখন তুচ্ছ হইল, তখন অতি হেয়রূপ জীব-হিংসাদি পাপ কখনই তোমার প্রবৃত্তিগত হইতে পারে না। তুমি যে নিষ্পাপ জীবনে কৃষ্ণনাম করিতেছ, ইহা আশ্চর্য্য নয়। একরূপ সকলেরই হইয়া থাকে।

কাম-ক্রোধাদির সদ্যবহার ও অসদ্যবহার

এখন দেখুন, হরিনামাশ্রিত জীবের পাপপ্রবৃত্তি থাকে না। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি চিত্ত-প্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই ‘পাপ’ হয়। কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-সেবামূলক বৈষ্ণব-সংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া আর পরস্মী-সংগ্রহ, প্রয়োজনান্বিত অর্থ-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা-তৎপরতা, বঞ্চনা, চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম করেন না। কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-বিদেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহিস্মুখ সংসার দূর করেন, স্মৃতরাং পর-পীড়ন ও নির্ধ্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন। ক্রোধ স্নেহ-স্থলে তরুধর্মের আয় সহিষ্ণুতারূপে পরিণত হয়। কৃষ্ণ-রসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া-পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপধ্যাপ্ত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রতি দৃকপাত করেন না। চিত্তসে মোহকে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলা-সৌন্দর্য্য এবং বৈষ্ণব-চরিত্রে মোহিত হন। ধন-জন ও জড়সুখাদিতে মোহ প্রাপ্ত হন না। অসং সিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না। কৃষ্ণদাস্তাভিமான মদকে নিযুক্ত করিয়া জ্ঞাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিজ্ঞানমদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। মাৎসর্য্যকে অর্থাৎ পরহিংসাদ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন একেবারে ত্যাগ করেন।

এইরূপ নিয়মিত-জীবনে পাপের উদয় হয় না। পাপ-প্রবৃত্তি নিম্ন লিত হয়।

ভগবন্তক্তের দৈবাৎ পাপকর্ম নিন্দনীয় নহে ; কারণ তাঁহার কখনও বিনাশ নাই

তবে কখন কাহার ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটয়া উঠিতে পারে, তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তে প্রশমিত হয়। সেরূপ দৈবাৎ আগত পাপ দৃষ্টি করিয়া কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। চিন্তে পাপ-প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমে কোন সামান্য পাপ উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণবতা দূর হয় না। এইজন্ত জগদ্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

অপি চেৎ সূহৃদাচারো ভজতে মামনন্ত্যভাকু ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ ॥ (গীঃ ৯৩০)

হে অর্জুন, আমার অনন্ত-ভক্তের কখন পাপ-প্রবৃত্তি হয় না। নামানুশীলন-রূপ একটি চিহ্ন্যপার আমার অনন্ত-ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক থাকে। জড়গত পাপ তাহার ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যদি কোন ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় এবং সে পাপ যদিও ধর্মশাস্ত্রমতে সূহৃদাচার বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি আমার অনন্তভক্তের নিন্দা করিবে না। কেন না—

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ণতি ॥ (গীঃ ৯৩১)

[হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্তভক্তি-পথাক্রম জীব কখনই নষ্ট হইবেন না। প্রথম-অবস্থায় ‘নিসর্গ’ ও ‘ঘটনা’বশতঃ তাহার অধর্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তি দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ স্বরূপগত-আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরমা শান্তি লাভ করিবেন।]

অনন্ত-ভক্তের পূর্বাচারিত ক্ষয়োন্মুখ পাপ একপ্রকার

হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্ত-ভক্তি লাভ করিতেছে, তাহার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামে রুচি হইল। কিন্তু তৎপূর্ব হইতে তাঁহার কোন একটি পাপ-সংসর্গ ছিল। অবৈধ জ্রীসঙ্গ, মৎস্ত-মাংসাহার, আসবসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি চিরনিবন্ধ পাপ ছিল। অনন্তভক্তি উদয় হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই অল্প সব পাপ-প্রবৃত্তি গেল, কিন্তু ঐ চিরনিবন্ধ পাপটি যাইতে যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্তভক্তি

হইয়াছে অর্থাৎ অগোপায়-সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না; কিছুদিন থাকে। যে-কাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত সেই অনন্তভক্তকে তন্নিবন্ধন অবজ্ঞা করিবে না।

অনন্ত-ভক্তে আকস্মিক অপ্রবৃত্তিগত পাপ দ্বিতীয়প্রকার

দ্বিতীয়প্রকার এই যে, অনন্তভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহ-সত্ত্বে কখন কোন গতিকে রোগীর অমেধ্য-সংযুক্ত ঔষধ-সেবনের দ্বারা কোন পাপক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অত্যন্ত অস্বাভাবিক, কেননা, প্রবৃত্তিগত নয়। সুতরাং এই দুইপ্রকার পাপ হইতে আমার অনন্তভক্ত অতি শীঘ্রই আমার ভক্তি-রূপায় শুদ্ধ ধর্ম্মান্বিত হইয়া পাপ হইতে শাস্তি লাভ করেন। হে কোস্তেয়! এই একটি আমার প্রতিজ্ঞা যে, আমার অনন্ত-ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না।

ভগবদ্ভক্তের পাপ ক্ষণস্থায়ী, ও তদ্বিনাশের জন্ত

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশ

এখন দেখুন, অনন্তভক্তি হইলে আর পাপপ্রবৃত্তি কখনই থাকে না, কেবল পাপক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে থাকিতে পারে। তাহাও অল্পদিন। আবার তাহাও দিন-দিন হীনবল হইয়া থর্ব্ব হয়। জগাই-মাধাই-চরিতে দেখা যাইবে যে, ভক্তিনাভের পর আর সেই দুইটী ব্যক্তির পাপপ্রবৃত্তি মাত্রই ছিল না। অপার করুণাময় মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নামাশ্রয় দিয়া কহিলেন,—

প্রভু বলে, “তোরা আর না করিস্ পাপ।”

জগাই-মাধাই বলে, “আর নাহে বাপ ॥” (৫: তা: ম: ১৩।২২৫)

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু জগজ্জীবের প্রতি রূপা করিয়া সকলকে ধর্ম্মচরিত্রে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। দক্ষ্য ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়া কহিলেন,—

শুন বিজ্ঞ, যতেক পাতক কৈলি তুই ।

আর যদি না করিস্ সব নিম্ন মুঞি ॥

পরহিংসা, ডাকা, চুরি সব অনাচার ।

ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ॥

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম ।

তবে তুমি অণ্ডেরে করিবা পরিজ্ঞান ॥

যত সব দস্যু-চোর ডাকিয়া আনিয়া ।

ধর্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥ (চৈ: ভা: অ: ৫।৬৮৫-৬৮৮)

পরম কারুণিক প্রভু নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ ধর্মাবতার ; সেই ধর্মমুষ্টি এই কথা উপদেশ করিলেন যে, যখন তুমি ধর্মপক্ষে থাকিয়া হরিনাম লইবে, তখনই তুমি বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়া লোকের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে ।

আচার্য্যের সদাচার প্রধান লক্ষণ

যাহারা আচার্য্যপদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক অত্র জীবগণকে স্বীয় সচরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন । আচার্য্যপুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন । অত্র জীব-হিংসা, ডাকাতি, চুরি, অবৈধ জমী-সম্ভাষণ, অমেধ্য-ভক্ষণ, আসব-পান প্রভৃতি সমস্ত দুর্দাচার পরিত্যাগ করিবেন । নিজের লম্পট হইলে শিষ্যকে কিরূপে ধর্ম শিক্ষা দিবেন ? সকল আচার্য্যদিগের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত হইলেও কখনই নিজ চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই । এমত নির্মলচরিত্র প্রভুকে যাহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে দিক ।

অসদাচারী শৃগাল-বাসুদেবের নিজদোষাচ্ছাদন-জন্ত

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-জিন্দনের গহর্গ

অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন । হা কলি ! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে ! অণ্ডে গুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাদি বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্মমুষ্টি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎ-সঙ্গ দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নবরসিক মধ্যে গণন করেন । নির্মলচরিত্র শ্রীকৃপ-গোস্বামী ও রামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা জমী-সম্ভাষণ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন । এই সমস্তই দুষ্ট কলির কার্য্য । মূল কথা এই যে, কাপট্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না । ধর্ম্মের ছলে পাপাচরণ করিয়া জগৎ-বঞ্চক হইয়া পড়ে ।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বগুণের আশ্রয়

যিনি অকপটে হরিনাম আশ্রয় করিবেন, তিনি সমস্ত পাপপ্রবৃত্তিশূন্য হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? প্রহ্লাদ কহিয়াছেন—

“যন্তাপ্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈশ্চ গৈন্তজ সমাসতে স্থরাঃ ।”

যাহার শ্রীকৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার শরীরে সমস্ত দেবতা,

সমস্ত মহদগুণের সহিত নিয়ত বাস করেন। ভগবদ্ভক্তি-উদয় এবং পাপপ্রবৃত্তি-নাশ যুগপৎ ঘটয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু দ্বিজকে সর্বাপরাধ-বিমুক্ত হইয়া হরিনাম লইতে উপদেশ দিলেন।

নিরপরাধে নাম-গ্রহণের উপদেশ

শ্রীমদ্ব্যাহারপ্রভুও বলিয়াছেন—

“নিরাপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।”

অতরাং অপরাধের সহিত লইলে নাম হয় না—নামাপরাধ হয়। অবশেষে নামাপরাধে নিতান্ত অধঃপতন হইয়া পড়ে। নামাভাস করিলেও পরে সাধু-সঙ্গে নামাভাসই ঘুচিয়া নামের উদয় হইতে পারে। ততদূর না হইলেও নামাভাসে পাপ নষ্ট হয় এবং চারিপুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু নামাপরাধ বড়ই কঠিন বস্তু। ইহাতে স্তম্ভল উদয় হওয়া বড়ই দুর্ঘট। নামাভাসী ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করিয়া শুদ্ধ নাম লাভ করুন। নামাপরাধী অপরাধ পরিত্যাগপূর্বক সাধুপদ আশ্রয় করত শুদ্ধনামের অন্বেষণ করুন।

পাপাসক্তের শ্রীনামে আসক্তি নাই ; কপটতা বৈষ্ণবতা নহে

কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি কোন স্কন্ধতিবলে নামাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার দেখা উচিত যে, নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি না হয়। আমরা পূর্বেরই দেখাইয়াছি যে, নামাশ্রয় করিয়াও পূর্ব পাপ-সম্বন্ধের অবশেষ কিছু কিয়দ্দিন থাকিতে পারে এবং ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার পাপপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। পাপপ্রবৃত্তি ও পাপাসক্তি একই কথা। যদি কৃষ্ণনামে রুচি হয়, তবে সেই রুচি ক্রমশঃ নির্মল হইয়া কৃষ্ণনামে আসক্তি হয়। যদি অন্য বিষয়ে বা পাপকার্যে আসক্তি থাকে, তবে তাঁহার নামে আসক্তি হইতে পারে না। আসক্তি একটি অনন্ত প্রবৃত্তিবিশেষ। তাহা হয় কৃষ্ণে হইবে, নয় অসৎ-বিষয়ে হইবে। কৃষ্ণে যাহার নিষ্কপট শ্রদ্ধা, তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে অনন্তরূপে অবশ্য হইবে। তখন অন্য কোন পুণ্য বা পাপবিষয়ে সে প্রবৃত্তি হইবে না। অনন্তরূপ বিশেষণ-দ্বারা অত্মাসক্তি দূরীকৃত হইয়াছে। অতরাং যাহার পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্তশ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ দেখান, তথাপি তাঁহার অনন্ত-নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি স্বীকার করা যাইবে না। যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুলকাক্ষপাত করিয়াও কপট বৈষ্ণব মধ্যে গণিত হইবেন। কেননা, তিনি নামাপরাধী। নামাপরাধী কখনই

শুদ্ধ-বৈষ্ণব নয়। এইজন্ত শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে “শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়”—এই বাক্যদ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।

নামবলে পাপবুদ্ধির প্রকৃত লক্ষণ

সেই বৈষ্ণব-প্রায় ব্যক্তিগণ বলেন যে, এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরণ করে, কোটি জন্মেও পাপী তত পাপ করিতে পারে না। স্বতরাং যখন আমার নিকট সেই হরিনাম আছে, তখন আর পাপ করিতে ভয় কি? হরিনামও করি, পাপও করি। জমাখরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্বক নূতন পাপ করেন, তাঁহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়।

নামবলে পাপবুদ্ধির প্রথম উদাহরণ

ইহার উদাহরণ এই যে, জীবহিংসা পরিত্যাগপূর্বক কোন গৃহস্থ নামাশ্রয় করিলেন। পরে একদিন কোন কুসঙ্গে ভাল মৎস্ত বা মাংস খাইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্ত এই স্থির করিলেন যে, অগ্নি আমি আর দশসহস্র নাম করিয়া মৎস্ত-ভোজন-পাপ দূর করিব। এইরূপ মনে করিয়া যিনি মৎস্ত-ভোজন করিয়া নাম করেন, তিনি নামাপরাধী।

নামবলে পাপবুদ্ধির দ্বিতীয় উদাহরণ

অন্য উদাহরণ এই যে, কোন ভিক্ষুশ্রমগত বৈষ্ণবপুরুষ কোন সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিলেন। অবশেষে পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া এই স্থির করিলেন যে, “যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম-শিষ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে-কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে। বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইল। বৈষ্ণব-সঙ্গ দুর্লভ। আবার উহার সঙ্গে গোপীভাব অনেক শিক্ষা হইবে। এইরূপ দুর্লভ সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায়।”—এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণবসেবা গ্রহণ করিলেন। এস্থলে নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল। এই দুইটি উদাহরণ বিচার করিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ ও ভেকধারিগণ নামাপরাধ হইতে সতর্ক হইবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা

ওরে দুঃখ মন ! না কৈলি কখন,

শ্রীহরি-ভজন কামনা ।

আসিলি মরতে, হইবে মরিতে,

এখনও কেন ভাব না ॥

ভজিবার তরে, এ বিশ্ব মাঝারে,

এসেছিলে ক'রে প্রার্থনা ।

কৃষ্ণ বিস্ময়িয়া, মায়াকে বরিয়া,

কত দুঃখ পেলে বল না ??

‘কৃষ্ণ-দাস’ আমি, নাহি জান তুমি,

‘আমি’ ‘আমার’ (সদা) জলপনা ।

জগন্নাথ ‘স্বামী’, তাহা ভুলি’ তুমি,

(নিজেকে) ‘অনাথ’ করিছ কল্পনা ॥

মোর কেহ নাই— তাবিছ সদাই,

শ্রীহরি-চরণ চিন্ত না ?

ত্রিতাপ-নাশন, (ভব) বন্ধ-বিমোচন,

অমৃত অভয় জান না ??

সর্বদেব-ঈশ, মহা-পরমেশ,

(তঁার) রাতুল চরণ স্মর না ?

অগতির গতি, শ্রীধর, শ্রীপতি,

তঁার দয়া কর প্রার্থনা ॥

দীননাথ হরি, গোলোক-বিসারী,

নর-বধু করি’ ধারণা ।

ত্যাগি’ গোলোক, প্রকটি’ ভুলোক,

করি’ অপরূপ ভারনা ॥

দ্বাপরেতে শ্যাম, ত্রেতাতে শ্রীরাম,
 কে জানে তাঁহার গণনা ।
 কশ্যপ-নন্দন, শ্রীবামন হ'ন,
 বটু-রূপ করি' কল্পনা ॥
 বলি পরীক্ষিতে, বলির সভাতে,
 ত্রিপাদ-ভূমি কৈল যাচ'ঞা ।
 বলিরাজ-দান— আত্ম-নিবেদন,
 সাধু-শাস্ত্রে আছে ঘোষণা ॥
 তাঁহার আদেশে, বলি-শিরদেশে,
 ওপদ করিল স্থাপনা ।
 ওদয়া তাঁহার, বর্ণে শক্তি কা'র,
 অসীম তাঁহারে ভাব না ॥
 মোর দুষ্কৃত মন ! এসব স্মরণ,
 কেন একক্ষণ কর না ?
 দুঃখ রাখি কোথা, দিন গেল যুগা,
 হরি-স্মৃতি 'তিল' হ'ল না ॥
 প্রতি যুগে তাঁর, যুগ-অবতার,
 করি' বহুরূপ ধারণা ।
 মৎস্য, কূর্ম্ম আর, বরাহাবতার,
 নৃসিংহাদি রূপ গণনা ॥
 পরশু মুরতি, নিষ্কত্রিয় ক্ষিতি,
 কতবার হ'ল বল না ?
 হ'য়ে নরহরি, হিরণ্যে সংহারি,
 প্রহ্লাদে অপার করুণা ॥
 শক্ত্যাবেশ আর, অংশাবতার,
 অগণিত নাহি বর্ণনা ।

সাধু-রক্ষা তরে দুষ্কৃতি সংহারে,
আত্ম-ধর্ম্য করে স্থাপনা ॥

বিষ্ণু ভগবান্ ‘অবতারী’ ন’ন,
ভাগবতে আছে লেখনা ।

‘অবতারী’ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র হ’ন,
নাহিক তাঁহার তুলনা ॥

তাঁহার দয়ার সীমা নাহি আর,
সাক্ষী তাহার পুতনা ।

বিষপান-হলে, ধাত্রী-গতি দিলে,
এহেন দয়ালে চিন্ত না ??

ভজ মন একান্ত, ব্রজে রাধাকান্ত,
অশ্রুভিলাষ হ’য়ে শূন্য ।

ব্রজ-রামাগণ, ভক্তি-পরায়ণ,
জয় জয় ব্রজ-অঙ্গনা ॥

প্রেমভক্তি যত, তোদের সম্পদ
এ দীনে করহে করুণা ।

(তব) পদাশ্রয় পেলে, (সর্বব) সিদ্ধি করতলে,
না লাগে ভজন-সাধনা ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
সাং বানারিপাড়, (বরিশাল)

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অত্যান্ত দেবতাগণের পূজার কোন প্রয়োজন নাই । বিশেষতঃ কলিযুগে ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ বা পূজার কোন সম্ভাবনাই নাই । অধুনা একপ্রকার ‘সার্বজনীন’ পূজার

বাহাড়ঘর দেখা যায়। এইসকল পূজার আয়োজনে শাস্ত্রসম্মত কোন বিধিরই পালন হয় না, কেবলমাত্র তামাসা-পরিপূর্ণ কতকগুলি আমোদ-প্রমোদের তামসিক নৃত্য দেখা যায়। বাৎসরিক আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্তই এইগুলি অল্পমিত হয়, কিন্তু এইসমস্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে কোনপ্রকার ভূরি-ভোজনেরও ব্যবস্থা থাকে না। মস্ত্রহীন, বিধিহীন, দক্ষিণাহীন, অন্নহীন এইপ্রকার তামসিক নাট্যের মূলে অর্থহীনতাই একমাত্র কারণ। কলিযুগে সাধারণের দারিদ্র্য-নিবন্ধন সমস্ত পূজাই বিধিহীন হইতে বাধ্য। সেইজন্ত স্তম্বেধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণ-যজ্ঞ দ্বারা অকৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের বা শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অথবা শ্রীকৃষ্ণের অর্চন আদৌ ব্যয়সাপেক্ষ নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চন শ্রীকৃষ্ণ-অর্চন অপেক্ষা আরও হ্রদিধাজনক। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অর্চন সম্বন্ধে পত্র-পুষ্প-ফল-জল সংগ্রহ করিতে যে সামান্য পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চনায় তাহাও আবশ্যক হয় না। উভয়েরই অর্চন সকলসময়ে, সকল-অবস্থায়, সকলদেশে এবং মুখ, জ্ঞানী, পাপী, পুণ্যবান, উচ্চ, নীচ, ধনী-নিধন-নির্বির্শেষে সকলের দ্বারাই সর্বদাই সম্ভবপর হইতে পারে। সেইজন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিলেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্বামি প্রযতাম্বনঃ ॥ (গীঃ ৯।২৬)

যত্নশীল ভক্তগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল—এই চারিটি বস্তুমাত্র ভক্তির সহিত প্রদান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। এবং যেহেতু তিনি পরতত্ত্ব পরমেশ্বর, তজ্জন্ত “সর্বাহর্গমচ্যুতেজ্য” বিচারে অর্চন হইলেই সকলের অর্চন হইয়া যায়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলেই তৎসম্বন্ধে শাখা-প্রশাখা-পত্রাদি সকল স্থানেই জল সিঞ্চিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের অর্চন হইলেই দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি সকলেরই পূজা-অর্চন সম্পাদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণাৰ্চন-কার্য্যে কোন প্রকার ব্যয়-বাহুল্যেরই কথা নাই এবং দেশ-কাল-পাত্রাদির কোন প্রকার বিঘ্নও নাই। গঙ্গাস্নান করিবার যেমন সকলের অধিকার, সেই ভগবানের সেবাকার্য্যে সকলেরই অধিকার আছে। আবার তাঁহার পূজা-পদ্ধতি এতই সরল যে, জগতের যে-কোন স্থানে যে-কোন ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। জগতের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে পত্র-পুষ্প-ফল-জল—এই চারিটি বস্তু অপ্রাপ্য। আবার জগতের বিচারে যিনি সর্বাপেক্ষা নিধন, তিনিও এই চারিটি বস্তু বিনা-ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারেন।

অধিকন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'অজ্ঞ' হইয়াও সর্বমূর্তি-বিশিষ্ট, সকল জীবেরই পরম পিতা বলিয়া ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্রাধম চণ্ডাল, কিরাত-হুণ-অন্ধু-পুলিন্দ-পুষ্কশাদি যতপ্রকার উচ্চ-নীচ যোনিসম্মত জীব আছেন, তাঁহারা সকলেই একযোগে কেবলমাত্র পত্র-পুষ্প-ফল-জল সংগ্রহপূর্বক শুদ্ধভক্তির সহিত সেই সর্বকারণকারণ আদি-পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিয়া তাঁহার নিত্যধামে গমন করিতে পারেন। এমন সুখ-সুবিধা ছাড়িয়া যাহারা মায়া-মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া, অন্তবৎ বস্তুর ফলাকাজ্জনা করিয়া অল্প দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বোকা লোক আর কে থাকিতে পারে? অধিকন্তু, আজকাল সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া যে একজাতি, একধর্ম, একশাস্ত্র এবং সকল-বিষয়েই ঐক্য-স্থাপনের যে একটা মহতী চেষ্টা চলিতেছে, তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-অর্চনে বা ভজনে সম্ভবপর হয়। এই কথা কোন কাল্পনিক প্রহসন নহে, পরন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু, উপস্থিত যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তিনি যদি অবিলম্বেই বিধিমত পত্র-পুষ্প-ফল-জল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চনা আরম্ভ করেন তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কি-ভাবে সেই পরমতত্ত্ব ভগবান্ ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্তী হইতেছেন। আমরা আমাদের সমস্ত সহস্রদ্বয় পাঠকবর্গকে বিনা-ব্যায়ে, বিনা-আয়াসে এবং বিনা-জ্ঞানে ও বিনা-জ্ঞাতিবিচারে—পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছিবার এই প্রকৃষ্ট উপায় সাধন করিবার জন্ত অবিলম্বেই সাহসনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

অত্যাগত দেবতাগণের উপাসকের মধ্যে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সেবকের মধ্যে বহুল পার্থক্য বর্তমান। সাময়িক কামনার বশবর্তী হইয়াই সাধারণতঃ লোকে অত্যাগত দেবতাগণের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের প্রতি নিত্য-প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পত্র-পুষ্প-ফল-জল যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা ভক্তির সহিত অর্পণ করেন বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই আদরে গ্রহণ করেন। সেইপ্রকার, ভগবৎপ্রীতির মধ্যে কোনপ্রকার কামনা থাকিতে পারে না। অল্প দেবতার উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তত্তৎ দেবতার প্রতি প্রেমভক্তি থাকিতে পারে না; সেখানে কামনাই প্রধান। সেই-প্রকার বহুবীজবাদের প্রদত্ত ষোড়শোপচার নৈবেদ্যও ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কারণ সেখানে প্রেম বা প্রীতি নাই। তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু বলিয়া সেই-সকল অল্পমেধা উপাসক-সম্প্রদায়ের অনিত্য নখর কামনাগুলি পরিপূরণ করিয়া থাকেন। প্রেমভক্তি-বিবর্জিত কোন দ্রব্যই শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। যেমন

ক্ষুধার উদ্রেক না থাকিলে উত্তম উত্তম ভোজ্যদ্রব্যও গ্রহণীয় হয় না, তদ্রূপ প্রেমভক্তি-বিবর্জিত বহুদ্রব্য-সম্ভার ভগবৎসেবার উপযোগী নহে। পূর্বে যে আমরা অবিধিপূর্বক কৃষ্ণসেবার কথা আলোচনা করিয়াছি, তাহার মূল কারণই এই ভক্তি-হীনতা। ‘ভক্তি’-অর্থে—ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, আর ‘কামনা’ অর্থে—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মানসে যাহারা ভগবৎসেবার ছলনা করেন, তাঁহারা কখনই ভক্ত হইতে পারেন না। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে ‘বণিক্’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তিই যখন ভগবানকে পাইবার মূলবস্তু, তখন আমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই (পত্র, পুষ্প, ফল, জল-পর্য্যায়) যদি ভগবানকে প্রদান করি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপশ্চা-স্বাধ্যায় ইত্যাদি সাধনার সিদ্ধি-স্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া যায়। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে সকলকেই উপদেশ দিলেন—হে মনুষ্যজাতি, তোমরা যে যেখানে যেমন ভাবেই অবস্থান কর না কেন, তোমাদের সংগৃহীত সমস্ত বস্তু আমাকেই প্রদান কর। সেই-প্রকার বৃত্তির দ্বারা তোমাদের সাধারণ কর্ম্ম, সাধারণ ভোজন, সাধারণ দান, সাধারণ তপশ্চা সমস্তই ভগবৎ-প্রাপ্তিরই কারণ হইবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপশ্চসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ (গী: ৯।২৭)

মনুষ্যজাতির কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পুণ্য, স্ত্রী-পুত্র, দেহ-গেহ, ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম্ম, জ্ঞান এমন কি পানীয়-আহারাদি যাহা কিছু আছে—যাহার দ্বারা তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র-নির্কিংশেষে দেহযাত্রা নির্বাহের জন্ত নানাপ্রকার কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, ভোজন করিয়া থাকেন, হোম-অর্চনাদি করিয়া থাকেন, দান করিয়া থাকেন, তপশ্চা করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই যদি “কাম—কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদেহবিজনে”—এই বিচারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তির সহিত অর্পণ করে, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই বস্তু যথাযথ গ্রহণপূর্বক তাহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন এবং পরমশান্তিময় নিত্যানন্দ-স্বরূপ তাঁহার পরমধামে লইয়া যান।

দেবতাগণের মধ্যে কেহ বা একপ্রকার পূজা লইতে পারেন, কেহ বা অগ্ন্যুৎসবের পূজা গ্রহণে সমর্থ। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের কর্ম্মফল গ্রহণ করিতে পারেন। বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন সকলের কর্ম্মফল গ্রহণ করিবার যোগ্যতা একমাত্র ভগবানেরই আছে। ভগবানের ভগবত্তা সেইখানে বর্ত্তমান।

মনুষ্যজাতির মধ্যে সকলেই যে শুদ্ধ-ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা আমরা কুত্ৰাপি করি না। সকলপ্রকার বিপর্যয় অবস্থাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিবার যোগ্যতা সর্বদাই সকলের বর্তমান আছে। সুতরাং যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে, তাহাই অর্চনামার্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই প্রদান করা একমাত্র বিধি।

নিষ্কাম কর্মযোগে যে-সকল কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় আলোচনা হইয়াছে, সে-সমস্তই প্রায় শাস্ত্রোক্ত কর্মপ্রধান। কিন্তু উপস্থিত আমরা বুঝিতে পারি—লৌকিক বা বৈদিক সকল কর্মই, পণ্ডিতগণ যাহাকে ‘অত্যাভিলাষিতাশূচ্য’ বলেন তাহাও, বা সকল কর্মের ফলই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা যাইতে পারিবে। শরীর দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যদ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা বা নিজ-নিজ স্বভাব-মূলত সকল কর্মদ্বারা যাহাই কৃত হউক না কেন, সমস্তই যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হয়, তিনি দয়া করিয়া সমস্তই গ্রহণ করেন। এইস্থানে একটা বিষয় আমরা ভুল না করি। কর্মজড় স্মার্তগণ সমস্ত কর্ম করিবার পর নারায়ণকে যেরূপ কর্মফল অর্পণ করেন, সেই-প্রকার অর্পণ করিবার কথা এখানে হয় নাই; কারণ সেইরূপ অর্পণ-কাধ্যে কামনা ব্যতীত কোন প্রীতি বা ভক্তি নাই। কিন্তু পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ভক্তি বা কৃষ্ণোদ্ভিগ্ন-তৃপ্তিই একমাত্র মূল কথা। সুতরাং যাহা কিছু করা যায়, ভোজন করা যায়, সমস্তই ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত হওয়াই প্রকৃত ভগবদর্পিত কার্য্য বুঝিতে হইবে। ‘আমি ভোজন করিব’—এই উদ্দেশ্যে পরিশ্রম না করিয়া, ভগবানের ভোজন হইবে বা ভগবানকে খাওয়াইতে হইবে এবং সেই-জন্তই সমস্ত প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিব, তজ্জন্তই ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে, সেইজন্তই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দান-তপস্তাদি কার্য্য সমাধান করিব—এইপ্রকার প্ররোচণাই শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি-যাজনের মূখ্য কথা। জগতে যাহাঁ কিছু আছে, তাহা সমস্তই ভগবৎ ও ভক্তিসম্বন্ধীয় কার্য্য; সুতরাং কোনটাই নৈরাশ্রজনক নহে। জগতের সকল বস্তুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। সেইজন্ত সকল কর্মের ফলই তিনি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণকে কৃত-কৃতার্থ করিতে পারেন। এই প্রকার ক্ষমতা তাঁহার আছে, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার সেবাকার্য্যে নিজ-ইন্দ্রিয়-তোষণ-

প্রবৃত্তি যেন আদৌ স্থান না পায়। মহাজন-প্রবর্তিত পথেই .আমাদিগকে অমুগমন করিতে-হইবে। ভগবানের নিকট সকলেই সমান। তাঁহার কাছে কোনপ্রকার উচ্চ-নীচ বিচার নাই। অতএব প্রীতির সহিত যিনি বা যাহারা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ভজন করেন, তিনি বা তাঁহারাই ভগবানের নিজ-জন। **তাঁহারাই অপ্রাকৃত হরিজন।** ভগবানের সেবা বা ভজনকে বাদ দিয়া ছাপ মারিয়া যে প্রাকৃত ‘হরিজন’ তৈয়ারী করিবার অপচেষ্টা, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ বা ভক্তিমার্গের উৎপাত-বিশেষ।

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ (গীঃ ৯ঃ২৯)

ভগবান্ সকলের প্রতি ‘সম’—ইহাতে একরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্ নির্বিশেষ এবং যাহার যে মত সেই প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাময় মার্গেও ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। তিনি সবিশেষ পরমভাবময় অপ্রাকৃত ক্রিয়াশীল। “সুহৃদং সর্বভূতানাং” অর্থাৎ তিনি সকলের বন্ধু। সুতরাং বন্ধুত্বের মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, সেইপ্রকার ভগবানের সমতাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—নির্বিশেষ নহে। যিনি যে-ভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত, ভগবান্ তাঁহার প্রতি সেই-প্রকারই ব্যবহার করিয়া থাকেন। “যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।” যিনি যে-ভাবে অর্থাৎ নির্বিশেষ, সবিশেষ, শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্যাদি-ভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হন, ভগবানও তাঁহাকে সেইভাবে গ্রহণ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি ‘মনুষ্য’ ভাবিয়া অবজ্ঞা করেন, তিনিও তাহাকে সেইভাবে উপেক্ষা করেন। আর যাহারা তাঁহাকে ‘স্বয়ং ভগবান্’ জানিয়া মহাজন-প্রবর্তিত পথানুসরণে ভক্তি করেন, তিনিও সেইসকল প্রেমিক ভক্তকে সর্বদাই রক্ষা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবৈদান্ত

এডিটর, ব্যাক-টু-গডহেড্

ভক্তির অধিকারী কে ?

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আকস্মিক সাধুর সঙ্গ ও রূপাফলেই শ্রদ্ধা হয়। এই সংসঙ্গ আবার ভগবৎ-রূপায় লাভ হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—

রূপয়া কৃষ্ণদেবস্ত তদ্বক্তৃজনসঙ্গতঃ ।

ভক্তেরা যাহা গাণি নু সদগুরুং জেৎ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জীব কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ করত সেই ভক্তের নিকট ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভক্তীচ্ছু হইয়া সদৃশকর ভজন করিবেন।

শ্রীহরিকথাই একমাত্র মঙ্গলের পথ—এইরূপ বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। হরিকথায় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিতে অধিকারী। শ্রীহরিকথাতে রুচিই নিত্য মঙ্গল-লাভের মূল কারণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজে ভক্তি হয় অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতে রুচি হয়, তাহাই পরধর্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম সূক্ষ্ম ভাবে পালন করিয়াও যদি হরিকথায় রুচি না হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই সার হইবে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যস্মাত্মা সূপ্রসীদতি ॥

ধর্মঃ স্বস্থিতিঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১২।৬,৮)

সাধুগুরুর কৃপায় ঐহারা হরিকথায় রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা দুর্কলতাবশতঃ সহসা কামনা-বাসনা বা বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাকে দুঃখকর ও ক্ষতিজনক জানিয়া, গহণমুখে বিষয়-ভোগ করিতে করিতে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া আদর ও প্রীতির সহিত ভগবানের সেবা করেন। নিরন্তর ভজন করিতে করিতে তাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রেম-ভক্তি লাভ করেন। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর “জাতশ্রদ্ধো মংকথাসু দুঃখোদর্কাংশ্চ গহয়ন্” (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

“সর্বকর্মসু লৌকিক-বৈদিকেসু কর্মসু তৎফলেষু নির্বিগ্নঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ নাতিসক্ত ইতি যদুক্তং তদ্বিব্রণোতি। কামান্ প্রীপ্তাদি-সঙ্গোথান্ কামান্ দুঃখান্নকান্ বেদ অথচ তৎপরিত্যাগেহ প্যসমর্থঃ ততস্তামবস্থামারভৈত্যেব দৃঢ়-নিশ্চয় ইতি গৃহান্তাসক্তিমে নশ্বত্ব বর্দ্ধতাং বা। ভজনেহপি মে বিঘ্নকোটির্ভবতু নশ্বত্ব বা অপরাধে নরকং চেদ্বতু কামমঙ্গীকুর্ষে তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি জ্ঞান-কর্মাদিকং নৈব জিহ্বক্ষামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিত্যেবং দৃঢ়ো নিশ্চয়ো যন্ত সঃ।”

“আরক্ত-ভজনস্ত তস্ত ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দার্ঢ্যং ন তথা তৎপ্রতিকূল-বস্ত্ত্বনি-ইত্যাহ—জুষমাণশ্চেতি। দুঃখোদর্কান্ কলত্র-পুত্রাদি-সঙ্গোথান্ কামান্ গহয়ন্নেব জুষমাণঃ। অহো অমী বিষয়ভোগা এব মমানর্থকারিণো ভগবৎ-পদ-প্রাপ্তি-প্রতিকূলা যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি ত্যক্তা অপি সময়ে ভোক্তব্য। এব ভবন্তীতি নিন্দামি চ পিবামি চেতি ত্রায়েন দুঃজানঃ।”

দুর্বলতাবশতঃ ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়-ভোগ ছাড়িতে না পারিলেও সংসদী বা সদৃগুরু-চরণাশ্রিত ভাগ্যবান্ সজ্জনের সাধু-গুরু-সঙ্গ-রূপাপ্রভাবে এই অবস্থাতেও ভজনে দৃঢ়তা যথেষ্ট থাকিতে পারে। তিনি বিষয়কে নিন্দাও করেন, আবার বিষয় ভোগও করিয়া ফেলেন ; আবার নিজকে ধিক্কারও দেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখনও হরিভজন ছাড়েন না। হরিভজন করিতে গিয়া আমার গৃহাদির প্রতি আসক্তি নষ্টই হউক বা বন্ধিতই হউক, আমার অর্নর্থ বা বিঘ্ন যাউক বা থাকুক, অপরাধের ফলে আমার নরকই হউক না কেন, আমি হরিভজন কিছুতেই ছাড়িব না—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যিনি সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভক্তিসিদ্ধি-লাভ করেন এবং তাঁহারই দুরাচার সর্বতোভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভক্তির অধিকারী। যতক্ষণ-শ্রদ্ধা না হয়, ততক্ষণ জীবের অভক্তিতে অর্থাৎ অগ্ণাভিলাষাদিতে নৈসর্গিক অধিকার দেখা যায়। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্” অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। “অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি” অর্থাৎ অজ্ঞ-অশ্রদ্ধধান ও সংশয়াত্মা পুরুষ বিনষ্ট হয়, তাই তাহারা কেহ মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

শ্রদ্ধাই প্রেমভক্তির প্রথম কথা। শ্রদ্ধা ব্যতীত অন্ত্রা ভক্তিতে অধিকার হয় না। শ্রদ্ধা ব্যতীত কখনও কদাচিৎ ভক্তি-প্রবৃত্তি দেখা গেলেও তাহা স্থায়ী হয় না। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিয়াছেন—“শ্রদ্ধাং বিনা অন্ত্রতাখ্যা ভক্তিঃ ন প্রবর্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তা চ নশ্চতি।” সংসার ক্ষয়োন্মুখ না হইলে শ্রদ্ধা হয় না। অতি সৌভাগ্যবান্ জীবই গুরু-কৃষ্ণ-রূপায় শ্রদ্ধা লাভ করেন। যাহার শ্রদ্ধা হইতেছে না, তাহার ভাগ্য নাই। অজ্ঞাত ভক্ত্যন্মুখী স্মৃতি—কোন পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্বক্তের সঙ্গ ও তৎ-রূপাজাত মঙ্গলোদয় বা অসংস্কারই ভাগ্য। শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু ভক্তির ক্রমবর্ণনে জানাইয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গেহথ ভজন-ক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ শ্রান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১৪।১০)

ভক্তির প্রথম-কথা শ্রদ্ধা হইলেও শ্রদ্ধার পূর্বে প্রথম-সাধুসঙ্গ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। তাই শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুর শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ-বিন্দুর টীকায়

লিখিয়াছেন—“আদৌ প্রথম-সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ-বিশ্বাসঃ। ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গে ভজনরীতি-শিক্ষার্থম্। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সার্থিত্যং কিন্তু বুদ্ধি-পূর্ব্বিকেষম্। রুচিরভিলাষঃ। আসক্তিস্তু স্বারসিকী এতেন নিষ্ঠাসন্তোষার্ভেদো জ্ঞেয়ঃ।”

শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিয়াছেন—“শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদ-শরণস্ত ভয়ং, তচ্ছরণস্তাভয়ং বদতি। অতো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তৎ শরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।” শ্রদ্ধার নাম—শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শাস্ত্র এই বলেন যে, যিনি ভগবানের শরণ লন নাই তাঁহার ভয় আছে, যিনি তাঁহার শরণ লইয়াছেন, তাঁহার ভয় নাই। অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ দেখিলেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, স্বীকার করা যায়।

‘শরণাপত্তি’ কাহাকে বলি? শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু কহিয়াছেন—“জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াং সদা তদমুদ্বৃতি-চেষ্টেব স্মৃতিঃ”, “কর্ম্ম-পরিত্যাগো বিধীয়তে” অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণানুদ্বৃতিচেষ্টা সৰ্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যক্ত হয়। ইহাই শরণাপত্তির লক্ষণ। ভগবদ্ গীতাশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথক পৃথক বিচার করিয়া অত্যন্ত গুহ্যতম উপদেশ দ্বারা শ্রীভগবান্ শরণাপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন; যথা—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ।

অহং স্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

‘সর্ব্বধর্ম্ম’-শব্দে বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবতাস্তর-পূজা ইত্যাদি শরণাপত্তির বাধক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। সেইসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি আমার শরণাপত্তি অর্থাৎ ভজন-শ্রদ্ধা স্বীকার কর। সে-স্থলে কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ-প্রযুক্ত কদাচিৎ কৃতপাপের যে প্রায়শ্চিত্তাদির অভাব হইবে, তাহাতে ভয় করিবে না। আমি সে-সকল পাপ অবশ্যই মোচন করিব।

এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা-শব্দে ‘আদর’ও বুঝায়। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। অতএব শ্রদ্ধা একা ভক্তিরই হেতু নয়—কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও হেতু। ঐস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসরূপ ভাবকে বুঝায়; তদন্তর্গৎ আর একটী ভাব অবশ্যই থাকে—তাহার নাম রুচি। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কাণ্ড হয় না, কিন্তু ‘রুচি’র প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে ‘রুচি’ পাপা ভক্তি-পরমাণু আছে। সেই ভক্তির সংস্রবমাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান নিজ নিজ প্রতিভাও ফলাদানে দৃঢ় হয়।

তদ্রূপ ভক্তি-সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাতে ভক্তির প্রতি ‘রুচি’রূপ একটি ধর্ম নিহিত আছে। সেই রুচিবৃত্ত-শ্রদ্ধাই জীব-হৃদয়ে প্রোথিত হয়। কর্ম-শ্রদ্ধা ও জ্ঞান-শ্রদ্ধায় কর্মরুচি ও জ্ঞানরুচি থাকে, তাহাতে সেই শ্রদ্ধা ভিন্নাকার-প্রাপ্ত ভক্তিরুচিমিশ্র-শ্রদ্ধার লক্ষণ ভক্তিতেই পর্য্যবসান হয়। ভক্তিরুচিই সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থ-শূন্য অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠারূপী হইয়া গুরুরুচি নাম লাভ করে। অতএব ভক্তি হইতে শ্রদ্ধা একটি পৃথক্ তত্ত্ব। শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে,—“তস্মাচ্চুদ্ভান ভক্ত্যঙ্গং, কিন্তু কর্মণ্যসমর্থবিদভাবদনত্যাখ্যায়াং ভক্তৌ অধিকারি-বিশেষণমেব।”

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু কর্মকাণ্ডে অসমর্থ-বুদ্ধিস্বরূপ অনন্ত-ভক্তিতে অধিকারের বিশেষণ মাত্র। শ্রদ্ধা ভক্তিতে অধিকার দেয়।

সংশয় দূরীকরণার্থে ইহাও এস্থলে কথিত হইতেছে যে, যখন ভক্তির অধিকার-হেতুরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ হইল না, তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধা-জননের পূর্ববর্তী হইয়া কোন কোন স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপ-প্রভুর বাক্য, যথা —

• জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি-প্রবেশায়োপযোগিতা।

ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাস্তত্ত্বমুচিতং তয়োঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১২০)

স্থল-বিশেষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে ঈষৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশের উপযোগিতা প্রদান করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না।

বৈদীভক্তিতে শাস্ত্র-বিশ্বাসময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। রাগানুগা ভক্তিতে ভাব-মাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। বিশ্বাসময়ী হউন অথবা লোভময়ী হউন, একমাত্র শ্রদ্ধাই উভয়বিধ গুরুভক্তির অধিকার প্রদানে সমর্থ। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তিনপ্রকার শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই শাস্ত্র-বিশ্বাস ও তদনুগত যুক্তিমিশ্র-শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। রাগানুগা ভক্তির অধিকারী-দিগের লোভের তারতম্য-অনুসারে তাহাদিগকেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

ভক্তি-বিষয়ে নরমাত্রেয়ই অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে, সাধু-গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার জন্মে। বিঘ্নালাভ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্বকই হউক অথবা ভাষা-জ্ঞানাভাবে সাধুমুখে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্বকই হউক, শাস্ত্র-প্রদত্ত ভক্তির সর্বোত্তম বোধ হইলেই শ্রদ্ধা জন্মিল, বলিতে হইবে। অথবা

ভগবলীলা শ্রবণ করত শুদ্ধ রাগভক্ত ব্রজবাসিগণের অনুরাগত হইতে যখন লোভময়ী শ্রদ্ধা হয়, তখনও শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মিল, বলিতে হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, ধর্মচর্চা, শম-দমাদি শিক্ষা দ্বারা যোগাভ্যাস ইত্যাদি গুণগণ সাধিত হইলেও ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। সাম্প্রদায়িক মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করিয়াও যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকারী না হওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত উত্তমা ভক্তির উদয় হয় না; কেবল ভক্ত্যাভ্যাসই হইয়া থাকে। উত্তমাধিকার লাভ করিবার যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা কেবল উত্তমভক্ত-সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তন দ্বারাই লাভ করা যায়।

লোভাশ্রিত বা শাস্ত্র-বিশ্বাসরূপিণী শ্রদ্ধার যখন উদয় হয়, তখনই নরমাত্মেরই শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে। সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম বা পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধোদয়ের হেতু নয়, কিন্তু কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাপ্রিয় সাধুদিগের সঙ্গই একমাত্র হেতু। শ্রদ্ধোদয়মাত্রই ভক্তিতে ‘কনিষ্ঠাধিকার’ জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধনভক্তির অল্পনীলন ও সাধুসঙ্গবলে অনর্থ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাশ্রিত হয়, তখন শুদ্ধভক্তিতে ‘মধ্যমাধিকার’ জন্মে। পুনরায় সাধনভক্তির অনুরাগ করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচিস্বরূপা হইলে সাধক ‘উত্তম-অধিকারী’ হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি লাভের সনাতন প্রথা। কিন্তু যদি এইরূপ ক্রমলাভ-কালে অসং-সঙ্গ অর্থাৎ বিবরাসক্ত বা নির্বিশেষ-চিন্তাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয় অথবা শুদ্ধভক্তের প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়, তবে কোমল-শ্রদ্ধা ও মধ্যম-শ্রদ্ধা উভয়েই লয় প্রাপ্ত হয়; তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। অতএব যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকার লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ফলপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, নতুবা প্রেম-ফলাশ্রিতা শুদ্ধভক্তি পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

—ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্ত্ৰিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

পতিতের আশা

হায় হায় মুই পড়িয়া সংসারে,
বিষয়-কূপের মাঝে ।

নিজ সত্তা ভুলি' স্বপন নেহারি,
মায়া'র প্রাকৃত সাজে ॥

পরব্যোমোপরি জড়মায়াতীত,
মোর বাস বৃন্দাবনে ।

নিত্যকাল তথা থাকিব সর্ববথা,
করি' কৃষ্ণ স্নেহেবনে ॥

কেহ নাহি পারে সে ধাম বুঝিতে ।

নাহি পারে কেহ বর্ণনা করিতে ॥

চিৎ-বিকশিত, স্বতঃপ্রকাশিত,
অখণ্ড, অক্ষয়, পর ।

নহে জড়-মায়া তাঁর অধিষ্ঠাতা,
সম্বিৎ আশ্রয় তাঁর ॥

সন্ধিনী নামেতে যে শক্তি প্রকাশে,
নিত্য ভগবৎ-ধাম ।

তথা মোর স্থান— হায় রে এখন,
পেয়েছি এজড়ে স্থান ॥

(যথা) কৃষ্ণদাস্ত ভুলি' ত্রিতাপ জ্বালায়
সুতপ্ত জীব-হৃদয় ।

তথায় আবাস হ'য়েছে আমার,
বাসনা হঞা উদয় ॥

এ-দুঃখ জানাতে কার কাছে যাই ।

কাহারে জানালে কৃষ্ণসেবা পাই ॥

কখন বা চাহি স্মৃথ দেহ মোরে

ওহে জগৎ-জীবন ।

কখনও বা মুক্তি চাহিয়া বেড়াই

ভুলিয়া আপন ধন ॥

যে ধনে বঞ্চিত হইয়াছি আমি

ভুলিয়া নিজাতিমান ।

সে ধন চাই না, চাই শুধু আমি

জড় ইন্দ্রিয়-তোষণ ॥

যত সংসারিক উন্নতি লভিতে

সতত তৃষিত-চিত ।

সেরূপ উত্তমে কেহ কি কখনে

লভিয়াছে নিজ হিত ??

কৃষ্ণভক্ত-জন কৃষ্ণৈকশরণ,

লুটায়ৈ তাঁহার পায় ।

তাঁর পদরজে অভিষিক্ত হ'লে

এ জড় বাসনা যায় ॥

যদি হয় মম স্বরূপ উদয় ।

জড়-বুদ্ধি তবে হইবে বিলয় ॥

অনুগত হ'ব কৃষ্ণ-ভক্ত-জনে ।

লভিবারে কৃষ্ণ তাঁর সন্নিধানে ॥

সেবকাধম—

—শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জୟত:

শ্রীশ্রীকেদার-বদ্রী-পৰিক্রমার বিরাট আয়োজন

—:—

পশ্চিমমধ্যে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেব প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ,
গুপ্তকানী, তুঙ্গনাথ, চামোলি, যোশীমঠ প্রভৃতি
বহু তীর্থস্থান দর্শনীয়।

রিজার্ভ-গাড়ী হাওড়া-ষ্টেশন হইতে
১৯শে ভাদ্র, ইং ৪।৯।৫২ তারিখে যাত্রা করিবে।
দুই নভাড়া ও দুই বেলা প্রসাদাদির
ভিক্ষা—৪৫০ টাকা।

সকলে যোগদান করিয়া
ধর্মজীবন সার্থক করুন।

বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মানবলীর জন্য
নিম্ন-লিখিত স্থানসমূহে আবেদন করুনঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
• শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

৮-৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জবত

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর)

বহুলাবন হইতে গোবর্দ্ধন যাত্রা

৩০শে অক্টোবর, ১২ই কার্তিক, মঙ্গলবার—প্রত্যুষে ৬।০ টায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দের বিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্তনযোগে যাত্রিগণ ন্যূনাধিক ১০মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বহুলাবন হইতে গোবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। গোবর্দ্ধনের ‘বাস-ষ্টাণ্ড’ হইতে কিছু উত্তরে রাধাকুণ্ডের রাস্তার পার্শ্ববর্তী আম্রকাননে শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব-সংগৃহীত ভূমিখণ্ডে পরিক্রমা-সভ্যের শিবিরশ্রেণী স্থাপিত হওয়ায় পথচারী জনসাধারণের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। যাত্রিগণ-দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তে প্রসাদ পাই বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যারাত্তিকের পর দৈনন্দিন বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহারা পাঠ-কীর্তনাদি শ্রবণের সুযোগ পান।

ব্রজের তিনটি প্রসিদ্ধ পর্বতঃ—গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষণ। ইহারা যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার তত্ত্ব বলিয়া শ্রুত হয়। গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের প্রায় মধ্যস্থলে সমতল-প্রদেশে গোবর্দ্ধন-গ্রাম অবস্থিত। ইহা “মানসী”-গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমদিক্ ব্যাপিয়া বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ নীলাম্বলীর মধ্যে এই গোবর্দ্ধন বিশেষ প্রসিদ্ধস্থান। কেদারনাথ-বন্দিত এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন মূল-নারায়ণের হৃদয় হইতে আবির্ভূত।

**ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই কেদার-বদ্রী দর্শনের
সর্বতোমুখী সুযোগ—মীত-বর্ষা কম।**

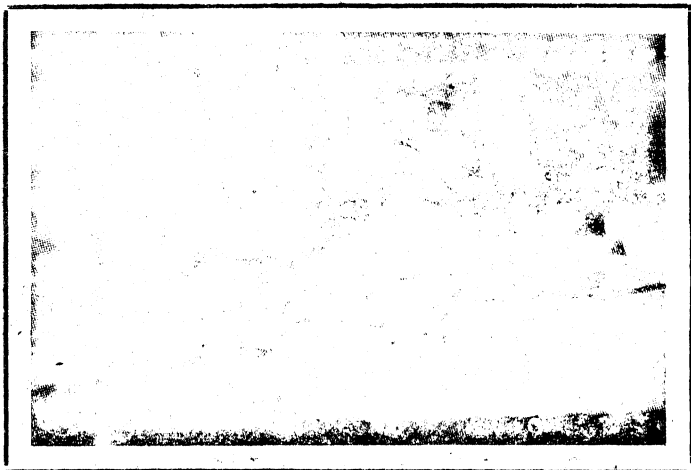
শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

৩১শে অক্টোবর, ১৩ই কার্তিক, বুধবার—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই পাঠ-কীর্তনাদি চলিতে থাকে। মঠাশ্রিত সেবক-সেবিকাগণ পূর্বরাত্র হইতেই মহোৎসবের বিবিধ আয়োজনে তৎপর হন। তাঁহারা স্ব-স্ব দেশে প্রচলিত রুচিপ্ৰদ বিবিধ ভোগসামগ্রী এবং শ্রীগিরিধারী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য বস্তুসকল যথাসম্ভব প্রস্তুত করেন। সকল

প্রকার আয়োজন সমাপ্ত হইলে যাবতীয় নৈবেদ্য-সত্তার শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পুষ্প-মলিকার ত্রায় অশ্লীল সংস্থাপিত হওয়ায় এক অপূর্ণ দৃশ্য হইয়াছিল। কেন্দ্রস্থলে অন্নস্তূপের চতুর্পার্শ্বে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধাতু ও মৃন্ময় পত্রাদিতে খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, লুচি, পুরী, ফল-মূল, পিঠা-পানা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতি ৩ শতাধিক বিচিত্র ভোগ-সামগ্রীতে শ্রীবিগ্রহের শিবিরস্থ ভোগ-মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, নৈবেদ্যসকল পুষ্প-পুষ্পমালাদি অশোভিত হইয়া সমঞ্জসী তুসলীপত্রে নিবেদিত হয়।

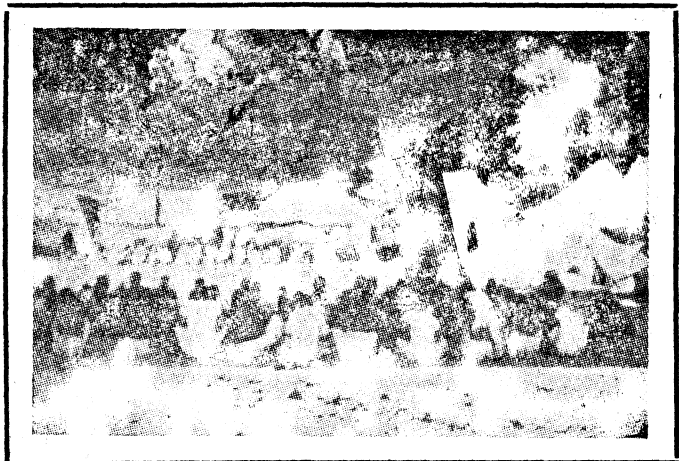
এইসময়ে যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর “অন্নকূট-মহোৎসব-বিবরণ” শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল কেশব মহারাজ যাত্রিগণকে কৃপাপূর্বক জানান—“সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দনৈ অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শন বহু সৌভাগ্যের ফলেই লাভ হইয়া থাকে। আপনারা বিশেষ ভাগ্যবান্।”

এদিকে অসজ্জিত শিবিকাস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ বিবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি ও চন্দনলিপ্ত অঙ্গস্থি পুষ্পমালা-বিভূষিত হইয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিগেন। শ্রীগিরিধারী ও শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চনের পর ভোগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। যাত্রিগণ অন্নকূটের এইরূপ বিরাট আয়োজন দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন। স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি দলে-দলে আসিয়া অভিনব অন্নকূট দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।



অন্নকূট-মহোৎসবের ভোগ-সামগ্রীর দৃশ্য

অন্তঃপর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। পরিক্রমাকারী যাত্রীগণ, উপস্থিত দর্শনার্থী নর-নারী, আহুত, অনাহুত, দীন, দুঃখী, ধনী, দরিদ্র সকলকেই অন্নকুটের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীঅন্নকুট দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতীত্ব জ্ঞান করেন। বলা বাহুল্য, কয়েকজন অর্থ-বিত্তশালী ভক্তও এই উৎসবের আংশিক আহুকুল্য ও সেবাতার গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক স্মৃতি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের হরিবাবু ও বেগমপুরের নারায়ণবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।



যাত্রী-শিবিরের সম্মুখে প্রসাদ বিতরণ

গোবর্দ্ধনে বিশেষ দর্শনীয় স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি

অপরাক্ত ৪ ঘটিকার সময় যাত্রীগণ বৈষ্ণবগণের আহুগত্যে দানঘাটী, মানসী-গঙ্গা, চক্রেস্বর মহাদেব (চাকলেস্বর), শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মন্দির, শ্রীহরিদেব, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

দানঘাটী গোবর্দ্ধন-পর্বতোপরি অবস্থিত। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ দানী সাজিয়া দধি-দুগ্ধাদি গ্রহণপূর্বক শ্রীরাধিকাসহ দানলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নন্দ-যশোদার দূরবর্তী স্থানে গঙ্গাস্নানের ক্রেশ লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মানস-সঙ্কল্পমাত্রে এই তীর্থ প্রকটিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম মানসী-গঙ্গা। এখানে গঙ্গা মকরবাহিনীরূপে ব্রজবাসিগণ-সমক্ষে আবির্ভূত হন। ইহার তীরেই শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ বর্তমান। মানসী-গঙ্গার উত্তর-তীরে গোবর্দ্ধনের

দ্বারপাল চক্রেস্বর মহাদেব মন্দির অবস্থিত। এস্থলে শিব শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অভীষ্টসেবায় সহায়তা করিয়া ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত, সকল দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। চাকলেস্বর ঘেরার মধ্যেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর বিদ্যমান। বৃদ্ধ বয়সেও গোস্বামিপাদের নিত্য গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা-সেবার ক্রেশ লক্ষ্য করিয়া ভক্তবংসল ভগবান্ স্বীয় শ্রীচরণ-চিহ্নযুক্ত একখণ্ড গোবর্দ্ধন-শিলা তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—এই শিলা পরিক্রমা করিলেই শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা হইবে এবং তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। (এই শিলা বর্তমানে বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধা-দামোদর-মন্দিরে সেবিত হইতেছেন)। ভজনকুটীরের নিকটেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমন্দির ও তাহার প্রাচীন সেবা বর্তমান। মানসী-গঙ্গার দক্ষিণ-তটপ্রদেশে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির সদর্পে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজও অতীতের গৌরব-নাহিনী গান করিতেছে। মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলের অধিদেব গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীহরিদেব শ্রীমন্দিরে বিরাজমান। ইহার বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বন-ভ্রমনকালে হরিদেবকে দর্শন করিয়া এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এই কুণ্ডের তীরে পাক করিয়া প্রভুকে তিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

১লা মতেস্বর, ১৪ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে যাত্রিগণ শ্রীশ্রীশ্রী-গৌরাদের আনুগত্যে উদগু নৃত্য-কীর্তনাদি-সহযোগে ময়ূর-ময়ূরীর কেকাশ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে প্রায় ১১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীউর্জ্জ্বল-কুণ্ড, নারদকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করেন। (উর্জ্জ্বলকুণ্ডে উর্জ্জ্বল মহারাজ দ্বারকা-মহিষী-গণের নিকট শ্রীব্রজমণ্ডল-মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা কীর্তন করিয়া ছিলেন। নারদকুণ্ডে নারদ-ঋষি বৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শন-মানসে তপস্যা করেন)। এস্থান হইতে যাত্রিগণ আরও প্রায় ১১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত রাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠ, শ্রীব্রজ-স্নানন্দ-সুখদ-কুণ্ড, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের পুষ্প-সমাধি প্রভৃতি দর্শন করেন। রাধাকুণ্ডে শ্রীমণ্ডিক দয়িত মাধব মহারাজ ও শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী মহোদয়ের সরল প্রমাণিক ব্যবহার এবং পরিক্রমাকারী ভক্তগণের মধ্যে প্রচুর মিষ্টান্নাদি বিতরণ ও প্রতি যাত্রিগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পরিক্রমা

অতঃপর যাত্রিগণ শ্রীরাধাকুণ্ডের চিন্ময় বারি শিরে ধারণ করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর সমাধি, শ্রীজাহ্নবদেবীর মন্দির, শ্রীরাধারমণ-জীউ, শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর, শ্রীল ভৃগুর্ভ গোস্বামীর পুষ্প-সমাধি, পঞ্চবৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীগোবিন্দ মন্দির, গিরি-গোবর্দ্ধনের জিহ্বরূপ শিলা দর্শন করিয়া শ্রীললিতা-কুণ্ড, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘেরা, মণিপুররাজের ঠাকুরবাড়ী, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর উপবেশন-স্থান, গোপকুয়া, নিতাই-গৌর-সীতানাথের মন্দির, অষ্টসখীর মন্দির, শ্রীরাধামাধব মন্দির, বনখণ্ডী মহাদেব, তমালতলায় শ্রীমগ্নহা-প্রভুর উপবেশন-স্থান, পাশাখেলা-স্থান, গোঘাট, শ্রীমদনমোহনজীউ, ভরতপুর মহারাজের মন্দির, গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, কুণ্ডেশ্বর মহাদেব, ঝুলন-বট, শ্রীরাধাকৃষ্ণজীউ, তুঙ্গবিহার স্থান, শ্যামসুন্দর, রাধাদামোদর, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর মন্দির প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা করেন ।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের ঘাটসমূহ :—(১) শ্রীজাহ্নবা ঘাট (জাহ্নবা ঠাকুরাণীর দাস-গোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দান), (২) শ্রীগোবিন্দ ঘাট (শ্রীল সনাতন গোস্বামীর রাধাগোবিন্দের ঝুলনলীলা), (৩) মানস-পাবন ঘাট, (৪) পঞ্চপাণ্ডব ঘাট (পঞ্চবৃক্ষরূপে পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থান ও দাসগোস্বামীকে স্বপ্নদান), (৫) শ্রীরাধাবল্লভ ঘাট, (৬) শ্রীজীব-গোস্বামী ঘাট, (৭) গয়াঘাট (মাধবেন্দ্রপুরীর বসিবার স্থান), (৮) তমালতলা ঘাট (শ্রীগৌরসুন্দরের উপবেশনস্থান), (৯) বল্লভাচার্য ঘাট, (১০) সঙ্গম ঘাট (শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মিলনস্থান ও তমালবৃক্ষ) ও (১১) ঝুলনবটের ঘাট (শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলার স্থান) ।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্ৰাকৃত লীলাবিলাসের সহায়কারীরূপে তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রই সর্বস্বতীর্থগণ সেবনোদ্দেশে আগমন করায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ । কুণ্ডদ্বয়ের অন্তর্কর্ত্তী প্রণালিকারূপ যোগসূত্র নিত্যকালই শক্তি-শক্তিমানের অভেদদ্বয় ও প্রেমমিলন-বৈচিত্র্য প্রতিপাদন করিতেছে । কালপ্রভাবে এই কুণ্ডদ্বয় বাহ্যদৃষ্টিতে বিলুপ্ত হইলে, রাধাশ্যাম-মিলিততন্ত্র শ্রীগৌরহরি ব্রজে আগমনপূর্বক ‘আরিট’ গ্রামস্থ দুই ধাতুক্লেত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্বল্পপরিমাণে জলে স্নান করিয়া এই কুণ্ডদ্বয়ের নিত্য অবস্থিতি ও বৈকুণ্ঠসীমা প্রকট করেন । তৎপরে গৌরপার্শ্বদপ্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু এই কুণ্ডদ্বয়ের

বিশেষভাবে সেবা-সংস্কারপূর্বক ইহার উজ্জ্বল্য বিধান করেন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড-
তীরে অবস্থান করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত ব্রজ-ভজনে
ব্যাপ্ত হন। আমরা শ্রীমাধু-গুরুমুখে শুনিতে পাই—এই শ্রীকুণ্ডই শ্রেষ্ঠ
গৌড়ীয়গণের চরমোপাশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়ণীয় ও নিত্য-বসতিস্থল। ইহাই
ব্রজনবসনবন্দ্য শ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত বিপ্রলভ্য কেলিকলা-বিস্তারকারী
মাধ্যমিক বিহারস্থলী। কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠা এই শ্রীকুণ্ডে বর্তমান।
শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি উন্নততম রসপূর্ণ এবং সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধাশ্রী-
স্বয়ং। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তমা, তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের
পরম ভিষ। তাই গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের ‘প্রেমামৃতান্নাবন’-ক্ষেত্র বলিয়া
শ্রীরাধাকুণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোপরি উপাশ্রয়-তত্ত্ব।

শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শনাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ তথা হইতে প্রায় ১১০ মাইল
দূরিত পশ্চিমকোণে অবস্থিত কুসুম-সরোবর দর্শন করেন। ইহা “সুমনঃ
সরোবর” নামেও পরিচিত। কুসুম-চরণের ছলে শ্রীমতী এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের
পাদচন্দ্রিকা হইতেন। এই সরোবরের দক্ষিণে ‘শ্রীরত্নসিংহাসন’ বা শঙ্খচূড়-
বসনান, পশ্চিমে ‘গোয়ালকুণ্ড’, ‘যুগল-কুণ্ড’, ‘কিল্ললকুণ্ড’, ‘খেলন বন’ প্রভৃতি
স্থান দর্শনীয়। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশিত ঘোষণাপত্রানুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
১৩৫২, ইং ১৭৭৩৫২ তারিখে হাওড়া হইতে রিজার্ভ
পার্কে যোগে রওনা হইয়া পরদিবস প্রাতে বালেশ্বর ষ্টেশনে অবতরণ করেন।
তাহাতে যাত্রিগণ কীর্তনসহযোগে রেযুণী উপস্থিত হন। তথায় শ্রীল
ধবেন্দ্রপুরীপাদেব স্থান ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহাদি দর্শনান্তে ষ্টেশনে
গ্যাগমন করেন। পরদিবস তথা হইতে পুনরায় রিজার্ভ গাড়ীতে ভুবনেশ্বর
গিয়া ১ রাত্র ধর্মশালায় অবস্থান করিয়া পুনরায় পরদিবস দর্শনাদি করিয়া
হইতে পুরী রওনা হইয়া ২০৬৩৫২ তাং এ অপরাহ্নে পুরীধামে পস্থিত হন।
সমিতি এখানে ৪৭৭৫২ পর্যন্ত অবস্থান করিয়া আলালনাথ, সাক্ষীগোপাল ও

কটবর্তী সমস্ত দর্শনীয় স্থান পরিক্রমাদি করেন। ঔ বিষ্ণুপাক্ শ্রীল সচ্চিদানন্দ
 ক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি এখানে এবংসর বিরাটভাবে পালিত
 ইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে এক সভা আহ্বান করা হয় এবং
 ল সভাপতি-মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত সজ্জনগণ
 রম কল্যাণ লাভ করেন। শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন, রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী ও পুন-
 ত্রাদি অমৃষ্ঠান বিরাটভাবে কীর্তন, পাঠ ও বক্তৃতা সহযোগে পালিত হইয়াছে।
 এবং যাত্রিগণ সকলে স্বচ্ছন্দ দর্শন এবং শ্রবণ-কীর্তনের সুযোগ পাইয়া
 রমানন্দ লাভ করেন। সমিতির সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ রেলভ্রমণ-কালে এবং
 সাদাসেবা ও বাসস্থান-বিষয়ে পরমানন্দিত হন। সমিতি যাত্রিগণ-সহ
 ১৭৫২ তারিখে প্রাতে হাওড়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথা হইতে সকলে
 স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬; ভাদ্র—১৩৫৯

১২ জ্বীকেশ, ১ ভাদ্র, ১৭ আগষ্ট, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ২।১০। দি
 ১।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ।

২০ জ্বীকেশ, ২ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট, সোমবার—গৌর-পঞ্চমী রা ২।৩।
 অদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২২ জ্বীকেশ, ১১ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট, বুধবার—গৌর-সপ্তমী রা ১।১৫।
 শ্রীললিতাসপ্তমী।

২৩ জ্বীকেশ, ১২ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—গৌরাষ্টমী রা ১২।২।
 শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী।

২৬ জ্বীকেশ, ১২ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট, রবিবার—গৌরৈকাদশী রা ৬।৪২।
 পার্শ্বৈকাদশী ও বামন-দ্বাদশীর উপবাস।

২৭ জ্বীকেশ, ১৬ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৪।২৪।
 দি ৯।৩১ মধ্যে শ্রীশ্রীবামনদেবের অর্চনান্তে পারণ। শ্রীল জীবগোস্বামী
 প্রভুর আবির্ভাব।

২৮ জ্বীকেশ, ১৭ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—গৌর-ত্রয়োদশী দি ১।৫৯।
 শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধার
 গোড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৯ জ্বীকেশ, ১৮ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার—গৌর-চতুর্দশী দি ১।১৩।
 শ্রীঅনন্ত-চতুর্দশীত্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

৩০ জ্বীকেশ, ১৯ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—পূর্ণিমা দি ২।৭।
 শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাধো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যাতে ভক্তিরধোক্ক্ষেজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যস্মায়্যা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ ।

অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূণ্ ॥

অত্র ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪র্থ বর্ষ

স্কীরোদশায়ী, ১১ হরীকেশ, ৪৬৬ গোরাধ
শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৫৯; ইং ১৬।৮।৫২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকেশবাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীকেশবায় নমঃ

নব-প্রিয়কমণ্ডরীরচিত-কর্ণপূর-শ্রিয়ং

বিনিস্ততয়-মালতীকলিত-শেখরেণোজ্জ্বলম্ ।

দরোচ্ছৃসিত-যুথিকাগ্রথিত-বহু-বৈকক্ষকং

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥১॥

শিশঙ্গি মণিকন্তুনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে
মৃদঙ্গমুখি ধুমলে শবলি হংসি বংশিপ্রিয়ে ।
ইতি স্ব-স্বরভীকুলং তরলমাংসয়ন্তং মুদা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥২॥

ঘনপ্রণয়-মেঘরান্ মধু সন্মগোষ্ঠী-কলা-
বিলাস-নিলয়ান্ মিলিবিবিধ-বেশ-বিভোতিনঃ ।
সখীনখিল-সারয়া পথিষু হাসয়ন্তং গিরা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৩॥

শ্রমাশু-কণিকাবলী-দরবিলীঢ়-গণ্ডাস্তরং
সমুচ্চ গিরিধাতুভিলিখিত-চারু-পত্রাকুরম্ ।
উদঞ্চদলিমন্তলী-রুচিবিড়ম্বি-বক্রালকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৪॥

নিবন্ধ-নব-তর্ণকাবলী-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া
নটৎ-খুরপুটাক্ষলৈরলঘুভিভূবং ভিন্দতীম্ ।
কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্তয়ন্তং পুরো
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৫॥

পদাক্তততিভিবরাং বিরচয়ন্তমধব-শ্রিয়ং
চলন্তরল-নৈচিকীনিচয়-ধূলি-ধূম্রস্রজম্ ।
মরুল্লহরী-চঞ্চলীকৃত-দুকূল-চূড়াঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৬॥

বিলাস-মুরলী-কলধ্বনিভিরুল্লসম্মানমাঃ
ক্ষণাদখিলবল্লবীঃ পুলকয়ন্তমন্তর্গহে ।
মুহুর্বিদধত্য হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥-৭॥

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চিতং
স্মিতাকুর-করম্বিতৈন'টদপাঙ্গ-ভঙ্গীশতৈঃ ।
স্তনস্তবক-সঞ্চরয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৮॥

ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসবোৎসাহসনং
 ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি স্তুত্ব পত্রাষ্টকম্ ।
 তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজ-পদারবিন্দদ্বয়ে
 রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তা দিশাখা-সখঃ ॥১॥

শ্রী শ্রীকেশবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

অভিনব কদম্ব-মঞ্জরী ষাঁহার কর্ণভূষণ, বিকশিত মালতী-মালায় ষাঁহার
 মৌলি স্ত্রশোভিত ও যিনি ঈষৎ-বিকশিত অতি-সুন্দর যুথিকামালা গলদেশে
 ধারণ করিয়া সাময়িকালে বন হইতে ব্রজধামে আগমন করিতেছেন, সেই
 শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥১॥

“হে পিশঙ্গি ! হে মণিকন্তনি ! হে প্রণতশৃঙ্গি ! হে পিঙ্গেশণে ! হে মৃদঙ্গ-
 মুখি ! হে ধুমলে ! হে শবলি ! হে হংসি ! হে বংশিপ্রিয়ে !” — ইত্যাদি
 সম্বোধন-বাক্যে স্বীয় গাভীগণকে ব্যগ্র হইয়া আহ্বান করিতে করিতে যিনি
 বনমধ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা
 করি ॥২॥

ষাঁহারা প্রগাঢ়-প্রণয়হেতু অতি-স্নিগ্ধ, স্তম্ভুর পরিহাস-বাক্যে ও নৃত্য-গীতাদি
 কলাবিলাসে কুশল এবং ষাঁহারা নানাপ্রকার বেশ-ভূষায় স্ত্রশোভিত, এবম্বিধ
 বয়স্কদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে অরণ্য হইতে যিনি ব্রজমধ্যে
 আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৩॥

বিন্দু-বিন্দু শ্রমজলে ষাঁহার পগুদেশ স্ত্রশোভিত, ষাঁহার মুখমণ্ডলে নানাবিধ
 গৈরিক ধাতুদ্বারা পত্রাঙ্কুর লিপিত হইয়াছে এবং ষাঁহার কুটিল-কুন্তলের শোভায়
 মধুলোভে চঞ্চল অলিবৃন্দের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে, এইরূপ বেশে বিপিন
 হইতে ব্রজমধ্যে সমাগত নন্দনন্দন সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৪॥

যে-সকল গাভী গোষ্ঠে আবদ্ধ অভিনব বৎসদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র
 ও উৎকণ্ঠিত হইয়া খুরাগ্রদ্বারা ভূমি খনন করিতেছে, তাহাদিগকে বেগুনিবাদ
 দ্বারা নিবর্তন করিতে করিতে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন,
 সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৫॥

যিনি ব্রজ-বজ্রাদি চরণচিহ্নদ্বারা পথের অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, অগ্রে দাবমান গাভীগণের খুরোখিত ধূলি-পটলে যাহার বনমালা ধূম্রবর্ণ হইয়াছে, মন্দ-মন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হওয়ায় যাহার বজ্রাঞ্চল ও চূড়া চঞ্চলিত হইতেছে, এইরূপ বেশে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৬॥

যিনি বিলাস-মুরলীর মধুর-ধ্বনিদ্বারা গৃহাবস্থিত মাতৃতুল্য যাবতীয় ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত উল্লাসিত ও অতিশয় আনন্দহেতু তাঁহাদিগের কলেবর পুলকিত করিতেছেন এবং যিনি জননী যশোদার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৭॥

দর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকায় আরুঢ়, ঈশৎ-হাস্তযুক্ত ব্রজ-যুবতীগণের কটাক্ষ-মালায় যিনি সংকুস্ত হইতেছেন এবং যিনি পুষ্পস্তবকে ভ্রমর-গতির ত্রায় তাহাদিগের কুচাগ্রমণ্ডলে দৃষ্টি নিষ্কম্প করিতে করিতে অরণ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীকেশবকে ভজনা করি ॥৮॥

যিনি ব্রজ-রমণীগণের আনন্দবর্দ্ধক অতি মনোহর এই পদ্মাষ্টক যথাক্রমে শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, বিশাখা-সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উজ্জ্বল-বীসম্পন্ন করিয়া নিজ-পাদপদ্মে অচলা রতি জন্মাইয়া চিরস্থায়ী করেন ।

ভক্তিসিদ্ধান্ত

ত্রিবিধ অধিকারে বেদের ত্রিবিধ কাণ্ড

বেদশাস্ত্রে তিনটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয় । যোগ্যতা বা অধিকার অনুসারে বেদশাস্ত্র ত্রিবিধ কাণ্ডে বিভক্ত । ফলভোগপর রুচি হইতে কর্মকাণ্ডের উদ্গম । ফলত্যাগপর রুচি হইতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রবৃতি । ঐহিক বদ্ধানুভূতি এই দুইটি বিভিন্ন মার্গের উদয় করাইয়াছে । আনুভূতিক মুক্ত্যানুভূতি এই কাণ্ডদ্বয়কে বহুগানন করেন না । মুক্তাভিமானের যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বেদের উপাসনাকাণ্ড বা ভক্তিপথ । ঐহিক বদ্ধ-বিশ্বাসে পারলৌকিক উপাসনা-কাণ্ড কর্মকাণ্ডের শাখা-বিশেষ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার উদয় করায় । জগতের যাবতীয় লৌকিক অনুভূতি পরিণামশীল বা ক্ষরধর্মযুক্ত । যে পথ

অবলম্বনে ক্ষর-ধর্মের মহিমা মলিনতা লাভ করে, উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা ভগবদ্ভক্তিবিদ্যা ।

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম-জ্ঞান ভক্তির সহায়ক নহে

লৌকিক ভোগপর কর্মসমূহ, লৌকিক ত্যাগপর জ্ঞান, বেদশাস্ত্রের ভক্তি-শাখার সহায়তা করে না । বেদোন্নিখিত ভক্তিকাণ্ডযাজ্ঞীর নিকট বেদের লৌকিক জ্ঞানপ্রসূত কর্ম ও জ্ঞান-শাখার আদর নাই । কর্ম ও জ্ঞানশাখায় বৈদিক পথদ্বয় অক্ষর-বস্তুর সেবা করিতে অসমর্থ । উক্ত শাখাদ্বয়ে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিশাখায় অবস্থিত মনে করা স্বরূপ-ভ্রান্তির পরিচয় মাত্র । অপরা বিদ্যা সম্বল করিয়া পরাবিদ্যা ভক্তির উপলব্ধি ঘটে না । ভক্তি প্রকৃতির অতীত বস্তু । যাহারা লৌকিক বিষয়-সেবায় রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা ক্ষরবস্তুর অহুশীলনে জীবন যাপন করেন ।

কর্মের ফল—অনিত্য ভোগ, জ্ঞানের ফল—আত্মবিলোপ

ও ভক্তির ফল—কৃষ্ণপ্রেমা

সিদ্ধান্ত বলিলে পূর্বপক্ষ নিরাসপূর্বক সিদ্ধপক্ষ স্থাপনকে বুঝায় । ভক্তিশাখা-যজ্ঞনকারী মনীষীবৃন্দ বলেন যে, বেদশাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্তের আবাহন করিয়াছেন ।

কর্মশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কর্মের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানেন, সংকর্মের অমুষ্ঠান অভিধেয় জানিয়া তদমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধিতে নিজেস্ত্রিয়-প্রীতিরূপ ফল লাভ করেন ।

জ্ঞানশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নির্ভেদ ব্রহ্মের সহিত একীভূত সম্বন্ধ করিয়া ষট্‌কসাধন-বলে অথবা হরিতোষণ-বলে প্রাকৃত ভেদহীন জ্ঞানাহুশীলনরূপ অভিধেয় অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রাকৃত অজ্ঞানোথ দৈতভাব নিরসনরূপ ফলদ্বারা নিজ বিলোপ সাধন করেন ।

ভক্তিশাখাবলম্বী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণের সহিত নিজ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কৃষ্ণ-সেবনরূপ নিত্য অভিধেয় ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ফলস্বরূপে কৃষ্ণপ্রেমা প্রাপ্ত হ'ন ।

• ভক্তিসিদ্ধান্তের অনভিজ্ঞতায় কর্ম-জ্ঞানের আবাহন

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন । বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ফলকামময় কর্ম-বৃত্তিদ্বারা, ফলত্যাগময় জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা এবং উভয় ত্যাগময় ভক্তিবৃত্তিদ্বারা বেদশাস্ত্রকে পূজা করিয়া থাকেন । কর্মী ও জ্ঞানী বিপ্রগণের

বিভিন্ন রুচিগত পার্থক্যের মূল কারণ অমুদ্রিত করিলে জানা যায় যে, তাঁহার বেদের ভক্তিসিকান্ত-বিষয়ে একমত নহেন। নির্মল জ্ঞানের অভাবে অদ্বয়জ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক অজ্ঞানরূপ দ্বৈতমত গ্রহণ করিতে গিয়া প্রাকৃত ভোগ ও ত্যাগময় রাজ্যে বেদের অপর দুইটা শাখার অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু সিকান্তে অভিজ্ঞ হইলে তাদৃশ কর্ম ও জ্ঞান-শাখাদ্বয়ের অপ্রাকৃত রাজ্যে অকর্মণ্যতা বুঝিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতই বেদের সার বা বেদান্ত

শ্রীমদ্ভাগবত বেদশাস্ত্ররূপ কল্পতরুর প্রপক্ক ফল। বেদের উপাসনাকাণ্ড সূষ্ঠ ভাবে সুষোগ্য ভাগবতগণের উপক'রের জহু জানাইয়া দিতে এই গ্রন্থরূপী ভগবানের নামাত্মক-মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই বেদের প্রপক্ক ফলরূপ গ্রন্থে জ্ঞান-শাখার নীরস কষায় এবং কর্মশাখার বৈরশ্রু বহুমানিত হয় নাই। বেদতাৎপর্যে অভিজ্ঞতা হইলেই শ্রীমদ্ভাগবতের উপাদেয়তা কর্মি-জ্ঞানী বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ও স্ব-স্ব পণ্যদ্রব্যের পরিহার করাইতে পারে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর নিজ চরিত্রে অভিম্যক্ত করিয়াছেন। সারগ্রাহী-চূড়ামণি বেদের ভক্তিশাখা-পারঙ্গত ব্রাহ্মণবর্ষ্য পরমহংস-কুলাধিরাজ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ভগবৎ-পার্ষদাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীগৌরোদ্ঘাটিত রহস্যমূলে লীলাময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রচার করিয়াছেন। তিনি সেই অগ্রতম বেদে লিখিয়াছেন যে,—

সিকান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস।

ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে স্মৃদু মানস ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সিকান্ত-জ্ঞানাত্মক ভক্তির বাধক

যিনি সিকান্ত-বিষয়ে আলস্য করিয়া বেদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবেন না, তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার অথবা অবস্থান সম্ভবপর নহে। ভক্তিসিকান্ত না জানিয়া তিনি বেদের কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সূতরাং তাঁহার ভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ-জ্ঞানে পরিহারপূর্বক অপর দুইটা পথকে ভক্তি পথ বলিয়া সিকান্ত করিতে হয়। সিকান্তানভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরিত অমুষ্ঠানসমূহ কর্ম ও জ্ঞানবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সর্বতোভাবে ত্যাজ্য।

বেদের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য্যবর্গ

শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী, প্রভুর দাসগণের ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। ভক্তিসিদ্ধান্তে অনিপুণ হইয়া শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু ‘হরিভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু’ নামে একখানি অপূৰ্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ভক্তমাত্রেরই জীবন-স্বরূপ। সেই অপ্রাকৃত বেদ-ভাষ্যের অবহেলাক্রমে আজ বর্তমান ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রাকৃত কলুষ প্রবেশ করিয়াছে। এই শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর আহুগতো শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজের উপকারের জন্য শ্রীশ্রীমৎ জীবগোস্বামী প্রভুপাদ সহস্রজ্ঞান বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ‘ষট্‌সন্দর্ভের’ প্রথম চারিটি সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য, আর শ্রীরূপের আহুগতো শ্রীদামোদর-স্বরূপের কৃপাপাত্র শ্রীশ্রীমৎ রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুপাদ স্বীয় ‘স্তুবাণী’ প্রভৃতি অপ্রাকৃত গ্রন্থে অভিধেয়-তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তের অভিধেয়-তত্ত্বাচার্য্য-স্বরূপে নিত্যকাল বর্তমান আছেন। শ্রীরূপাহুগতোই বেদের শুদ্ধ ভক্তিকাণ্ড প্রচারিত হইয়াছে।

প্রচারের ফল যোগ্যপাত্রেরই প্রতিফলিত হয়

প্রচার বলিলেই যে অত্যাভিলাষী, কস্মী বা জ্ঞানিগণ সেই প্রচারের ফললাভ করিবেন এরূপ নহে। যোগ্যপাত্রের সিদ্ধান্ত-আলোক স্পষ্টভাবে প্রদীপ্ত হইলেই ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদশাখায় অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপাহুগত্য-করণে সমর্থ হইবেন। ভক্তিসিদ্ধান্তের গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ আজ অবৈদিক শূদ্র বলিয়া তাণ্ডব নৃত্যে প্রমত্ত। শ্রীরূপাহুগং শুদ্ধ-বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাদিগকে সংসিদ্ধান্ত ওনাইয়া বৈদিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যজ্ঞে যোগ্য করুন—ইহাই প্রার্থনা।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

মানবজাতির সকল শ্রেণীই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আলোচক

যে-কাল হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেইকাল হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সহস্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সর্বকালে ও সর্বদেশে এই বিষয় দুইটির আলোচনা হইয়া থাকে। যতপ্রকার লিখিত শাস্ত্র স্বদেশে ও বিদেশে

দৃষ্ট হয়, সে-সমুদয়ই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমালোচনায় পরিপূর্ণ। আৰ্য্যজাতির বৈদিক শাস্ত্র, মুসলমানদিগের কোরাণ, খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেল ও বৌদ্ধ-সমাজের বেদ-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান সমুদয়ই ইহার প্রমাণ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ক যে মানব-জাতির একটি প্রধান তত্ত্ব, তাহা পূর্বোক্ত বিশাল আলোচনার দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয়। যখন সর্বকালে ও সর্বদেশে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা ও সম্যক্ বিচার হয়, তখন ঐ বিষয়টি যে সত্যমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক

মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া কিছুদিবস পরে কোন ব্যক্তিই সমাগত হয় নাই ; অতএব ‘জীবের দেহ-বিয়োগের দ্বারা যে অস্তিত্বের অভাব হয় না’—এই প্রকার বিশ্বাসের প্রমাণ কি ? এই বিশ্বাসের সাধারণতাই ইহার একমাত্র প্রমাণ বলিতে হইবে। উত্তর-কেন্দ্রস্থ কোন পুরুষ এবিষয়ে দক্ষিণ-কেন্দ্রস্থ পুরুষের সহিত বিবাদ করেন না, বরং আত্মার অমরত্ব সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত। যদিও অনেকানেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি কুতর্ক-সহকারে এবং অসদালোচনার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অমরতা বিশ্বাসকে নিরস্ত করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাদের দ্বারা জগতের সাধারণ বিশ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে না। আৰ্য্য-প্রদেশে ‘চার্বাক’ প্রভৃতি এবং অপরাপর দেশে ‘সারডেনপ্লাসাদি’ অনেক অনিত্যবাদী পাষাণের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি আত্মার অমরতার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, তাহার উচ্ছেদ হয় নাই।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-আলোচনার প্রস্তাবনা

পূরমেখরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবের আনন্ত্যে নিশ্চয়তা প্রভৃতি যে-সমস্ত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বিষয় আছে, তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ক তত্ত্বও প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই বিষয়ের বিচার লিপিবদ্ধ হইয়া পুরুষানুক্রমে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অখিল বেদও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিতেছে। এই সমুদয় বিষয় নিম্নে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ের আলোচনা যে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা লিখিত হইবে।

ভারতের ৮-১০ শতাব্দী পূর্বের কাল অবস্থা

এখন সহস্র বৎসর বিগত হয় নাই, আৰ্য্য-বিরোধিগণ আমাদের আৰ্য্যভূমিকে হস্তগত করিয়াছিল। তাহাদিগের ভাষা, স্বভাব, চরিত্র ও ধর্ম এদেশের পক্ষে

অতিশয় বিরুদ্ধ হওয়ায় আমাদের পূর্ব-পুরুষ মহোদয়গণের অধিকতর ক্রেশ হয় । তাহারা স্বভাবতঃ ও ধর্মতঃ নিষ্ঠুর থাকা-প্রযুক্ত এদেশের সমুদয় বিষয়ের হ্রাস হইতে লাগিল । যে-দেশে কবি-গুরু বাল্মীকি ও জ্ঞানিপ্রবর বেদব্যাস স্মৃতি সংকলিত-ভাষায় নানাবিধ ছন্দে কৃত কৃত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, যে-দেশে হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্মিক নৃপতিসকল প্রজার সুখ-বৃদ্ধির জন্ত আপনাপন শরীর ও ইন্দ্রিয়বল ক্ষয় করিয়া বান্ধকের সহিত অলিপন করিয়াছিলেন, যে-দেশে সাবিত্রী, অরুন্ধতী, বৃন্দা প্রভৃতি মহিলাগণ সতীত্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ঐতিহাসিক যশাকাশের নক্ষত্ররূপে দেদীপ্যমানা হইয়াছিলেন, সেই ভুবনবিজয়ী ভারতভূমি * * * খজাধারী ব্যক্তিদিগের হস্তে যে কতই দুর্দশাপ্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না ।

প্রাচীন ভারতের দুর্দশাহেতু নানা অপধর্মের উৎপত্তি

বেদশাস্ত্র লুপ্ত হইল, জ্ঞান গুপ্ত হইল এবং আর্ঘ্য-চৈতন্য একবারে নীত-কালের সর্পের ত্রায় স্তম্ভপ্রায় রহিল । ব্রাহ্মণদিগের তর্কসকল সুদীর্ঘ পুস্তকের অন্তর্ভাগে স্থান গ্রহণ করিয়া তটস্থভাবে রহিল । ক্ষত্রিয়সকলের শৌর্য ও বীর্য কেবল শয়নাগারে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল । অপরাপর জাতিসকল স্বীয় ধর্মের আশ্রয়ের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া বেদ-বিধি ভঙ্গ করিতে লাগিল । যদিও এই প্রকার আপৎকালে অনেকের পক্ষে নিবৃত্তি-ধর্মই অবলম্বনীয় হয়, তথাপি কক্ষফলানুসারে আর্ঘ্য-বংশীয় পুরুষেরা বেদ-ধর্মের অতিক্রমণ করত অনেকপ্রকার স্বকপোল-কল্পিত উপধর্মের সৃষ্টি করিয়া তদনুযায়ী কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

ইংরাজ-শাসনে ভারতীয় যুবকদের অধঃপতন

ইংলণ্ডীয় পুরুষদিগের এতদেশে আগমন হওয়ায় আমরা অনেক সুখ পাইতেছি । কিন্তু কোন ঘটনাই অমিশ্র সুখ দিতে সক্ষম হয় না । ইংরাজদিগের ভারতবর্ষাধিকার হওয়ায় যেমন আমাদের অধিক সুখ হইয়াছে, তদুপায় আমাদের কোন কোন বিষয়ে অমঙ্গলও হইয়াছে । ইংরাজেরা এ প্রদেশে স্বীয় ভাষার দ্বারা অনেকপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রদান করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । আমাদের নব্য-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান অর্জন করত ও তাঁহাদের প্রকাশিত ধূম্রজ্ঞান, তড়িঘাত্তাবহ প্রভৃতি যন্ত্রসকল দর্শন করত একেবারে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিতেছেন । ইহাতে অনেক ভয়ঙ্কর

দোষের উৎপত্তি হইতেছে। আৰ্য্য-ভাষা ও তদন্তর্গত বিশাল ও নির্মল জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে। এ বিষয়ের প্রমাণ অতি শীঘ্রই হইতে পারে। কোন একটি রুতবিশিষ্ট ইংরাজী-বিদ্যার অধ্যাপককে পরমপূজনীয় সর্ববেদসার সাক্ষাৎ সামবেদরূপী শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে হাস্য করিয়া উহাকে পুরাতন পুস্তক কহিয়া কোটরস্থ করিতে উপদেশ দিবে। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের আধ্যাত্মিক পরম-রমণীয় অপ্ৰাকৃত বৃত্তান্ত-সকলের সারবত্তা বুঝিতে না পারিয়া লাম্পট্যোদ্বেগী অসার পুস্তকের মধ্যে উহাকে পরিগণিত করে। আহা! কতদূর মূর্থতা! এ সকল বালকেরা একণে বুদ্ধি হইয়া অনেক দল-বল সংস্থান করত কয়েকটি উপধর্ম স্থাপন করিয়াছে। সে যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় প্রাকৃত বিজ্ঞান-সকলই যে মানবজাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ঐ সকল অপক ব্যক্তিগণ অপ্ৰাকৃত তত্ত্বকে স্বপ্নবৎ ভাণ বলিয়া স্থির করে। ইহাতে ইংরাজ-দিগের দোষ কি?

বাইবেলের নিবৃত্তি-মার্গ আচ্ছাদিত হইয়া সম্প্রতি

বিজ্ঞান-প্রভাবে প্রবৃত্তি-মার্গের প্রাধান্য

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ভাবের উদয় করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পাঠকবর্গেরা এই বিষয় অবগত হউন, যে ইংরাজ-সংসর্গে আৰ্য্যবংশীয় ব্যক্তিগণ নিবৃত্তি-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য বোধ করিয়াছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটির মধ্যে ‘সারমার্গ প্রবৃত্তি,’—এইরূপ তাঁহারা স্থির করেন, নিবৃত্তি-মার্গকে পূর্বকালের ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে-প্রকার সঙ্গ হয় তদ্রূপই জীবের বিচার, সিদ্ধান্ত ও স্বভাব হইয়া উঠে, ইহা ভূরি ভূরি শাস্ত্রে কথিত আছে। ইংরাজেরা সম্প্রতি ইন্দ্রিয় ও মনোবলের প্রাচুর্য্যে প্রবৃত্তি-মার্গকে ভগবদ্ভাক্ত্যের একমাত্র পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ‘সম্প্রতি’-শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের অবতার বা ধর্মগুরু খ্রীষ্ট স্বীয় প্রকাশিত ধর্মে উভয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গ স্বীকার করত তন্মধ্যে নিবৃত্তির উৎকৃষ্টতা স্থাপনা করিয়াছেন।

যিশুর নিবৃত্তি-মার্গের উপদেশ

একব্যক্তি যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে গুরো! অনন্তায়ুঃ পাইবার জন্য কি কর্তব্য?” যিশু কহিলেন, “যদি সাংসারিক ধর্মসকল প্রতিপালন করিয়াও এপ্রকার প্রশ্ন কর, তবে শুন, তোমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর এবং আমার অনুগামী হও।” সে ব্যক্তি এই পরামর্শে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় যিশু তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন, “দেখ বিষয়িলোক-

দিগের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্ঘটনীয়।" পুনরায় কহিলেন, "যে মহাশয় আমার পথানুগামী হইবার জন্ত গৃহ, ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা, মাতা, ভাৰ্য্যা, কি শিশুবালাক-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের অধিক লভ্য হইবে এবং তাহারা অনন্ত আয়ুর অধিকারী হইবে।"

বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানগণ যিশুর মতবিরোধী

যিশুর এই প্রকার অনেক উপদেশ আছে। যিশু যে একজন বৈরাগী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্প্রতি যে খ্রীষ্ট-ধর্ম শিক্ষিত হয়, তাহা খ্রীষ্টের উপদেশের সহিত ঐক্য হয় না, নতুবা খ্রীষ্টিয়ান জাতিসকল রাজ্য-লাভের জন্ত প্রাণবধ ইত্যাদি স্বীকার করিত না। যুদ্ধ করা একপ্রকার পশু-বৃত্তি বলিতে হইবে, অতএব বৈরাগ্যধর্ম-বিরোধী, ইহাতে আর সংশয় নাই।

প্রটেস্ট্যান্ট লুথারের প্রবৃত্তি-মার্গ—যিশুর বিশুদ্ধ মত নহে

হে ভাগবতমহোদয়গণ! খ্রীষ্টের এই উপদেশে কি নিবৃত্তি-মার্গ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইল না? ইংরাজ-মহাশয়েরা খ্রীষ্ট হইতে "কি স্বতন্ত্র হইলেন না? কেবল যে প্রবৃত্তি-মার্গ শ্রেষ্ঠ, এরূপ সকল ইংরাজগণ কহেন না সত্য, কিন্তু ঐহারা নিবৃত্তি-বিদ্যেয়ী, তাঁহারা 'লুথর' নামক কোন ধর্মসংস্কার শিষ্য। 'লুথরে'র সময় হইতে তাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গই উপাসনার একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক 'প্রটেস্ট্যান্ট', অর্থাৎ 'লুথরের' শিষ্যসমূহ সম্মাসাবলম্বী পুরুষদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া বলেন। কিন্তু রুশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশে লুথরের মত বিশেষরূপে গ্রাহ্য না হওয়ায়, তথাকার পাদরীগণ কখন কখন আমাদের বৈরাগী ও মোহান্তদিগের ন্যায় স্ত্রী-সন্তোকে বিরত হইয়া নিঃসঙ্গ-ভাবে উপাসনা করেন। ঐ মতকে 'কেথলিক' অর্থাৎ খ্রীষ্টের যথার্থ মত কহা যায়। 'লুথর' খ্রীষ্ট-বাক্য-সকলের লক্ষণা দ্বারা স্বতন্ত্রার্থ করত নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লুথার-পন্থী ভারতীয় যুবকদের ঘৃণিত বিচার

আমাদের দেশে যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পরিব্রাজক বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষৎ সকলের গোণার্থের দ্বারা মায়াবাদরূপ অসচ্ছাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে 'লুথর'ও তদ্বৎ বাইবেল-শাস্ত্রের গোণার্থ করিয়া নিবৃত্তি-মার্গকে ভ্রমমার্গ কহিয়া প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের নবীন ইংরাজী বিদ্যার্থীগণ পূর্বোক্ত ইংরাজ-ভক্তির দ্বারা আদ্রচিত্ত হইয়া এই প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। সম্মাসী ও বৈরাগিসকলকে দেখিলে তাঁহাদের এই বলিয়া

দুঃখ হয় যে, আহা! এপ্রকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সংসারের উন্নতির পক্ষে অকর্মণ্য হইয়াছে। ইহারা যদি বিবাহাদি করিয়া ভূমি-কর্ষণাদি ক্রিয়া করিত, তাহা হইলে ভূদেবীর অনেক দুঃখের লাঘব হইত।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির তারতম্য-বিচারে চারিটি প্রমাণ

এই প্রকার যাহারা বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে মূর্খ, এমত আমরা বর্ণনা করি না, বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন। কিন্তু রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট মানব ভ্রমশূত্র হইতে পারে না; অতএব তাঁহাদেরও যে ভ্রম থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? প্রবৃত্তি-মার্গের পক্ষাবলম্বী বস্তুতঃ অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এই বিষয় বিচার করিতে হইলে শ্রীশ্রীভাগবতোক্ত চারিটি প্রমাণের অবলম্বন করা কর্তব্য।

প্রমাণ-চতুষ্টয় অবলম্বনে লেখকের নির্ভীক আলোচনা আরম্ভ

“শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।” (ভাঃ ১১।১২।১৭)। অখিল শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, ইতিহাস ও যুক্তি এই চারিটি প্রমাণ অবলম্বন করিলে বিচার নিশ্চল হইবে। আমরা বিচার-কালে কোন মনুষ্যের পাণ্ডিত্যে ভীত বা ভ্রান্ত হইব না। আমরা স্বাধীনতার সহিত বিচার করিব। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু আমাদের এইরূপ কহিয়াছেন।—

স্বাধীনতা-রত্ন হয় ঈশ্বরের দান।

তাহারে ত্যজিতে কভু নারে বুদ্ধিমান্ ॥

নিশ্চল যুক্তি, শাস্ত্র, ঐতিহ্য ও প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, তাহা আমাদের নিতান্ত পূজ্য। শঙ্করাচার্য্যের ছায়া পণ্ডিতসকলে যদিও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বিশ্বাস করিবেন, তথাপি তাহাতে আমরা বিচলিত হইব না। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন বলিয়াই যে প্রবৃত্তি-মার্গ সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে, এমত বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজেরাও মনুষ্য। আমাদের নব্য মহোদয়েরা যে প্রাপ্ত সাধ্যভ্রমের বশীভূত হইয়া আর্ধ্য-প্রকাশিত নিবৃত্তি-পথকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এটিও তাহাদের বহু ভ্রমের মধ্যে একটি প্রধান ভ্রম। এক্ষণে মূল বিষয়ের বিচার করা যাউক। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-চরণে প্রার্থনা

(মন !) প্রজন্ম ছাড়িয়া, বদন ভরিয়া,

শ্রীরাধাগোবিন্দ বল না ?

আন কথা ছাড়ি', চিন্ত সदा হরি,

ভব-রেশ তব রবে না ॥

ব্রজ পরিহরি', অজেশ শ্রীহরি,

রাধাজ করিয়া ধারণা ।

(রাধা) প্রেম আশ্বাদিতে, উদি' নদীয়াতে

গৌররূপে—তুমি জান না ??

নাহি স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র জ্ঞান,

সবে যাচে প্রেম—লও না ?

অনর্পিত প্রেম, লক্ষ যেন হেম,

কোন যুগে কেহ লভে না ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, দাতা হেন অশ্রু,

হয় নাই কভু হ'বে না ।

হেন দয়াময়, প্রভু গৌরায়,

পায় নাই কেহ পাবে না ॥

সঙ্গে নিত্যানন্দ, ত্রিজগৎ-বন্দ্য,

প্রেমের মুরতি দু'জনা ।

নিতাই, চৈতন্য, বলি' হও ধন্য,

তোমার কি আর ভাবনা ??

ওরে দুষ্ট মন ! না কর স্মরণ,

তাঁদের অপায় করুণা ।

পেয়ে কলি ধন্য, নিতাই-চৈতন্য,

বদান্তের নাহি তুলনা ॥

জয় জয় গুরু, বিশ্ব-কল্লতরু,
 অধমে কর হে করুণা ॥
 অজ্ঞান নাশিয়া, কেশ আকর্ষিয়া,
 চরণে সদাই রাখ না।
 যুধিবে জগতে, দয়া ভালমতে,
 রাতুল চরণে প্রার্থনা ॥
 অহৈতুকী দয়া, কর হে উদয়া,
 এমন সুপাত্র পাবে না।
 সেই দয়া বই, কোন গতি নাই,
 গুরুপদে দীনার প্রার্থনা ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
 সাং বানারিপাড়া, (বরিশাল)

ভক্তিকথা

(পূর্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

আমরা ভগবানকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া যে উদাহরণ দিয়া থাকি, তাহা ‘শাখাচন্দ্র-
 তায়’ মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কল্পবৃক্ষ অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ভগবানকে
 কল্পবৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে আংশিক গুণ
 প্রকাশিত হয় মাত্র। কল্পবৃক্ষের নিকট যিনি যাহা যাচঞা করেন তিনি তাহা
 প্রাপ্ত হন মাত্র, পরন্তু কল্পবৃক্ষের আশ্রিত ব্যক্তির কল্পবৃক্ষের প্রতি কোন আসক্তি
 নাই। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের মধ্যে যে আসক্তি-জনিত পরস্পর আদান-
 প্রদানের নিয়ম আছে, তাহাই মাধুর্য্যময়। কস্মিন্-জ্ঞানি-যোগিগণকে সেই সেই
 বিষয়গত ফল প্রদান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কল্পবৃক্ষের সহিত তুল্য হইতে পারেন,
 কিন্তু পরস্পর আসক্তি-প্রবৃত্তি তিনি তাঁহার নিজ-ভক্তগণের নিকট কল্পবৃক্ষ
 অপেক্ষাও অধিক উপাদেয়। সুতরাং সেই ভগবানকে ‘ভক্তবৎসল’ বলিলেই
 তাঁহার করুণার সম্যক পরিচয় প্রদান করা হয়।

পিতা হিরণ্যকশিপু এবং পুত্র প্রহ্লাদ উভয়েই যে-যেভাবে ভগবানের
 সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, ভগবানও তাঁহাদের উভয়ের প্রতি সেই সেই-

ভাবে প্রতি-ব্যবহার করিয়াছেন। ‘ভগবান্ সর্বত্র বর্তমান থাকিতে পারেন কি না’—হিরণ্যকশিপু এই কথায় অবিশ্বাস করিয়াই ভক্ত প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহার ভগবান্ স্তম্ভের মধ্যে আছেন কি না? আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ভক্ত প্রহ্লাদের সেইপ্রকার অবিচ্যুত দৃঢ়-বিশ্বাসের প্রমাণ দিবার জন্ত স্বয়ং নৃসিংহরূপে সেই স্তম্ভের মধ্য হইতেই বাহির হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবানকে নিজ শত্রু বলিয়া বিচার করিতেন, সুতরাং ভগবানও তাঁহার শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়া শত্রুর যে কার্য্য তাহাই সম্পাদন করিয়া হিরণ্যকশিপুর বুদ্ধির অগোচর নথর দ্বারা তাহাকে ছিন্নবিছিন্ন করিয়াছিলেন; আর ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবানকে সর্বদাই নিজ প্রভু বলিয়া স্বরণ করিতেন বলিয়া, তাঁহাকে ভগবান্ হিরণ্যকশিপুর অমানুষিক অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। ‘পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্’—এই কথার যথার্থ অর্থ এইস্থানেই প্রকাশিত হইয়াছে। সাধুগণের পরিত্রাণ-কালে ভগবানের আবির্ভাব হইলে আত্মসজ্জিকভাবে অসাধুর বিনাশ-কার্য্য সাধিত হয়, নচেৎ কেবল অসাধুর বিনাশ-কার্য্যের জন্ত ভগবানের বিবিধ শক্তিই যথেষ্ট কার্য্যকরী হইতে পারে। এইপ্রকার কার্য্যের দ্বারাই ভগবানের সমতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ যিনি যে ভাবে বা যে রসে ভগবানের সহিত সম্বন্ধিত, ভগবানও তাঁহার সহিত সেইভাবে বা সেই রসে প্রকাশিত। এইপ্রকার বিচিত্র কার্য্যাদির দ্বারা ভগবান্ নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না, পরন্তু তিনি যে অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তম—ইহাই প্রমাণিত হয়।

প্রাকৃত জগতে যেমন দেখা যায়—প্রত্যেকেই নিজ-নিজ দাস, বন্ধু, পুত্র এবং কলত্রাদির প্রতি সাধারণভাবেই আসক্ত থাকেন, সেইপ্রকার অপ্রাকৃত জগতেও ভগবান্ তাঁহার অপ্রাকৃত দাস, বন্ধু, পুত্র এবং কলত্রাদির প্রতি স্বাভাবিক-ভাবেই আসক্ত থাকেন। প্রাকৃত-জগতে যেমন কেহ অত্র কাহারও দাস, বন্ধু প্রভৃতির সহিত আসক্ত হন না, অপ্রাকৃত জগতেও ভগবান্ অত্রাত্ম দেবতাগণের দাসের প্রতি আদৌ আসক্ত নহেন। অপ্রাকৃত জগতের বিকৃত-প্রতিফলনই এই প্রাকৃত জগৎ। বিকৃত-প্রতিফলন বলিয়াই প্রাকৃত দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য-রসের তিক্ততা, হেয়তা প্রভৃতি সর্বদাই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু ভগবানের সহিত আমাদের যে অপ্রাকৃত শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য-রসের সম্পর্ক আছে, তাহার উদ্বোধন হইলে আর আমাদের তিক্ততা বা হেয়তা অনুভব করিবার অবকাশ থাকে না।

এইস্থানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তগণের প্রতি আসক্ত হন, তাহা প্রাকৃত কোন জন্ম-ঐশ্বর্য-বিদ্যা বা শ্রীর বলে নহে। ভগবানের সহিত অপ্রাকৃত সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইতে হইলে প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা বা শ্রী কোনটাই আমাদের সুবিধা করিয়া দিতে পারে না; বরং অপরপক্ষে প্রাকৃত নীচকূলে জন্ম, ধন-হীনতা, অজ্ঞানতা এবং সৌন্দর্য্য-হীনতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট গুণও ভগবৎ প্রাপ্তির কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এইখানেই ভগবানের সমতার পরিচয়। প্রাকৃত জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা-শ্রী থাকিলে, বা না থাকিলে, কিছুই যায় আসে না। একমাত্র প্রীতি বা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলেই ভগবান্ সেই সেই সেবকের প্রতি আসক্ত হন। ভগবদ্ ভক্তই ‘সাধু’-নামে পরিচিত। সুতরাং সাধুর পরিচয় হইবে ভগবদ্ভক্তির পরিচয়ে; জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা বা শ্রীর সহিত সাধুর কোন সম্বন্ধ নাই। ক্ষয়িষ্ণু যক্ষা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যে জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা বা শ্রী, তাহার কোনটাই উপাদেয় নহে; কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির নীচকূলে জন্ম, ধনহীনতা, অজ্ঞান বা সৌন্দর্য্যহীনতা সমস্তই উপাদেয়। সেই প্রকার মায়াহুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু জগতের সমস্ত ধন, ঐশ্বর্য্য, জন্ম বা শ্রী কোনটিরই স্থায়ী মূল্য নাই, আর ঐগুলি না থাকিলেও যাহার সামান্য ভগবদ্ভক্তি আছে, তাহার মূল্য বা সম্মান অনেক অধিক। ভগবদ্ভক্তিবহীন ব্যক্তির জন্ম-ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-তপ-তপ সমস্তই মৃত ব্যক্তিকে সাজাইয়া লোকরঞ্জন-কার্য্যের হায়া।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণের অনগ্রা ও অব্যাভিচারিণী ভক্তি আছেন কিনা, তাহাই যাচাই করেন। প্রাকৃত জন্ম-ঐশ্বর্য্য আছে কিনা, সে হিসাব তিনি রাখেন না। তাই তিনি শ্রীগীতায় তাঁহার সমতার পরিচয় আরও ভালভাবে দিলেন। যথা—

অপি চেৎ সূহৃদ্রাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ ॥ (গীঃ ৯।৩০)

এইস্থানে দৃঢ়তার সহিত বুঝা আবশ্যক যে, “ভজতে মামনন্তভাক্” অর্থে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন বুঝায়। যাহার বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরাংপর-তত্ত্ব, আর সমস্তই তাঁহার অংশ-কলা ও শক্তিতত্ত্ব, তিনি একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করেন। তিনি যদি স্বভাববশতঃ সূহৃদ্রাচারও হন তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ‘সূহৃদ্রাচার’ শব্দে চোর, লম্পট, পরহিংসা-পরায়ণ ইত্যাদি বুঝায় এবং ‘সু-সূহৃদ্রাচার’ শব্দে তাহা অপেক্ষাও অধিক বুঝায়। অতএব তদ্রূপ অবস্থাতেও

জাগতিক দৃষ্টিতে অসদাচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি একান্তভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন এবং কৰ্ম্ম-জ্ঞান-অন্ত্যভিলাষ-পরিবর্জিত হন, তাহা হইলে সেইসকল অনন্তভাক্ ভক্তগণকে সাধু-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রাকৃত সদগুণ বা অসদগুণের সহিত সাময়িক কিছু সম্বন্ধ থাকিলেও, সেগুলি ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নহে; সেইসকল গুণের নিত্যত্ব কিছুই নাই। অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ এবং ভগবানের নাম-গুণ-লীলা-পরিকর হইতে অভিন্ন বলিয়া কোনই অনিত্য বস্তুর সহিত তাহার তুলনা হয় না। সেই প্রকার বহু-মূল্য বস্তুর সহিত সামান্য সংস্রবই বহুভাগ্যের পরিচয়। প্রাকৃত বহু-মূল্য বস্তু কোনদিনই তাহার তুল্য হইবে না। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বহুপ্রকার হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত মূলশ্লোকের “মন্তব্য”-বাক্যটির প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। যে-বিষয় উত্তমরূপে বিচার করা যায়, তাহারই সিদ্ধান্তকে ‘মন্তব্য’ স্থির করা হয়। আবার সেই বিষয়ের বিচারক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাঁহার ‘মন্তব্য’ সকলেরই শিরোধার্য্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আবার ‘মন্তব্য’ কথাটি একটি বিধিবাক্য। হয়ত অনেকে বলিবেন—দুরাচার-সম্পন্ন কৃষ্ণভক্তকে আংশিক সাধু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য অতরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে (মূল-শ্লোকে) ‘এব’-শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন—আংশিক নহে। এস্থলে ‘অনন্তভাক্’ কৃষ্ণভক্ত সম্পূর্ণ সাধু—এই বিচারই সর্ব্ববাদি-সম্মত। নিঃশুণ বস্তুর সহিত সংযোগই সাধুত্বের পরিচয়। যেমন গঙ্গাজলের স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইতর প্রণালিকার জলও গঙ্গাজলে পরিণত হইয়া যায়, সেইপ্রকার নিঃশুণ বস্তুর সহিত সংযোগেই প্রাকৃত দোষ-গুণ সবই নষ্ট হইয়া নিঃশুণ হইয়া যায়। অতএব ‘অনন্তভাক্’ কৃষ্ণভক্তির সহিত সংযোগ মাত্রই দুরাচারগুলির দুরাচারত্ব তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যেখানে দুরাচারত্বের বিবোদ্ধার নাই, সেইখানেই সাধুত্বের পরিচয়—ইহাতে আর সন্দেহ কি? অগ্নি-সংস্পর্শে সমস্ত দূষিত পদার্থই নির্দোষ হইয়া যায়। ইহ-জগতে যেখানে যত প্রকারের প্রাকৃত গুণ-সংস্পর্শে নীচ, পাপী, দুর্জাতি, দুরাচার ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে, তাহারা যদি একবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তাহা হইলে সকলেই সাধুর শিরোমণি হইবেন। সকলেই সাধু হইয়া গেলে ইহজগতে ঐক্য, সাম্য এবং শান্তির অভাব হইবে না। ইহজগতে যদি বাস্তবিক ঐক্য, সাম্য এবং শান্তি আনিতে হয়, তাহা হইলে

মনোধর্মে চালিত হইয়া এটা-সেটা করিলে ফল হইবে না ; পরন্তু একমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারের দ্বারাই ঐ কার্য সম্পাদন হইতে পারে। এই মন্তব্যের খণ্ডন করিবার জন্ত জগতের কোন ব্যক্তিই বর্তমান নাই। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এই মন্তব্যই প্রচার করিবার জন্ত ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যবহারিক জগতে এক ব্যক্তি কেবলমাত্র অন্তঃকৃষ্ণভক্তির জন্ত সাধু বলিয়া গণ্য হইলেও, তাঁহার নীচ-কুলে জন্ম, স্বভাবগত ব্যভিচার ইত্যাদি দোষ সামাজিক চক্ষে সর্বদাই প্রকট থাকিবে। এবং তাঁহাকে মনে-মনে সাধু ভাবিয়া লইলেও সত্য-ভব্য-সমাজ তাঁহার সহিত আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পানাদি ও আদান-প্রদান করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিবেন। সেইপ্রকার প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ স্বয়ংই নিম্ন-লিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রীতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণয়তি ॥ (গীঃ ৯।৩১)

বন্দুকের বারুদে যে প্রকার একবার মাত্র অগ্নি-সংযোগ করিতে পারিলেই আর রক্ষা নাই, সেইপ্রকার ছলে-বলে-কৌশলে কোনপ্রকারে যদি জীব-হৃদয়ে একবার কৃষ্ণভক্তি উদয় করান যায়, তাহা হইলে জীবের সর্বার্থ সিদ্ধি হয়। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ দেখা যায়—কর্মা, জ্ঞানী, অত্যাভিলাষী এবং যোগিগণের মধ্যে অনেকেই ভাগ্যশুণে কৃষ্ণ-ভক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত অত্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ এই যে, স্বরূপতঃ জীবমাত্রেই কৃষ্ণভক্ত বা কৃষ্ণদাস, কিন্তু ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত হইয়া তাহাকে কৃষ্ণভক্ত, অত্যাভিলাষী-সুজ্জায় সজ্জিত দেখা যায়। কৃষ্ণভক্তি কোনপ্রকার বাহ্যিক আরোপিত বস্তু নহে। “নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ‘সাধ্য’ কভু নয়”। যেমন আতস-বাজী অগ্নি-সংযোগের পূর্বে সামান্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হইলেও, অগ্নি-সংযোগের অব্যবহিত পরে তাহার অন্তরূপ দেখা যায় ও সে অপূর্ব আলোক-রশ্মি বিস্তার করে, সেইপ্রকার স্বরূপতঃ নিত্য-‘কৃষ্ণদাস’ জীবগণকে মায়ার আবরণে বাহ্যিক মলিন দেখাইলেও তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকারে কৃষ্ণভক্তি-রূপ অগ্নি সংযোজিত হইলে, তাহাদিগকে জগতের সর্বাপেক্ষা ধর্ম্মাশ্রয় হইতেও অধিক শৃণ-সমন্বিত দেখা যাইবে। ‘কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত’। সুতরাং সেই ধর্ম্মাশ্রয়ের চির-শান্তি লাভ হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

কৃষ্ণভক্তি লাভ হইলে দেবতাগণের ব্যবহার এবং আচার তাঁহাতে শীঘ্রই দেখা যাইবে। দুরাচারত্ব-বর্জিত হইয়া তিনি অচিরেই অমানী এবং দৈন্ত্য-গুণে বিভূষিত হইবেন। কৃষ্ণভক্তির সংশ্বে তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত অভদ্র-ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই তাঁহার তথাকথিত স্তুরাচার-গুলির পরিণাম ভাবিয়া তিনি মনে-মনে ‘হায় হায়’ করিতে থাকেন; প্রবল অমুতাপ-নিবন্ধন শীঘ্রই সৰ্ব্বাপেক্ষা ধৰ্ম্মাত্মা হইয়া সৰ্ব্বগুণাযুক্ত হন। এবং নিজ অপ্রাকৃত দৈন্ত্য দ্বারা নিজকে ধিকার করিতে করিতে নিত্য-শাস্তিময় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রথম অবস্থায় এই মঙ্গলময় ভাব স্বল্পভাবে নিহিত থাকিলেও অবিলম্বেই তাহা প্রকটিত হইবে—ইহাই শ্রীভগবানের মন্তব্য। জ্বর হইয়াছে, এমত অবস্থায় কুইনাইন্ সেবন করিলেই জ্বর ছাড়িবে—ইহা আমাদের জানা কথা। কিন্তু কুইনাইন্ সেবনের অব্যবহিত পরেই বিগতজ্বর না দেখা গেলেও যে রূপ কিছুক্ষণ পরেই জ্বর অপসারিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করা মাত্রই যদি স্তুরাচারগুলির অবসান না দেখা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তাহার স্তুরাচারত্বের ঔষধ প্রয়োগ হইয়াছে; শীঘ্রই তাহার ঐসকল দোষ অপসারিত হইবে। সুতরাং, এস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-ভক্তিই সাধকের সাধুত্বের পরিচয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবৈদ্য

এডিটর, ব্যাক টু-গডহেড্

অতিথি-সংকার

সকল শাস্ত্রেই অতিথি-সংকারের কথা দেখা যায়। অতিথি-সংকার সকলের নিত্য-কর্তব্য ও ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেব ও অন্যান্য মহাজন-গণ সকলেই অতিথিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিথিসেবা ও দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

“প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যাভার’।

দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥

দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি’।

অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি ॥

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে ।
 যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাঁকারে ॥
 কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ ।
 সবা' নিমন্ত্ৰেন প্রভু হইয়া হরিষ ॥
 সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে ।
 কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥
 ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে-মনে ।
 'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে ?'
 চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্ জনে ।
 সকল সম্ভার আনি' দেয় সেইক্ষণে ॥
 তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম-সন্তোষে ।
 রাঞ্জন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে ॥
 সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া ।
 তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥
 এইমত যতেক অতিথি আসি' হয় ।
 সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময় ॥
 গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম ।
 "অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম ॥
 গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে ।
 পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে ॥
 যার বা না থাকে কিছু পূর্বাদৃষ্ট-দোষে ।
 সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥
 তৃণানি ভূমিরুদ্ধকং বাক্ চতুর্থী চ মনুতা ।
 এতাংপি সতাং গেহে মোচ্ছিক্তন্তে কদাচন ॥ (মহুসংহিতা)
 সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার ।
 তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার ॥
 'অকৈতবে চিত্ত-স্থখে যার যেন শক্তি ।
 তাহা করিলেই বলি 'অতিথিরে ভক্তি' ॥"
 অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে ।
 জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১-২৭)

এতৎপ্রসঙ্গে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

“প্রভু একদিকে যেমন দীন-ভুখী ও অতিথিগণের অভাব-মোচন করিতেন, অপরদিকে তেমনই চতুর্থাশ্রমী ত্যক্তগৃহ সম্মাসিগণের পরিচর্য্যার আদর্শও পুণ্যাত্মা ধার্মিক-গৃহস্থগণের পূর্ণাদর্শভূত স্বীয় গার্হস্থ্য-লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধার্মিক সদ্গৃহস্থই যে আশ্রমধর্মের আদর করিতে বাধ্য, তাহা জানাইবার জন্মই প্রভু পুণ্যময় গৃহস্থোচিত-ধর্মের পূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শ দেখাইয়া সম্মাসিগণের ভোজন, আশ্রয় প্রভৃতি প্রদান করিতেন। যাহারা ত্যক্ত-গৃহ চতুর্থাশ্রমী যতি, গৃহস্থের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তাঁহাদের দেশ-পধ্যটনকালে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য ভোজ্য ও আশ্রয়-প্রদান—প্রত্যেক বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালক গৃহস্থেরই একান্ত কর্তব্য। কালক্রমে হিংসাবশে গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমিগণকে তাঁহাদের গ্রাম্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করায় প্রকৃত আশ্রম-ধর্ম ক্রমশঃ লুপ্ত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি, কোন কোন গৃহস্থ একপণও মনে করেন যে, গৃহস্থ-হিতৈষী সম্মাসীকে গৃহস্থাশ্রম হইতে তাঁহার গ্রাম্য প্রাপ্য ভিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাঁহাদের পরম-ধর্ম। সঙ্গতিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য গৃহস্থের লীলা না দেখাইলেও প্রভু গৃহস্থগণকে সম্মাসিগণের সংকার-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্ম নিজ-গৃহে দশ-বিশ-জন সম্মাসীকে মধ্যে-মধ্যে নিমন্ত্ৰণ করাইয়া ভোজন করাইতেন।

যতিগণের সাধারণতঃ অগ্নি-ব্যবহার না থাকায় তাঁহাদের পাকাদি কার্য সাগ্নিক-ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই নির্বাহিত বা সম্পাদিত হইত। নিরগ্নিক যতি-সম্প্রদায় সাগ্নিক-বিপ্রের গৃহ-পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-গৃহে একটি বিষ্ণুমন্দির থাকিত এবং সম্মাসিগণও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পাচিত অন্নসমূহই সেবন করিতেন। বিপ্রের অপরের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত ইতরদেব-নৈবেদ্যে অমেধ্যাদি থাকিবার সম্ভাবনা-হেতু পরিব্রাজক যতিগণের বিপ্রের কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করিবার রীতি ছিল না। তিনি পুণ্যময় গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ধর্মাত্মত্বের আদর্শ প্রদর্শনোদ্দেশ্যে স্বয়ং সম্মাসিগণের নিকট বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবন করাইতেন।

বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত, পরিব্রাজক ও এক-তিথিকাল-অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল গৃহমেধী কেবলমাত্র নিজের জন্ম পাকাদি গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তিথ্যক্ জীব স্বীয় অভাব-নিবৃত্তি ও আহাৰ্য্য-সংগ্ৰহের জন্ম পৃথিবীতে ও আকাশে বিচরণ

করে ; উহাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ ‘সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীব’ বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মাহুষ্ঠান করিতে বাধ্য। যদি ঐবিষয়েই তাঁহারা বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও আশ্রয়-বিহীন নগ্ন পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবলমাত্র স্ব-স্ব-উদর-ভরণকারী জীব বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। মনুষ্যের স্ব-স্ব-উদর-ভরণ ব্যতীত বিষ্ণুসেবার জন্তই দ্রব্যাদি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার উচ্চ-অধিকার বর্ত্তমান ; তজ্জন্ত নারায়ণ-তোষণকাম জীব-হিতাকাজক্ষী পরিব্রাজক ও অতিথিগণের আশ্রয় ও ভোজন-প্রদানও তাঁহাদের সামাজিক বিধির অন্তর্গত। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাঁহাদিগকে পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা যাইবে।” (চৈঃ ভাঃ গোঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১-২৭)

গৌরপার্বদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামতে লিখিয়াছেন,—

“আতিথ্য দুই প্রকার—১। জন-প্রতি, ২। সমাজ-প্রতি। গৃহস্থব্যক্তি অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাঁহার যথাযোগ্য সেবা না করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকিবেন। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবেন। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্ত্তমানকালে ততবেলা পর্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে-সময় যিনি আহার করেন, তাহার পূর্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্তব্য সাধন হয়। অভুক্ত লোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়াযোগে সামাজিক আতিথ্য কর্তব্য।”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন,—“ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দূষণীয়। সংকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রকে অন্নাদি-দান, পীড়িতকে ঔষধদান, শীতার্ভকে বস্ত্রদান ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহার-যোগ্য পাত্র, তখন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কার্পণ্য-দোষ হয় না। কিছু না থাকে, মিষ্ট-বাক্যদ্বারা সকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাহার সহিত মিষ্টবাক্য দ্বারা, কাহার সহিত অর্থ-দ্বারা, কাহার সহিত শ্রম-দ্বারা সদ্যবহার করিবে। ব্যবহার-কার্পণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।” (চৈঃ শিঃ)

কঠোপনিষদেও দেখা যায়,—যখন নচিকেতা যমরাজের গৃহে উপস্থিত হন, তখন যমরাজ গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। নচিকেতা তথায় তিনরাত্রি বাস করেন। যমরাজ গৃহে ফিরিয়া আসিলে যমপত্নী বলিলেন,—“আমাদের গৃহে অতিথি অভুক্তবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার সংকার করা কর্তব্য।” যম নচিকেতার যথোচিত

সংকার ও পূজা করিয়া বলিলেন,—“তুমি আমার গৃহে অতিথি হইয়া তিনরাত্রি উপবাসী আছ, ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ ক্ষালনার্থ তোমাকে তিন রাত্রির জন্ত তিনটি বর প্রদান করিতেছি।” এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, প্রাচীনকালেও সনাতন-ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে অতিথি-সেবার প্রতি কিরূপ যত্ন ও মর্যাদা ছিল। বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ যমরাজও অতিথিসেবা-তৎপর ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠেও জানা যায় যে, কেহ কেহ নিজপ্রাণ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্র, এমন কি যথাসর্বস্ব-দান করিয়াও অতিথি-সেবা করিয়াছেন। শ্রীবলি-মহারাজের শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি দান কিংবা শ্রীঅম্বরীষ-মহারাজের শ্রীদুর্কাসার সেবার দৃষ্টান্ত অতিথি-সেবার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মা যশোদা, ধরাদেবী, শ্রোপদী, কল্লিণী ও দীতাদেবী প্রভৃতি সকলেই অতিথিসেবা-পরায়ণা ছিলেন।

শ্রীচেতন-ভাগবতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতা রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যান্।

দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন-নাম ॥

অকৈতর, উদার, পরম-বিষ্ণুভক্ত ॥

অতিথি-সেবনে, পর-উপকারে রত ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ : ৫।৪০-৪১)

শ্রীপার্কতীদেবীও শ্রীমহাদেবের সঙ্গে অতিথি-সেবা করিয়া থাকেন,—

পরম সন্তোষে হুঁছে অতিথি দেখিয়া।

পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥

পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে ॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগোপরাজ নন্দ ও শ্রীযশোমতী অতিথিরূপে আগত কণ্ঠমুনি প্রভৃতির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীধরাদেবী নিজের প্রাণ দিয়াও অতিথিসেবা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, অতিথিসেবন প্রভৃতি পরোপকার, উদারতা ও অকপটতা বৈষ্ণবতারই লক্ষণ। বৈষ্ণবগণ সকলেই অতিথিসেবা-তৎপর। লৌকিক ও সামাজিক অতিথিসেবা—সভ্য-সমাজনিষ্ঠ সংকল্প, ইহাতে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীহরি-পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

তোমার ভক্তির তত্ত্ব জীবে নাহি জানে । অপরাধময় ইহা কল্পনা-বিলাস ।
 প্রকাশিলে বেদচয় তাহার কারণে ॥ বিনাশিতে হৈলা প্রভো তোমার প্রয়াস ॥
 সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা তব মুখে শুনি' । রাম', নিম্ব, মধ্ব, বিষ্ণু চারি নিজ-দূতে ।
 প্রচারিল চতুঃশ্লোক তত্ত্ব-শিরোমণি ॥ পাঠাইলে জগতে ভক্তি প্রচারিতে ॥
 নারদের শিষ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস । খণ্ডিয়া 'সোহং'-তত্ত্বের কদর্থ-বিচার ।
 ভাগবত-রূপে গ্রন্থ করিল প্রকাশ ॥ কৃষ্ণ প্রভু, ভীষ্ম দাস, ভক্তি সদাচার ॥
 শুক, সূত, বলিরাজা আদি মহাজন । মতবাদ ছেড়ে নরে শাস্ত্র-মত ধরি' ।
 প্রচারিল তব ভক্তি-ধর্ম সনাতন ॥ নামের কীর্তন করে মহানন্দ করি' ॥
 কতদিন পরে ভক্তি বিলুপ্ত হইল । আচার্যের অভাবে লোকে ভক্তির তত্ত্ব ।
 ভাগবত বুরিতে শক্তি কারো না রহিল ॥ হারাইয়া স্থাপে পুনঃ মত অসংখ্যাত ॥
 নানা-মতবাদ সমাজেতে প্রবর্তিয়া । মায়াতে মোহিত-চিত্ত, তত্ত্ব নাহি জানে ।
 দেবতারে তোষে লোকে নর-বলি দিয়া ॥ যার যাহে ইচ্ছা তাহে সত্য বলি' মানে ॥
 বেদধর্ম বলি' লোকে তা'কে মাগু করে । পুনর্বার হৈল লুপ্ত ভক্তি-সদাচার ।
 রঞ্জিত হইল বেদী নরের কুধিরে ॥ অসত্যেই সত্য ব'লে লভিল প্রচার ॥
 সহিতে না পেরে তুমি 'বুদ্ধ'-রূপ ধরি' । 'আমি ব্রহ্ম' বলি' মত্ত হৈল শ্রেষ্ঠজন ।
 আসিয়া করিলে ধন্য এ অবনী পুরী ॥ ভক্তি হইল সোহং-জ্ঞানের সাধন ॥
 'অহিংসারে ধর্মরূপে সংস্থাপন করি' । সাকারেতে করি' পূজা লভি চিন্ত-শুদ্ধি ।
 সমাজের হাত হৈতে বেদ নিলে কাড়ি' ॥ সোহং-ধ্যান করে যত আছে মন্দবুদ্ধি ॥
 তোমার আজ্ঞায় শিব 'শঙ্কর'-রূপেতে । ভক্তির সে অপমান সহিতে না পারি ।
 এসে প্রচারিল জ্ঞান-ধর্ম অবনীতে ॥ নবদীপে অবতীর্ণ হৈলা গৌরহরি ॥
 দিল পুনঃ হাতে বেদ তত্ত্বের বিচার । পুনর্বার গীতা-ভাগবত হাতে ধরি' ।
 শুনি' লোকে মানো চিন্তে অতি চমৎকার ॥ প্রচারিলে গুরুভক্তি তুমি স্বয়ং হরি ॥
 'ভক্তির পোষক বেদ' ইহা না বাখানি । খণ্ডিলে জ্ঞান-বাদ যাতে দুষ্ট মত্ত ।
 শঙ্কর সাধিছে সদা অকল্যাণ-খনি ॥ জীবকে জানাইলে গুরুভক্তির তত্ত্ব ॥
 ভক্তিপর-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা না জানিয়া নরে । জ্ঞানে তুচ্ছ জানি' যত গুরু জ্ঞানীচয় ।
 মতবাদে 'মত' ব'লে সমাদর করে ॥ নামের কীর্তন করে হইয়া নির্ভয় ॥
 একারণে লভে নরে পরম দুর্গতি । ভারত ব্যাপিয়া উঠে শ্রীনাথের ধ্বনি ।
 'আমি ব্রহ্ম' বলি' করে বিষয়েতে রতি ॥ ব্রহ্মবাদী হৈল চূপ পরাজয় মানি' ॥

সংগোপিলে নিজরূপ চরাচর হৈতে । কেবল রহিল স্বাকী আসাম-প্রদেশ ।
 আরম্ভিল ব্যাখ্যা লোকে নিজ-নিজ মতে ॥ সে-কারণে চিন্তে গুরু অশেষ-বিশেষ ॥
 ভক্তির আচার্য্য হৈল জ্ঞান-উপদেষ্টা । আকর্ষিয়া আসামবাসী নাম 'নিমানন্দ' ।
 নাম-মন্ত্র দিয়া দেয় জ্ঞান মাত্র শিক্ষা ॥ হরিনাম দিয়া প্রেমে করিলা আনন্দ ॥
 নৈবেদ্য-আহার ছাড়ি' মদ্য-মাংস খায় । করিল আদেশ তবে প্রভু সরস্বতী ।
 ভবানীরে পূজি' সবে মহানন্দ পায় ॥ করিবে প্রচার আসামেতে বিষ্ণুভক্তি ॥
 ভাগবত ছাড়ি' পড়ে ত্রিনাথ-পাঁচালী । গুরুর আদেশ পেয়ে প্রভু নিমানন্দ ।
 চণ্ডী শুনে দেয় মহানন্দে করতালি ॥ প্রচারিল বিষ্ণুভক্তি করি' মহানন্দ ॥
 তোমার ভক্তে, তোমায় ভাবি' অম্বুদার । গুরুর শক্তিতে তিনি শক্তিমান হঞা ।
 সংশোধন করে লয় আচার-বিচার ॥ করিল প্রচার 'নাম' ঘরে-ঘরে গিয়া ॥
 জ্ঞান-ভক্তি এক মানে, কহে ভেদ মাই । দেশীয়-ভাষায় শাস্ত্র প্রণয়ন করি' ।
 'কালী-কাল' ভেদ যার সে বড় বালাই ॥ বিলাইল আসামেতে বহুধৈর্য্য ধরি' ॥
 উক্তরূপ চিন্তা-ধারা বিনাশ করিতে । এ অধম লভে 'নাম' সন্ধান পাইয়া ।
 পাঠাইলে এজগতে দুই নিজ দূতে ॥ সাধন-ভজন করে বিষয় ত্যজিয়া ॥
ডক্টিবিনোদ, আর প্রভু সরস্বতী । ভবু কেন মগ্ন হই সংসার স্নেহেতে ।
 এসে জানাইল সর্বজীবে ভক্তি-রীতি ॥ সে-কারণে পুড়ে মরি ত্রিতাপ-জ্বালাতে ॥
 আলোক-সুত্তের মত দুই মহাজন । কাম, ক্রোধ ছয়জনে মোরে বশ করি' ।
 ভ্রান্ত পথিককে করে পথ প্রদর্শন ॥ ভুঞ্জায় বিষয়-স্বর্থ সেবা-বুদ্ধি হরি' ॥
 বহু মঠ স্থাপি' কয়ে গুরুভক্তি দান । এবে কৃপা কর মোর ওহে প্রভুপাদ ।
 গ্রহণ করিয়া জীবে পায় পরিজ্ঞান ॥ ভূমিষ্ঠ হইয়া মাগি' তোমার প্রসাদ ॥
 শত শত লোক এসে শিষ্যত্ব লভিয়া । - যেখানে জন্মি না কেন, এই মোর আশ ।
 আনন্দেতে করে নাম নাচিয়া নাচিয়া ॥ জন্মে-জন্মে হই যেন তব দাস-দাস ॥
 সম্রাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী । গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় মতি হউ' মোর ।
 চতুর্ধা আশ্রমী সেবে গুরুপদ ধরি' ॥ কর আশীর্বাদ প্রভো, মায়া যাউ' দূর ।
 গুরুর আদেশ পেয়ে সবে তব ভক্তি । সনৎকুমার দাঁসে লইয়া শরণ ।
 করিল প্রচার ভবে যার যত শক্তি ॥ তুমি পদে করে আজ আত্ম-সমর্পণ ॥
 গুরুর শক্তিতে সবে শক্তিমান হঞা ।
 উদ্ধারিল সর্বদেশ ঘরে ঘরে গিয়া ॥

— শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী,
 ভাগবতভূষণ, (আসাম)

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর প্রবন্ধ

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর

পতিত ও পাতক-তারগণের চেষ্টা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্শ্বদ বাসুদেব-সার্বভৌম-শাখায় 'ভগবান্ আচার্য্যের' নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহরবাসী ছিলেন। আচার্য্য খঞ্জ ছিলেন। খঞ্জ-রূপ বপুসত্ত্ব দোষ দেখিয়া আমরা যেন ভক্তের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করি। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের 'কলা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ গুণ-বর্ণন করিয়াছেন—

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।

পরম-বৈষ্ণব তেঁহো। সুপণ্ডিত আৰ্য্য ॥

সখ্য-ভাষ্যাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার।

স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥

একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্য-চরণ।

মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করে নিমন্ত্রণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২৮৪-৮৬)

ইহারই গৃহে প্রভুর ভিক্ষাকালে ছোট হরিদাস মাধবীদেবীর নিকট হইতে সুস্বাদু তণ্ডুল ভিক্ষা করায় প্রভু বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে তাঁহার দ্বার প্রবেশ নিষেধ করিয়া, বৈষ্ণবদিগের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন নাই। এক বৎসর পরে ছোট হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া গন্ধর্ব্ব-দেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইয়াছিলেন। গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে মহাপ্রভু বলেন—“সকল ফলভুক পুমান্।”

ছোট হরিদাসের প্রকৃতি-সম্ভাষণ অস্বাভাবিক, আর শ্রীমতী রাধারাগীর গণের ৩০ জনের মধ্যে অর্দ্ধজন মাধবীদেবীর প্রতিও তাঁহার কখনই ভোগবুদ্ধি বা প্রকৃতিসম্ভাষণ-জনিত দোষ হইতে পারে না। তথাপি সদ্ধর্ম্মপালক জগদগুরু লোকশিক্ষক মহাপ্রভু নিরপেক্ষ-ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক ছোট হরিদাসের দ্বারা তত্ত্বগূহ বৈরাগীর কৃত্য সম্বন্ধে জগৎবাসীকে শিক্ষা দিলেন।

বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 'বৈরাগী' হইবেন। কোনরূপ পাপবাসনা না থাকিলেও বা

ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিয়াও ত্যক্তগৃহ সাধক জীব কখনই ভোগাসক্ত হইবেন না। অনধিকারী বদ্ধজীবগণ অকালে বৈরাগ্য গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্মই প্রভুর ঐরূপ কঠোরতা ও নিরপেক্ষতা। আশ্রমোচিত বেষ গ্রহণ করিয়াও পুনরায় ভোগাসক্ত হওয়া ভীষণ অপরাধজনক। এইরূপ ভোগোন্মুখ-প্রবৃত্তি ও সংসারাসক্তি হইতেই জীবের যতকিছু অনর্থের সৃষ্টি হয়।

স্বরূপ-বিস্মৃত জীব নিজ-নিজ কন্মামুসারেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে অল্পপাতক, উপপাতকাদি পাপ বা অপরাধের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। নচেৎ শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণা লাভে আমরা কখনই সক্ষম হইব না। পরদুঃখদুঃখী দয়াল নিত্যানন্দের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়া নিষ্কপটে যদি আমরা কখনও জগাই-মাধাইএর আশ্রুগতো, “আর নারে বাপ” বলিতে পারি, তবেই আমরা উদ্ধার পাইব। আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রুগতো ও উপদেশে যখন আমাদের চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জিত হইবে, তখনই আমরা অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের রূপা লাভেও সক্ষম হইব। অপার করুণাময় নিতাই-ঠাকুর পাপী-তাপী আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তবে আমার ত্রায় পাতকী ও পতিত-জনের প্রতি কি তাহার করুণা হইবে না? তাই সর্ব্বক্ষণ কাতরস্বরে তাঁহার রাতুল শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই—

“যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার।

করুণা না হ’লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর ॥

শাস্ত্র ও গুরুমুখ-নিঃসৃত বাণীই আমাদের ভক্তনের একমাত্র সহায় ও সম্বল। তাহাতেই প্রকৃত মঙ্গল নিহিত আছে। তাই আমিও এস্থলে কিছু মহাজনবাক্য উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় নিবেদন করিতেছি :—

“শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রুগতো ষাঁহারা শুদ্ধ-গৌরকৃষ্ণ-ভক্তনেছঁ সাধক, তাঁহারা প্রভুকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের দণ্ডপ্রদান-লীলায় নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলি লক্ষ্য করিয়া আপন আপন ভজন-পথে অগ্রসর হইবেন—

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরম কারুণিক হইয়া ছোট হরিনামকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কলিকালের দুর্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে ‘বৈষ্ণবধর্ম্ম’ জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন
কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ড-প্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্বসাধারণকে উপদেশ
দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপ-জীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌর-কৈঙ্কর্য
করা কর্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য'
শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজ-ভক্তগণের সুনির্মল-চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয়
আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিস্তি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন
এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়,
তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ড-বিধানরূপ অমনোদয়া দয়া এবং প্রভুর
প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত ঐহিক-পরিমাণে ছিল, তাহা
দেখাইবার জন্ত তাঁহার সামান্য ক্রটিও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।
প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকল-
প্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়মুখ-লালসা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা
শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।”

যাঁহারা আত্মকল্যাণকামী, তাঁহারা শুদ্ধাচার-প্রচার-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তের
নিকট হইতে আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় শ্রবণ করিয়া উহা নিজ জীবনে
প্রতিপালন ও প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। মহাপ্রভু সকলকেই
বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ভার দিয়াছেন। “আচার, প্রচার-নামে কর দুই
কার্য্য। তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্ঘ্য ॥” —ইহাই তাঁহার
উপদেশ। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি স্বয়ং সমগ্রাস গ্রহণ করিয়া
জগতে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তমে বসিয়া
উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে
শ্রীমণ্ডিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত-প্রভু তাঁহার আদেশে শ্রীনাম-প্রেম-
প্রচারণে তৎপর হইয়াছিলেন। তাই গৌর-নিত্যানন্দের অপার করুণার কথা
স্মরণ করিয়া নিম্নোক্ত মহাজন-বাণী স্বতঃই স্মৃতিগটে উদ্ভিত হয়—

“যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতীর।

তখন না হৈল জন্ম, এদেহের কিবা কৰ্ম্ম, মিছামাত্র বহি ফিরি ভার ॥”

আচারবিহীন প্রচারকের কোনই মূল্য নাই। শাহ ও সাধু-মহাজনবর্গের মঙ্গলময় উপদেশ-নির্দেশাদি পালন না করিলে আমাদের পাপময় জীবন গঠন করিয়া পরিশেষে নিরক্ষরগামী হইতে হইবে। তাই সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্বতোভাবে সাহায্যে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি, তজ্জন্ম এই প্রার্থনা জানাইতেছি—“আমার বার্ষিক্যের পরবর্ত্তী অবশিষ্ট দিন কয়টিতে জানিয়া-শুনিয়া যেন শ্রীগুরুবাক্য অবহেলা-রূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন না হই।”

“সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস,” “সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,” “কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥” ইত্যাদি মহাজন-বাক্যে বহু আত্মমঙ্গলের কথা রহিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতিতে মানব-চিন্তাপ্রোত যেভাবে নাস্তিকতায় পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাতে ঐহারা গা ভাসাইয়া তাহারই বহুমানন করিবেন, তাঁহারা শাস্ত্রাঙ্গ-লঙ্ঘনরূপ দোষে নিপতিত হইবেন। আর ঐহারা সর্বাবস্থাই তাঁহাদের ভজনের অমূল্য জ্ঞানে নির্ভীকভাবে সাধু-শাস্ত্র-বাণী হৃদয়ে ধারণ করত ভগবদ্ভজনে তৎপর হইবেন, তাঁহারা প্রকৃত আত্মকল্যাণ লাভ করিবেন। তখন তাঁহারা নির্ভয়ে বলিতে পারিবেন—“আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের আবার ভয় কি?”, “স্বাথে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ স্বাথে কে?”, “আমরা কৃষ্ণের সংসারে তাঁহারই প্রদত্ত বস্তুসকল সর্বদা রক্ষা করিব” ইত্যাদি। তাঁহারা নিজেরা ঐ প্রকার আচরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের অত্যাচার বহিস্কৃত জীবকুলকেও ভজনে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগকে বলিয়া থাকেন—“অন্তরে লুটিয়া থায় কৃষ্ণের সংসার”, “এজগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের, আর ভগবানের দ্রব্য তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত কর, তাঁহারই সেবার জন্ত তোমার জীবনধারণ করিবার প্রয়োজন আছে।” এইপ্রকারে পরদুঃখদুঃখী মহাভাগবতগণ জগন্মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্বদাই ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করেন—“জীবের পাপ লঞা মুক্তি করি নরক ভোগ। সকল জীবের, প্রভু, ঘৃণাও ভবরোগ” ॥ ইহাই ভগবদ্ভক্ত-পরম্পরায় পতিত-পাবনত্ব।*

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

(মথুরা)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

বংশ-পরিচয় ও বাল্য-পরিচয়

দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে কর্ণাট-দেশের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় সর্বপুত্র্য ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 'জগদগুরু' নামে এক মহাত্মা উদ্ভূত হন। সেই সর্বজ্ঞ জগদগুরুর পুত্র শ্রীঅনিকর দেব। ইনি নিগম-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ও জগদ্বরেণ্য ছিলেন। অনিকরের 'শ্রীকৃপেশ্বর', ও 'শ্রীহরিহর' নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ভ্রাতা শাস্ত্রে এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা শাস্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন। কৃপেশ্বর হরিহর কর্তৃক রাজত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজা শিখরেশ্বরের সহিত মধ্যস্থাপন-পূর্বক শিখরভূমিতে বাস করেন। কৃপেশ্বরের পুত্র 'পদ্মনাভ' সুপবিত্র গাজতটে 'নৈহাটী' নামক স্থানে বাস্তুব্য স্থাপন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের নাম—শ্রীমুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র শ্রীকুমার দেব। ইনি সদাচারী ও ভগবন্তকৃত ছিলেন; ধর্ম-বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি নৈহাটী ছাড়িয়া বঙ্গদেশস্থ বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে* গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাকলার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি একটি বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সদাচার-নিষ্ঠ পরমভক্ত ব্রাহ্মণের তনয়রূপেই গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য-শিরোমণি, ত্রিভুবনমাণ্ড গৌরপাদপ্রবর শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভৃদ্বয় আবির্ভূত হন। শ্রীকুমারদেবের অত্যন্ত পুত্রগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভই বৈষ্ণব-বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতৃপুত্র গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু; তাঁহার জনক 'শ্রীবল্লভ' বা অল্পপয়—রূপ-সনাতনের ভ্রাতা।

* বাকলা চন্দ্রদ্বীপ—একটি পরগণার নাম। ইহা বর্তমান যশোহর-খুলনা জেলার পূর্ব-অংশ বাগেরহাট হইতে বর্তমান বাথরগঞ্জ জেলার সদর বরিশাল সহরের পশ্চিম অংশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বরিশাল সহরের ৭ মাইল পশ্চিমে মাধবপাশা গ্রামে চন্দ্রদ্বীপের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। উক্ত বিরাট ভূখণ্ড লইয়াই বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ পরগণা। ইংরাজ-শাসন আমলে উহা বাকলা ও চন্দ্রদ্বীপ নামে বিভক্ত হইয়া কেবলমাত্র বাথরগঞ্জ জেলার কালেক্টারী তৌজীর অন্তর্গত হইয়াছে। উক্ত পরগণার অন্তর্গত বাগেরহাট, মশ্‌নী-দৈবজ্জহাটী, পিরোজপুর, বানারিপাড়া, দেহেরগতি, মাধবপাশা প্রভৃতি প্রধান পল্লী-সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রকট-কালের অন্ধ-নির্ণয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী-পত্রিকার' ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অন্ধনির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং স্বধামগত গোপীবল্লভপুরের মোহন্ত শ্রীমদ্বিখম্বরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণে ও শ্রীবৃন্দাবনের রাধারমণ-ঘেরার পণ্ডিত শ্রীবৃন্দ বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণে একই প্রকার অন্ধ-নির্ণয় পাওয়া যায়। তাহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব কাল—১৪১০ শকাব্দ, ১৫৪৫ সনৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ; গৃহে অবস্থান—২৭ বৎসর; ব্রজে অবস্থান—৪৩ বৎসর; সর্বসমেত প্রপঞ্চ অবস্থান কাল—৭০ বৎসর; অপ্রকট—১৪৮০ শকাব্দ, ১৬১৫ সনৎ, আষাঢ়ী শুক্লপূর্ণিমা, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ।

বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা ও যৌবনে রাজকাৰ্য্য

কুমারদেবের স্বধাম প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গোড়-রাজধানীর নিকট কোনও ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-বলে গোড়েশ্বর হুসেন শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু বিদ্যাবাচস্পতি এবং তৎপুত্র শ্রীনীলাচলে অবস্থানকারী শ্রীবাসুদেব সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য, এই উভয়েই শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু স্ব-কৃত দশম-টিপ্পনীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—“ভট্টাচার্য্যং সার্কভৌমং বিদ্যাবাচস্পতিং গুরুং। বন্দে বিদ্যাভূষণং গোড়দেশ-বিভূষণম্ ॥ বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্। রামভক্তং তথা বাণীবীলাসকোপদেশকম্ ॥”

আমি মদীয় অধ্যাপক বিদ্যাবাচস্পতি, সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য এবং গোড়দেশ-বিভূষণ বিদ্যাভূষণপাদকে বন্দনা করিতেছি। আমি শ্রীরসপ্রিয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও বাক্চতুর অধ্যাপক শ্রীরামভক্তকে বন্দনা করি।

শ্রীরূপ-সনাতনের যে সর্বশাস্ত্রে স্নৈনপুণ্য, তথা গ্রাম, তর্ক, অলঙ্কার এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল, তাহা আমরা প্রামাণ্য বাক্যে প্রাপ্ত হই।—

“গ্রাম-সূত্র ব্যাখ্যা নিজ-কৃত যে করয়।

সনাতন-রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয় ॥

এঁছে সব সর্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা।

সনাতন-রূপ শুণ পায় স্তম্ভ পাঞা ॥” (ভঃ রঃ ১ম তঃ)

বঙ্গের যবন-রাজ হুসেন সাহ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের অমাহুযিক বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় পাইয়া স্নেহবশতঃ তাঁহাদের গুণে ও স্বভাবে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজ-ভ্রাতৃবৎ তাঁহাদিগকে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে—‘দাবির-খাস,’ ও শ্রীসনাতনকে—‘সাকরমল্লিক’ এই নাম ও উপাধি প্রদান করেন। কৃষ্ণ-সনাতনের প্রভাবে রাজা হুসেনসাহেরও রাষ্ট্রে আধিপত্য ও সম্পদ অধিকতর-রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বয়ং বাদসাহ সাকরমল্লিক ও দাবিরখাসকে পৃথক রাজ্য ও বিভাগ করিয়া দিলেন। তৎকালে উক্ত গোস্বামি দ্বয় রামকেলিতে অবস্থান-কালে অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজভবনে মহতী-সভা নির্মাণ করিয়া বিশিষ্ট শাস্ত্র-নিপুণ পণ্ডিতগণের স্তূত শাস্ত্র-বিচার করিতেন।

অমরপুরীর ইন্দ্রসভা-তুল্য শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ সভাগৃহে সর্বদেশী গায়ক-বাদক এবং ভিন্ন ভিন্ন নাটক ও কাব্যে নিপুণ কবিগণ সেই সভায় যোগদানে ধন্যতীক্ষ্ণ হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাদিগকে স্নগদুর ব্যবহারে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন। তাহারাও কৃষ্ণ-সনাতনের গুণাবলী কীর্তন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করত সর্বত্র তাঁহাদের গুণ-মহিমা বিস্তার করিতেন। এমন কি, কর্ণাট দেশীয় বিপ্রগণও তাঁহাদের দিগন্তপ্রসারী গুণ-মহিমায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া একে একে সকলেই তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন তাঁহাদিগকে নৈগাটীর নিকটস্থ গঙ্গা-সান্নিধানে ভট্টপল্লীতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভট্টপল্লীবাসী ও নবদ্বীপবাসী অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের সান্নিধ্যে রামকেলি গ্রামে গিয়া পরমানন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু

পূর্বে উক্ত হইয়াছে—নবদ্বীপবাসী বাহুদেব সাক্ষিভোম ও তদভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি শ্রীল সনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু ছিলেন। তাঁহারাও কৃষ্ণ-সনাতনের গুণে মুগ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে রামকেলিতে গিয়া বাস করিতেন। গোড়দেশ-বিভূষণ ‘বিদ্যাভূষণপাদ’ও রামকেলিতে গিয়া বাস করিতেন। বিদ্যাভূষণ-পাদও সনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে-কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত বর্তমান মহর-নবদ্বীপ কুলিয়া নগরে মাধব চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমন্নহাপ্রভু অসংখ্য লোক-সংঘট্টের মধ্যে সৌভাগ্যবান্ জনগণকে কৃপাপূর্বক দর্শন দিয়া বিদ্যানগরে বিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে সংগোপনে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীভগবন্ মহিমা

সংগোপিত হয় না,—অসংখ্য দর্শনার্থী চতুর্দিক হইতে সমাগত হইয়া গৌরহৃন্দরকে দর্শনের জন্ত আকুল-প্রাণে চাতকের ছায়া অবস্থান করিতেছিল। নিরপেক্ষ-ধর্মের শিক্ষক শ্রীমন্নহাশ্রভ তাহাদিগকে দর্শন দিয়া মহাসৌভাগ্যাস্বিত করিয়াছিলেন; তিনি নাতিবিলম্বে সে-স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীসনাতনের বিজ্ঞাশিক্ষার গুরু নীলাচলে অবস্থানকারী বাহুদেব সার্কভৌমও তদ্রূপে বিজ্ঞাবাচস্পতি এই উভয়েই শ্রীমন্নহাশ্রভের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের রামকেলিতে নিত্যসিদ্ধ-ভজন-বিলাস

শ্রীরূপ-সনাতন যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর ছিলেন, তাহা আমরা তাহাদের জীবনের আদি লীলাতেই লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাই। শ্রীমন্নহাশ্রভের সহিত ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের পূর্বে ভ্রাতৃ-বৃন্দ যখন রামকেলিতে রাজকার্য্যে ব্যাপ্ত ছিলেন, সে-কালেও নিত্য-ব্রজভূমিতে চিন্ময় অবস্থিতির ছায়া নিজ আবাস-ভূমিতেও ব্রজের প্রোজ্জ্বলিত মাধুর্য্যভাব প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অন্তরঙ্গ ভাব-সেবায় অপ্রাকৃত রসরসে অভিভাবিষ্ট থাকিতেন।

“বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত-স্থানেতে।

কদম্ব-কানন, রাধা-শ্রামকুণ্ড তাতে ॥

বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিস্তন।

না ধরে ধৈর্য্য, নেত্রের ধারা অহুক্ষণ ॥

শ্রীবিগ্রহ শ্রীমদনগোপাল-সেবায় রত।

সদা খেদ উজ্জি, তাহা কহিব বা কত ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র বিহরে নদীয়া।

সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া ॥ (ভঃ রঃ ১ম ভঃ)

রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের মিলন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শনোৎকণ্ঠায় রূপ-সনাতনও অত্যন্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজ প্রিয়জনের হৃদি-মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বয়ং শ্রীগৌরহৃন্দরও বৎসহারা গাভীর ছায়া ব্যাকুল হইয়া প্রেম-বশীভূত হৃদয়েই রামকেলিতে শুভ-বিজয় করিলেন। ভ্রাতৃত্বও তৎক্ষণাৎ আসিয়া মিলিত হইলেন। আকর্ষক এবং আকৃষ্টের কি অপূর্ব সন্মেলন! যেন—ভাষ্যর উদয়ে মানস-সরোবরে তক্তিরূপা স্মমনঃ-কমল প্রমুদিত হইয়া চতুর্দিক সৌরভে আমোদিত করিল। অপরদিকে ভাবরূপ প্রশান্ত মহাবারিধির অতল-প্রদেশ হইতে উথিত বিভাবাদিযোগে উচ্ছ্বসিত প্রেম-রস-তরঙ্গের উদ্বেলন হইল;

তাহাতে চতুর্দিকস্থ সমাক্রষ্ট লোকসমূহও তরঙ্গায়িত হইল। শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী এমন কি, যবনগণও চতুর্দিক হইতে ছুটিয়াছে ; 'এককাজে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত'। শ্রীমন্নহাপ্রভুর বৃন্দাবনে গমনের লীলার মধ্যে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত যে মিলন, তাহাতে আনুসঙ্গিকভাবে জীবোদ্ধার-কার্য্যের অভিযুক্তি রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই কেদার-বর্জী দর্শনের
সর্বতোমুখী সুযোগ—শীত-বর্ষা কম ।
যাত্রীগণ প্রস্তুত হউন । বিশেষ
সংবাদের জন্য পত্র লিখুন ।

আমাদের কর্তব্য

মৃত্যুর করাল-মূর্তি হেরিয়া নয়নে, মৃত্যুর কল্লোল শুনি' না করিব ভয় ।

ভুলিব না কভু মোরা মৃত্যুর আশ্রানে, মৃত্যুরে করিতে জয় হইবে নিশ্চয় ॥

আমরা অমৃতের সন্তান ; সুতরাং আমরাও অমৃত । কিন্তু অমৃত আজ মৃত্যুর কবলে কবলিত হ'ল কি ক'রে ? জীব স্বরূপতঃ অমৃত হ'লেও অত্যধিক দুর্বলতা-প্রযুক্ত তা'র মায়াক্রান্ত বা মৃত্যু-দ্বারা কবলিত হওয়ার অবস্থা বর্তমান এবং স্বতন্ত্রতার অসম্ভাবহার ক'রেই তা'র আজ এরূপ দুর্বলতা ঘটেছে । 'আমরা অমৃতের সন্তান অমৃত',—এ কথা ভুলে গিয়ে জড়াভিমানে প্রমত্ত হ'য়েছি ব'লেই দেহাত্ম-বুদ্ধি আমাদের হৃদয়কে বিশেষভাবে অধিকার ক'রেছে । দেহের বিনাশকে আমার বিনাশ মনে ক'রে তা হ'তে সতত আমরা ভীত হ'চ্ছি । সুতরাং এই অবিজ্ঞা বা জড়াভিমানকে বিদূরিত ক'রে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হ'তে পারলেই দ্বিতীয়াভিনিবেশের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যাবে । দেহাত্মবুদ্ধি-পরিমুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণস্বভি বা স্বরূপোদ্বোধনের নামই হ'চ্ছে 'মৃত্যু-জয়' ; কারণ, চেতন ত' আর জ্ঞাত বা সৃষ্টবস্তু নয়, যে তা'র ধ্বংস হ'বে ।

এখন কথা এই যে, আমাদেরকে আগ্রহ হ'তে হ'বে, মৃত্যুর হাত থেকে নিজদিগকে বাঁচতে হ'বে, নতুবা দুঃখের আর পরিসমাপ্তি হ'বে না। এই আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচতে চায় না জগতে একুপ লোক নেই। কিন্তু কি ক'রে মৃত্যুকে জয় করতে হয়, তা প্রায় কেউই জানেন না। স্বয়ং অমৃত বা অমৃতের দূতগণই আমাদেরকে এ'র সন্ধান দিতে পারেন ; এবং তাঁ'রাই হরিকথারূপ মৃতসঞ্জীবনী-সুধা দান ক'রে আমাদেরকে মৃত্যুর করাল কবল থেকে চিরকালের জ্ঞাত রক্ষা ক'রতে পারেন। তাঁ'রা বৈকুণ্ঠ-জন—শ্রেয়ঃপত্নী বা শ্রীতপত্নী।

আমরা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ নামে দুটি পথের কথা শুনে পাই। তন্মধ্যে শ্রেয়ঃ পথটি মৃত্যু আত্মান করে। ইহা ইন্দ্রিয়-তর্পণের পথ এবং এ'পথ গ্রহণ করলে মৃত্যুকে জয় করা ত' দূরের কথা, বরং, ভেকের কোলাহল-দ্বারা যে রূপ কালসর্প আনা হয়, তদ্রূপ মৃত্যুকে আত্মান করা হয় মাত্র। শ্রেয়ঃপথ—সেবাপথ বা শ্রীতপথই মৃত্যুজয়ের একমাত্র পথ। অমৃত-ব্রহ্মতে শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ হ'য়ে থাকে। ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ছাড়া সেই বৈকুণ্ঠে আর কোন কথাই নেই। যাঁ'রা সর্বক্ষণ অমৃতের চিন্তায় ব্যস্ত, সেই অমৃত—সাধুগণই আমাদেরকে এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রতে পারেন। তাঁ'রাই আমাদের পিতা, বন্ধু, গুরু—তাঁ'রাই সব। এ' বিপদ থেকে যাঁ'রা আমাদেরকে রক্ষা ক'রতে পারেন না, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। স্তবরাং আমাদেরকে সাধুসঙ্গ ক'রতে হ'বে, সতত শ্রবণ রাখতে হ'বে যে—

“গুরু ন স শ্রাৎ স্বজনো ন স শ্রাৎ, পিতা ন স শ্রাজ্জননী ন সা শ্রাৎ।

দৈবং ন তং শ্রাম পতিষ্ঠ স শ্রাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥”

সেই গুরু ‘গুরু’ ন'ন, সেই স্বজন ‘স্বজন’ পদবাচ্য ন'ন, সেই পিতা ‘পিতা’ ন'ন, সেই জননী ‘জননী’ ন'ন (অর্থাৎ তাঁর গর্ভ-ধারণ করা বৃথা), সেই দেবতা ‘দেবতা’ ন'ন, যাঁরা জীবের সংসার-বন্ধন মোচনে অসমর্থ।

হরি-বিমুখ ব্যক্তিগণ আমাদেরকে কেবল ক্রম্বতর কথারূপ বিষ প্রদানই করে। আর সাধুগণ মৃতসঞ্জীবনী-সুধা-স্বরূপ শ্রীহরিকথা আমাদের কাছে কীর্তন করেন। তা'র ফলে শ্রীনাম-গ্রহণের স্পৃহা জন্মে। এই শ্রীনাম-সুধা যদি আমরা সেবানুখ-কর্ণে আদরের সহিত পান করি, তা' হলে আমাদের জড়াভিনিবেশ বা মৃত্যুভয় থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি শ্রীহরি-কীর্তন-সুধা পান না করি অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট না হই—এই মৃত্যুজয়ী মহোষধ-গ্রহণে বিতৃষ্ণ হই, তা' হলে আমরা বাঁচব কি করে ?

মায়াভিনিবেশবশতঃ আমরা এখানে ভোক্তা সেজে সমস্ত ভোগ্য দর্শন করি। তাই আমাদের পক্ষে তাহা বিষ বা মৃত্যুবাণ। কিন্তু সদগুরুর সঙ্গ-প্রভাবে যদি আমরা জাগতিক প্রত্যেক বস্তুকে ভগবৎসেবোপকরণ বলে দেখবার দিব্য চক্ষু পাই, তখন সবই আমাদের কাছে মঙ্গলজনক হ'য়ে পড়ে। একই জিনিষ—অনেক সময় ব্যবহার-তারতম্যে কুফল ও সুফল প্রদান ক'রে থাকে। আমাদের যখন ভাল-মন্দ জ্ঞান বা সদস্য বিচার নাই, তখন সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আমরা স্বরূপতঃ ষ্টখন কৃষ্ণ-সেবক, তখন তাঁ'র সেবা ক'রুলেই আমাদের সব গোলযোগ কেটে যায়। কিন্তু হরি-সেবা যে-সে প্রকারে ক'রুলে হ'বে না। ওকে সাধারণ কাণ্ড মনে করা উচিত নয়। ভগবৎ-প্রিয়জন যদি জীবকে দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা হয় বা করা যায়। নতুবা মাতৃঘের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নেই যে, এত হাঙ্গামা কাটিয়ে হরিসেবা করতে পারে। স্বতরাং এখন কি করা যায়? এখন কাঁদা ছাড়া, আলুগতা ছাড়া, আর অল্প কোন গতিই নাই। জন্ম, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি বহুবিধ মদ আমাদেরকে কতভাবে প্রলুব্ধ করছে; তা'র কি আর ইয়ত্তা আছে? এ-সকল মত্ততাকে যদি শোষণ ক'রে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ ক'রতে না পারা যায়, তা' হলে আমাদের আর নিস্তার কোথায়? কিন্তু আমাদের ত' কোন সাধ্য নাই দেখছি। আমরা অতি দুর্বল, অতি দুর্দশাগ্রস্ত, ভীষণ অপরাধী জীব। আমরা আজ নিরুপায়! কাম-ক্রোধাদি প্রবঞ্চক রিপুগণ বন্ধু সেজে এসে আমাদের গলায় রজ্জু লাগিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস ক'রতে বসেছে। এখন আর কোন উপায় না দেখে কৃষ্ণের বস্ত্র-রক্ষক গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি, তাঁ'রা আমাদেরকে রক্ষা না ক'রলে আমাদের রক্ষার অল্প কোনও উপায় নেই। তাই আমরা সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তাঁ'দের আশ্রয়ভিক্ষা ক'রছি। তাঁ'রা সর্বপ্রকারে মায়াব বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করুন।

“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিম্।

যংকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীমতারণম্॥

বাহ্যকল্পতরুতশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥”

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଜ୍ରୀନାରାୟଣ ପରିକ୍ରମାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ-ପତ୍ର

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶୁକ୍ଳଗୌରୀନାଥ ଜୟତ:

ଶ୍ରୀଉଦ୍ଧାରଣ ଗୋଡ଼ୀୟ ମଠ

ଚୋରାଧା, ପୋ: ଚୁଢ଼ା (ହଗଳୀ)

ମାଦର ସନ୍ତାପନପୂର୍ବକ ନିବେଦନ—

ଶ୍ରୀଗୋଡ଼ୀୟ ବେଦାନ୍ତ ସମିତି ଏହି ବৎସର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଜ୍ରୀନାରାୟଣ ପରିକ୍ରମାମୁଖେ ହରିଦ୍ବାର, ହସୀକେଶ, ଶ୍ରୀନଗର, କେଦାରନାଥ, ତୁଳନାଥ ପ୍ରଭୃତି ୬୪ଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବେନ। ସମିତି ଆଗାମୀ ୪୮ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୨, ୧୯ଶେ ଭାଦ୍ର ୧୩୫୨, ସୁହସ୍ପତିବାର ହାଓଡ଼ା-ଫ୍ରେଶନ ୪ନଂ ପ୍ଲଟଫର୍ମ ହାତେ ରାଜ ୮-୧୦ ଟାର ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବେନ। ଆମରା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ସକଳକେହି ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମାବଳୀ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏହି ଅପୂର୍ବ ଉପଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଅନୁରୋଧ କରି।

ନିୟମାବଳୀ :—

୧। ଦୁଇବେଳା ପ୍ରମାଦ ଓ ହାଓଡ଼ା ହାତେ ହରିଦ୍ବାର ପ୍ରଭୃତି ଯାତ୍ରାସ୍ଥାନ ଫ୍ରେଶଭାଡ଼ା ଓ କେଦାର-ବଜ୍ରୀର କୁଳି ଧରତେର ଜଗ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କେ ୫୫୦୦ ଟାକା ଭିକ୍ଷାସ୍ବରୂପ ଦିତେ ହାତେ।

୨। ଯାତ୍ରାଗଣ ପ୍ରବଳ ଶୀତେର ଉପଯୋଗୀ ବିଛାନା (ମଶାମୁଁ ସହ), ଜାମା, ଗରମ କାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ୧ଟି କରିବା ଏଲୁମିନିୟାମେର ଥାଳୀ, ସଟି, ବାଟି ଓ ଗ୍ରାସ ସଙ୍ଗେ ଆନିବେନ। ପାହାଡ଼-ପଥେ ପିପାସା ନିବାରଣେର ଜଗ୍ ଅନ୍ତତ: ୧୦ ଏକସେର ଲଞ୍ଜେଜ୍, ଅଥବା ତାଲମିଶ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭିବେନ। ବିଛାନା, ବାସନପତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବସମେତ ୧୫ ସେର ହାତେ ୧୦ ଆଧମଣେର ମଧ୍ୟେ ଲାଭିବେନ।

୩। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀ ୧୦ ଆଧମଣେର ବେଶୀ ମାଲ ହାତେ ପ୍ରତିସେରେ ୫୦ ହିସାବେ କୁଳିଭାଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଦିତେ ହାତେ।

୪। ଦେଶ ଭିକ୍ଷାର ଟାକାର ମଧ୍ୟେ ୧୦୦୦ ଆଗାମୀ ୧୦୫ ଭାଦ୍ର, ୧୯୫୨ ତାରିଖେର ମଧ୍ୟେ ତ୍ରିଦଶାମୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରପ୍ରଜ୍ଞାନ କେଶବ ମହାରାଜେର ନିକଟ ଉକ୍ତ ଟିକାନାମ ପାଠାହାତେ ବା ଜମା ଦିଆ ସମିତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରସିଦ୍ ଓ ଟିକେଟ୍ ଲାଭିତେ ହାତେ।

৫। অগ্রিম ১০০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ১২শে ভাদ্র, ইং ১৯২২ বৃহস্পতিবার বেলা ১টা হইতে ৫টার মধ্যে হাওড়া-ষ্টেশনে ৪নং প্ল্যাটফর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া রসিদ লইবেন।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া অতিরিক্ত লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতি, লাঠি ও বিছানা ঢাকিবার জল্লরবারুথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ৪০।৪৫ দিন সময় লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা

হরিদ্বার, ছবীকেশ, লছমমুখোলা, ব্যাসঘাট, দেবপ্রয়াগ, কীর্তিনগর, শ্রীনগর, কদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, চন্দ্রপুরী, গুপ্তকাশী, উখীমঠ, যৈথুগা, রামপুর, ত্রিযোগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা গণেশ, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, মঠ, পিপলকুটি, গরুড়গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, যোশীমঠ, পঞ্চবদ্রী, পঞ্চশিলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর হনুমান্‌চটী, শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ, তপ্তকুণ্ড, বসুধারা, চামেলী, নন্দপ্রয়াগ, আদিবদ্রী প্রভৃতি।

হিমালয়-পর্বতে উর্জ্জব্রত

বদরিকা-পরিক্রমার অন্তে

শ্রীনগরে ব্রত-সমাপ্তির
পরিকল্পনা চলিতেছে

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬ ; ভাদ্র—১৩৫৯

১১ পদুনাভ, ৩০ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণদ্বাদশী অহোরাত্র ।
ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস ।

১২ পদুনাভ, ৩১ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণদ্বাদশী প্রাতঃ ৬।১২ ।
দি ৬।১২ মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ ।

আশ্বিন—১৩৫৯

২২ পদুনাভ, ১০ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—গৌর-সপ্তমী দি ১।১২২ ।
শ্রীদুর্গাপূজা ।

২৫ পদুনাভ, ১৩ আশ্বিন, ২৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার—গৌরৈকাদশী রা ২।৫০ ।
শ্রীল গঙ্গাচার্য্যপাদের আবির্ভাব—বিজয়োৎসব ।

২৬ পদুনাভ, ১৪ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১২।২৪ ।
পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস । দ্বাদশ্যরন্তপক্ষে উর্জ্জব্রত, কার্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ । শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব ।

২৭ পদুনাভ, ১৫ আশ্বিন, ১ অক্টোবর, বুধবার—ত্রয়োদশী রা ১০।২ ।
দি ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ ।

২৯ পদুনাভ, ১৭ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর, শুক্রবার—পূর্ণিমা রা ৫।৪৩ ।
শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা । শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব । পৌর্ণ-
মাস্যারন্তপক্ষে কার্তিকব্রত, দামোদরব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা ।

৫ দামোদর, ২২ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ১২।৫১ ।
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব ।

৮ দামোদর, ২৫ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ৩।৪২ ।
বহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকৃষ্ণে স্নান-দানাদি মহোৎসব । মতান্তরে শ্রীল গদাধর গোস্বামীর
তিরোভাব ।

৯ দামোদর, ২৬ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর, রবিবার—কৃষ্ণ-নবমী সন্ধ্যা ৫।২৮ ।
শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব ।

১১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণেকাদশী রা ৯।৩৭ ।
শ্রীরমা একাদশীর উপবাস ।

১২ দামোদর, ২৯ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১।১৩৭ ।
দি ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ । শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীশ্রীগৌরাদ
মহাপ্রভুর শুভ বিজয় ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অতঃ ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪র্থ বর্ষ	{ প্রচ্যুত, ১২ পদ্মনাভ, ৪৬৬ গৌরাঙ্গ মঙ্গলবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৫৯; ইং ১৬৯৯৫২	{ ৭ম সংখ্যা
-----------	--	-------------

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্

[শ্রীমদ-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্যৈ নমঃ

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্তেত্র-লক্ষ্মী-
বিলসিত-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটশ্চ খেলাম্ ।

হৃদয়-মধুপ-মল্লীং বল্লবাধীশ-সূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ১ ॥

পিতুরিহ বৃষভানোরব্বায়-প্রশস্তিঃ
 জগতি কিল সমস্তে সৃষ্টু বিস্তারয়ন্তীম্ ।
 ব্রজনপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
 সুরভিগি নিজ-কুণ্ডে রাধিকামর্চয়ামি ॥ ২ ॥

শরদুপচিত-রাকা-কোমদীনাথ-কীর্ত্তি-
 প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাম্ ।
 নটদঘভিদপাঙ্গোভুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
 কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৩ ॥

বিবিধ-কুসুমবৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্লধাটী-
 বিঘটিত-মদঘূর্ণৎ-কেকিপিঙ্গ-প্রশস্তিম্ ।
 মধুরিপু-মুখবিশ্বোৎগীর্ণ-তাম্বুলরাগ-
 স্মুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৪ ॥

অমলিন-ললিতাস্তঃস্নেহ-সিন্ধাস্তরঙ্গা-
 মখিলবিধ-বিশাখাসখ্য-বিখ্যাতশীলাম্ ।
 স্মুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
 ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৫ ॥

অতুলমহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেহভিষিক্তাং
 নিখিল-সময়ভর্তুঃ কার্ত্তিকশ্রাদ্ধিদেবীম্ ।
 অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মুখ্যাং
 জগদঘহরকীর্ত্তিং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৬ ॥

হরি-পদ-নখকোটা-পৃষ্ঠপর্যাস্তসীমা-
 তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণকোটেরতীর্থম্ ।
 প্রমুদিত-মদিরাঙ্গীবৃন্দ-বৈদগ্ধি-দীক্ষা-
 গুরুমতিগুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৭ ॥

অমল-কনকপটোদঘৃষ্ট-কাশ্মীরগৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীম্।
হরিভুজ-পরিরন্ধাং লঙ্করোমাঞ্চ-পালিং
স্মুদররুণ-দুবুলাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৮ ॥

তদমল-মধুরিমাং কামমাধার-রূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং স্তম্ভু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিমকিরণপুল্লী-কূল-কল্যাণচন্দ্রঃ
স্মুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোত ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি কোনদিকে দৃষ্টি-নিষ্ক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন সেইদিকে খঞ্জনমালা খেলা করিতেছে, অর্থাৎ খঞ্জন-পক্ষীর ত্রায় বিলোকন-পটু স্তম্ভীক চঞ্চলদৃষ্টি-সম্পন্ন ষাঁহার নয়নযুগল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের মল্লিকা-কুসুমস্বরূপ এবং অশেষ গুণের আশ্রয়হেতু যিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ১ ॥

যিনি এই নিখিল জগতে স্বীয় পিতা বৃষভাসুরাজের বংশ-শ্লাঘা বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি বিবিধ জলজ-পুষ্পে সুরভিত নিজ বিলাস-স্থান শ্রীরাধা-কুণ্ডে সখীগণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চনা করি ॥ ২ ॥

যিনি মন্দ-মন্দ হাস্তযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা শরৎকালীন নিম্বল চক্রে শোভাও তিরস্কার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা ষাঁহারা অনঙ্গ-রঙ্গ পরিবন্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীঅঙ্গে লাভণ্যের তরঙ্গ ধারণ করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৩ ॥

নানাবিধ কুসুম-শোভিত কেশপাশ দ্বারা যিনি শিখণ্ড-গর্ভের গর্ভিত শিখণ্ডি-গণের গর্ভে থকা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক ষাঁহার সুন্দর গণ্ডদেশ তাড়ুলরাগে দ্বিধং রঞ্জিত, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার অন্তঃকরণ ললিতা-সখীর নিম্নল আন্তরিক স্নেহে অভিষিক্ত, বিশাখার সহিত অশেষবিধ সখ্যভাব থাকায় যাঁহার সু-স্বভাব জগদ্বিখ্যাত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেমরূপ মাণিক্যের পেটিকা, মাধুর্য-বিনোদিনী সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৫ ॥

যিনি অতুল-প্রভাবসম্পন্ন বৃন্দাবন-রাজ্যের অধিশ্বরী, নিখিল সময়ের অধিপতি কার্তিক-মাসের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী উর্জেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেমসীগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা এবং যাঁহার লীলা নিখিল পাপহারিণী, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ নখপ্রান্তকে প্রাণের অভীষ্ট বলিয়া বোধ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণগতপ্রাণ বলিয়া কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই যিনি জ্ঞানেন না, যিনি নিখিল ব্রজরমণীগণের বাক্চাতুর্য্য শিক্ষার গুরু, সেই বিপুল-কীর্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৭ ॥

কনক-কষ্টিপাথরে ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের ত্রায় যিনি গৌরাজী, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মাধুর্য-তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু হন, যাঁহার পরিধানে সুন্দর অরুণ-বর্ণ বসন, সেই ব্রজ-কিশোরী শ্রীরাধিকাকে আমি অর্চনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ স্বরূপ-গুণ-বিতৃতিপূর্ণ এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি স্তম্ভুভাবে পাঠ করেন, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্বাতীষ্ট পরিপূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রথম দর্শন

ঠাকুরের প্রথম পুরী-যাত্রার কাল—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ

এখনকার সময় হইতে ৭০ বৎসর পূর্বে নিদাঘকালের প্রত্যুষে এক তরুণ-বয়স্ক যুবক কটক হইতে পদব্রজে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া চলিতে-ছিলেন। তাঁহার পাথেয় বা সঞ্চল ভগবানের চরণ-দর্শন-কৌতুহল-মাত্র। পার্থিব অর্থের অসম্ভাব-বশতঃ তাঁহার তৎকালে কোনও প্রকার যানের সাহায্য গ্রহণ করিবার সুবিধা হয় নাই। যদিও সে-কালে বাঙ্গালীয় যান বা বৈদ্যুতিক

মান ছিল না, তথাপি যখন-অধিকারকালে বঙ্গদেশ হইতে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-নীলাচল পর্য্যন্ত একটী পথ বর্তমান ছিল।

বাল্লালা হইতে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের প্রাচীন পথের অবস্থা

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকল-দেশে বৃটিশরাজ্যভুক্ত হওয়ার সময় হইতে এই পথে পূর্বের গ্রাম পথিকগণের নিকট হইতে কোন শুদ্ধ আদায় করা হইত না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন মাণ্ডলিকগণ পথের জন্ত শুদ্ধ বা কর আদায় করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখকগণ একথা তাঁহাদের রচিত লীলাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহারা শ্রীশিবানন্দ সেনের ঘাটি-সমাধান শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভূম্যধিকারিগণ পথিকগণের নিকট হইতে পথে চলিবার কর আদায় করিতেন। যখন আমাদের তরুণ যুবক কটক হইতে নীলাচলে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শুদ্ধপ্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া-ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভোজ্য বস্তুর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ শক্তু মাত্র ছিল।

অতিমর্ন্ত্য চরিত্র-বর্ণনে ঐতিহাসিকের ভ্রান্তি অবশ্যস্বাভাবী

অপ্রাকৃত রাজ্যের হরিজনগণের ক্রিয়াকলাপ ঐতিহ্যবিৎ সাধারণ-বাহ্য-বিচারকের চক্ষে আবরণ-স্বরূপে অবস্থান করে। এই প্রকার ঐতিহ্য কুজ্ঞাটীকার গ্রাম বদ্ধজীবের হৃদয়ে সত্য-স্বর্ঘ্যের রশ্মি আবরণ করিয়া তাহাদিগকে লৌকিক-বিচার-ভূমিকায় বিচরণ করায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র লইয়া ঠাকুরের উড়িয়া-গমন

আমরাও ঐতিহ্যমূলে দেখিতে পাই যে, এই ভাবী কৰ্ম্মবীরের কৰ্ম্মসূত্রে তখনকার অবলম্বনের মধ্যে মাত্র একখানি পত্র। সেই পত্রখানি খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। তাহা তিনি ডাঃ রোয়ার নামক একজন জার্মান মনীষীকে দিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, “আমার একটা ছাত্র কার্য্য-উপলক্ষে উৎকলদেশে যাইতেছেন; শিক্ষা-বিভাগে তাহার একটা চাকুরী হইলে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হয়।” যদিও এই পত্রবাহক অতি সম্মানিত ধনবানের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি কালবশে তাঁহার সম্প্রতি পরসেবা না করিলে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইতেছে।

নীলাচল-নাথের প্রথম দর্শনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আমাদের পথশ্রান্ত তরুণের হস্তে কিঞ্চিৎ শক্তু ও এই পত্রখানি সম্বল ছিল। তিনি দিবসের অষ্টম যামার্কে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলাচল-নাথের

প্রথম-দর্শন-লাভ করিলেন এবং সন্ধ্যার পরে শিক্ষাবিভাগের একটি কর্মচারীর গৃহে শ্রীনীলাচল-নাথের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পাঠক! এই তরুণ যুবকটি কে, বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ—ঐহার কৃপায় বর্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-স্বরধুনী পুনঃপ্রবাহিত দেখিতে পাইতেছেন।

বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের নিকট পত্র অর্পণ

ঐহার গৃহে তিনি মহাপ্রসাদ পাইলেন, সেই ব্যক্তি একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ; পরবর্ত্তিকালে বিচারবিভাগে কর্মচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রাদেশিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মহাশয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরদিবস আমাদের কথিত যুবক ঐ পত্রখানির ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার পরের কতিপয় ঘটনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে বলিয়া এখানে সেইসকল কথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বিরত রহিলাম।

ছুটীগ্রামে বাস

শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথের দর্শনের পূর্বে আমাদের কথিত পুরুষ-প্রবর কটক জেলার অন্তর্গত 'কেদ্রাপাড়া' নামক মহকুমার নিকটবর্ত্তী 'ছুটী' নামক গ্রামে কার্য্যামুরোধে কয়েকমাস যাবৎ বাস করিতেছিলেন।

জগতের নিমিত্ত-কারণ শ্রীজগন্নাথের পূর্ব দর্শনে

নির্বিশেষ ব্রহ্ম-দর্শন

জগতের নাথ জগতের সর্বত্র বিরাজমান। গতিশীল জগতের গতির আকরহুত্রে জগতের নাথকে যিনি যেখানে থাকেন, সেইখানেই উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-লোলুপতায় তাহার ব্যাঘাত ঘটে। সকল জগৎ শ্রীজগন্নাথের সম্পত্তি-বিশেষ হইলেও জগতের অধিবাসী মালিকের সান্নিধ্য-লাভে বঞ্চিত হইয়া বাহিরে বাহিরে অবস্থান-কালে মূল প্রভুর কথা বিস্মৃত হয়। সুতরাং বাহু-জগতে বিবিধ বিক্রম লক্ষ্য করিয়া একটি শক্তি-মত্তত্বকে কোন কোন সময়ে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া ধারণা করেন। তাঁহাদের বিচারে 'নিমিত্ত-কারণ' নির্বিশেষ অবস্থায় 'অব্যক্ত' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। ব্যক্ত জগতে প্রকাশিত ব্যাপারমাত্রই যখন জগৎ, তখন সেই চঞ্চল-জগৎ কখনই স্থির নিত্য "জগন্নাথ" শব্দবাচ্য নহে। সুতরাং জগন্নাথ-দর্শনের পূর্বে জগতের অধিবাসী জীবের হৃদয়ে নির্বিশেষ (impersonal) ব্রহ্মকেই "জগন্নাথ" বলিয়া প্রতীতি হয়।

দেশ-কাল-পাত্ররূপ জগতের নাথ বা মূল আকর 'প্রকৃতি' নহে

অতন্ত্রিসন-বিধি-অবলম্বনে জাগতিক সবিশেষ-ভাব অতিক্রম করিয়া জগতের স্থলশরীরসমূহ যে আধারে অবস্থিত আছে, সেই অবকাশের মধ্যে জগন্নাথের অবস্থিতি মনে করিয়া অনেকের বিচার জড়ীভূত হইয়া পড়ে। আবার কাহারও বা অথও কালকেই 'জগন্নাথ' বলিয়া প্রতীতি হয়। জগন্নাথের পাত্রত্ব-নিরূপণে যাহারা নির্বিশেষ-বিচারের বশবর্তী হন, তাঁহাদের দেশ ও কালকেই "জগন্নাথ" প্রতীতি হয় এবং তাঁহারা স্থল সমষ্টিকেও পাত্র জ্ঞান করেন। প্রকৃতির অধীনে যে দেশ-কাল-পাত্র "জগৎ" নামে ব্যক্ত, তাহার কারণ অল্পসন্ধান করিয়া অ-জগৎ বা অ-ব্যক্ত প্রকৃতিকেই নির্বিশেষ-পাত্ররূপে আকর জ্ঞান করেন।

ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানের বিচার-ভ্রান্তিহেতু ঠাকুরের মত-ভেদ ;

সবিশেষ ব্রহ্মের প্রথম বিকাশে শ্রীজগন্নাথ

কলিকাতাবাসী আমাদের এই সুবক সেইকালে পাশ্চাত্য-দর্শন-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের বিচার-প্রণালী ও নব্য একেশ্বর-ব্রহ্মবাদের চিন্তাশ্রোতের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক মতভেদ বর্তমান ছিল। ইনি এই উভয় সম্প্রদায়ের বিচারের মধ্যে ঈশ্বর-সূচক নির্দেশ-গুলির আদর করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতার পরস্পর বৈষম্য ও জাগতিক যুক্তি-চাঞ্চল্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ধর্মমতে ভগবৎস্বরূপগত হৃদয়প্রতীতির মধ্যে নির্বিশেষ বিচারের কতকটা গন্ধ তাঁহার স্বাভাবিক রুচির প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নব্য একেশ্বরবাদে ব্রহ্ম-রূপা, ব্রহ্মচরণামূলীন প্রভৃতি শব্দসমূহ-মাত্র জাগতিক চাঞ্চল্যের উপপাদক জানিয়া সবিশেষ বিষ্ণু-বস্তু-দর্শন করিতে আসায় শ্রীনীলাচল-নাথের সঙ্কোচিত অব্যক্ত পদদ্বয় ও অসম্প্রসারিত বাহুদ্বয়ে তাঁহার শ্রীভগবানের জিত্যরূপ সন্দর্শনের কোতুহল সমৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, সবিশেষ ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া যাহারা ব্রহ্মের আপাদ-মস্তক-দর্শনাভিলাষী হন, তাঁহাদিগের নিকটে নীলাচল-নাথ স্বীয় পদপ্রদর্শন না করিয়া সামান্য-বাহু মাত্র প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক

শ্রীজগন্নাথের সেবা-প্রচার

বিশিষ্টাধৈত দর্শন-প্রচারক শ্রীমল্লক্সগদেশিক একদিন শ্রীজগন্নাথের

নির্বিশেষ-প্রতীতি অপসারণ করিবার জন্ত শ্রীনীলাচলে সমাগত হন। ইহার বহুপূর্বে শ্রীবিষ্ণুস্বামী-পাদ জড়-নায়কোপাসকদিগের কর্মজড়বাদ নিরসন করিয়া একদিন শ্রীনীলাচল-নাথকে সুন্দরাচলবাসী করিয়াছিলেন। “অপাণি-পাদঃ” শ্রুতি-মন্ত্ৰের জবন-গ্রাহক হইয়া জগতে প্রচার করিবার জন্ত রথারূঢ় নীলাচল-পতি সুন্দরাচলে নীত হন। ভগবানের শক্তিত্রয় ‘শ্রী-ভূ-নীলা’ নামে প্রসিদ্ধ। সেই নীলা হইতে ভূ-শক্তিরূপিনী প্রেম-ভক্তির অনুসংযোগে নীলাচল-নাথকে শ্রী-ভূমিকায় আনয়ন-কার্য্যে আদি বৈষ্ণবাচার্য্যের (বিষ্ণুস্বামীর) চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর জীব-মানস-রথকে প্রাপঞ্চিক বিচার অতিক্রম করাইয়া অপ্রাকৃত মনোরথে শ্রীজগন্নাথকে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ‘শ্রীচৈতন্য-গীতা’ গ্রন্থের রচনা

নীলাচল-নাথের আদি দর্শনফলে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আমাদের প্রথম দর্শনার্থী প্রভুর হৃদয়ে অব্যক্ত আভাসে প্রতিভাত হইলেও তাঁহার লিখনী ঐ সকল কথা প্রকাশ করিতে আরও দুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াছিল। পাঠকের কেহ কেহ “শ্রীচৈতন্য-গীতা”-নামক একখানি বঙ্গীয় ছন্দোগ্রন্থের কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থের লেখক ‘শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমানন্দার’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনিই পরবর্তিকালে “শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ”-সেবকগণের বিচারমতে মুকুন্দ-প্রের্ষরূপে সম্পূজিত হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ) —

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১২ পৃষ্ঠার পর)

বেদোক্ত ধর্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-রূপ দ্বিবিধ

পরের ‘ভ্রম’কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার ‘সাধুবাক্য’ গ্রহণ করাই যে আমাদের বাঞ্ছনীয় ও আচরণীয়—ইহার উদাহরণস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ অনাদরণীয় হইলেও, তাঁহার লিখিত নিম্ন-প্রকাশিত যুক্তবাক্য গৃহীত হইল। তিনি শ্রীগীতা-ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যথা :—‘দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্মঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।’ ধর্ম বাস্তবিক দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রবৃত্তি-ধর্মের ফল—ভুক্তি এবং নিবৃত্তি-ধর্মের ফল—মুক্তি।

প্রবৃত্তি-ধর্মাবলম্বনের ঐহিক ক্রিয়া

প্রবৃত্তি-ধর্মাবলম্বন করিলে সংসারে অধিকতর উন্নতি হয়, যথা ভূর্গোৎসব, অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও বহুজনের অল্পগ্রহের পাত্র হওয়া যায়। প্রবৃত্তি-মার্গে সংসারের অনেক উন্নতি হয়। পণ্ডিত-সকল প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বনপূর্বক বহুগ্রন্থ-রচনা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও ভূততত্ত্বকে নানাভাগে বিভক্ত করত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তরল পদার্থের গুণ-সকল অন্বেষণ করত তদ্বারা মানবের যে কিছু ফল হইতে পারে, তাহা স্থির করেন। তড়িততত্ত্বের বৃত্তির আবিষ্কার করিয়া বার্তাবাহাদি শিল্পের ভিত্তি পত্তন করেন। ধূম্রতত্ত্বের দ্বারা জলযান, ব্যোমযান ও স্থলযান-সকলের অলুভব করিতে থাকেন। বৃক্ষাদির গুণসকল অল্পসন্ধান করত অপূর্ব ঔষধি-বিচার নির্ণয় করেন। সাংসারিক বিষয়েও তাহারা বহুতর কার্য্য করেন। সংসার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ সভ্যতার নিয়ম স্থাপনা করেন। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, অর্থের দ্বারা জীবনোপায় ও অগ্রাশ্র লাভ-স্থির, ঋণ-গ্রহণ ও দান-বিচারের দ্বারা অভাবের পূরণ, গৃহ, গ্রাম, নগর ও বিপণি-স্থাপন-দ্বারা ব্যবহারিক অভাবের সঙ্কুলন ইত্যাদি বিধি-সকল নিয়মিত হয়। বিবাহাদি সংস্কার-কার্য্যের দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি এবং অায়পূর্বক স্ত্রী-সন্তোগের দ্বারা দেহ ও বল রক্ষা করিয়া থাকেন। শিল্পকারেরা প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়া কত কত অলঙ্কার, বস্ত্র, কাষ্ঠাসন, আলোকাধার, অপরাধদণ্ড এবং খাট, গৃহ, পালক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি ও বিশেষতঃ গৃহ-পরিবাহাদি এবং যশের প্রতি প্রবৃত্ত পুরুষদিগের এতদূর প্রেম জন্মায় যে, তাহারা অগ্রাশ্র আক্রমণকারী পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধের দ্বারা রক্ত-পাতাদি করিয়া থাকে। এইসকল আয়াত্মগত প্রবৃত্তি; কিন্তু এতদতিরিক্ত অগ্রাশ্র প্রবৃত্তিও অনেক আছে।

প্রবৃত্তি-ধর্মাবলম্বনের পারলৌকিক ক্রিয়া

ইন্দ্রিয়পরবশ প্রবৃত্ত-পুরুষেরা স্ত্রীলোকে অগ্রাশ্র আসক্তি ও পান-ভোজনাদিতে গাঢ় প্রেম ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীবন-যাপন করে। প্রবৃত্ত-পুরুষেরা কেবল দৃষ্ট জগতেই আবদ্ধ থাকে, এমত নহে; তাহারা ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি নানাবিধ পারলৌকিক জগতেরও আশা করিয়া তত্তদ্ব্যক্ত দেবতাগণের উপাসনা করে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করত তাহারা ইন্দ্রপুরীতে অপরাধির সহিত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করত সুখী হইতে বাঞ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের আশার সমাপ্তি নাই। ভূ-দেবত্ব, স্বর্গের রাজ্য, ব্রহ্মপদ, শিবত্ব প্রভৃতি অনেক পদের বাঞ্ছা করে। এই সমস্ত বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে এবং প্রত্যক্ষ-বিশ্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু

আমরা তাহার মধ্যে এখানে কিছুই সংগ্রহ করি নাই, যেহেতু মহাশয়েরা সে-সমুদয় অবগত আছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রবৃত্তিমার্গের ফল প্রত্যক্ষ—পশুতেও লক্ষিত হয়

প্রবৃত্তি-পথ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং তৎপথাবলম্বী পুরুষদিগের যে-সকল প্রত্যক্ষ ফল হয়, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতি বিচার-শক্তিতে বিভূষিত, অতএব তাহাদের নিকট প্রবৃত্তি-পথের ফল প্রকাশ হইবে, ইহাতে কথা কি? পশুগণের বুদ্ধি আবদ্ধ থাকিলেও তাহারাও প্রবৃত্তির ফল অবগত আছে। 'বিভর' নামক পশুর গৃহ-নির্মাণ ও 'বাবুই' পক্ষীর বাসা-নির্মাণ কেবল প্রবৃত্তির ফল মাত্র।

প্রবৃত্তিমার্গে ইন্দ্রিয়-সুখ নিঃসন্দেহ

প্রবৃত্তি-পথে মানবজাতির অনেক সুখ আছে, ইহাতেই বলা সন্দেহ কি? * * * অর্দ্ধভাষী বালক-বালিকাগণকে ক্রোড়ে গ্রহণ, ঘৃতান্নাদির রস আশ্বাদন, রমণীগণের নৃত্যস্থলে পদ-চালন এবং দুষ্ক-ফল-প্রায় শয্যায় শয়ন ও ধূম্রধানাদিতে দূরদেশ ভ্রমণ যে অতিশয় আনন্দকর, তাহাতে সংশয় কি? জীবের প্রতি কৃপা করিয়া পরমেশ্বর যে এই জগৎপাশ্বনিবাসটিকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস হয়; কেন না, জিহ্বার গঠনের সহিত উদ্ভিদ পদার্থের যে কোমল সম্বন্ধ ও কর্ণবিবরের সহিত গীতা-বাছাদির যে শ্রিয় অন্য় ও চক্ষের সহিত দৃশ্য পদার্থ আলোকাদির যে সৌহৃদ্য, তাহা অচিন্ত্য-শক্তি পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তির ফল—ইহা কে না স্বীকার করিবে?

পাথিবী সুখমাত্রই প্রবৃত্তি-সুখ

সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, সে-সকলই 'প্রবৃত্তি-সুখ'। প্রবৃত্তি-সুখের বশবর্তী পুরুষেরা দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির জন্ত সর্বদাই ব্যস্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সুখ যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের সাংসারিক অবস্থায় অনেক দুর্দশা ঘটিত। কোথা বা নগর, কোথা বা রেলরোড, কোথা বা নৌকা, কোথা বা বিপণি ও কোথা বা মন্দিরাদি কি দৃষ্ট হইত? মানবজাতি পশুবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া ধাইত। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য পৃথিবীতেই লুপ্তভাবে নিহিত থাকিত।

নিবৃত্তি-সুখের অস্তিত্ব এবং জীবতত্ত্ব কি?

এই প্রবৃত্তি-সুখ ব্যতীত জীবের পক্ষে আর একটি সুখ আছে। গভীররূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিবৃত্তি-সুখের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা যায়। নিবৃত্তি-

সুখ কাহাকে বলি, ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জীব কে, ইহা প্রথমে বিচার্য। এই মনুষ্য-দেহে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, হাড়, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সাতটি পদার্থ গোচর হয়। ইহাতে জীবের কি সম্বন্ধ ? ত্বক্, অস্থি প্রভৃতি পদার্থ প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক ; কিন্তু জীব এতদতিরিক্ত পদার্থ, ইহাতে অনেক গাঢ়তর প্রমাণ আছে। দেহ বিয়োগ হইলে ঐ সমস্ত ত্বক্, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি পদার্থ দেহেতে অবস্থিতি করে ; কিন্তু কাহার অভাবে যে সমুদয় শূন্য বোধ হয়, ইহা বিচার করা নিতান্ত কৰ্ত্তব্য। চক্ষু শীতল হইয়া পুত্তলিকার চক্ষুর ত্রায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, হস্ত-পদাদি স্পন্দহীন হইয়া থাকে, বন্ধুবান্ধবগণ হা-হতাশ করত রোদন করিতে থাকে ; কিন্তু বিষুক্ত দেহ আর কাহাকেও উত্তর দেয় না ! আহা ! এ বিষয়টি কতই গভীর !! যে দেহ আপনার বেশবিশ্রাস করত কত কত রমণী-গণের মন হরণ করিতেছিল, যে চক্ষু অলুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা গতকল্য ঞ্জবতারা ও অক্ষমর্ত্যের দূরতা নির্ণয় করিতেছিল, যে কর্ণ নানাবিধ মধুর স্বর-সম্মিলিত ‘নিধুবাবুর টপ্পা’ শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতেছিল, যে হস্ত গতকল্য খড়্গা, চর্ম্ম, বন্দুকাদি ধারণ করিয়া স্বদেশ-রক্ষা এবং শত্রুদলন করিতেছিল, যে পদ কএক দিবস হইল কাশীক্ষেত্র ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিল, সে সমুদয় অস্ত্র কুকুর ও শৃগালাদির মহোৎসবের উপকরণ হইয়াছে। এই সমুদয় বিচারপূর্বক কোন্ মহাজন না আত্মচিন্তায় ব্যস্ত হন ? পাষাণগণেরাও ক্ষণকালের জন্ত বৈরাগ্য-বিস্তারক বাক্য-সকল কহিতে থাকে ; কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকায় অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যায়।

দেহ বা প্রাকৃত পদার্থ জীবাশ্ম নহে

এই ত্বগাদি সপ্ত আবরণবিশিষ্ট দেহই যে জীব-পদ-বাচ্য, এমত হইতে পারে না। জীব স্বয়ং আত্মতত্ত্ব এবং জীবাশ্ম নামে বিখ্যাত। প্রাকৃত পদার্থের সহিত জীবের যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ, তাহা কদাপি নিত্য নহে। প্রাকৃত পদার্থে যে-সকল ‘রস’ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। প্রাকৃত কোন পদার্থ হইতেই জীবের নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে না। প্রাকৃত পদার্থই স্বয়ং জড় ও দেহের উৎপাদক। কিন্তু জীবাশ্ম দেহ হইতে বিলক্ষণ।

নিত্য-সুখই জীবাশ্মার কাম্য ; ভৌতিক

দেহাবলম্বিতাই তাঁহার বন্ধাবস্থা

জীবাশ্মা সর্বদা স্বভাবতঃ কোন এক অনির্বচনীয় অখণ্ডানন্দের লালসা করিয়া থাকে। প্রাকৃত পদার্থে ঐ আনন্দের কোন আভাস-মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং ভৌতিক দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের অনেক প্রকার অকল্যাণ হইয়াছে। জীব

প্রকৃতির অধীন হইয়া নিজ স্বাধীনতা-স্বথকে অনুভব করিতে অশক্তি। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি ছয়টি আপৎ সর্বদা জীবকে যত্না প্রদান করিতেছে। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে জীবের প্রবেশকে ‘বদ্ধভাব’ কহা যায়। সমস্ত বৈধব-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই এই প্রকার অবস্থা-প্রাপ্ত জীবগণকে “বদ্ধজীব” কহেন। ফলতঃ তাঁহারা কোন কোন মুক্ত জীবেরও আভাস প্রাপ্ত হন।

বদ্ধাবস্থাতেই ইন্দ্রিয় ও শিবদ্ব-লাভের স্পৃহা

ভৌতিক পদার্থে জীব যখন আবদ্ধ হইয়া সুখান্বেষণ করিতে থাকেন, তখন মায়া-প্রকৃতিস্থ প্রবৃত্তি-স্বথ তাঁহাকে আতিথেয় বরণ করিয়া মোহিত করিয়া রাখে। এই অবস্থা-স্থিত পুরুষেরা সাংসারিক পদার্থ-স্বথ, কল্লিত ইন্দ্রিয়, ব্রহ্মদ্ব ও শিবদ্ব প্রভৃতি পদের আশা করিয়া চিরকাল দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। জীব মনে করেন যে, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ও নানাবিধ উপকরণ ও স্বন্দরী স্ত্রী, বালকাদি ও রেলরোড, বাতীবহ ও সুনিয়মিত রাজ্য-শাসন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত্যই জীবনের উদ্দেশ্য। আহা! কি কঠিন ভ্রম! যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত্যদ্বারা ও সমস্ত রাজনৈয়মের অল্পটানে তাঁহার ১৫০ বৎসর পর্যন্ত দেহান্তর না হইত, তবে অবশ্যই তাঁহার ক্রিয়-পরিমাণে জয় স্বীকার করা যাইত। নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এবং ভক্তিহীন তর্কিকেরা এই সংসারের উন্নতির দ্বারা জীবের পরমাণু বৃদ্ধি ও অনন্ত উন্নতির কল্পনা করেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের মঙ্গল চিন্তা নিষ্ফল

আহা! তাঁহাদের ভ্রম কি গাঢ়তর! অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে ভৌতিক বিজ্ঞান-সকলের অনেকানেক উন্নতি হইতেছে। গ্রীসদেশে ‘থেলিস’ নামক পণ্ডিত যখন জল হইতে সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি-বিষয়ক তত্ত্ববিজ্ঞা প্রকাশ করেন, তখন মনুষ্য-মণ্ডলী বিজ্ঞানের দ্বারা বহুবিধ আশা করিয়াছিল। বেকন, নিউটন, লাগার্ক, গোয়েট প্রভৃতি অনেকানেক নবীন তত্ত্ববাদী বহুবিধ চিন্তামণির প্রকাশ করিয়াও জীবের কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইয়েন নাই। চৌষকবিজ্ঞান, রেলরোড, বন্দুক ও অনেকানেক শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু তদ্বারা মানব-জাতির সংসার-স্বথের কি বৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের একরূপ যুক্তিতে নবীন-সম্প্রদায়ের সন্তোষ হইবে না, যেহেতু তাঁহারা বাল্যকাল হইতে এতদ্বিষয়ে কুসংস্কারের দাস হইয়া রহিয়াছেন। রেলরোড ও জাহাজ প্রভৃতির দ্বারা যে অনেকপ্রকার বাণিজ্যাদি প্রভৃতি সাংসারিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস; যেহেতু সম্প্রতি দেশের পরিবর্তন হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকাল

হইতে তাহাই গুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিলে তদ্বারা যেমত কতকগুলি সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমত অনেক দুঃখেরও উদয় হইয়াছে।

আশা-আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের কারণ

‘সন্তোষ’ একথাটিও বর্তমানকালের অভিধানে পাওয়া যায় না; পৌরাণিকরূপে কথিত হইয়া থাকে। সন্তোষের লাঘব হওয়া কে না স্বীকার করিবেন? সন্তোষই জীবের অমূল্য রত্ন। আশার অবধি নাই। আশা মত্ত হস্তীর তায় ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াও নিবৃত্ত হয় না। আশাই জীবের প্রধান শত্রু। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির আধুনিক ইতিহাস এবং দুর্ঘোষন-রাবণাদির পৌরাণিক বৃত্তান্ত যাহার দ্বারা অলোচিত হয়, তাহার আর আশার আশা থাকে না। সম্প্রতি যে সন্তোষের অভাবে আশার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখা যায়, এস্থলে প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী পুরুষ-দিগের যে উন্নতির ভাব, তাহা নিকৃষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই; আশা যে অনর্থকর, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং স্তখং ।

যথা সংচ্ছিত্ত কাস্তাশাং স্তখং স্তম্বাপ পিঙ্গলা ॥ (ভাঃ ১১।৮।৪৪)

‘মাবতীয় পার্থিব জ্ঞানই অজ্ঞান’—পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তি

যদিও পদার্থ-বিচার অকর্মণ্যতা আমরা স্থাপন করি না, তথাপি তদ্বিচার উন্নতির দ্বারা জীবের কি সাফাং লাভ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। গন্তীর বিচারকেরা এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন। জার্মানি প্রদেশস্থ এক মহাপুরুষ অনেকানেক তত্ত্ব-বিচার আবিষ্করিয়া করত আপনাকে অনেক বিধির বিধাতা জ্ঞান করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার সময় তাহার পুস্তকাগারে উপবেশন করত কহিলেন,—“হায় ! আমি সমস্ত পদার্থ-বিচার নূতন সত্যের আবিষ্করিয়া করিয়াছি, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে ; কিন্তু আমি ফলতঃ কি শিক্ষা করিয়াছি ? সামান্য মূর্খের সহিত আমার কি বিশেষ ভেদ আছে ?” তখন তিনি অনেক আলোচনাপূর্বক কহিলেন,—“আমার বিশাল জ্ঞান হইয়াছে, যেহেতু আমি অত জানিতে পারিলাম যে, কোন একটিও স্বরূপ-সত্য আমি জানি না”। এই বৃত্তান্তটি “ফট” নামক একখানি অপূর্ব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। জুইডেনবর্গ নামক একজন মহাপুরুষও এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। নবীন-সম্প্রদায়ের বিদেশীয় গ্রন্থে ও পাণ্ডিত্যে অধিক আস্থা, এজন্য এস্থলে আমি বিজাতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম। আমাদের

স্বদেশীয় শাস্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। একটিমাত্র প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে, শুকবাক্য—

শাকশ্চ হি ব্রহ্মণ এষ পস্থা, যন্মামিধীয়ায়তি দীৰ্ঘপাৰ্থে ॥

পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেহর্থান, মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ (ভাঃ ২।২।২)

স্বামিকৃত-টীকা চ—শাকং শকময়ং ব্রহ্ম বেদস্তশ্চ এষ পস্থাঃ কৰ্ম্মফলবোধন-প্রকারঃ। কোহসৌ? অপার্থৈর্ধৰ্ম্মশূন্যৈরেব স্বর্গাদিনামভিঃ সুখকশ্চ ধীধীয়ায়তি তত্তদিচ্ছাং করোতীতি যৎ। অপার্থহমেবাহ তত্র মায়াময়ে পথি স্থখমিতি বাসনয়া শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্চান্নিব পরিভ্রমন্নর্থান বিন্দতি, তত্তল্লোকং প্রাপ্তোহপি নিরবতঃ স্থখং ন লভত ইত্যর্থঃ।

[শব্দব্রহ্মরূপ বেদের পথ বা কৰ্ম্মফল বোধনের প্রকার এই যে, ইহা অর্থশূন্য ‘স্বর্গাদি’ নাম সৃষ্টি করিয়া ‘আমি স্বর্গে স্থখ পাইব’ ইত্যাদি চিন্তায় বুদ্ধিকে বুঝা নিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু স্থখ-বাসনায় শয়ান-পুরুষ যেমন স্বপ্নে স্থখদর্শন মাত্র করে, প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াময় পথে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষয়িষ্যলোক প্রাপ্ত হইলেও উহার ঐকান্তিক নিরবতঃ স্থখলাভ করিতে পারে না।]

স্বাধীনতাই জীবের নিত্য-স্থখ ও নিবৃত্তিমার্গেই মুক্তি—

প্রবৃত্তিমার্গে নহে

কিন্তু ‘জীবের নিত্য স্থখ কি’ এবিষয়ে বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে, স্বাধীনতা জীবের নিত্য স্থখ। প্রকৃতির অধীনতা-প্রযুক্ত জীবের দুঃখের উদয় হইয়াছে। এই মায়্য-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া জীবের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম মুক্তি। ইহাকে নিবৃত্তি-স্থখ कहा যায়। প্রবৃত্তি-মার্গস্থিত পুরুষদিগের কৰ্ম্মের ফলও লজ্জনীয় নহে; অতএব প্রবৃত্ত-পুরুষের মায়্যা হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রবৃত্তি-মার্গের উন্নতিই তন্মার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য। কোন কার্যে বিপরীত ফল হয় না; সজাতীয় ফলই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রবৃত্তি কদাচ নিবৃত্তি প্রসব করিতে শক্ত হয় না। তবে যদি ভাগ্যক্রমে কোন প্রবৃত্ত-পুরুষের প্রবৃত্তির প্রতি অপ্রবৃত্তি জন্মে, তবে তাহার শুভফল লাভ হয়। এই প্রকারে অনেক পুরুষ মায়্যামুক্ত হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিনী

ভক্তি-মহিমা

মঙ্গলাচরণ

গুরু-গৌর-রাধানাথ নিজগণ-সহ ।
সকল আরম্ভে শুভ বন্দি অহরহঃ ॥
গৌর-করুণা দেহ 'গৌর'-সরস্বতী' ।
বন্দি গুরু-পদ আজ করি শত নতি ॥
নিবেদনে বন্দি পুনঃ ভক্ত অলিগণে ।
ভক্তি-রস-তরঙ্গিনী সবে করু পানে ॥
শ্রীরূপ-গোস্বামীর ভরসা-বাণী
গুরুকূলে বাস নাই, নাই বিতা-বল ।
হ'বে কি সফল মোর হেন আশা-বল ॥
শুনি সাধুজন বলে না হ'বে বিফল ।
নীচের আগুন তাই শোধে সোণা-মল ॥
পাপনাশী হরিকথা শুনে সাধু কাণ ।
যে-কোন শব্দে কর তাঁর গুণগান ॥

ক্ষমা-প্রার্থনা

তাই সাধুজন-পদে সদাই প্রার্থনা ।
শোধন করুন মোর মনের কামনা ॥
শাস্ত্র-শ্লোকের মর্ম্ম ধারণাতে বহি' ।
অযোগ্য লেখনী-দ্বারে পরারৈতে কহি ॥
ভক্ত-মধুকরগণ ক্ষম অপরাধ ।
দাস-অনুদাস জানি' করহ প্রসাদ ॥

এশ্বের বিষয়

ভক্তি, ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিবশ হরি-সীমা ।
ভক্তি-সদাচার, ভক্তি-সাধক-মহিমা ॥
এ পঞ্চ মহিমা লই ভক্তি-তরঙ্গিনী ।
জুজনের ঘরে ধীরে চলে মহাশ্রী ॥

এস্থারম্ভ

প্রথমেই শুন সবে 'ভক্তির মহিমা' ।
দূরে যাবে অগ্র সব সাধন-কালিমা ॥
মায়াকৃত উপাধি সব ছাড়িয়া যাইলে ।
কৃষ্ণে শরণাগতি হ'লে ভক্তি মিলে ॥
চিরদিন ভক্তি-রত্ন রাখি' লুকাইয়া ।
বঞ্চিল সবারে হরি ভোগ-মোক্ষ দিয়া ॥
ব্রহ্মাদি হুল'ভ ভক্তি কেহ নাহি পায় ।
হইল অলভ এবে শ্রীগৌর-রূপায় ॥
হেন গৌর-ভক্তিসার 'রূপে'র সম্পদ ।
শুন অধীজন আর রবে না বিপদ ॥
ছাড়ি' অগ্র অভিলাষ, আর জ্ঞান-কর্ম্ম ।
হরি-অনুকূল সেবা ভক্তি-সারমর্ম্ম ॥
কুশলদায়িনী, পাপ-ক্লেশ-নাশিনী ।
মোক্ষ-তাড়িণী, আর হুল'ভ-মানিনী ॥
সুখ-স্বরূপিণী, আর কৃষ্ণাকর্ষিণী ।
সকল সাধন-সার মহাজন-বাণী ॥
ভক্তিদেবী ধরে সদা এই ছয় গুণ ।
আরাধনা করে তাই জুজন নিপুণ ॥
ভক্তি-মনে পূজে যেই তুলসী ও জলে ।
আত্মা দিয়া শোধে ঋণ হরি নিজে বলে ॥
পূর্ণ হরি তুষ্ট যদি, হেন ভক্তি-ভাবে ।
অলাভ কি থাকে আর, ভেবে দেখ ভবে ॥
মন-মাঝে ভুক্তি-মুক্তি-আশা যদি রয় ।
ভক্তি-সুখ কতু তবে উদয় না হয় ॥

‘ভক্ত’-ধাতুর অর্থ ‘সেবা’ জানে সব স্বধী
 কৃষ্ণসেবা-অনুকূল হয় ভক্তি-নিধি ॥
 ভক্তির বিশেষ অর্থ ভাবিবার নাই ।
 কৃষ্ণপদে অহুরক্তি, ভক্তি নামে গাই ॥
 ভক্তিযোগে ভীষ্ম যারে জিনিল সমরে ।
 ভক্তিযোগে যশোদা বান্ধিল তাঁহারে ॥
 ভক্তিযোগে সত্যভামা ঈশ্বরে বেচিল ।
 ভক্তিযোগে তাঁর কাঁধে শ্রীদাম চড়িল ॥
 ভক্তিযোগে সদা হরি পরাভূত হয় ।
 এই লাগি ভক্তি তিনি লুকায়ে রাখয় ॥
 মহাপ্রভু বলে, যে জনেব কৃষ্ণভক্তি আছে
 কুশল, মঙ্গল, তার নিত্য থাকে পাছে ॥
 যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাই কথা ।
 তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্বথা ॥
 বেদশাস্ত্র মহাজন-পথ সে লওয়ায় ।
 তাহা ছাড়ি’ অবোধ সে অগ্র পথে যায় ॥
 ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস ।
 সনকাদি, যুধিষ্ঠির আরো পঞ্চ দাস—
 প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধব ।
 মহাজন হেন নাম যত আছে সব ॥
 ভক্তি সে মাগেন সবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ।
 ‘জ্ঞান’ যদি বড় হয়, ভক্তি মাগে কেনে?
 শ্রেয়ঃ হরিপদ লাভে ভক্তিই সক্ষম ।
 জ্ঞান-পথ কষ্ট-সার নিতান্ত অক্ষম ॥
 বিনা বিচারেতে কি সে সব মহাজন ।
 মুক্তি ছাড়ি’ ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ ॥
 সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ ।
 কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান ॥
 কিবা ব্রহ্ম-জন্ম কিবা হউ যথা-তথা ।
 ‘দাস’ হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্বথা ॥

এই মত যত মহাজন-সম্প্রদায় ।
 সবেই সকল ছাড়ি’, ভক্তি মাত্র চায় ॥
 হাজার হাজার পশু-পাখী কীট-যোনি ।
 ভ্রমিব হেথায় কিছু দুঃখ নাই মানি ॥
 কিন্তু হরি তোমা পদে ভক্তি থাকে যেন ।
 এই বর মাগি আমি ওহে জনার্দন ॥
 অতএব সর্বমতে ভক্তি সে প্রধান ।
 মহাজন-পথ সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥
 ভক্তি বিনা শুধু জ্ঞান-যোগ-তপস্যায় ।
 কিছু নাই হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায় ॥
 লোক-বেদমতে যে-যে ক্রিয়া দেখা যায় ।
 হরিসেবা-অনুকূল হ’লে ভক্তি কয় ॥
 আত্মারাম মুনিগণ মুকুতি লভিয়া ।
 অচিন্ত্য গুণের হরি ভজে মন দিয়া ॥
 বিষ্ণু ছাড়ি’ অগ্রপূজা কৰ্ম্মাঙ্গ-বিশেষ ।
 বিধিহীন সেই পূজা অবিধি অশেষ ॥
 অবিষ্ণুর বশে কৰ্ম্মী আঁধারেতে যায় ।
 তা’ হ’তেও জ্ঞানপন্থী আঁধারে মিশায় ॥
 নির্বিশেষ জ্ঞানিগণ দুঃখ পায় রাশি ।
 যেহেতু অব্যক্ত-ভাবে’ ধ্যান করে বেশী ॥
 অতএব ‘কৃষ্ণ-ভক্তি’ সাধন-প্রধান ।
 আদর করিয়া লহ ছাড়ি’ কৰ্ম্ম-জ্ঞান ॥
 “জ্ঞানী মুক্তদশা পাইলু করি’ মানে ।”
 সে বুদ্ধিও শুদ্ধ নয় হরিভক্তি বিনে ॥
 যাগ-যোগ সব ছার, ‘শ্রদ্ধা’ মাত্র সার ।
 শ্রদ্ধা-বিন্দু হ’তে মিলে ভক্তি-অধিকার ॥
 সাধুমুখে হরিকথায় শ্রদ্ধার উদয় ।
 ভক্তি-বীজ বলি’ গীতা-ভাগবতে গায় ॥
 সাধু-সঙ্গ হয় তাই ভক্তি-বীজ-মূল ।
 সাধু-সঙ্গফলে জীব ছাড়ে সব ভুল ॥

সামান্য, সাধন, ভাব, প্রেমভক্তি-মতে ।
 ভুক্তিদেবী চারিরূপ ধরে ভক্ত-চিত্তে ॥
 হরি-কাছে ল'য়ে যায়, দেখায়, বশ করে ।
 ভক্তিদেবী সদা তাই এত গুণ ধরে ॥
 মুখ যেন বাহুবলে সিদ্ধ নাহি তরে ।
 সেইমত ভক্তি বিনা অগতি সংসারে ॥
 'হরি-ভক্তিই ভজন' জান সর্বকাল ।
 তা' হ'তে ঘুচে জীবের সকল জঞ্জাল ॥
 ধন-জন বিছা-কুলে হরি নাহি পায় ।
 ভক্তিবশ ভগবান্ সাধু-শাস্ত্র গায় ॥
 হরি-আকর্ষণী ভক্তি পশ্চাতে সতত ।
 দাসীবৎ চলে মুক্তি-সিদ্ধি আদি যত ॥
 মানুষ্যের পরোধর্ম অধোক্ষজে ভক্তি ।
 অহৈতুকী, অব্যয়, আত্ম-অনুরক্তি ॥
 'হেতু'-শব্দে কহে যত কামনা অন্তরে ।
 ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি মুখ্য এতিন প্রকারে ॥
 এক ভুক্তি কহে, ভোগ অনন্ত প্রকার ।
 সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চ প্রকার ॥

এ সব বিহীন সদা ভক্তি অহৈতুকী ।
 যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥
 ভক্তির সাধন-মধ্যে নবধা প্রচার ।
 ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি বহুবিধ আর ॥
 প্রেমের লক্ষণ যত আছেয়ে প্রচার ।
 তার মধ্যে মহাভাব উপর সবার ॥
 শাস্ত্র-ভক্তের রতি—প্রেম পর্য্যন্ত ।
 দাস-ভক্তের রতি—রাগ-দশায় অন্ত ॥
 সখা-ভক্তরতি—অনুরাগ পর্য্যন্ত ।
 পিতা-মাতা-স্নেহ আদি—অনুরাগ অন্ত ॥
 কাস্তাগণের রতি পায়—মহাভাব সীমা ।
 'ভক্তি' শব্দের এ-সব অর্থ মহিমা ॥
 ভক্তিপূণ্য জনে মুক্তি না করি প্রসাদ ।
 মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ ॥
 ভক্তি-স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি ।
 ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি ॥
 শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মোর গুরু ।
 নিয়ত বসুক হৃদে আশা-বল্লভরু ॥
 হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা-কাদাল ।
 'ভক্তি-তরঙ্গিনী' গায় আনন্দগোপাল ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

আনন্দপুর, (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠার পর)

আধুনিক সভ্যতার প্রগতি-প্রসূত চুরাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিলেই তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে । কৃষ্ণভক্তির সংশ্রবে এবং কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান তাহাদের হৃদয়স্থিত অভদ্রভাব নষ্ট হইতে আরম্ভ হয় । হৃদয়ের নিভৃততম স্থানগুলি যেখানে কেবলমাত্র অভদ্র-ভাবই পূর্ণ থাকিত, সেই সেই স্থানে ক্রমশঃ নির্মল ও মঙ্গলময় ভাব পরিপূর্ণ হয় ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবলেই ঐ দুরাচার বা স্বেচ্ছাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া প্রবল অনুতাপ-নিবন্ধন শীঘ্রই ধৰ্ম্মাত্মা হইয়া সকল সদগুণের অধিকারী হন। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিয়াও যদি স্বেচ্ছাচারত্ব বর্তমান দেখা যায়, ভগবৎকৃপাবলে তাহাও শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া যাইবে—ইহাই সিদ্ধান্ত। অনন্তর ভক্তগণ যাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অগরাধী নহেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ সাধুই জানিতে হইবে। আমাদের বাহ্যিক দর্শনে ঐসকল অনন্তর ভগবৎভক্তগণের স্বেচ্ছাচারত্ব সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ দেখা না গেলেও, ঐসকল ভক্তগণ কোনদিনই কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগীর স্তায় নষ্ট হইয়া যাইবেন না—ইহা ভগবানের সাক্ষাদ্ শ্রীমুখবাণী। অজামিল-উদ্ধার-উপাখ্যানে আমরা এই দৃষ্টান্ত স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি। অনন্ত-কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই বাহ্যতঃ দুরাচার-দশাতেই শুদ্ধাচরণ হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াই বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনন্তর ভক্তগণ কোনদিনই নাশ প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহার ভক্তবৎসলতার প্রমাণ এই শ্লোকেই দৃষ্ট হয়, কারণ তিনি নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া না বলিয়া তাঁহার ভক্ত মহাবীর অর্জুনকেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে বলিলেন। কারণ ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেও, ভক্তবৎসলতা-নিবন্ধন তাঁহার ভক্তের প্রতিজ্ঞা সৰ্ব্বদাই রক্ষা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভক্ত ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভক্ত-বাৎসল্যেরই পরিচয় দিয়াছিলেন।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, ভগবৎভক্তের স্বেচ্ছাচারত্ব বিনাশের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উচ্চবর্ণাদি সম্বন্ধেই সম্ভব। কারণ অজামিলাদি ভক্তগণ ব্রাহ্মণকুলেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং কৰ্ম্মদোষে কিছুদিন স্বেচ্ছাচার-সম্পন্ন দেখা গেলেও ভগবৎস্মৃতি-জগ্ন তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারত্বের যে কথা বলা হইল, তাহা উচ্চ-নীচ বর্ণসম্ভূত সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। কীরাত, হুণ, অন্ধ, পুলিন্দ, পুন্ড্র, আভীর, শুক্ষা, ম্লেচ্ছ, যবন, খণ্ড, চণ্ডালাদি জগতে যত প্রকার পাপ বা নীচঘোনি-সম্ভূত দলুস্তাদি বর্তমান আছে এবং যাহারা স্বাভাবিক-ভাবেই বদাচার-সম্পন্ন, তাহারা সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা লাভ করিলেই সেই পরমধামে যাইতে পারিবে।

নাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য বেহপি হ্যঃ পাশযোনয়ঃ ।

শ্রীয়ো বৈশান্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ (গীঃ ৯।৩২)

কীরাত-হুণাঙ্ক-পুলিন্দাদি অত্যন্ত নীচ-যানিসমূহ ত ব্যক্তিগণ যখন কৃষ্ণভক্তি দ্বারা পরমধামে যাইতে পারেন, তখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বা তন্নিম্নস্থ স্ত্রী-শূদ্র-যবনাদির ত' কোন কথাই নাই। ভগবানের ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা নাই। প্রকৃত একজাতিত্ব, একধর্মত্ব, একেশ্বরত্ব ইত্যাকার ভাব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ত্বেই সম্ভব হয়,— অশ্রুতায় নহে।

কলিকাল-নিঃস্পৃহিত মনুষ্যজাতি মান্নাকবলিত হইয়া যে স্বরূপ ভেদ-বুদ্ধিতে জগতে বিপর্যায় উপস্থিত করিয়াছে এবং সেই বিপর্যায়ের সমাধানকল্পে মনিষিগণ আজ জগতে যে একই আনিবার গুণ গভীর গবেষণা করিতেছেন, উহা সহজে কিভাবে এবং কোন্ পথে সমাধান হইবে, তাহা বহুদিন পূর্বেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতাশাস্ত্রেই নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

মন্যনা ভব মন্তন্তো মদ্ব্যজী মাং নমস্কর ।

• মামেবৈষ্ণসি যুক্তৈঃ সগাঅানং মংপরায়ণঃ ॥ (গীঃ ৯।৩৪)

হে মনুষ্যজাতি ! তোমরা সকলেই শ্রীমদ্ভগবদঙ্গীতার বাণী অহুমরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মনঃসংযোগ কর। তোমাদের শারীরিক, মানসিক সমস্ত কাৰ্য্য তাঁহার সেবোপকরণ হিসাবে করিতে থাক। এইভাবে সর্বতোমুখী কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইলেই, তোমরা কেবলমাত্র ইহ-জগতেই যে সুখী হইবে তাহা নহে, পরন্তু পর-জগতেও নিত্যকাল তাঁহার সেবাসুখ লাভ করিয়া নিত্যানন্দে নিমগ্ন হইবে। মহাবদান্ত-অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-মহাপ্রভু এই কথাই প্রচার করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশে তিনি বাঙ্গালাদেশে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালী-জাতিকে ধন্যতিধন্য করিয়াছেন। বাঙ্গালীজাতি তাঁহার কথা সমস্ত জগতে প্রচার করিয়া নিজকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকভাবে 'তাঁহার' কথা স্মৃষ্ট প্রচার হইলেই বিবদমান মনুষ্য-জাতি পরাশান্তি লাভ করিবে। দুঃখের বিষয়, শ্রীমদ্ভগবৎপ্রভুর নাম ভাঙ্গাইয়া তের প্রকার অপসম্প্রদায়ই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া কতকগুলি সরলমতি শিষ্যাদি সংগ্রহ করত নিজদিগকে বহুমানন করিতেছে। যাহারা নিজেরাই কোনপ্রকার শিষ্যত্ব স্বীকার করে নাই, তাহারা-কোনবলে গুরু বলিয়া পরিচয় দিতেছে—আমরা তাহা বুঝি না। যে কথা সমস্ত জগদঙ্গীকে গ্রহণ করাইতে হইবে, তাহা কোন লোক-বন্ধনামূলক ভাবুকতা নহে; তাহা অত্যন্ত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। মুখ্যসমাজে ভাবুকতার ভাগ দেখাইয়া গুরু

সাজিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর কথা কোনদিনই প্রচার হইবে না। সাধু সাবধান।

আমরা সর্বদাই অহুভব করি যে, একমাত্র কৃত্তিক চিং-জড়-সম্বয়বাদী বা মায়াবাদী শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ‘স্বয়ং ভগবান্’ বলিতে কুন্তিত। তাহারা নিজ চেষ্টায় ভগবান্কে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত থাকিবে। এ কথা তাহারা নিজেরাও বুঝিতে পারে না এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদগণ তাহা দৃঢ়ভাবে বুঝাইয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপত্তির অভাবেই এইপ্রকার দুরবস্থা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ অপ্ৰাকৃত বিষয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা কোনদিনই গ্রাহ্য হয় না। সূর্য্যাকিরণ-দ্বারাই যেমন সূর্য্যদর্শন হয়, সেইপ্রকার ভগবানের সেবা-কিরণ-দ্বারাই ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশিত হন।

পরমতত্ত্ব বুঝিবার জন্ত যে-সকল সরঞ্জাম আমাদের আছে, তাহা এইরূপ— যথা, বুদ্ধি অর্থাৎ হৃদ্মার্থ-নির্ণয়-সামর্থ্য, জ্ঞান অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিবেক, অসংশোধিত, ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা, সত্য বা যথার্থ-ভাষণ, দম বা বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, সমতা বা অন্তরিন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ ইত্যাদি সাত্ত্বিক গুণসমূহ; অভয়, সমতা, তুষ্টি ইত্যাদি রাজসিক গুণসমূহ এবং ভয়, জন্ম-মৃত্যু-দুঃখাদি তামসিক গুণ-সমূহ সকলই ভগবানের বহিরঙ্গা ত্রিগুণগমী মায়া হইতে সম্ভূত। আবার সেই মায়া ভগবানের অধীন-তত্ত্ব—শক্তি বলিয়া উপরিউক্ত সমস্ত বিভূতিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণের অতীত অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবস্ত। সুতরাং উপরিউক্ত বুদ্ধি-জ্ঞানাদি সত্ত্বগুণের আলোড়ন করিয়া গুণাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌছান যায় না। মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে সেই ভগবানের পাদপদ্মে প্রপত্তি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, “মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে (গীঃ ৭।১৪)।” মায়াকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—শ্রীভগবানে প্রপত্তি। সেই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ (ব্রঃ সং ৫।১)।” মায়াতীত অবস্থাতেই ভগবানের মহৈশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি উপলব্ধি হয়। মায়াতীত অবস্থায় ভগবানের মুখপদ্মনিঃসৃত নিম্নলিখিত কথাগুলি বুঝা যায়। যথা—

অহং সর্ব্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।

ইতি মন্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমাধিতাঃ ॥

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ (গীঃ ১০।৮-১০)

[অর্থাৎ—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি-স্থান বলিয়া আমাকে জানিও—এইরূপ অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তি-সহকারে যাহারা আমাকে ভজন করেন, তাহারাই ‘পণ্ডিত,’ আর সকলেই অপণ্ডিত ॥৮॥ অনন্তভক্তিদিগের চরিত্র এইরূপ;— তাহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সমাক্ষ অর্পণ করত পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথায় কথোপকথন করিয়া থাকেন ; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভাস্কজুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লক্ষপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রস রমণ-স্থখ লাভ করেন ॥৯॥ নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা যাহারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন, আমি তাহাদের শুদ্ধজ্ঞান-জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি ; তাহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন ॥১০॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবৈদ্য
এডিটর, ব্যাক-টু-গডহেড্

অতিথি-সংকার

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠার পর)

সকল দেশেই এই ‘অতিথিসেবার কথা শুনা যায়। ইহা দেখিয়া শুদ্ধভক্তি-পথের পথিকগণ মনে করিতে পারেন,—যে-সকল কস্মৈ কস্মীদিগের আদর ও আগ্রহ, শুদ্ধভক্তিগণের পক্ষে কখনও উহার অনুকরণ করা কর্তব্য নহে। কিন্তু কস্মী বা অন্তাভিলাষী যাহাই করিষেন, তাহা বৈষ্ণবদের কর্তব্য নহে মনে করিয়া, অতিথিসেবা বা দীন-দুঃখী-দরিদ্রকে বা ভিখারীকে ভিক্ষাদান ও অর্থাদি সাহায্য করাকে কস্মাদ্ বিচার করত তৎপ্রতি উদাসীন হওয়া ভক্তি-পথান্ত্রিত ব্যক্তিগণের কর্তব্য নহে। এই অতিথি-সংকার কি গৃহস্থ, কি বৈষ্ণব সকলেরই করা উচিত। যদি তাহারা শ্রীগুরু-গোবিন্দের আদর্শানুসরণে অতিথি-সেবা না করেন, তাহা হইলে তাহাদের বিচার কতটা শাস্ত্রানুসৃত, তাহা সজ্জনগণ বিচার করিবেন।

বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজকে লোকে যে-সকল অর্থাদি দান করিতেন, তিনি তাহা অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিতেন এবং ঐ অর্থ

শ্রীধামের অভ্যাগতগণের সেবায় নিয়োগ করাইতেন। নিত্যসিদ্ধ-ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও অতিথিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

একসময় জনৈক বাউল-বেথী উদাসীন ব্যক্তি শ্রীপুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ পুরী-মঠেই ছিলেন। মঠের কোন নবাগত ভক্ত তাঁহার বাউল-বেষ দেখিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিতে অস্বীকার করেন। শ্রীল প্রভুপাদ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং সেই ভক্তকে সাবধান করিয়া দিয়া সেই ব্যক্তিটিকে আদরের সহিত নিজে সম্মুখে থাকিয়া প্রসাদ ভোজন করান, এবং সেদিন হইতে সকলকে বলিয়া দেন— যে-কোনও উদাসীন ব্যক্তি যে-কোন সম্প্রদায়েরই হউক, যদি প্রসাদ ভিক্ষা করেন, তবে তাঁহাকে তাহা প্রদান করা প্রত্যেক মঠবাসীর কর্তব্য। যেরূপ গৃহস্থের পক্ষে অতিথিসেবা কর্তব্য, তদ্রূপ কৃষ্ণের সংসার মঠেও অভ্যাগতের সেবা কর্তব্য। নিজেরা ভোজন না করিয়াও অতিথির সেবা করিতে হইবে। প্রচুর প্রসাদাদি না থাকিলে মাধুকরী প্রদান করিতে হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে জল, আসন ও মিষ্ট বাক্যের দ্বারা অভ্যাগতের সম্মান করিবেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালে দেখিতে পাই, শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীপদ্মাবতী দেবী তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় একটিমাত্র পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে দান করিয়া এক সন্ন্যাসী অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীশচীদেবীও অতি যত্ন ও আর্তির সহিত তৈরিক-অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে নিত্য অতিথি-সেবা হইত। বিষ্ণুসেবার গ্রাম অতিথি-সেবাকেও তাঁহারা নিত্যধর্ম বলিয়া জানিতেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও সময়-সময় দিন ও দুঃখীকে নিজের পকেট হইতে অর্থাদি সাহায্য করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, দীন-দুঃখীকে দান করিলে তাহা কর্ম হইয়া যায়, এজন্য আমরা অতিথি-সংকারাদি করি না। এইরূপ কল্পিত বিচারের মূলে ভক্তি ও ভগবানের প্রতি কতটা আদর ও প্রীতি আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ ব্যবহার-কার্পণ্যকে ভক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন। যাহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদের চরিত্রে অতি সাধারণ গুণ বা তটস্থ-লক্ষণগুলিও থাকিবে না। এরূপ নয়। বরং কৃষ্ণক-শরণতা-রূপ স্বরূপ-লক্ষণ তা থাকিবেই, তটস্থ-লক্ষণগুলিও আনুমানিক-ভাবে স্বরূপ-লক্ষণের সেবা করিবে। কর্মী ও শুদ্ধভক্তের মধ্যে পার্থক্য-এই যে, কর্মী

তটস্থ-লক্ষণগুলিকেই মুখ্য-লক্ষণ মনে করে এবং ত্রিগুলিকে প্রাধান্য দিয়া হরিভক্তিকে গোণ, কখনও বা হরিভক্তিহীন নীতিকে বহুমানন করে। কিন্তু শুদ্ধভক্তের বিচার এই—

যশাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈশু নৈশুজ সমাসতে স্বরাঃ।

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন।

কর্ম্মীর লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত ক্রিয়া আত্ম-সুখময় অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনার অমুকূলে কৃত হয়। আর ভক্তের লৌকিকী ও বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া হরিসেবার অমুকূলে কৃত হইয়া থাকে। কর্ম্মী পুণ্যকামী হইয়া অতিথি-সেবা করেন, আর শুদ্ধভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পূর্বগুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রীতিকল্পে শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের জন্ত অতিথিসেবা করিয়া থাকেন। কখন কোন্ শুদ্ধভক্ত যদৃচ্ছাক্রমে অতিথিরূপে সমাগত হইবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অনেকে অতিথিসেবা করিতে করিতে স্বেচ্ছাভ মহা-ভাগবতের সেবা ও সঙ্গ-লাভ করিয়া ধন্য হন। মহাভাগবতগণ অনেক সময় সাধারণ অতিথিরূপে পৃথিবীতে পর্যটন করিয়া থাকেন। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ অতিথিসেবা-বিমুখ হন, তাহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। শ্রীউদ্ধব-মহারাজ যখন কৃষ্ণ-প্রেরিত হইয়া ব্রজে গমন করেন, তখন শ্রীনন্দ-মহারাজ—“মদভীষ্টদেবোহতিথিরূপেণাগতঃ” এই কথা স্মরণ করিয়া শ্রীউদ্ধবের যথাযোগ্য যত্ন ও সেবা করিয়াছেন। একথা শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদিগকে তৎকৃত টীকায় জানাইয়াছেন।

যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণও অতিথিসেবার উজ্জ্বল আদর্শ পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে গৃহস্থধর্ম্ম সঙ্ঘন্ধে শ্রীযুধিষ্ঠির-মহারাজকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

মৃগেষ্টিথরমর্কাখু-সরীসৃপ-খগ-মক্ষিকাঃ।

আত্মনঃ পুত্রবৎ পশুং তৈরেষ্যামস্তরং কিমং ॥ (ভাঃ ৭।১৪।২)

মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, মুষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা—ইহাদিগকে স্বীয় পুত্রের তুল্য দর্শন করিবে; অর্থাৎ পুত্রের হ্রায় যথোচিত ভোজ্য দিবে, যেহেতু পুত্রাদি হইতে ইহাদিগের পার্থক্য কি পরিমাণ?

আশ্বাঘাত্তেহবসায়িত্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা ।

অপ্যেকামাত্মনো দ্বারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।১১)

কুকুর, পতিতব্যক্তি ও চণ্ডাল প্রভৃতিকে ভোগ্যবস্তু যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিবে । একমাত্র মমতাস্পদ ভাৰ্য্যাকেও নিজসেবায় উপেক্ষা করিয়া অতিথিসেবায় যথাযোগ্যরূপে নিযুক্ত করিবে ।

দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৃণাম্নানমবহম্ ।

স্ববৃত্ত্যা গতিবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।১৫)

গৃহস্বব্যক্তি প্রতিদিন স্ববৃত্তিদ্বারা উপার্জিত বিত্তে দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, প্রাণী, পিতৃপুরুষ ও আত্মাকে পৃথক্ তৃপ্ত করিয়া সৰ্বাস্তর্ঘ্যমীর সেবা করিবে ।

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ ।

অগ্নং সংবিভজন্ পশ্বেং সৰ্বং তৎপুরুষাত্মকম্ ॥ (ভাঃ ৭।১৫।৬)

দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, প্রাণিসমূহ ও আত্মীয়স্বজনগণকে যথাযোগ্য অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ভগবৎসম্বন্ধে দর্শন করিবে ।

শ্রীপৃথু মহারাজও শ্রীসনৎকুমারকে বলিয়াছেন,—

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ ।

যদগৃহা হর্ষবর্ষ্যাস্থ-তৃণভূমীশ্চরাবরাঃ ॥ (ভাঃ ৪।২২।১০)

যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ঋণ পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী, ও ভৃত্যাদি সেবাসত্তার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ এবং নিধন হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত ধনী ।

ব্যালালয়ক্রমা বৈ তেহপ্যুক্তাখিলসম্পদঃ ।

যদগৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জিতাঃ ॥ (ভাঃ ৪।২২।১১)

যে-সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বর্জিত, সেইসকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ মৃত্যু-ভয়প্রদ । (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিময়ুখ ভাগবত মহারাজ ।

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

বাল্যে সনাতনের ভাগবতামুরাগ ও স্বপ্নে তৎপ্রাপ্তি

শ্রীসনাতন-রূপ আবাল্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচুর্ণীলনে বিশেষ অমুরাগী ছিলেন, তাহা আমরা প্রামাণিক আশ্রয়াক্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকি ;—

“শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত । শ্রীভাগবতে ষাঁর অতিশয় প্রীত ॥

প্রথমবয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর । শ্রীভাগবত দেয় আনন্দ অন্তর ॥

স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা । প্রাতে সেই বিপ্র ভাগবত দিল ।

পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষ চিতে । মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিলা । তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিলা ॥

শ্রীসনাতনের পূর্ব কহি সংক্ষেপেতে । শ্রীজীবগোস্বামী বিস্তারিলা তোষণীতে

(ভঃ রঃ ১।৫।৩১-৩৬)

“যে শ্রীমদ্ভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতঃ জাগরে ।

স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাং প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥

মমজ্জুঃ শ্রীভাগবতঃ প্রেমামৃত-মহাসুধো ।

তোষামেব হি লেখোহয়ং শ্রীসনাতন-নামিনাম্ ॥” (লঘুতোষণী)

যিনি প্রথমবয়সে স্বপ্নে জনৈক বিপ্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বপ্ন-ভঙ্গে জাগরণকালে প্রভাতেও সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, সেই ‘শ্রীসনাতন গোস্বামী’ নামে বিখ্যাত মহাজনেরই লিখিত এই গ্রন্থ ।

শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলনান্তে দৈন্ত্য-বিলাপ

“দন্তে ত্বণ ধরি’ দৈন্ত্য কৈল যে প্রকার ।

সে সব শুনিত্তে প্রাণ বিদরে সবার ॥

শ্রীভক্তবৎসল প্রভু-ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ।

সনাতন-রূপের দৈন্ত্যেতে প্রাণ কান্দে ॥” (ভঃ রঃ)

শ্রীপ্রভুও বিগলিত-হৃদয়ে বলিলেন,—“দৈন্ত্য ছাড়, তোমার দৈন্ত্যে ফাঁটে মোর মন ।”

শ্রীরূপ-সনাতন বলিতে লাগিলেন,—

“জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ ।

অধম পতিত পাপী আমি দুইজন ॥

মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া ।
 কুবিসয়-বিষ্ঠা-গর্ভে দিয়াছে ফেলিয়া ॥
 আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল ।
 পতিত-পাবন নাম তবে সে সফল ॥
 মোরে দরা করি' কর স্বদয়া সফল ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥” (চৈঃ চঃ)

“বিপ্রগণে বিশ্বয় এ মর্শ না বুঝিল ।
 প্রভু ভক্তদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল ॥
 অহে ভাই ! কে বুঝিতে পারে প্রভু-হিয়া ।
 ভক্তাধীন হন ভক্তগুণ প্রকাশিয়া ॥” (ভঃ রঃ)

তুই গুচ্ছ তুণ তুই দশনে ধরিয়া ।
 গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে, দণ্ডবৎ হঞা ॥
 দৈন্তে রোদন করে, আনন্দে বিহবল ।
 প্রভু কহে, উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল ॥
 উঠি তুই ভাই তবে দস্তে তুণ ধরি' ।
 দৈন্ত করি' স্তুতি করে করযোড় করি' ॥
 “জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
 পতিত-পাবন জয়, জয় মহাশয় ॥
 নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ-কাজ ।
 তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥
 আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাও ক্ষোভ ।
 তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥
 বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে ।
 তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥”

শ্রীসনাতনের দৈন্ত্য শ্রবণে-শ্রীমন্নহাপ্রভুর স্নেহ-প্রণয়োক্তি

শুনি মহাপ্রভু কহে—“শুন, দবির-খাস ।
 তুমি তুই ভাই—মোর পুরাতন দাস ॥
 আজি হৈতে তুঁহার নাম ‘রূপ-সনাতন’ ।
 দৈন্ত ছাড়, তোমার দৈন্তে ফাটে মোর মন ॥
 দৈন্ত-পত্নী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার ।
 সেই পত্নীদ্বয়ে জানি ব্যবহার তোমার ॥
 তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্বারে ।
 তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিহু বারে বারে ॥” (চৈঃ চঃ)
 “পরব্যসিনি নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মত্ব ।
 অমেবাস্বাদয়ত্যন্তন বসঙ্গরসায়নম্ ॥”

পরশুরামের রমণী গৃহকর্ম-সমূহে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নব-নব সঙ্গরস আনন্দন করিতে থাকে। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমামুরাগী ভক্ত বাহু-দর্শনে বৈষয়িক কার্যো ব্যাপৃত থাকিয়াও অন্তরে নব-নব রসধাম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গরস আনন্দন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্লোকে নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক মহাজন শ্রীরূপ-সনাতনকে ইঙ্গিতে রাগমাগীয়ে ভজনের উৎসাহ দিলেন। প্রভু-আরও বলিলেন—

“গৌড় নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।

তোমা দুই। দেখিতে মোর ইহা আগমন ॥

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।

সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥” (চৈঃ চঃ)

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব রামানন্দের দ্বারা কন্দর্পের দর্পনাশ, দামোদরের আদর্শে নিরপেক্ষতা, ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা সহিষ্ণুতা, সনাতন-রূপের দ্বারা জগতে দৈত্যের পরাকাষ্ঠা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবঞ্চনায় কৃপাপ্রাপ্ত-জনের স্বভাব

“শ্রীচৈতন্য কৃপা যারে তাঁর ঐছে রীতি।

আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিৎ ॥

সদা একরস আপনাকে নীচ মানে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্ব জানে ॥

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

যেছে দৈত্য করে তৈছে না করয়ে অত্ম ॥

তাঁর ভক্ত দৈত্যরসে নিমগ্ন সদায়।

দৈত্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায় ॥

সনাতন-রূপের অন্তরে হৈল যাহা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জানিলেন তাহা ॥” (ভঃ রঃ ১ম ভঃ)

প্রভুর বিদায় গ্রহণ ও রূপ-সনাতনের বিষয়-ত্যাগের সঙ্কল্প

প্রভু বিদায় লইয়া বৃন্দাবনের দিকে যাইবেন, কিন্তু সঙ্গে বহুলোকের সংঘট হইবে দেখিয়া শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে বলিলেন,—“যাহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ-কোটি। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটি ॥” মহাপ্রভু কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, সঙ্গে লোক-সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া সনাতনের কথা শ্রবণ-পূর্বক বৃন্দাবনে না গিয়া পুনঃ নীলাচলের দিকে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের গৃহে পাঁচ-সাত দিবসকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীসনাতন তীর্থ প্রভু-বিচ্ছেদ-দুঃখে অভিভূত হইয়া বিষয় ত্যাগের চেষ্টা করিতেছেন,—তাহার রাজকাৰ্য্য আদৌ ভাল লাগে না ; শ্রীকৃষ্ণামুরাগপর চিন্তে, ভাবিলেন—“রাজা মোরে প্রীতি করে এ মোর বন্ধন”—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবেন। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী প্রভুও মহাপ্রভুকে দর্শন করা অবধি তাহার নিত্য-সঙ্গী হইবার একটি উপায় স্থাপিত করিলেন। উভয়ে শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রয় পাইবার জন্ত কৃষ্ণমন্ড্রে পুরস্চরণ করিলেন। মহাচতুর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী সনাতনের জন্ত গোঁড়ে দশহাজার মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া নিজস্ব সমগ্র ধন-সম্পদরাশি নৌকায় উঠাইয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্ব-গণের জন্ত সমগ্র অর্থ বিভাগ করিয়া দিলেন। এদিকে মহাপ্রভু কোন্‌দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন,—ইহা জানিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী দুইজন বিশ্বস্ত চর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চর কর্তৃক শ্রীমন্নহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সেই সংবাদ পাঠাইয়া নিজ কনিষ্ঠ-ভ্রাতা অন্নপূর্ণের সহিত শ্রীমন্নহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের দিকে রওনা হইলেন।

উত্তট-চন্দ্রিকার টীকাকার লিখিয়াছেন,—যেকালে শ্রীকৃষ্ণ-গোস্বামী শ্রীগৌর-অনন্দের দর্শনোৎকণ্ঠায় শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করেন, সেকালে শ্রীকৃষ্ণ একখানি পত্র শ্রীসনাতনকে দিয়াছিলেন। পত্রখানি এই ; -

“যদুপতে: ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতে: ক গতান্তর-কোশলা।

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারণ ॥”

যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল? রঘুপতির উত্তর-কোশল-দেশই বা কোথায়? এইজগৎ অনিত্য, এই বিচারে মনকে স্থির কর। শ্রীকৃষ্ণের পত্র প্রাপ্ত হইয়া সনাতন গোস্বামী পরমানন্দিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সনাতনকে আরও অত্র পত্রে লিখিলেন,—আমি এবং অন্নপূর্ণ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্ত বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম; তুমি যে কোনও প্রকারেই হউক যবনের কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমার কারাগৃহ হইতে নিমুক্তির জন্ত আমি সওদাগরের গৃহে দশ-সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছি। তুমি যত শীঘ্র পার, ঐ অর্থের দ্বারা সর্বপ্রকার বাধা-বিলম্ব হইতে নিমুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া আইস। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি

“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তং পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

পরম করুণাময় শ্রীগুরু আমার ।

তব পদে নিত্য কোটি কোটি নমস্কার ॥

পতিতপাবন তুমি অধম-তারণ ।

তব সম এ ভুবনে নাহি কোন জন ॥

কে আর করিবে দয়া এ পাতকী-জনে ।

রূপা করি' স্থান দিলে ও রাজ্য চরণে ॥

তোমার করুণাগাথা কি কহিব আমি ।

বলিতে অশক্ত' তাই বার বার নমি ॥

তুমি ত করুণাসিন্ধু মুঞি টুনটুনি

কতটুকু শক্তি মোর পিতে তব পানি ॥

আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি ।

গৌমার মহিমা তবু বর্ণিবারে নারি ॥

ক্ষুদ্র 'বামন' হইয়া চাঁদে লোভ কৈল ।

আমার যে মুঢ় মন তেমনি হইল ॥

যে পাপীকে দে'খে লোকে ঘৃণায় না চায় ,

যে পাতকী-দরশনে সাগরও শুকায় ॥

তা'রে তুমি কোলে নিলে এ অতি আশ্চর্য্য

তাহে জানিলাম আমি, তুমি শ্রেষ্ঠ আর্ধ্য ॥

বিঘূর্ণিত কাল-রূপ চক্রের ঘূর্ণনে ।

দারুণ বিপদগ্রস্ত হই যেই ক্ষণে ॥

নিমজ্জিতা হ'য়ে আমি ভবসিন্ধু-মাঝে ।

হাবু-ডুবি খেয়ে মরি প্রাণ মাত্র আছে ॥

উপায় না দে'খে ডাকি শ্রীমধুসূদন ।

শ্রীগুরু-রূপেতে তুমি দিলে দরশন ॥

সে হেন সঙ্কটে মোরে করিলে গো ত্রাণ ।

তাহে জানি মোর প্রভু অতি শক্তিমান ॥

তুমি যদি না তুলিতে কেশেতে ধরিয়া ।

উদ্ধার তরঙ্গে তবে যেতাম ভাসিয়া ॥

শ্রীচরণ-তরী দিয়ে করিলে উদ্ধার ।

তোমার চরণে মোর বহু নমস্কার ॥

অমৃত-আধার তব চরণ দু'খানি ।

তাহা পেয়ে শাস্ত হ'ল দগ্ধ তনুখানি ॥

“পূর্ব্ব ইতিহাস, তুলিহু সকল”

তব পদে পেয়ে স্থান ।

“দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল”

পাইহু আলোক-সন্ধান ॥

পড়েছিহু অতি ঘোর 'তমঃ' অন্ধকারে ।

জ্ঞান-শলাকায় মোর তমঃ নাশ করে ॥

যে আলোর সন্ধান তুমি দিলে গো আমারে

সে অপূর্ব্ব দয়া তব তুলিব কি ক'রে ??

পথের পাথের কিছু না আছে আমার ।

তুমি বিনে এ অধমে কে করিবে পার ??

তব পদে এই মোর করুণ প্রার্থনা ।

তুমি যেন এ অধমে না করিও ঘৃণা ॥

অশোক-অভয় তব চরণ-যুগল ।

জন্মে-জন্মে পাই যেন তুমি ত সম্বল ॥

অসার সংসার এই শ্মশান সমান ।

যত সব স্বার্থপর পিশাচের স্থান ॥

অশান্তির চিতা-বহি সদা ধু-ধু জ্বলে ।

তাহে মোর চিত্ত পড়ি' কাঁদছে আকুলে ॥

সে অনলে শান্তি-সুখা-বারি ঢাল তুমি ।

তব সম দয়াময় নাহি দেখি আমি ॥

কে আর করিবে দয়া পাতকী দেখিয়া ।

পতিতা দেখিয়া কার বিদরিবে হিয়া ॥

যেদিন তোমাতে কৈহু আত্ম-সমর্পণ ।

ঘুচিল দারুণ জ্বালা শাস্ত হইল মন ॥

ভবের কাণ্ডারী তুমি শ্রীগুরু আমার ।
 তোমার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥
 নিত্য তুমি স্তমহান্ প্রণত-পালন ।
 তোমার পদারবিন্দ করি গো বন্দন ॥
 ধ্যান-যোগ্য যেই পদ সদা সর্বদাই ।
 সে-পদ বন্দন বিনা মোর গতি নাই ॥
 অভীষ্ট-পূরণ করে যেই ত চরণ ।
 সেথায় করিতে বাস ইচ্ছে মোর মন ॥
 কেবল তোমার বার্তা চিন্তে করি' সার ।
 অনায়াসে ত'রে যাব এ ঘোর সংসার ॥
 কর্মপথে সংসারেতে ভ্রমি যে সর্বথা ।
 সংসার তারয়ে তব শ্রীমুখের কথা ॥
 কেবল তোমার ভক্ত-সঙ্গেতে রহিয়া ।
 তরিব সংসার, কাম-বন্ধন ত্যাগিয়া ॥
 তোমার ভক্তের সঙ্গে ভব কথা ল'য়ে ।
 দুস্তর সংসার হ'তে যাব গো তারিয়ে ॥
 স্মরণ করিব নিত্য তোমার চরণ ।
 তব গুণ অবিরত করিব কীর্তন ॥
 তব আচরণ, তব মধুর বচন ।
 সর্বদা স্মরিব আমি হ'য়ে একমন ॥
 সে-সব স্মরিয়া আমি সংসার তরিব ।
 অতএব ক্ষণাঙ্গি না চরণ ছাড়িব ॥
 তিলেকের তরে যদি তব সঙ্গ পাই ।
 বৈকুণ্ঠের স্থখ আমি কিছু নাহি চাই ॥
 তোমার চরণ সেবি ভক্ত-সনে বাস ।
 জনমে-জনমে মোর এই অভিলাষ ॥
 পতিতপাবন-রূপে তব অবতার ।
 মো সমপতিতাদমে করিবে উদ্ধার ॥

এই ত বিশ্বাস ল'য়ে আছি এ ভুবনে ।
 নিশ্চয় করিবে দয়া পাতকিনী জনে ॥
 স্তুবিজ্ঞ নাবিক তুমি, মোর ভগ্ন তরী ।
 কৃপা করি' পার কর, তব পদে ধরি ॥
 যতপি এ ক্ষুদ্রগতি অন্ত পথে ধায় ।
 কেশে ধ'রে টেনে এনো চরণ-তলায় ॥
 এই নিবেদন মোর তব শ্রীচরণে ।
 মায়া'র কবল হ'তে উদ্ধার' এ জনে ॥
 তোমার চরণে মোর আছে পাশ্চধ্যম ।
 শ্রাস্ত হ'লে তথা আমি করিব বিশ্রাম ॥
 আমার হৃদয়ে সদা এই বাঞ্ছা হয় ।
 আমার বাসনা তুমি পূরাবে নিশ্চয় ॥
 তোমার মহিমা আমি কি কব কি জানি ।
 তোমার চরণ সার—এই মাত্র জানি ॥
 যতই আশ্রক বাঞ্ছা ভয় নাহি মানি ।
 দৃঢ় করি' ধরিব ও চরণ দু'খানি ॥
 অপার ককণা তব না যায় লিখন ।
 যতটুকু শক্তি দিলে করিছ বর্ণন ॥
 জানি এ আমার গুরু বাঞ্ছা-কল্পতরু ।
 কৃপা করি' শোধিবেন মোর মন-মরু ॥
 কায়-মন-বাক্যে আমি সেবি ও চরণে' ।
 'দাসী' করে রেখো যেন এ নারকী-জনে ॥
 অসীম তোমার দয়া নাহি পাই পার ।
 তব পদে নতি আমি করি বারবার ॥
 আমি অতি মূঢ়-মতি না জানি ভকতি ।
 শ্রীচরণে এগিনতি—থাকে যেন (পদে) মতি ॥
 তোমার চরণে সদা এই ভিক্ষা চাই ।
 অতীত ও রাঙ্গাপদে যেন ঠাই পাই ॥

আপনার সেবাভিলাষী—

—শ্রীউষারাগী দেবী, পাচবেড়িয়া (মেদিনীপুর)

চিত্রকেতুর উপাখ্যান

পূর্বকালে ‘চিত্রকেতু’ নামে এক মহা-পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তাঁহার মণি-মাণিক্য, রত্নসিংহাসন, দাস-দাসী, প্রসূর-নির্মিত বিচিত্র অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য ছিল ; কিন্তু এই সব বিপুল ঐশ্বর্য থাকা-সত্ত্বেও রাজার মনে বিন্দুমাত্রও স্নেহ ছিল না। তাঁহার সাত শত রাণী থাকিলেও রাজা একটা মাত্রও পুত্র সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন—আমার এই বিপুল ধন, রত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য লইয়া কি হইবে—কে এসমস্ত ভোগ করিবে? আমি পরলোকগমন করিলে, কে আমাকে শ্রাদ্ধ-শান্তি, পিণ্ডদান করিবে?—এই চিন্তায় রাজা সর্বদাই মগ্ন থাকায় তাঁহার বদন কালিমাবর্ণ ধারণ করিল। দারুণ চিন্তায় রাজা দিনে-দিনে শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন রাজা চিত্রকেতু রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি শ্রীনারদ গোস্বামী বীণায়ন্ত্রে শ্রীহরিগুণগান করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সহসা ঋষিকে দেখিয়া রাজা শশব্যস্তে রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া স্বহস্তে মূনিবরের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সম্মানে আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন। শ্রীনারদ-ঋষি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করায়, রাজা চিত্রকেতু বিষাদমনে ঋষিকে কহিলেন,—“হে! অন্তর্ধামিন্! আমার অন্তরের দুঃখের কথা আপনি সমস্তই অবগত আছেন; একটা পুত্র অভাবে আমার এই বিশাল রাজপুরীতে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না।”

শ্রীনারদ-ঋষি রাজাকে ‘তত্ত্বজ্ঞান’ প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু পাষাণে বীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ রাজাকে রজোগুণোপধি বিষয়াসক্তিতে মগ্ন দেখিয়া ও এবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া, ঋষিবর রাজাকে একটা পুত্র লাভের বর প্রদান করিলেন। তাহাতে রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এ’কেই বলে মায়া’র নেশা; গীতায় শ্রীভগবান্ অঙ্কনকে বলিয়াছেন—“দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।” এই সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী দৈবীমায়া দেবতাদিগেরও মোহকারক। ক্ষুদ্র জীব গুরু-কৃপা ব্যতীত কখনই এই দুস্তরা মায়া’র হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

মূনিবর রাজাকে বর প্রদান করিয়া চলিয়া গেলে, যথাসময়ে রাজার একটা রূপ-লাবণ্যযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন রাজপুরীতে আর আনন্দের সীমা

নাই। রাজা সময়োচিত পুত্রের জাতকস্মাদি করাইয়া দীন-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সকলকেই প্রচুর পরিমাণে রক্ত-কাঞ্চনাদি দান করিলেন এবং চর্য্য, চূষ্য, লেঙ্ঘ্য, পেয়াদি ভক্ষ্য-দ্রব্য দ্বারা সকলেরই তৃপ্তি বিধান করিলেন। পুত্ররত্ন লাভ করিয়া রাজার আর স্থের অবশিষ্ট রহিল না।

কিন্তু কালচক্র কি ভীষণ ! অতি নিশ্চয় !! নিষ্ঠুর !!! আজ যে দরিদ্র, কা'ল সে রাজা। হুসেন সাহ বাদশাহ প্রথম জীবনে দরিদ্র অশ্বপাল হইয়া পরিশেষে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। আজ যিনি মহারাজা, কালের কবলে পড়িয়া তিনিও দুঃখী-কাঙ্গাল হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বশ্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেন। শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত শত-সহস্র রহিয়াছে। দুরন্ত কাল সে কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। অতুল ঐশ্বর্য্য, কোঠাবাড়ী, মন্দিরনির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা—তাঁহাও হঠাৎ ভূমিকম্পে নিমেষমধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যায়; সাধের দ্রব্যসকল মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়—ইহাই বিচিত্র কালের গতি।

এই মায়াব সংসারে জীবসকল বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া—“আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি সম্রাট, আমি রাজ্যপাল, আমার বাড়ী, আমার বাগান, আমার জমি, আমার ধন-রত্ন”—এইরূপ সমস্তই ‘আমি ও আমার’ মনে করিয়া পরিণামে শাস্ত্রানের দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া থাকে। দর্পহারী ভগবান্ জীবের এই অনিত্য ধন-জনের মোহ—ইজ্জতালের ত্রায় দেখাইয়া হরণ করিয়া থাকেন। “যন্তাহমন্তগৃহামি হরিষ্যে তদ্বনং শনৈঃ।” শ্রীভগবান্ বলিলেন—যাহাকে আমি অল্পগ্রহ করি, এই মায়াব অনিত্য দু'দিনের সম্পত্তির মোহ ঘুচাইয়া তাহাকে আমার নিত্য চিদ্দৈবদ্য প্রদান করিয়া থাকি।

মহারাজ চিত্রকেতু পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে রাণীর সন্তান হইয়াছে, রাজা তাঁহাকে অত্যধিক ভালবাসেন দেখিয়া অত্যাচার রাণীগণ (সতীনীগণ) বিষেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাণীগণ মন্ত্রণা করিয়া দাসীকে দিয়া সন্তানের দুগ্ধপান করিবার দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন। রাজপুত্র দুগ্ধ পান করত দোলায় ছলিয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও রাজপুত্রকে গভীরভাবে নিদ্রিত দেখিয়া রাজমাতা শঙ্কায়িত হইয়া দাসীকে আজ্ঞা করিলেন—“পুত্রকে ঘুম হইতে জাগাইয়া ক্রোড়ে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।” হুকুম শুনিবামাত্র দাসী খোকার দোলার নিকট যাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“রাণী-মা ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, খোকা আর ঘুম

হইতে উঠিবে না—সে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে ; তাহার মুখ, শরীর নীলবর্ণ হইয়াছে, সে আর এজগতে নাই । রাণী-মা ‘বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের’ ছায়া এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন ; অত্যাগ্ন রাণীরা সকলেই কপট-ক্রন্দন আরম্ভ করিল । প্রহরী রাজসভায় যাইয়া রাজাকে অন্তঃপুৰ-মধ্যের এই শোকাবহ সংবাদ প্রদান করিলে তিনি নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া রাজসিংহাসন হইতে ভূমিতে পড়িয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন ।

অন্তর্ধামী শ্রীনারদঋষি এই মর্ম্মভঙ্গ ঘটনা জানিতে পারিয়া রাজার এই সঙ্কট-সময়ে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন । রাজা চেতনা পাইয়া ঋষিকে সমাদর করত স্নানমুখে কহিতে লাগিলেন হে মুনিবর ! আপনার কৃপায় বর লাভ করিয়া একটা পুত্র পাইলাম বটে, কিন্তু পরিণামে এ কি হইল ? হায় ! হায় ! আমি কি পাপ করিয়াছি যে, তাহার জন্য এই দারুণ পুত্রশোক ভোগ করিতে হইল ?

মুনিবর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে রাজন্ ! আমি পূর্বেই তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতাম, কিন্তু তোমার অনিত্য বস্তুতে অত্যাশক্তি দেখিয়া পুত্র-বর দিয়াছিলাম ; কিন্তু এসমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এখনও কি জ্ঞানের উদয় হয় নাই ?—নির্বেদ আসে নাই ? কালের কি ভীষণ ভ্রুকুটি ! কৰ্ম্মস্বরূপ কাল ঐ দেখ তোমার পুত্রকে হরণ করিয়া লইল । সন্তানবৎসলা জননী স্নেহবশতঃ শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতেছে । কতশত স্ত্রীলোক স্বামীহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে । কত স্বামী বিপন্নীক হইয়া শিশু, পুত্র-কন্যা লইয়া অসহ জালায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছে । কতশত কবি, কত মনীষী, কত সুসন্তান, কত সিদ্ধ যোগী-মহাত্মা ভারতমাতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে ?—কেহ অনলে, কেহ সলিলে, কেহ ব্রাহ্মমুখে, কেহ সর্পমুখে, কেহ জরে, কেহ রোগে, কেহ শোকে—ঐ কালাগ্নিসদৃশ চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে । হে রাজন্, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয় । ‘স বৈ ভূমা স্মৃথম্’ । ভূমাই স্মৃথ, নিত্য বস্তুতেই স্মৃথ, অনিত্য বস্তুতে স্মৃথের অভাব—দুঃখই বর্তমান । এই তত্ত্বজ্ঞান যমরাজ শ্রদ্ধাশীল ব্রহ্মচারী নচিকেতাকে প্রদান করিয়াছিলেন ।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরামর হঠত রাবণ ।

ধনে যদি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ, অতএব কি করিবে ধন ॥

রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সওয়ালক্ষ নাতি একজনও বংশে বাতি দিতে রহিল না। সোণার লক্ষা হনুমান্ পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিলেন। এই অনিত্য ধন-জনের পরিণামই এই। মৃত্যুকালে এ অনিত্য ধন, জন, সম্পদ কেহই জীবকে রক্ষা করিতে পারে না। এখন তোমার মনে নির্বেদের উদয় হইয়াছে। আইস রাজা, আমি তোমাকে পারকরক্ষ নামে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করি ; সেই অপ্রাকৃত শব্দরক্ষ শ্রীকৃষ্ণনামের—শ্রীহরিনামের—পরমতত্ত্বের উপদেশ করি। এই বলিয়া মহর্ষি-নারদ পরমভাগবত রাজা চিত্রকেতুকে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া তাঁহাকে এই দুরন্ত ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার*

(৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

(৬) শ্রীবলদেব-বাক্যের অনুসরণ ও গুরুবাক্য

শ্রীজন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে অনেকেই শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের ‘প্রমেয়-রত্নাবলী’ গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া জন্মাষ্টমীর ব্রত-নির্ণয়ের দিন স্থির করিয়াছেন। শ্লোকটি এইরূপ,—

অরুণোদয়-বিদ্ধন্ত সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ ।

জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যাজেৎ ॥ (প্রঃ রঃ ৮২)

এই শ্লোকটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত শ্লোকের যে যে-প্রকার অর্থ ই করুন না কেন, মহাজনকুল-চূড়ামণি সর্ববিদ্যা-বিশারদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যেক্রপভাবে শ্লোকটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অমুগত-অভিমানী সেবকবৃন্দ তাহা হইতে কেশাগ্র পরিমাণ বিচ্যুত হইতে পারি না। কোন্ শ্লোকের কি তাৎপর্য্য, তাহা মহাজন ব্যতীত অন্য কাহারও হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় না ; স্মার্ত্ত বৌদ্ধ শ্রমণগণের কা কথা। আমরা প্রমেয়-রত্নাবলীর ঐ শ্লোক-সম্বন্ধে উক্ত মহাপুরুষের অমুবাদমুখে নির্দেশ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। পাঠকবর্গ ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবেন—

“জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি হরিত্রতের সম্মান। ঐ সকল তিথি সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে। শ্রীহরিভক্তিবিনাশে

* আমরা এই প্রবন্ধের ক্রোড়ীভূত ৬টি প্রবন্ধের ৫টি প্রবন্ধ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৫-২৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি। এই ৬ষ্ঠ প্রবন্ধই উহার অবশিষ্টাংশ।

এই সকল কথার বিস্তারিত বিচার আছে ॥২॥” (প্রঃ রঃ-গৌড়ীয়ভাষ্য ৮২ পৃষ্ঠা)

আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গকে উল্লিখিত শ্লোক ও তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্যের স্পষ্ট স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপ অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। অনুবাদে ‘এসকল তিথি সূর্য্যোদয়বিদ্যা হইলে পরিত্যাগ করিবে’—এস্থলে ‘এ সকল তিথি’ বলিতে জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিতেছে।

এই সমুদয় তিথিসমূহে অর্থাৎ একাদশীতেও সূর্য্যোদয়বিদ্যা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু গোপালবর্গের সকলেই একাদশী সম্বন্ধে অরুণোদয়বিদ্যাই বিচার করিয়া থাকেন। তথাপি প্রভুপাদ জন্মাষ্টমী ও একাদশী উভয় সম্বন্ধেই সূর্য্যোদয়বিদ্যা পরিত্যাগের উল্লেখ করিলেন কেন?—ইহাই এস্থলে বিচার্য্য।

প্রভুপাদের লেখনীর ভঙ্গীতে তিনি সর্বপ্রথম জন্মাষ্টমীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে জন্মাষ্টমীর প্রতি বিশেষ গোরব প্রদর্শিত হইয়াছে। জন্মাষ্টমী ও একাদশীর প্রতি কাহারও তারতম্যমূলক বিচার আনয়ন করা সুসঙ্গত নয়, ইহা প্রদর্শনের জন্তই তিনি উভয় তিথিকেই একই পৰ্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে সূর্য্যোদয়বিদ্যা মানিলে একাদশীতেও সূর্য্যোদয়বিদ্যা মানিতে হইবে। পক্ষান্তরে, একাদশীতে অরুণোদয়বিদ্যা মানিলে জন্মাষ্টমীতেও অরুণোদয় মানিতে হইবে—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য বিষয়। এতদ্ব্যতীত অধিক কিছু

মানিতে হইলে “শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই সকল কথার বিস্তারিত বিচারও আছে।”

উক্তস্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে ত’ সূর্য্যোদয়বিদ্যা মানিতে হইবে বলিয়াছেন; সুতরাং আমরা জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে

সিদ্ধি একাদশী-প্রসঙ্গ বিচার করিব না অর্থাৎ একাদশীতে সূর্য্যোদয়বিদ্যার কথা পরিব না এবং শ্রীল প্রভুপাদ জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে সূর্য্যোদয়বিদ্যাই ‘প্রমেয়-রত্নাবলী’র ‘গৌড়ীয়-ভাষ্য’ নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থলে আগার বক্তব্য,—

বিচার-জগতে ইহাই রীতি এবং সিদ্ধান্ত যে, বাক্যের সর্বাংশ গ্রহণ করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সঙ্গতিবিহীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাকে ‘অসঙ্গতি-ভ্রান্তি’ বলা হয়। আরও দেখিতে পাই,—

এক নিম্নে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥ (চৈতন্যভাগবত)

সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের বিচারের সর্ব্বাংশ গ্রহণ না করিলে আমরা অপরপক্ষকে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ‘ভণ্ড’ ও ‘পাষণ্ড’ বলিলে দোষ হইবে কি? যাহারা সবদিক্ না দেখিয়া একদিক্ দেখে, তাহাদিগকে ‘কাণা’ বলে। সুতরাং গ্রাম্য-কথায় বলে,—‘কাণা গরুর ভিন্ন গোষ্ঠ।’ অন্ধ গরুর গর্ত্তে পোট।

শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকার ব্যাঙ্গোক্তি তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ যদি মনে করেন, ‘গৌড়ীয়ভাষ্য’ মুদ্রাকর প্রমাদবিশেষ, তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ‘প্রমেয়-রত্নাবলী’ গ্রন্থখানির ‘গৌড়ীয়-ভাষ্য’র রচয়িতা এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ের অগ্রতম। এই সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ‘শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ’ নামে পরিচিত হন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রমণমহারাজ এই শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমণমহারাজ তাহার গুরুদেব শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের স্পাদিত গ্রন্থের বিচার গ্রহণ করিতে অপারক হইতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি কি মনে করেন, তাহার বর্ত্তমান গুরুদেব ভুল করিয়াছেন? আমরা কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ সূচতুৰ লোক বলিয়াই জানি। উক্ত ‘প্রমেয়-রত্নাবলী’ গ্রন্থখানি শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ‘গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে’ মুদ্রিত হইয়া ৪৩২ গৌরাক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক, মুদ্রাকর সকলেই চতুর ও পণ্ডিত। তাহাদের কাহারও উক্তরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা যে প্রকৃতই মুদ্রাকর-প্রমাদ নহে, তাহার আরও একটা প্রমাণ আমরা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

পরলোকগত মাননীয় অতীন্দ্রিয় দাস অধিকারী (ভক্তিশুণাকর) মহোদয়ের সঙ্কলিত “গৌড়ীয় কঠহার” গ্রন্থের ২১৪ পৃষ্ঠায় পূজ্যপাদ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতে গিয়া সঙ্কলনকারী মহোদয় তীর্থ মহারাজের (কুঞ্জবাবুর) স্পাদিত অনুবাদের অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়া উহা সৰ্ব্বতোভাবে উদ্ধার করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

“জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি হরিব্রতের সন্মান। ‘ঐ সকল ভিথি’ সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা হইলে পশ্চিঅ্যাগ করিবে ॥৮৩॥”

সুতরাং যে-বাক্য পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একই ভাবে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই কথা উক্তি করিলে তাহা প্রামাণ্যই হইয়া থাকে। গায়ের জোরে বা গলায়

জোরে অগ্ররূপ ব্যক্ত করিলে চলিবে না। এইসমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীল প্রভুপাদ একাদশী ও জন্মাষ্টমী একই বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ যে-যেস্থলে জন্মাষ্টমী ও একাদশীর উল্লেখ পাইয়াছেন, সেই সেই স্থলেই বিস্তারিত বিবরণ অবগতির জন্ত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১২শ বিলাস আলোচনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই ১২শ বিলাসে মূলতঃ একাদশী ও প্রসঙ্গতঃ জন্মাষ্টমী সম্বন্ধেও বিচারিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, দ্বাদশ বিলাসে ‘সূর্য্যোদয়বিদ্ধা’-শব্দ অথবা তাহার কোনও প্রসঙ্গই আলোচিত হয় নাই। যদিও হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাসে মুখ্যতঃ জন্মাষ্টমী সম্বন্ধেই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীল প্রভুপাদ ইহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়াও জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে ‘১৫শ বিলাস দ্রষ্টব্য’ এইরূপ নির্দেশ কোঁধাও দেন নাই। ব্রত-নির্ণয়-প্রসঙ্গে গুরুবাক্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন—“গুরোরাজ্ঞা হবিচারণীয়া।” তসে এস্থলে একরূপ বুঝিতে হইবে না যে, জন্মাষ্টমীতে হরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাস আদৌ গ্রহণীয় নহে। ১৫শ বিলাসে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে যে বিচার রহিয়াছে, উহা ১২শ বিলাসের বিচারের অন্তর্কূলে গ্রহণ করিতে হইবে; ১৫শ বিলাস ১২শ বিলাসকে খণ্ডন করিতেছে একরূপ বিচার নহে। আমরা এসম্বন্ধে ৫ম প্রবন্ধে “শ্রীল সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য্য ও গূঢ়ার্থ”-শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি— পাঠকবর্গ উহা ভাল করিয়া বিচার করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (৪র্থ সংস্করণ, ৮৩৪ পৃষ্ঠা) মধ্যলীলা, চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ, ৩৩৫ পয়ারের অন্তর্ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।” এখানে ‘১২’ সংখ্যাটীও মুদ্রাকর-প্রমাদ নহে (যদিও কোনও বন্ধু একরূপ বলিতে চাহেন)। কারণ ইহার পূর্ব্ব-সংস্করণে উহাই এইরূপ লিখা আছে,—“জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ—‘দ্বাদশবিলাস’ দ্রষ্টব্য।” এইস্থলে ১২শ শব্দটী কথায় লিখিত হইয়াছে, অঙ্কের দ্বারা নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, ১৫শ বিলাস দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। ঐ পয়ারের অন্তর্ভাষ্যের পর ৩৩৭ সংখ্যা পয়ারের অন্তর্ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“একাদশীতে অরুণোদয়-বিদ্ধাত্যাগ এবং অগ্রব্রতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিক্র ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধব্রত পালন দোষ এবং অবিক্রব্রত-পালনেই ভক্তি হয়। বিশেষ জানিতে হইলে হঃ ভঃ বিঃ ১২ ও ১৩ বিঃ দ্রষ্টব্য ॥৩৩৭॥” এই অন্তর্ভাষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীল প্রভুপাদ একাদশীতে অরুণোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতেছেন।

জন্মাষ্টম্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিধি ৩৩৫ সংখ্যক পন্নারের অনুভায়ে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত ‘অন্ত্রত’ বলিতে জন্মাষ্টমী ব্যতীত অন্ত্রত বুঝাইবে। প্রতিপক্ষগণ ‘অন্ত্রত’ বলিতে জন্মাষ্টমীকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন; তাহা কোনওক্রমে সম্ভব নহে। বিশেষ-বিধি বাদ দিয়াই সামান্য বিধির উল্লেখ হয়; এমন কি, সামান্য ও বিশেষ-বিধির মধ্যে বিশেষ-বিধিই বলবান—ইহাই সর্ববাদিসম্মত হয়। সুতরাং জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে ১২শ বিলাসের উল্লেখ করিয়া প্রভুপাদ অরুণোদয়বিষ্কার কথাই বলিতেছেন, যেহেতু ১২শ বিলাসে সূর্য্যোদয়বিষ্কার কোন প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয় নাই।

বলদেব-বাক্যের অনুবাদে তিনি খোলসা করিয়া জন্মাষ্টমী ও একাদশী সম্বন্ধে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই ‘অরুণোদয়-বেধ মানিলেই চলিবে’ না লিখিয়া ‘সূর্য্যোদয়বিষ্কা হইলে পরিত্যাগ করিবে’ এইরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য কি? বক্তব্য এই যে, একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি ব্যতীত ‘অন্ত্রাণ্ড যাবতীয় তিথিসমূহে ব্রত হইলে সূর্য্যোদয়বিষ্কা পরিত্যাগ করিতে হইবে—ইহা প্রকাশ করাই তাৎপর্য্য।’ অর্থাৎ মূল শ্লোকে ‘জন্মাষ্টম্যাদিকং’ বাক্যের এইরূপ অর্থ হয় হইবে—জন্ম (বিনা) অষ্টম্যাদিকং অর্থাৎ জন্ম ব্যতীত অষ্টমী প্রভৃতি যাবতীয় তিথিতে সূর্য্যোদয়-বেধ পরিত্যজ্য। এস্থলে ‘জন্ম’ অর্থে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের জন্ম লক্ষ্য করিতেছে। ‘জন্ম’ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে ‘জন্ম’; ‘বিনা’ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী নিরুজ্জ্বলা একাদশী-প্রসঙ্গে ১৫শ বিলাসান্তর্গত ১৩শ শ্লোকের অর্থ যেরূপ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। যথা—

স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।

উপযুক্ত নৈবাণ্ড-ব্রতভঙ্গোহন্থা ভবেৎ ॥

ইহার স্বাভাবিক অর্থ—স্নানে বা আচমনেও পণ্ডিতব্যক্তি জল বর্জ্জন করিবেন এবং অপর সকল-প্রকার উপভোগই ত্যাগ করিবেন, নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে। কিন্তু এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী ‘স্নান এবং আচমন বিনা অণ্ড সকল প্রকার উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন’ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। টীকা, যথা—“স্নানাচমনয়োর্থদ্ব্যুদকং তদ্ ‘বিনা’ ইত্যর্থঃ।”

সুতরাং বলদেব-বাক্যের অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ একাদশী ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ব্যতীত অন্ত্রাণ্ড তিথির সম্বন্ধে সূর্য্যোদয়-বিষ্কার নির্দেশ করিয়াছেন।

‘নিবেদন’—কি নিগোপন

অনুমান ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে “নিবেদন বা সাইনবোর্ড” (বিজ্ঞাপন) নামক একখানা ‘সাধারণ সাপ্তাহিক পত্র’ ৭নং এজরা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইত। উহার সর্বেসর্ব্বা ছিলেন আর, পি, দত্ত এণ্ড কোং। এই কোম্পানী চা-বিক্রেতা ও বিবিধ দ্রব্যের সরবরাহকারক (অর্ডার সাপ্লায়ার)।

আমরা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম, শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ তাঁহাদের দলের একখানি মাসিক পত্রিকার ৬২ পৃষ্ঠায় “প্রভুপাদ সম্পাদিত নিবেদনে জন্মাষ্টমী-বাসর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জানি, ‘নিবেদন বা সাইনবোর্ড’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিনই ছিলেন না। শ্রমণ মহারাজ আমাদের কাছে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ঐ ‘নিবেদন’-পত্রিকাখানি কি দেখাইতে পারিবেন? তিনি ঐ পত্রিকার কোন বর্ষ, সংখ্যা, মাস, তারিখ প্রভৃতি কিছুই উল্লেখ করেন নাই কেন? আমরা বলি, এই প্রবন্ধ প্রভুপাদের নামে কখনই প্রকাশিত হয় নাই—ইহা ক্রবসত্য। জনসাধারণ ইহা দেখিতে চাহিলে দেখাইবেন কি? তবে পাটোয়ারী চা’লে ‘প্রভুপাদ-সম্পাদিত নিবেদনে’ এইরূপ বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা দিয়া প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য সকলেই এইবার ধরিয়া ফেলিবেন। তাই বলি, উহা নিবেদন নহে—নিগোপন। সত্য গোপন রাখিয়া অসত্যকে সত্যের ছায়া প্রকাশ করাই পাটোয়ারী চা’ল। তাই বলি—সাধু সাবধান।

শ্রীল প্রভুপাদ এই ‘নিবেদনে’ কদাচিৎ কোন সময়ে ২২টি প্রবন্ধ দিতেন মাত্র—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কোনদিনই ইহার সম্পাদক ছিলেন না। সেই সময়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ মাসিক পত্রিকা “সজ্জনতোষণী”ই প্রকটিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন ‘জ্যোতির্বিদ’ নামক একখানা মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। এই দুইখানি মাসিক পত্রই ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। তিনি একই সময়ে ২ খানি পত্রিকার সম্পাদনা করেন নাই, ইহা ক্রব সত্য। আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-আফিসে যে ‘নিবেদন’-পত্রিকা রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রমণ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত বা লিখিত বা অনুমোদিত বলিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, উহা প্রভুপাদের নহে এবং ইহা তাঁহার

নামেও প্রকাশিত হয় নাই,— হইতে পারে না। কারণ উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে ‘প্রমেয়-রত্নাবলীর’ “অরুণোদয়বিদ্যুস্ত” শ্লোকটির যেরূপ অর্থ লেখা হইয়াছে, সেইরূপ অর্থ শ্রীল প্রভুপাদের নিজ-নির্মিত ‘গৌড়ীয়ভাষ্যে’ লিখিত হয় নাই। একই মহাপুরুষের লেখনীর ভিতরে এইরূপ তারতম্য দৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ২৪শ পরিচ্ছেদের ৩৩৬-৩৭ পয়ারের অর্থ-নিরূপণ-ক্ষেত্রেও অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের নিজনির্মিত অমৃতভাষ্যের সহিত শ্রমণ মহারাজের উদ্ধৃতিত শ্রীল প্রভুপাদের নাম দিয়া প্রকাশিত তথাকথিত প্রবন্ধের অর্থমধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করি। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধ প্রভুপাদের নিজস্ব প্রবন্ধ বলিয়া ধরা যাইবে কি?

যদি কোনও বিপক্ষ দল উহা প্রভুপাদের প্রবন্ধ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই উহা প্রভুপাদের প্রবন্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া হয় যে ঐ প্রবন্ধ শ্রীল প্রভুপাদের অমুমোদিত, যদিও এইরূপ ধরিয়া লইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, তথাপি বলিতে হইবে শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপ পূর্ব সিদ্ধান্ত অপেক্ষা পরের সিদ্ধান্তই সঙ্গত। ‘নিবেদন’ পত্রিকার স্থিতিকালের বহু পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণের ‘অমৃতভাষ্য’, প্রমেয়-রত্নাবলীর ‘গৌড়ীয়-ভাষ্য’ এবং ‘গৌড়ীয়-কণ্ঠহার’ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সমস্তই শ্রীল প্রভুপাদের নিজকৃত ও অমুমোদিত।

আরও একটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বলেন, ব্রতোপবাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রচলিত বিচারই আমাদের আদর্শ ও নিদর্শন—“সম্প্রদায়ানুচ্যাব এব গতিরিত্তি দিক্।” হঃ ভঃ বিঃ টীকা ১৮১ ॥ শ্রীবল্লভ (বিষ্ণুস্বামী) ও নিম্বার্ক সম্প্রদায় একাদশী ও জন্মাষ্টমীতে যথাক্রমে অরুণোদয় ও কপালবেধ অনুসারে উপবাস করেন। তাঁহারা একাদশীতে একরূপ, জন্মাষ্টমীতে অন্তরূপ উপবাসের ব্যবস্থা করেন না; একাদশী ও জন্মাষ্টমীকে তুল্য জ্ঞান করত একই বেধের অন্তর্গত বিচার করেন। এসম্বন্ধে কাশী ও জয়পুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও নিম্বার্ক-‘ব্রতনির্ণয়’-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জন্মাষ্টমী সম্পর্কে আরও বহু শাস্ত্র-বিচার ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আরও অধিক লিখা বাহুল্য মনে করি। বিশেষতঃ আমার কয়েকজন বিশেষ বন্ধু আমাকে এই প্রসঙ্গে অধিক লেখালেখি করিতে নিবেদন করিয়া অমুরোধ জানাইয়াছেন। আমার প্রারব্ধ জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গের আলোচনা অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া তাহা এখানে সম্পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলাম। জন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিচার সকল-পক্ষই মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে প্রভুপাদের বিচার কোনটী—ইহা লইয়াই মতভেদ।

<p>* ধর্মঃ বহুগুণিতঃ পুংসাং বিম্বকুসেন-কথাত্ম যঃ ।</p>	<p>সবৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা, যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥</p>	<p>* নোংপাদ্যেদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥</p>
--	--	---

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্বশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূত্বরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪র্থ বর্ষ	{	গর্ভোদশায়ী, ১৪ দামোদর, ৪৬৬ গৌরাঙ্গ শুক্রবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৫৯; ইং ১৭।১০।৫২	}	৮ম সংখ্যা
-----------	---	---	---	-----------

(স্বাক্ষর) ৭

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্
[শ্রীস-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীশচীনন্দনায় নমঃ

গদাধর ! যদাপরঃ স কিল কশ্চনালোকিতো
ময়াশ্রিত-গয়াধবনা মধুর-মুক্তিরেকসুদা ।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃত-নবাম্বুদো নেত্রয়ো-
লুণ্ঠন্ ভুবি নিরুদ্ধবাগ্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥১॥

অলঙ্কিতচরীং হরীতু্যাদিতমাত্রতঃ কিং দশা-
 মসাবেতি বুধাগ্রীৱতুল-কম্প-সম্পাদিকাম্ ।
 ব্রজমহহ ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রেস্থিতি
 শিষ্ঠ্যগণ-বেষ্টিতো বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥২॥

হহ ! কিমিত্যুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহ-
 র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা ! ধাতবঃ ।
 প্রসিক্ত ইহ বর্ণ-সংঘটিত-সম্যগান্নায়কঃ
 স্বনান্নি যদিতি ব্রুবন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৩॥

নবান্বজ-দলে যদীক্ষণ-সবর্ণতা-দীর্ঘতে
 সদা স্বহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদম্ ।
 স পাঠয়তি বিস্মিতান্ স্মিতমুখঃ স্বশিষ্ট্যানিতি
 প্রতি প্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৪॥

ক যামি করবাণি কিং ক নু ময়া হরিলভ্যতাং
 তমুদ্दिशतु कः सखे ! कथय कः प्रपद्येत माम् ।
 ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
 সস্মৃচ্ছয়তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৫॥

স্মরার্বুদ-দুরাপয়া তনু-রুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
 তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নিশ্মূলয়ন্ ।
 নৃণাং নয়ন-সৌভগং দিবিসদাং মুখৈস্তারয়ন্
 লসন্নধিরঃ প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৬॥

অয়ং কনক-ভূধরঃ প্রণয়-রত্নমুচ্চৈঃ কিরন্
 কৃপাতুরতয়া ব্রজমভবদত্র বিশ্বস্তরঃ ।
 যদক্ষি-পথ-সঙ্করং সুরধুনী-প্রবাহৈর্নিজং
 প্রবণং জগদাদ্রয়ন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৭॥

গতোহস্মি মথুরাং মম প্রিয়তমা বিশাখা-সখী
গতা নু বত ! কিং দশাং বদ কথং নু বেদানি তাম্ ।
ইতীন স নিজেচ্ছয়া ব্রজপাতেঃ স্মৃতঃ প্রাপিত-
স্তদীয়-রস-চৰ্চবগাং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৮॥

ইদং পঠতি যোহষ্টকং গুণনিধে ! শচীনন্দন !
প্রভো ! তব পদাম্বুজে ক্ষুরদমন-বিশ্রম্ভবান্ ।
সমুজ্জ্বল-মতিং নিজ-প্রণয়রূপ-বর্ণানুগং
বিধায় নিজ-ধামনি দ্রুতমুরীকরুণ স্বয়ম্ ॥৯॥

শ্রী শ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকের বঙ্গানুবাদ

একদিন শ্রীমন্নহাপ্রভু প্রিয় গদাধর সহ কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন,
হে গদাধর ! গয়াপথে কোন এক পরমোৎকৃষ্ট অপূর্ব মধুর মূর্তি দর্শন করিয়া-
ছিলাম ; জলদ-গম্ভীর-স্বরে এই কথা বলিবা মাত্র ষাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দরদর
ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া বাক্শক্তি-
রহিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥১॥

আহামরি ! যিনি অধ্যয়ন-ব্যপদেশে শিষ্যাদির মুখে অথবা অত্র কোনও ছলে
“হরি” এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিষামাত্র, অনুপম কম্পাদি-যুক্ত কি এক অপূর্ব
অনির্কচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেক্রপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, পরন্তু
শাস্ত্রালোচনায় তদ্রূপ করিতেন না, শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সেই
শ্রীশচীনন্দন গৌরঙ্গ-শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥২॥

ছাত্রগণ ধাতুপাঠ আরম্ভ করিলে শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিলেন, হায় ! হায় ! বৎসগণ !
তোমরা কি বলিতেছ ? বারম্বার ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বল । হে বুধগণ ! ধাতুসকল ‘কৃষ্ণ’
বিনা কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে ? এমন কি, যিনি ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালা দ্বারা
কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥৩॥

যাঁহার নয়ন-যুগলের বর্ণ ও আয়তন নব-বিকসিত কমল-দল-সদৃশ, সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরির 'পদ' সদা হৃদয়ে চিন্তা কর ও শীঘ্র সেই 'পদ' সাধনা কর, ব্যাকরণের 'পদ' সাধনা করিয়া কি ফল হইবে? —এইরূপে যিনি হাস্তমুখে বিশ্বয়াপন্ন শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরানন্দসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৪॥

“হে সখে! কোথায় যাইব? কি করিব? কোথায় গেলে সেই হরিকে পাইব? কে আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কে বা আশ্রয় দিবে?”—এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে, যিনি ভূমি-লুপ্তিত হইতেন এবং যিনি কখনও বা শোক-ভরে ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মাতৃদেবীর সত্যক্ মোহ উৎপাদন করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥৫॥

কোটা কোটা কন্দর্পেরও ক্ষুদ্রলভ অঙ্গচ্ছটায় যিনি মানবগণের কলিযুগ-জনিত মলিনতা ও অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করিয়াছেন, এবং অধর-মাধুর্য্যে যিনি দেবতাগণের ন্যূনানন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সমুজ্জল বিশ্বস্তর শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥৬॥

এই যে সোণার পর্কত শ্রীগৌরানন্দ অসীম করুণা প্রকাশপূর্বক কোনও বিচার না করিয়া অকাতরে সর্বসাধারণকে প্রেম-রত্ন বিতরণ করত নিখিল জগৎ পোষণ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত যাঁহার নাম “বিশ্বস্তর” এবং যিনি নয়নপথ-নিঃসৃত গঙ্গা-প্রবাহ দ্বারা আপনাকে ও অপরকে—এমন কি, সমস্ত জগৎকে নিমজ্জিত করিয়া-ছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন ॥৭॥

“আমি মথুরাপুরে আসিয়াছি, বল বল, আমার প্রিয়তমা বিশাখা এখন কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে? আহা! তাহা আমি কি-প্রকারে জানিতে পারিব?”—এইরূপে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বেচ্ছাক্রমে বিশাখা-বিষয়ক রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরানন্দসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৮॥

হে গুণনিধে! হে প্রভো! হে শ্রীশচীনন্দন! যিনি তোমার পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তুমি স্বয়ং সেই উজ্জলচেতা ভাগ্যবান ব্যক্তিকে নিজ-প্রেম-পরিকরের অল্পচর কারয়া তোমার স্বধামে স্থান প্রদান করিও ॥৯॥

নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় দর্শন

নীলাচলে ঠাকুরের দ্বিতীয়বার যাত্রা ও শ্রীজগন্নাথের সেবা-গ্রহণ

বর্তমান সময় হইতে কিক্সিন্যূন ষষ্টি বর্ষ পূর্বে পদব্রজে আগমনকারী প্রাপ্ত পুরুষটী নরযানে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর, লক্ষ্মণনাথ ও কটক হইয়া শ্রীনীলাচলনাথের দর্শনে আসিতেছিলেন। এবার একক আসেন নাই, সঙ্গে শিবিকায় তাঁহার সহধর্মিণী, দুইটী শিশুপুত্র ও দুইটী শিশুকন্যা ছিলেন। দ্বিতীয়-দর্শন-জগু আসিবার উপলক্ষ কৰ্ম্ম-জগতের সূত্র অবলম্বন করিবার প্রারম্ভ নহে, কিন্তু প্রারম্ভ-কৰ্ম্মসূত্রের অভিনয়ে শ্রীনীলাচলনাথের সেবা।

বাহুদর্শনে ঠাকুর একজন বিরাট কৰ্ম্মবীর

প্রথম-দর্শনে নীলাচলে অল্পকাল-স্থিতি, মধ্যকালীয় দর্শনে প্রকৃত প্রস্তাবে নীলাচলনাথের সেবা গ্রহণ। আধ্যাত্মিক-জ্ঞানমত্ত জনগণ এই পুরুষের কৃতিত্বের বিবরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একটী “যোগ্য-কৰ্ম্মবীর” বলিয়া গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্নিহিত দৃষ্টির অভাবে তাঁহার লোকাতীত হরিজনত্ব দর্শন করিবার নয়ন-লাভে বঞ্চিত হইবেন।

(উড়িয়াবিজয়ী ইংরাজ-কর্তৃক) শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সেবা-পরিচালক-রূপে ঠাকুরের ৫ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি

এই দ্বিতীয়বারের যাত্রী শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার তাঁহার প্রেমালঙ্কারটী প্রকাশ করিতে আর প্রস্তুত নহেন। ইনি এখন শ্রীসচ্চিদানন্দ (শ্রীজগন্নাথ) দাস নামে আপনাকে জানাইয়াছিলেন। এইকালে তাঁহার শ্রীনীলাচলনাথের কেবলমাত্র দর্শন নহে; পরন্তু পঞ্চবর্ষাতিত-কাল কায়মনোবাক্যে সেবাধিকার লাভ। বাহু-বিচারে ইনি একজন ভূতক কৰ্ম্মচারী, কিন্তু তাদৃশ ভূতি শ্রীজগন্নাথের সেবকত্বের বিনিময়ে নহে। আধিকারিক দেবগণ যেরূপ স্বরূপগত চেষ্টায় হরির নিত্য সেবক ও বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, সেইপ্রকার শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস লৌকিক আধিকারিক ভার প্রাপ্ত হইয়া ভূতক হইলেও পরমার্থ-সংগ্রহের অভিনয়ে তাঁহার কোনরূপ ওদাসিত্ব ছিল না। শ্রীনীলাচলনাথের সেবোন্মুখ হইয়া ইনি পঞ্চবর্ষাধিক কাল যে-সকল আত্মস্থানিক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার

আমুপূর্বক বর্ণন এখানে সম্ভবপর না হইলেও সংক্ষেপে কয়েকটা নিদর্শন মাত্র দেখাইতেছি।

পুরী-অবস্থিতিকালে শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থের অনুসন্ধান

শ্রীমহাভারতের প্রকাশক কলিকাতা-নিবাসী প্রতাপচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি আমাদের কথিত পুরুষের দ্রব্যাদি কলিকাতা হইতে প্রেরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর উক্ত রায় মহাশয় বটতলা হইতে মুদ্রিত অত্যধিক ভ্রমপূর্ণ একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠাইয়াছিলেন। তৎপূর্বে শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও উহা প্রাপ্ত হন নাই। যাহাদের নিকট হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ছিল, তৎকালে তাঁহারা অনেকেই পুরুষাভুজের উহার পঠন-পাঠন প্রভৃতি কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। আবার যাহারা ঐ গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক বলিয়া অনাদর-পূর্বক সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনায় বিব্রত থাকিতেন, তাঁহারাও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আশ্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কোন প্রভু-সন্তান-নামধারী এক ব্যক্তির নিকট চরিতামৃতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করায় তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দের অমুজ সহোদর এবং শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে বিভাগ-চতুষ্টয়ে স্বরূপও, বাল্যরূপও, গৃহরূপও ও সন্ন্যাসরূপও আছে। তবে সেই গ্রন্থের কথা তাঁহার শোনা আছে মাত্র, তিনি স্বয়ং দেখেন নাই।

উৎকল-সম্রাট্চরের গ্রন্থাগার হইতে ভক্তিগ্রন্থের প্রতিলিপি সংগ্রহ

আমাদের কথিত পুরুষের নীলাচলে নীলাচলপতির আরাধনা করিতে করিতে উৎকলদেশীয় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ মিশ্রের নিকট সেবান্মুখ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আলোচনা করেন এবং সেই পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের সর্বপ্রধান সেবক উৎকল-সম্রাট্চরের পুস্তকাগার হইতে বহুব্যায়ে ও গোপনে শ্রীজীবপাদ-প্রণীত ছয়খানি সন্দর্ভের প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত “শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য”, “প্রমোদ-রত্নাবলী” এবং তাঁহার অগ্রাগ্র যাবতীয় গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি, সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাধামোহন বসুর নিকট ‘ভক্তিরত্নাকর’-গ্রন্থ প্রাপ্তি ও তাহা

হইতে গৌরজন্মস্থান আবিষ্কারের প্রেরণা

সেইকালে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাচরের জনক বিন্দুমাধব বসু ও তাঁহার ভ্রাতা রাধামোহন বসু শ্রীক্ষেত্র-বাসোপলক্ষে সর্বদা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া

নানাপ্রকারে পরমার্থ-বিষয়ে সত্যতা স্থাপন করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ সেইকালে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের লিখিত একখানি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ রাধামোহন বসুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপের অহুসঙ্কানে (এই সময়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে) প্রবৃত্ত হন। শ্রীপরমানন্দ-দাস-প্রণীত গ্রন্থখানি শ্রীনবদ্বীপের স্থানীয় অহুসঙ্কান-বিষয়ে একমাত্র সাহায্য করিয়াছিল। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথার আভাস আছে। শ্রীনবদ্বীপের স্থানসমূহ নির্ণীত হইবার পর রাধামোহন বসুর গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে কালাকুঞ্জে তাঁহার নিকট পুনরায় তাঁহার পুত্র (রামকৃষ্ণ বসুর পিতা) বলরাম বসু দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। চন্দননগর হইতে 'প্রজাবন্ধু' নামক একখানি সাময়িক-পত্রের উপহারস্বত্রে এই-শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের কতিপয় পত্র কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে বহরমপুর হইতে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয়বার প্রচার হইয়াছে।

ঠাকুরের আবিষ্কৃত ভক্তিমণ্ডপেই তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা

শ্রীসচ্চিদানন্দ কেবল যে শ্রীমদ্ভাগবত, গোবিন্দভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যাপকের নিকট নীলাচলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এরূপ নহে, তিনি পুরুষোত্তমবাসী কতিপয় ব্যক্তিকে স্বয়ং সেইকালে ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কার্য্য ব্যতীত শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ মুক্তি-মণ্ডপে—নির্বিশেষ-বিচারপর প্রবল-বিপ্রাভিজাত্য-সম্পন্ন শাসন-ব্রাহ্মণগণের অধ্যুষিত মুক্তি-মণ্ডপের বিপরীত-উত্তর-পার্শ্বে বর্তমান শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মাবস্থিত স্থানের বেষ্টনমুখে তিনি “ভক্তি-মণ্ডপ” স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মণ্ডপে তাঁহার ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনার স্থান ছিল।

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক পাষাণদলন-মুখে সর্বত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রচারের ইচ্ছিত

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সর্বতোভাবে অবনতি ও দুর্গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় যেরূপ দ্রব হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রোথিত-গৌড়ীয়-শুদ্ধবৈষ্ণব-বিশ্বাস স্মার্ত্তপদ-দলিত গৌড়ীয়-ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াও সর্বত্র বিশাল শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট দ্রুমে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই 'ভক্তি-মণ্ডপে' পুনরায় কণ্টক আরোপিত হওয়ায় শুদ্ধভক্তি-পথের পথিকের কোমল-

পদসমূহ কিছুদিন হইতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোণিত উদগীরণ করিতেছে। গৌরপার্বদ ত্রিদণ্ডী স্বামিপাদের অমুগ-গণ অমুক্ষণ তাঁহার প্রস্তাবিত কণ্টকোন্মূলন কার্যে নিযুক্ত আছেন।

“কালঃ কলিকর্ণিনি ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ,

শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটী-রুদ্ধঃ।

হা হা ক যামি, বিকলঃ কিমহং কেরোমি

চৈতন্যচন্দ্র যদি নাথ কৃপাং কেরোষি ॥”—এই বাণী-কথিত যে

শুদ্ধভক্তিলতার বীজ আরোপিত হইয়াছে, কণ্টকের বীজ-দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইলেও শুদ্ধপ্রেম-ভক্তির বত্মা, প্রোথিত-কণ্টক-বীজ-কৃত্রিম ভূমিকাকেও ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবে। সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তি-লতিকা প্রেম-প্রসূন দ্বারা কেবল উৎকল-গগন নহে, সমগ্র পৃথিবীতে গৌর-প্রেমভক্তির সুরভি বিস্তার করিবে।

ঠাকুরের সহায়কদ্বয়—শ্রীল স্বরূপদাস ও কান্হাধারী রঘুনাথদাস

সেইকালে নীলাচল-ক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী ও শ্রীল কান্হাধারী রঘুনাথ-দাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েকজন উদাসীন বৈষ্ণব সচ্চিদানন্দের শুদ্ধ-ভজন-বিষয়ে সহায়ক ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ইহার যে-সকল পারমার্থিক বিচার ও আত্মগাণ্ডিক ব্যবহার হয়, তাহা এখানে বর্ণনের স্থান অল্প।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের অনুরোধ উপেক্ষিত

পরিদর্শকসূত্রে তিনি শ্রীমন্দিরের নানাবিধ সেবা-সৌষ্ঠব বিধান করেন। সারদা মঠ হইতে সেইকালে ত্তনৈক নির্বিশেষবাদী জগদগুরু-নামধারী আচার্য্য যতিবর শ্রীনীলাচলনাথের নিকট একটি উপল-নির্ম্মিত কুকুর পুনঃস্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবক-সূত্রে তিনি এসকল নবীন কথা অমুমোদন করিতে পারেন নাই। তৎকালে শ্রীরামানুজীয় মঠধারী মহাস্তগণের মধ্যে শ্রীরাঘবদাস মঠের মহাস্ত শ্রীনारायणদাস তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে ‘শ্রী’-সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থাদি ও প্রপন্নগণের লিখিত ভক্তিশাস্ত্রাদি আলোচনামুখে ভগবৎ-সেবায় ঐকান্তিকতা আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল।

‘বেদান্তাধিকরণমালা’ প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থের রচনা

অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ভিষ্ট বিষয় হইতে বিশেষভাবে পৃথক্—ইহাও তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল। অনেক সময় শ্রীজগন্নাথের বিভিন্ন সেবার পরিদর্শকসূত্রে তাঁহাকে

শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিতে হইত। তাঁহার শ্রী-নীলাচলনাথের দ্বিতীয়বার দর্শন কেবল সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের ব্যাপার নহে, পরন্তু অভিধেয়-সমৃদ্ধির নিদর্শন জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, শ্রীতত্ত্বসূত্র, বেদান্তাধিকরণমালা, গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি, কল্যাণ-কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শ্রীসচ্চিদানন্দের শুদ্ধভক্তি-প্রসার-সৌধের অভিধেয়-সুত্তরূপে নিত্যকাল অবস্থান করিবেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

জগৎ-সর্বস্ব যুক্তিবাদীর মত

অনেক আধুনিক ও পুরাতন যুক্তিবাদী পুরুষ ‘যুক্তি’ বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের প্রথম প্রতিবাদ এই যে, “এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-সৃষ্ট, অতএব মানবের বাঞ্ছনীয়। জগদীশ্বর মানবদিগকে যুক্তি-শক্তির দ্বারা ভূষিত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতে দিয়াছেন। মানবগণ যুক্তিশক্তির পরিচালনার দ্বারা সমাজ ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক ব্যবস্থা স্থাপন করত জগতে সুখভোগ করিতেছেন। অনেকানেক আবিষ্কৃতি করত সুখ এবং সুখোপায়ের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কালে কালে এই প্রকার উন্নতি হইতে হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড একটী অপূর্ণ ক্রেশরহিত ধাম হইয়া বিরাজ করিবে। মানবগণ তখন অনায়াসে সর্বস্ব সুখ ভোগ করিতে পারিবেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।”

জগৎ-সর্বস্ব যুক্তিবাদীর মত-খণ্ডনমুখে—

(ক) দেহ-মনের অতিরিক্ত আত্মার নির্দেশ

এই প্রকার সিদ্ধান্ত-বিশ্বাসও যুক্তি-বিরুদ্ধ, যেহেতু ইহার বিপরীত স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ আত্মায় একটী অপ্রাকৃত আশা প্রতীয়মান হয়। হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের অস্থি-চর্ম্ম-বিশিষ্ট স্থূল দেহ ও মনোময় সূক্ষ্ম দেহ নির্ভেদ করত আত্মার কোটরে প্রবেশ করিয়া একবার সমাধি অবস্থায় এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ করুন। তাহা হইলে দেখিবেন যে, আপনারা পান্থ-নিবাসীর আশ্রয় এই সম্ভাবরণ-বিশিষ্ট দেহেতে বাস করিতেছেন এবং স্বীয়-ধাম-গমনের গাঢ়তর আশা

করিতেছেন। পুরুষোত্তম-ধামাভিমুখ যাত্রীসকল যেমত পথ-মধ্যে কোন একটি গৃহেতে বাস করিয়া রাত্রিযাপন করত অরুণোদয়ের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ আপনারাও এই প্রাকৃত দেহেতে অজ্ঞানরূপ রাত্রি যাপন করত জ্ঞানরূপ অংশুমালীর অপেক্ষা করিতেছেন।

(খ) দেহ-মন আত্মার পান্থনিবাস, তাহাতে আসক্তি বৃথা

পান্থ-নিবাসে আসক্ত হইয়া কোন মূর্খ তাহার উন্নতির চেষ্টা করে? যাত্রীরা কখনই করিবে না; তবে ঐ পান্থ-নিবাস-দ্বারা যাহাদের কার্যসাধন হয় এবং উহাদের অধিকারী ব্যক্তিরাই তৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবে। যে-পুরুষ এই পান্থভৌতিক পান্থ-নিবাসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহার পালন-কর্তা। কর্তব্যবিমূঢ় যাত্রীসকল এই পান্থ-নিবাসে আসক্ত হইয়া ইহার উন্নতি করে এবং ঈশ্বরও ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা নিজ কার্যের সাধন করিয়া ল'ন। ইহাতে তাঁহার অসীম কৌশলের ব্যাখ্যা হইতেছে। যেহেতু পান্থস্থিত পান্থাসক্ত ব্যক্তিগণ তদাসক্তিরূপ যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডস্বরূপ তাহারা অকৰ্মণ্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। পূৰ্ব-পাপক্ষয়রূপ ফল ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহাদের আসক্তি গাঢ় হইলে তথায় বাস করিয়া আপনাদিগকে বঞ্চনা করে।

(গ) পান্থভৌতিক জগৎ অভাবদ্বারা নির্মিত, স্মৃতরাং চির-অপূর্ণ

জীব যে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের চিরনিবাসী নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব-ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা কহিলে বিশ্বাসবিরুদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড যতই উন্নত হউক না কেন, কখনই ইহা নির্দোষ হইবে না। কখনই বিমল স্মৃৎ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এটিও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। পঞ্চভূত মায়া-জনিত; অতএব অভাব-সঙ্কল। অভাবই ইহার স্বভাব, অতএব ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড কোনকালেও অভাবরহিত হইবে না এবং পূর্ণতা না হইলেও যে বিমল স্মৃৎ কখনও আশা করা যাইবে, এমত নহে। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের যতই উন্নতি হউক না কেন, দেশ, কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদক গুণসকল কোথা যাইবে? ইউরোপ ও আমেরিকা দেশস্থ অনেক * * তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতও এই সম্বন্ধে অনেক ভ্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঘ) প্রাকৃত জগৎ ক্রমোন্নতিতে কখনও অপ্রাকৃত হয় না

কেহ কেহ এই ভূতসকল ক্রমোন্নতির দ্বারা অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে; এরূপ স্বীকার করেন। হাঃ! তাঁহারা যুক্তি করিবার সমস্ত পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ধ্যান করেন না। যদি একবার হৃদয়-কন্দরে সেই পরমপুরুষ ভগবানের সচ্চিদানন্দ

ভাবকে স্থান দান করেন, তবে আর এরূপ সর্লীর্ণ অসংক্লত তর্কের উদয় হয় না। পরমেশ্বর যখন সর্বশক্তিসম্পন্ন, তখন তাঁহার অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি থাকিতে পারে। এই প্রাকৃত জগৎই যে ক্রমে অপ্রাকৃত হইবে, ইহার প্রয়োজন কি? তাঁহার কি আর একটি অপ্রাকৃত জগৎ থাকিতে পারে না? ইহার। সমুদায় জগতের আদি বলিয়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং একটি মহান চৈতন্যকে স্বীকার করিতে সমর্থ হন না, অথচ চৈতন্যরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাই কেবল প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত জগতের প্রাদুর্ভাব কল্পনা করিতে পারেন। সৈশ্বরবাদী পুরুষেরা এ প্রকার কহিলে আশ্চর্য্যবিত্ত হইতে হয়। প্রাকৃত জগৎ যে কোনকালে অপ্রাকৃতরূপ হইবে, এরূপ কদাচ স্বীকৃত হইতে পারে না।

(৬) জীবের উন্নতি ও উপভোগের জন্ম জগৎ সৃষ্ট হয় নাই

এ প্রকার প্রতিবাদ যে যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাও দৃষ্টি করুন। পরমেশ্বরকে বেদসকল সত্যসঙ্কল ও সর্বশক্তিমান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। জগদীশ্বর যে মানবদিগকে উন্নত করিবার আশায় প্রথম সৃষ্টির পরেই এ জগতে স্থাপিত করিয়াছেন, এমত হইতে পারে না। তিনি সর্বমঙ্গলময়, অতএব অকারণে আমাদিগকে যে ক্লেশময় দেশে স্থাপিত করিয়া বিপজ্জালে পাতিত করিবেন। এরূপ তাঁহার স্বভাব নহে। যদি এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের চিরনিবাস অথবা ভোগের জন্ম সৃষ্ট হইত, তবে তিনি অবশ্যই নির্মলরূপে ইহাকে সৃষ্টি করিতেন। তিনি সর্বশক্তিমান, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বিশেষ পরিণাম আশায় বদ্রিয়া আছেন, এরূপ তাহার পক্ষে ঘটনীয় নহে।

(৭) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কারণ ব্যতীতই কার্য্য করেন

সূত্রধরেরা কাষ্ঠ ও বাটালী ব্যতীত কোন বিষয় নির্মাণ করিতে সক্ষম হয় না, কর্ম্মকারেরা লৌহ, হাতুড়ী ও অগ্নি ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না এবং কুস্তকারেরা কুলাল, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ ব্যতীত কিছুই গড়িতে পারে না, এরূপ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর কি তদ্রূপ অক্ষম পুরুষ? তিনি কি মানব-বুদ্ধি ও ফল-সৃষ্টি ব্যতীত এই জগৎকে উন্নত করিতে পারিতেন না? আহা! যে মহাপুরুষ ইচ্ছামাত্রেই এই সদস্য জগৎকে উৎপত্তি করিয়াছেন, তিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে কি কোন দ্রব্য বা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়? যিনি সমস্ত চৈতন্য, জড় ও যন্ত্রাদির নিয়ন্তা, তাঁহার সঙ্কল্প কখনই গোণ-সিদ্ধ হইতে পারে না।

(৮) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটী জগৎ অবশ্য স্বীকার্য্য

এই ব্রহ্মাণ্ডটি যে চিরকাল অসিদ্ধ ও অভাবপূর্ণ থাকিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, নতুবা ইহার অবস্থা এরূপ হইত না। জীবের প্রাণ্য আর একটি ধাম স্বীকার

না করিলে কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শাস্ত্রবুক্তি ও আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। জীব সেই অদ্ভুত অপ্রাকৃত ধামের আশা করিয়া থাকেন। যথা, বামনপুরাণে—

শ্রুতৈতদদর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতে: পরম্।

কেবলাহুভবানন্দমাত্রমক্ষয়মক্ষয়ম্ ॥

শ্রুতৌ চ—এষ: ব্রহ্মলোক, এষ আত্মলোক ইতি।

এই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটি জগৎ স্বীকার করা অনাদি-সিদ্ধ বলিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভাবী গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন

বিশেষ নিবেদন এই, আমাদের গ্রাহকসংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, তাহাতে যাহারা ভবিষ্যতে নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহাদিগকে আমরা আর বর্তমান ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিতে পারিতেছি না। দুঃখের বিষয়, আমাদের পূর্ব-মুদ্রিত সমুদয় সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ সমুদয় সংখ্যা পুনরায় ছাপিতে হইলে, অত্যধিক অর্থ ব্যয় হইবে। সুতরাং ভাবী গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—আমাদিগকে ১ম সংখ্যা হইতে ত্রীপত্রিকা দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া লজ্জিত করিবেন না। গত ৭ম সংখ্যা হইতে প্রচুর পরিমাণে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছাপিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ঐ ৭ম সংখ্যা হইতেই আমরা ভাবী গ্রাহকবর্গকে ৪র্থ বর্ষের ষাণ্মাসিক গ্রাহকরূপে অঙ্গীকার করিতে পারিব।

অধিক কি, আমাদিগের সংরক্ষিত সংখ্যাগুলিও (reserved copies) নূতন গ্রাহকগণের অনুরোধে তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং কেহ পুরাতন সংখ্যার জন্ত পত্র দিলে আমরা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অপারক হইতেছি। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের এই ক্রটি মার্জনা করিবেন।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র

চিন্তামণিপ্রকরসদস্য কল্পবৃক্ষ-
লক্ষ্যবতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মী-সহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১॥

‘চিন্তামণি’ শব্দে জড় চিন্তামণি নয় ।
গোলোকের চিন্তামণি সুদুর্লভ হয় ॥
জড় পঞ্চভূত-দ্বারে জগৎ গঠন ।
চিৎ-চিন্তামণি-দ্বারে গোলোক রচন ॥
হেন চিন্তামণি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-আলয় ।
রচিয়াছে চিচ্ছক্তি অপ্রাকৃতময় ॥
সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম-অর্থ-কাম ।
মোক্ষরূপ তুচ্ছফল করয়ে প্রদান ॥
কৃষ্ণালায়ে কল্পবৃক্ষ প্রেমরূপ ফল ।
প্রদানি’ জীবের জন্ম করয়ে সফল ॥
সাধারণ কাম-ধেনুগণেরে দোহিলে ।
সেইক্ষণে দুগ্ধমাত্র তাহা হ’তে মিলে ॥
কিন্তু শুন, গোলোকেতে কামধেনুগণ ।
সাধারণ দুগ্ধ কভু না করে প্রদান ॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশকারী চিদানন্দ-স্রাবী ।
প্রেম-প্রসবণ-রূপ দুগ্ধ তত্ত্ব লভি ॥
হেন প্রেম-দুগ্ধ-সমুদ্রেতে তত্ত্বগণ ।
পান স্নান করে সদা হ’য়ে নিমগন ॥
প্রেমানন্দ দুগ্ধস্রাবী কামধেনুগণ ।
কৃষ্ণচন্দ্র তথায় করয়ে পালন ॥
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীগণ যাহারে সেবয় ।
(সেই) আদিপুরুষ গোবিন্দে ভজহ হিয়ায় ॥১॥

বেণুং কনসুমরবিন্দদলায়তাক্ষং

বর্হাবতংসমসিতান্দুদ-সুন্দরান্দম্ ।

কন্দর্পকোটি-কমনীয়-বিশেষশোভং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২॥

জড়বস্ত্র-সম কৃষ্ণের রূপ নাহি হয় ।

জড়রূপ বিকৃতি হেয়-ধর্মময় ॥

ভক্তিরূপ চিৎ-সমাধিতে ব্রহ্মা যাহা ।

হেরিলেন স্তব-কালে, গাহিলেন তাহা ॥

বেণু-গানে রত থাকি' সব চেতনেরে ।

রমণীয় স্বর-যোগে চিন্ত-বিন্ত হরে ॥

স্নিগ্ধতা বর্ষণ করে যেন পদ্মদল ।

সেইমত কৃষ্ণ দৃষ্টি করে নিয়মল ॥

ময়ূরের পুচ্ছ আর শিরের ভূষণ ।

অপ্রাকৃত শোভা হয় অতি মনোরম ॥

নীলমেঘ-সম বর্ণ কৃষ্ণের শরীর ।

চিন্ময় শ্যামল বলি' কহে সব ধীর ॥

কোটি কন্দর্পের রূপ একত্র করিলে ।

কৃষ্ণ-রূপ-সম নাহি হয় কোন কালে ॥

কোটি কোটি কন্দর্পেরে মোহয়ে যে-রূপ ।

সেই ত' আদিপুরুষ গোবিন্দের রূপ ॥

অতি অপরূপ রূপ ভগবান্ যিনি ।

(সেই) আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দেরে ভজি আমি ॥২॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকুমুদ সন্ত মহারাজ

ভক্তিকথা

১ (পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬১ পৃষ্ঠার পর)

প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, ব্যক্ত-অব্যক্ত যাহা কিছু বিद्यমান আছে, সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তির একমাত্র কারণ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । তিনিই আদিকর্তা, সর্বকারণের কারণ, পরমেশ্বর । মায়াতীত ভগবদ্ভক্তগণের যেসমস্ত চেষ্টা, তাহাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানিসূত্রে চেষ্টা করিয়া থাকেন । যাহারা পণ্ডিত তাঁহারাই সেই সেই অপ্রাকৃত দাস্ত-সখা-ভাবাদি-দ্বারা বিভাবিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকেন । তাঁহাদের চিত্ত সর্বদাই কৃষ্ণ-লীলাময় এবং সেই অপ্রাকৃত মাধুর্যালীলা-আনন্দনে সর্বদাই লুক্ক-মানস । সেইসকল অনন্ত-ভক্তগণের ভগবৎপ্রসাদেই দুর্কোথা ভজন-রহস্য ও তদনুগ তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই উদ্ভিত হয় । তখন তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেমজনিত শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের বিষয় শ্রবণ-কীর্তন ভিন্ন প্রাণ-ধারণ করা দুঃসাধ্য হয় । তাঁহারা স্বজাতীয়শয়-স্নিগ্ধ ভগবদ্ভক্তের সহিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিতে করিতে ভক্তি-স্বরূপ-প্রকারাদি আশ্বাদন করত মঙ্গলময় ভগবানের অপ্রাকৃত-লীলাবিষয় আলোচনামুখে শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ প্রভৃতি নবধাভক্তির সাধন করিতে থাকেন । সাধন-অবস্থায় ঐ একই ভক্তির দ্বারা নির্ঝিল্লি ভজন-সম্পাদন-জগৎ সন্তোষ লাভ করেন এবং সিদ্ধ-অবস্থায় সেই ভক্তির দ্বারাই স্বয়ং ভগবানের সহিত অপ্রাকৃত দাস্ত-সখ্যাতিরসে রমণ করিয়া থাকেন বা বিধি-ভক্তির দ্বারা তোষণ এবং রাগভক্তির দ্বারা রমণ-সুখে তৎপর হন । সেইপ্রকার অপ্রাকৃত তোষণ এবং রমণাদি-সেবায় সততযুক্ত ভক্তদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যদ্বারা তাঁহাদের সেই ভক্ত্যঙ্গসকল উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইয়া ভগবৎ-প্রেমরূপে আনন্দিত হয় । ভাবাবস্থায় সেই সেই ভক্তগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নিজ অপ্রাকৃত ভাবসমূহের আদান-প্রদান হয় । ভগবান্ই ভক্তের বুদ্ধিযোগ-প্রদাতা ; ভক্ত সেই বুদ্ধিযোগ অহুসারে তাঁহার সেবা করিয়া ক্রমশঃ তাঁহারই অপ্রাকৃত ধামে অগ্রসর হইতে থাকেন । এইপ্রকার ভক্তগণের কোনপ্রকার অজ্ঞান সম্ভব নহে ।

যে-সকল মায়াবাদিগণ শুদ্ধভক্তগণকে প্রাকৃত ভাবুক বা অজ্ঞানী সন্দেহে অবমাননা করেন, তাহারা অত্যন্ত অপরাধী । শুদ্ধভক্তগণের পাদপদ্মে অপরাধ-ফলেই মায়াবাদী ও মিছাভক্ত-সম্প্রদায় নিজেদের মূঢ়তাবশতঃ অহর-ভাবাপন্ন হয় ; ক্রমশঃ কৃষ্ণবিদ্বেষ ভিন্ন তাহাদের আর কোন জ্ঞানই লাভ হয় না ; যাহা লাভ হয়

তাহা কেবল ক্লেমাাত্র। ঐক্লপ মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণ যদি কখনও কোন সাধু-কৃপায় জ্ঞানলাভ করে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—যাঁহারা ভগবানের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করেন, তাঁহাদের অজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। মায়াবাদিগণের বুঝা অবশ্যক যে, ভগবান্ অন্তর্ধামিহ্মত্রে শুদ্ধভক্তের হৃদয়স্থিত সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দেন।

তেষামেবান্ধুকস্পার্থমহিমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মবহ্নৌ জ্ঞানদীপেন ভাষতা ॥ (গী: ১০।১১)

শুদ্ধজ্ঞানিগণ মনে রাখিতে পারেন—ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকাশ্যভাবেই বলিতেছেন যে, ‘তেষাম্’ অর্থাৎ সেই সেই সততযুক্ত ভক্তগণকেই দয়া করিবার জ্ঞ। জ্ঞানী বা যোগিদিগকে দয়া করিবার জ্ঞ। তিনি পরমাত্মরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন না, পরন্তু ভক্ত দগকেই দয়া করিবার জ্ঞ। তিনি অন্তর্ধামী পরমাত্মরূপে জীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রেরণ দ্বারা যদি ক্রমশঃ তাঁহার সন্নিগটস্থ করিয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে সেই ভক্তগণের অজ্ঞানী হইবার অবকাশ কোথায়? নিজবুদ্ধির পরাক্রম দ্বারা জ্ঞানিগণ যে সেই পরতত্ত্বকে জানিবার চেষ্টা করেন, তাহাই মূলতঃ অজ্ঞান-অন্ধকার। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার চিজ্যোতির দ্বারা যে অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ, শুদ্ধজ্ঞানি-সম্প্রদায় কি সেই জ্ঞানালোক দিতে সমর্থ? নিজের চেষ্টায় কোনদিনই অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত হইতে পারে না। শুদ্ধজ্ঞানি-সম্প্রদায় অপ্রাকৃত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন না বলিয়াই নিরীশ্বর কপিল প্রভৃতি দার্শনিকগণ সেই পরতত্ত্বকে ‘অব্যক্ত’ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সেইপ্রকার অব্যক্তাসক্ত জ্ঞানিগণের যে কেবল ক্লেমই লাভ হয়, তাহা আমরা গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। যথা—

ক্লেমোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গুতিতুঃখং দেহবস্ত্রিরবাপ্যতে ॥ (গী: ১২।৫)

অব্যক্ত ব্রহ্মবাদিগণের যে কুচ্ছ সাধনা, তাহা সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই ক্লেমদায়ক। ব্রহ্মবাদিগণ চিং-জড়-সমন্বয় করিতে গিয়া নানা কল্পিত মতবাদ স্থাপন করিতে বিশেষ দুঃখ পান। ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক ভাবিয়া ব্রহ্মের যে পরা ও অপরা শক্তিদ্বয় বর্তমান, তাহা কুতর্কদ্বারা এক করিবার প্রয়াস পাইয়া পণ্ডিত-সমাজে হাস্যাস্পদ হয়। অবিকারী ব্রহ্মকে বিকার-অবস্থায় অধঃপাতিত করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না এবং তাহাতে কেবলমাত্র হাস্যাস্পদই হন না, পরন্তু দ্বৈতবাদ

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সম্প্রদায়গত বিবর্তবাদ স্থাপন করিতে গিয়া ব্রহ্মের শক্তি-পরিণামবাদের গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিতে চাহেন না। বেদ-বেদান্ত এবং তদনুগ শাস্ত্রাদির মূখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া যে গোণার্থ স্থাপন করিবার জন্ত প্রাদেশিক বাক্যাগুলি ব্যবহার করেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, আর বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে বাধ্য হন। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সবিশেষত্বের অপ্রাকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া জড় নির্বিশেষ ভাবকেই চরম-ভাব চিন্তা করিয়া কল্পিত ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ-রূপ যে প্রাকৃত চেষ্টা, তাহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কারণ শ্রোতস্বিনী নদীর প্রবাহে বাধা দেওয়া যেমন দুর্লভ ব্যাপার, নির্বিশেষপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-নিরোধও সেইপ্রকার দুর্লভ ব্যাপার। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন—

যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা, কৰ্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদগ্ধথয়ন্তি সন্তঃ।

তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতোয়োহপি ক্লক-শ্রোতগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

(ভাঃ ৪।২২।৩২)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সর্পস্ব ভক্তগণ ভক্তির দ্বারা যেভাবে কৰ্ম্মাশয়-গ্রন্থিসকল নিঃশূল করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও ভক্তিরহিত নির্বিশেষী বোগিগণ তদ্রূপ হৃদয়-গ্রন্থি ছেদনে সক্ষম নহেন। অতএব ভগবান্ বাসুদেবের ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

বিষ্ণুর নির্বিশেষ-ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব। বিষ্ণুর পরাশক্তি-সম্ভূত যে জীবশক্তি, তাহা ব্রহ্মসামুদ্র্যরূপ মুক্তিলাভ করিলে বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শক্তিমান্-তত্ত্ব নিজশক্তিকে আত্মসাৎ করিতে সর্বদাই সক্ষম, কিন্তু তদ্বারা শক্তির নিত্য বিলাস বিলোপ হইয়া যায় না। সূতরাং এরূপ বিচার বা চিন্তা অত্যন্ত অনুপাদেয়। ব্রহ্মবাগিণ যে সামুদ্র্য-মুক্তির কামনা করত উহা লাভে সক্ষম বলিয়া মনে করেন, তাহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ঐপ্রকার কৈবল্য-সুখকে ভগবদ্ভক্তগণ নরক-যন্ত্রণার সমতুল্য জ্ঞান করেন। জড় সবিশেষ তত্ত্বে যে হেয়তা-অবরতা আছে, তাহা নিরাস করিতে গিয়া চিৎ-সবিশেষ পর্য্যন্ত নিরাস করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দুর্লবিতার কার্য্য। রোগ-নিঃশূন্য করিতে গিয়া রোগ এবং রোগী উভয়কেই নিঃশেষ করিয়া ফেলা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সেইজন্ত লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদন্ত্য তে বিভো, ক্লিষ্টান্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্টান্তে, নান্যদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে ভগবন্, আপনার নিত্যানন্দময় চিৎসেবা-সুখ পরিত্যাগ করিয়া বাহারা

কেবলমাত্র বস্তুজ্ঞান লাভের জন্ত চেষ্টা করেন এবং শুষ্ক অতন্মিরসন করেন, তাহাদের ধাত্ত পরিত্যাগ করিয়া খুল তুষে আঘাত করার ত্রায় কেবল ক্লেশই লাভ হয়, পরন্তু কোন শস্ত বা ফল লাভ হয় না। অব্যক্তভাবে জীবের স্বরূপ-বিরোধী ও দুঃখজনক বলিয়াই সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য।

ক্লেশকর অব্যক্ত ব্রহ্মবাদী না হইয়া ষাঁহারা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহারা কিন্তু কোন প্রকার দুঃখভোগ না করিয়াই এই ভব-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান এবং পরিশেষে ভগবানের পরম-ধামে তাঁহার নিত্য-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধামিক্রমে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জ্ঞানালোক দ্বারা যেমন ভক্তের সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করত তাঁহাকেই পাইবার জন্ত বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, সেইপ্রকার তিনিই চেষ্টা করিয়া তাঁহার ভক্তকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া লন। নিজের চেষ্টায় সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলে প্রায় ডুবিয়া মরিতে হয়, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ংই যদি উদ্ধার করিয়া লন, তবে সংসার-সমুদ্রে সম্ভরণ-রূপ যে কষ্ট, তাহাও স্বীকার করিতে হয় না। ভগবানের শরণাগতিতে সংসার-সমুদ্র হইতে নিস্তার পাওয়া সৰ্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এইভাবে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংত্ৰস্ত মৎপরা।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মম্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ (গীঃ ১২।৬-৭)

ষাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত অর্থাৎ নির্কির্শেষ ব্রহ্মবাদী নহেন, পরন্তু ভগবানের নিত্য স্বরূপাবলম্বী এবং সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কৰ্ম্মকে সেই ভগবানেরই ভক্তির সম্পূর্ণ অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং সেই ভগবৎ সম্বন্ধীয় অনন্তভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, কৰ্ম্ম, তপাদি-রহিত শুদ্ধ-ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানের নিত্য-বিগ্রহ শ্রামহুন্দর মুরলীধরের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেইসকল কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত-পুরুষদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি শীঘ্রই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এইরূপ যে, যিনি স্নেহ-ভাবে তাঁহার নিকট প্রপত্তি করিবেন, ভগবানও সেইভাবে তাঁহাকে রূপা করিবেন।

ব্রহ্মবাদিগণ যে ভগবানের নির্কির্শেষ ভাব কল্পনা করিয়া ব্রহ্মের সহিত একত্ব মিশিয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে ভগবানের কিছু আপত্তি থাকিলেও ক্ষতি কিছুমাত্র নাই। ভবরোগগ্রস্ত পুরুষ যদি তাহার রোগ এবং নিজেকে একত্বই রোগ-রোগী

ধ্বংস করিতে চাহেন, তাহাতে আর ক্ষতি কাহার ? কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাহারা জ্ঞানগেরই নিবৃত্তি করিতে চাহেন, কিন্তু রোগাক্রান্ত নিজ-সত্তার ধ্বংস কখনই চাহেন না ; তাহারা নিজ-সত্তার শুদ্ধস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবারই চেষ্টা করেন। যাহারা সেই প্রকার শুদ্ধ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাহাদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভেদ-বুদ্ধি-রূপ জীবাত্মার বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করেন। ব্রহ্মের সহিত অভেদবাদীর যে গতিলাভ হয়, তাহাধারা জীবের স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয়। মুক্তিকামীর সংসার-মুক্তিরূপ যে সূত্র, তাহা ভগবদ্ভক্তের আহুসঙ্গিক-ভাবেই লাভ হয়। যথা—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্ঠয়ে ।

তয়া বিনা তদাপোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ (নারদীয় পুরাণ)

ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি শ্রী-

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যাক্রিশোর-মূর্ত্তিঃ ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেহ্মন্যন

ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)

ইতি ‘ভক্তিকথা’ সমাপ্ত।

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবৈদ্য
এডিটর, ব্যাক-টু-গড্ হেড্

অতিথি-সংস্কার

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

কোনও ব্যক্তি অতিথিরূপে গৃহে বা মঠে আসিলে তাঁহার সেবা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য। অতিথি বৈষ্ণব হইলে তাঁহার সঙ্গ করা দরকার ; আর কর্ম্মী জ্ঞানী, অগ্রাভিলাষী বা ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায়ের লোক হইলে তাহাদের সঙ্গ না করিয়া তাহাদের কল্যাণ-কামনায় কেবল প্রসাদাদি দানের দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করা সকলেরই কর্তব্য ; অথবা প্রত্যাবায় অবশ্যজ্ঞাবী। উদরভেদ-বাদ প্রসংশনীয় নহে। “জীবে সম্মান দিবে জানি” কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান—এই আদর্শই প্রত্যেকের অহুসরণীয়।

সাধারণ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বতোভাবে শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহারও অনাদর করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনদিনই তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। কারণ সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন। প্রতি জীবের অন্তর্যামিরূপে

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিলে কেবল উপচারাতির দ্বারা যে অর্চনের ছলনা হয়, তাহাতে পরিশ্রমই সার হয়। শ্রীকপিলদেব তাঁহার জননীকে বলিয়াছেন,—

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।

তমবজ্জায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চ্যাবিভ্রমন্ ॥ (ভাঃ ৩২২২১)

[মাতঃ ! আমি অন্তর্যামিরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত। যে মর্ত্য-জীবসমূহ আমার অধিষ্ঠানভূত প্রাণিসমূহে কাঞ্চবুদ্ধি না করিয়া বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করেন, তাঁহারা প্রাকৃত-বুদ্ধিতে যে প্রতিমাদি পূজা করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শ্রীঅর্চার অবজ্ঞাই করা হয়।]

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তুমাগ্নানমীশ্বরম্ ।

হিতার্চ্যাং ভজতে মোঢ়্যাদুশ্মন্যোব জুহোতি সং ॥ (ভাঃ ৩২২২২)

[যে ব্যক্তি সর্বভূতে বর্তমান পরমাত্ম-স্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ কেবল লৌকিকী রীতি অনুসারে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে অর্চ্যামূর্তির পূজা করে, সে ব্যক্তি ভগ্নে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।]

দ্বিষতঃ পরকায়ৈ মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।

ভূতেষু বদ্যৈবরশ্চ ন মনঃ শাস্তিমুচ্ছতি ॥ (ভাঃ ৩২২২৩)

[পর-শরীরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, এইরূপ অভিমানী, ভেদদর্শী, ভূতসমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শাস্তিপ্ৰাপ্ত হয় না।]

আত্মানশ্চ পরশ্চাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ ।

তশ্চ ভিন্নদৃশো মৃত্যুবিদগ্ধে ভয়মুন্মগ্নম্ ॥ (ভাঃ ৩২২২৬)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—‘অন্তরোদরম্’ উদরভেদেন ভেদং করোতি, ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনা-অসমং পশুতি; ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্তীত্যর্থঃ। তশ্চ ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোহহমুন্মগ্নম্; ভয়ং সংসারম্ ।

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।

অর্হৈয়েদ্ধান-মানাভ্যাং বৈঘ্যেভিন্নেন চক্ষুষা ॥ (ভাঃ ৩২২২৭)

“অথ অতো হেতাঃ; যথায়ু কং যথাশক্তিদানেন তদভাবে যানেন চ। অভিন্নেন চক্ষুষা ইতি পূর্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি বৈকুণ্ঠ-দেবেন “যে মে তদ্বির্জবরান্ দুহতীশ্চদীমা ভূতাত্মরূপশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা” (ভাঃ ৩১৬১০) ইত্যাদি; যদ্বা, ভিন্নেন চক্ষুষাত্ত্ব বা দৃষ্টিস্ততোহুতি-বিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্বোৎকৃষ্ট-দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ।” (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অঙ্কচ্ছেদ)

অর্থাৎ—স্বধর্ম-পূর্বক অর্চনের অনুষ্ঠান করিলেও প্রাণিগণের প্রতি দয়া ব্যতীত অর্চন সিদ্ধ হয় না, এই অভিপ্রায়েই শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—‘যে ব্যক্তি নিজের ও পরের পৃথক্ পৃথক্ উদর বা দেহ আছে দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করে, বস্তুতঃ আমার অধিষ্ঠান-ভূত অপরকে আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও সে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের উদরাদিই পোষণ করে ; সেই ভেদ-দর্শনকারীর মৃত্যুরূপী হইয়া আমি নিদারুণ ভয় অর্থাৎ সংসার বিধান করিয়া থাকি ।’ এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিশ্চয়রূপে দেখাইতেছেন,—‘অতএব মিত্রভাবে অতেদ-দর্শন পূর্বক অর্থাৎ সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান ও মানের দ্বারা পূজা করা কর্তব্য । দুঃখিত প্রার্থীকে অর্থশক্তি দান এবং দানের সামর্থ্যভাবে তাহাদিগকে সম্মান করিতে হইবে ।’

অহঙ্কার করিয়া কাহাকেও অনাদর করা উচিত নহে । দৈন্ত্যই ভক্তের ভূষণ, আর “সর্বাদর-লক্ষণ”বৃত্ততাও ভক্তের একটি প্রধান লক্ষণ । শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।

ন তদ্বক্তেষু চাত্রেষু স তক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি শ্রীহরির প্রীতি-কামনায় কেবলমাত্র অর্চাবিগ্রহে শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, পরন্তু তদীয় ভক্ত বা অগ্র কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত । অর্থাৎ তাঁহার ভক্তি-প্রকৃতি বা ভক্তি-প্রবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র । তিনি সর্বাদরকারী শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে ক্রমশঃ সকলকে আদর করিতে শিখিয়া—সর্বত্র ভগবদধিষ্ঠান দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়া উত্তম হইবেন । শ্রীল চক্রবর্তিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, “অর্চায়াং প্রতিমায়াং হরয়ে হরিং প্রীণয়িতুং ন তদ্বক্তেষুপি অত্রেষু চ সুতরাং প্রাকৃতঃ প্রকৃতি-প্রারম্ভঃ অধুনৈব প্ররন্ধ-ভক্তিঃ শনৈরুত্তমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ।”

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুও ঐ শ্লোকের টীকায় “অর্চায়াং প্রতিমায়ামেব, ন তদ্বক্তেষু অত্রেষু চ সুতরাং ভগবৎ প্রেমাভাবাৎ, তক্তমাহাত্ম্যাজ্ঞানাভাবাৎ, সর্বাদরলক্ষণ-ভক্তগুণাহুদয়াচ্চ স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ অধুনৈব প্ররন্ধ-ভক্তিরিত্যর্থঃ ।”

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে ;—

অহঙ্কার ধর্ম এই কছু ভাল নহে ।

ব্রাহ্মণাদি কুকুর চণ্ডাল অন্ত করি ।

দণ্ডবৎ করিবেক বহুমাগ্ন করি ॥

এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম—সবারে প্রণতি ।

সেই ধর্ম-ধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৬, ২৮-২৯)

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে,—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।

জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৫)

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—“তস্মাদন্তেষামনাদরো ন কর্তব্যাস্তং-সম্বন্ধেনাদরীদিকঞ্চ কর্তব্যম্ । স্মাতজ্যেদ্যনোপাসনন্তু ধিক্ কৃতমিতি ।”

অতএব অত্যাগ প্রাণিসমূহের অনাদর কর্তব্য নহে বরং ভগবৎসম্বন্ধী জ্ঞানের আদরই কর্তব্য । আর স্বতন্ত্রভাবে অত্যাগ দেবতার বা প্রাণীর উপাসনাকে ধিকারই দেওয়া হইয়াছে । শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু ক্রমসন্দর্ভে আরও জানাইয়াছেন,—“কেবলং জীবকারণ্যং খলু বিঘ্নায় ভবতি ভরতবৎ । অতএব কেবল-ভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চনং ত্যক্তবতো ভরতশ্রান্তরায়ঃ ।”

মহারাজ শ্রীভরত দুষ্ট্যাজ্য রাজ্য, ঐশ্বর্য, স্ত্রী, পুত্র, গৃহস্থ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়া সতত ভগবদ্ভজনে রত ছিলেন । ঘটনাচক্রে হরিণশিশুর প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি হরিসেবা বিস্মৃত হইয়াছিলেন । ভগবৎসম্বন্ধে সকলকে আদর করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল ভূতানুকম্পা করিতে গিয়া শ্রীভরতের ঐ অবস্থা ঘটয়াছিল । কিন্তু মহারাজ শ্রীরস্তুদেব ভগবৎসম্বন্ধ-দৃষ্টিতে জীবগণকে সাহায্য করিয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি বৈষ্ণব-গৃহস্থ ছিলেন । তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অপরকে সর্বদা বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন । সময় সময় এমন হইত যে, ঐ নরপতি সমুদায় বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া সপরিারে উপবাসী থাকিতেন । এমন কি, জল মাত্র পান না করিয়াও তাঁহার মাসাধিক-কাল গত হইত ।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু রাজর্ষি ভরত ও মহারাজ রস্তুদেবের চরিত্রদ্বয় দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ভরত স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য, গৃহকর্ম—সমস্ত ত্যাগ করিয়াও কেবল জীবের দৈহিক কষ্ট নিবারণের জন্ত কারুণ্য প্রদর্শন করিতে ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন । আর মহারাজ রস্তুদেব সর্বজীকে বাস্তুদেব-সম্বন্ধী দর্শন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদ দ্বারা ভগবৎসেবকত্বে তাহাদের আত্মার কল্যাণ-বিধান এবং আত্মসম্বন্ধভাবে তাহাদের ব্যবহারিক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়া যান্না অতিক্রম করিয়াছিলেন । এমন কি, ব্রহ্মাদি দেবতার বাঞ্ছিত

পদ, যোগিগণের বাঞ্ছিত অনিমাди সিদ্ধি বা কৈবল্য-অর্থও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তিনি ঐ সকল বস্তুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া ভগবান্ বাহুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তিবিশিষ্ট ছিলেন এবং জীবগণকে ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুজ্ঞানে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ-বিধান করিবার জন্ত বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐক্লপ কার্য্য “বাহুদেব-সম্বন্ধ-সহিত” হওয়াতে ভক্তাপেক্ষে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর রাজর্ষি ভরতের কারুণ্যেচেষ্টা কেবল ভূতানুকম্পা মাত্র হওয়ায় তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যাহারা অতিথিসেবা করেন না, তাঁহাদের নরক-প্রাপ্তির কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু লিখিয়াছেন—

অতিথি দেখিয়া যেবা ক্রোধ করে মনে।

ভক্ষ্য-ভয়ে না করয়ে তাঁর সম্ভাষণে ॥

বজ্রতুণ্ড গৃধ-কাক - মহাভয়ঙ্করে।

টান দিয়া তার আঁখি বেড়িয়া উফাড়ে ॥

“যস্থিহ বা অতিথীনভ্যাগতান্ বা গৃহপতিরসকৃৎপগত-মহ্ম্যর্দিধক্ষুরিব পাপেন চক্ষুষা নিরীক্ষতে তশ্চ চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা গৃধ-কক্ষ-কাক-বটাদয়ঃ প্রসঙ্করুবলাদুৎপাটয়ন্তি।” (ভাঃ ৫।২৬।৩৫)

যে-সকল গৃহপতি ইহলোকে অতিথি (অজ্ঞাতপূর্ব্ব) ও অভ্যাগত (জ্ঞাতপূর্ব্ব) দেখিলে বারম্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাহাদিগকে দণ্ড করিতে উত্তত হয়, তাহারা “পর্য্যাবর্ত্তন” নামক নরকে পতিত হয়, তথায় বজ্রের আঘাতকঠিন চক্ষুবিশিষ্ট গৃধ, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষু সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।

হিতোপদেশেও লিখিত আছে,—

অতিথির্ষস্ত ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।

স তস্মৈ দুষ্কৃতিং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥

যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, সেই অতিথি উক্ত গৃহস্বামীকে নিজের দুষ্কৃতি বা পাপ প্রদান করিয়া তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে।

শ্রীনারায়ণ সনকাদি মুনিগণকে জয়-বিজয়ের অপরাধের কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণ, দুঃখবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী—আমার এই তিনটি শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে আমা হইতে ভেদ-বুদ্ধিতে দর্শন করে, আমার

প্রদত্ত অধিকারসকল দণ্ডধারী ষমের ক্রুদ্ধ গৃধ্রাকার সর্পতুল্য দূতগণ চঞ্চুদ্বারা পাপনষ্টচক্ষু সেই ব্যক্তিগণের চক্ষু সবলে উৎপাটন করিয়া থাকে।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীনারদ-লোমস-সংবাদে এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্রীলোমস-মুনি শ্রীনারদকে বলিতেছেন, আপনি স্বয়ং মূর্ত্য ব্রহ্মতেজ ; জলময় তীর্থসকল এবং মুন্ময়ী বা শিলাময়ী দেবতাগণ বহুকালেও যাহা পবিত্র করিতে সমর্থ নহেন, বৈষ্ণব-দর্শনমাত্রেই তাহা পবিত্র হয়। বৈষ্ণবের পাদস্পর্শমাত্রে তীর্থসকল সত্ত্ব পবিত্র হন এবং সসাগরা পৃথিবীও পবিত্র হইয়া থাকে। আপনার মত বৈষ্ণব-অতিথি আমার আশ্রমে সহসা উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্ত হইয়াছি। যিনি বৈষ্ণবের পূজা করেন, তাঁহার ত্রিংশের পূজা করা হয়। অতএব সমস্ত বস্তুর সহিত আমার আশ্রম আপনাকে নিবেদন করিলাম। আপনি কৃপাপূর্বক দুগ্ধ ও ফলাদি গ্রহণ করিয়া এখানেই বিশ্রাম করুন।

যাহার প্রতি অতিথি পরিতুষ্ট হন, শ্রীহরি স্বয়ং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হরি তুষ্ট হইলে গুরু তুষ্ট হন, গুরু তুষ্ট হইলে ত্রিজগৎ তুষ্ট হয়। গৃহে অতিথির অধিষ্ঠান হইলে, সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়। যিনি অতিথির পূজা না করেন, তাহার সমস্ত পুণ্য, অখিল ব্রত, তপস্শ, যজ্ঞ, সত্যধর্ম প্রভৃতি সেই অপূজিত অতিথির সহিত চলিয়া যায়। যাহার গৃহ হইতে অতিথি সংকৃত না হইয়া চলিয়া যান, তাহার পিতৃগণ, দেবতাসকল, পুণ্য, ধর্ম, ব্রত, ভক্ষ্য-ভোজ্য, সংযম, কীর্তি, লক্ষ্মী ও অতীষ্টদেব, গুরু,—ইহারা সকলেই নিরাশ হইয়া সেই পাপ-পুরুষকে পরিত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তি অতিথির অর্চনা না করে, সে স্ত্রী-ঘাতী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট, মিত্রদ্রোহীদিগের তুল্য। যাহারা সত্যের অপমান, উপকারীর অপকার, পাপকার্যের দ্বারা অর্থোপার্জন, অত্যাচার স্বকীয়, দান করিয়া তাহার অপহরণ, কণ্ঠা বিক্রয়, মিথ্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদান, ব্রাহ্মণের অর্থ অপহরণ এবং গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করে, যাহারা গো-আরোহণ, বহুযাজন, শূদ্রান্ন-ভোজন, শূদ্রের শ্রাদ্ধদিনে তদীয় অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও অতিথি-বিমুখকারীর সমান। শ্রীকৃষ্ণবিমুখ ব্রাহ্মণ, নরঘাতী, হিংস্র, গুরুভক্তিহীন, রোগার্ত, সত্য মিথ্যাবাদী, বিপ্রপত্নীগামী, মাতৃগামী শূদ্র অশ্বখবৃক্ষ-কর্তনকারী, পতিঘাতিনী নারী, পিতৃ-মাতৃঘাতী, শরণাগতের হস্তা, শিলা ও স্বর্ণাপহারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ইহারা অতিথি-বিমুখকারীর তুল্য।

—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিনী

ভক্তিশাস্ত্র-মহিমা (২)

দ্বিতীয় মহিমা কহি শুন স্বধীজন ।
 ‘ভক্তিশাস্ত্র’ বলি’ যাহা কহে মহাজন ॥
 যে শাস্ত্র পুরাণে বা হরিভক্তি নাই ।
 ব্রহ্মা নিজে কহিলেও নাহি শুনি তাই ॥
 ঋক্, যজুঃ, সামাদি; ভারত, পঞ্চরাত্র ।
 মূল রামায়ণ—হয় প্রামাণিক শাস্ত্র ॥
 এ’র অনুকূল যোঁ-যোঁ শাস্ত্র কহি তাঁ’রে ।
 অথ গ্রন্থ যত সব থাক্ ছাঁরখারে ॥
 সাম্প্রিক পুরাণে হরি-মহিমা সে কয় ।
 রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার গুণ গায় ॥
 তামসিকে চুর্গা, অগ্নি, শিব, বরুণ ।
 সংকীর্ণে কহিল, অশ্রু দেব-পিতৃগুণ ॥
 অগ্রাগ্র পুরাণ তওদিন শোভা পায় ।
 যতদিন ভাগবত কেহ নাহি গায় ॥
 গঙ্গা, শিব, হরি যথা নিজ-গণে বড় ।
 সেইমত ভাগবত জানি সার দৃঢ় ॥
 বৈষ্ণবের প্রিয় সদা এই ভাগবত ।
 বিমল-ভক্তি যাতে কহে একমত ॥
 সর্ববেদ-সার হরি ভাগবতে কয় ।
 শুনিলে অপরে রতি আর নাহি রয় ॥
 বৈষ্ণব-শাস্ত্র যাহার গৃহে পূজা হয় ।
 সর্বদেব বন্ধু তা’র, পুরাণেতে কয় ॥
 বৈষ্ণব-শাস্ত্র যা’রা শুনে, পাঠ করে ।
 হরি-দয়া লভে তা’রা এ ধরা-মাঝারে ॥

সংশয় সমাধান

যদি বল অগ্র শাস্ত্র তবে কেন বাছে ।
 ইহার উত্তর পদ্মপুরাণে আছে ॥

এক সময় পার্শ্বতী পুছে মহাদেবে ।
 বল নাথ! পাষণ্ডীর কি লক্ষণ ভবে ॥
 তাহার উত্তরে শিব কহে পার্শ্বতীরে ।
 অজ্ঞান-মোহিত যা’রা অবনী-ভিতরে ॥
 অশ্রুদেবে বড় বলে নারায়ণে ছাড়ি ।
 যমদণ্ডী পাষণ্ডী সে, শিরে তার বাড়ি ॥
 অবৈদিক চিহ্ন—ভস্ম কপালে ধারণ ।
 জটা, বকল-বেশ গৃহীর বারণ ॥
 এইসব ধরে যে, সেই ত’ পাষণ্ড ।
 বিষ্ণু-সম অশ্রুদেব, বলে সেই ভণ্ড ॥
 শুনিয়া পার্শ্বতী বলে ওহে স্বরবর ।
 ইহাতে সংশয় বড় দাওহে উত্তর ॥
 কপালে ভস্ম-ধারণ যদি হীন কাজ ।
 ধর কেন তবে তুমি দেবের সমাজ ॥
 শাস্ত্র উত্তরে বলে শুন দেবি তবে ।
 অতি-গুহকথা না জানে কেউ ভবে ॥
 আমার অভিন্ন তুমি তাই এ সংশয় ।
 দূর করিতেছি এবে জানিহ নিশ্চয় ॥
 মহাদৈত্য ‘নমুচি’ আদি এককালে ।
 ঈশ-উপাসনা করি’ লভি মহাবলে ॥
 ইন্দ্রাদি দেবতা সবে করি’ পরাজয় ।
 স্বর্গ হেন পুণ্যলোক হ’তে বিতাড়য় ॥
 দেবগণ বিষ্ণুপদে লইয়া শরণ ।
 বলিতে লাগিল—ওহে বিপদ-মোচন ॥
 অশ্রুরের অত্যাচার আর নাহি সহে ।
 করহ সংহার তুমি এই সব গ্রাহে ॥
 শুনি’ দৈবদৈব হরি, অজ্ঞেয় অহরে ।
 বিনাশের লাগি আজ্ঞা করিল আমারে ॥

বিষ্ণু কহেন—

ওহে আশুতোষ ! মনে নাহি পাও ব্যথা ।
 অম্বর-মোহন লাগি' শুন মোর কথা ॥
 নাস্তিকাচরণ ধর্ম, তামস-পুরাণ ।
 রচনা করহ তুমি আশ্বর বিধান ॥
 অন্যভক্ত ব্রাহ্মণ কণাদ, পৌতম ।
 শক্তি উপমহ্য, জৈমিনী ব্যুৎক্রম ॥
 কপিল, দুর্কাসা, মুকণ্ড, বৃহস্পতি ।
 ভার্গব, ভ্রমদগ্নি আদি দশ জ্ঞাতি ॥
 ইহাদের মতি সব তম-ভাবে আনি' ।
 তামস-শাস্ত্রে কর প্রচারের ধনি ॥
 নিজে তুমি ভস্ম-চর্ম করিয়া ধারণ ।
 আজ হ'তে ত্রিজগতে করহ ভ্রমণ ॥
 কঙ্কাল, পাষণ্ড আর মহাশৈব আদি ।
 পাপপত-শাস্ত্র সব প্রচারহ যদি ॥
 বেদ-বহিভূত-বাদে সব মুগ্ধ হঞা ।
 ঘুরিবে, অধম দ্বিজ ঐ চিহ্ন ধরিয়া ॥
 নিজে বড় বলি' তুমি জানাবে সবায় ।
 শীঘ্রই ভুলিবে মোরে, তোমার মায়ায় ॥
 বধিতে সহজ হ'বে তখনি তা'-সবে ।
 তোমার পূজন প্রথা হ'বে বিশ্বে তবে ॥

শিব-উক্তি—

অপরূপ কথা শুনি' অতি দুঃখে মরি ।
 কহিলাম হরিপদে নমস্কার করি' ॥
 নিষ্ঠুর আদেশ তব কেমনে পালিব ।
 লাজ্যলেও অপরাধ সহিতে মারিব ॥
 শুনি' মোর মন-দুঃখ বিষ্ণু পুনঃ বলে—
 “দেব-হিত লাগি' আজ্ঞা পাল' কুতূহলে ॥
 অপরাধ নাশিবার শুনহ উপায় ।
 হৃদয়ে ধরিও ধ্যান সদাই আমায় ॥

হাজার শ্রীনাম মোর, মন্ত্র বড়ক্ষর ।
 জপিলে ঘুচিবে দোষ রহিবে অমর ॥”
 জনিয়া তখন আমি আদেশ-পালনে ।
 যতন করিহু যত অম্বর-মোহনে ॥
 আমার প্রভাবে তা'রা হইল দুর্কল ।
 দেবগণ বধে তবে অম্বর-সকল ॥
 মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী যাহা হয় ।
 উপাসক জনে শুধু স্বর্গ-ফল কয় ॥
 শুন দেবি মোর ‘মত’ আচরিবে যা'রা ॥
 ধরম-করমহীন নারকী সে তা'রা ॥
 হরি-আজ্ঞামতে এই জগৎ-ভিতরে ।
 “হেন আচরণ করি”—কহিহু তোমাতে ॥

পার্বতীর উক্তি—

ক্ষান্ত হই' তবে দেবী পুছে পুনরায় ।
 হেন শাস্ত্রাধম কিবা বলহে আমায় ॥

শিব-উক্তি—

হে দেবী মোহন-শাস্ত্র শুন এবে গাই
 স্মরণেও মানা সব জ্ঞানীর দোহাই ॥
 আগে পাশুপত আদি শাস্ত্র কহিয়া ।
 পাছে কহিয়াছি অন্ত দ্বিজগণ দিয়া ॥
 কণাদের বৈশেষিক, শ্রায় গোতমের ।
 বৃহস্পতির চার্বাক, সাংখ্য কপিলের ॥
 বুদ্ধ হ'তে বৌদ্ধ-শাস্ত্র, আমি মায়্যবাদ ।
 কহিলাম যত কিছু ভুবনে প্রমাদ ॥
 বেদবাণী-হীন অর্থ সমাজে প্রকাশি' ।
 কর্মত্যাগ বিধর্ষে, কহি পাপরাশি ॥
 দেখরে জীবেতে কত কিছু নাহি ভেদ ।
 ব্রহ্ম নিশ্চ'ণ বলি' বিচারিহু বেদ ॥
 মায়্যবাদ হেন শাস্ত্র আমারি সে জান ।
 প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত সকলি নির্মাণ ॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

আনন্দপুর, (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীসনাতনের অসুস্থ্যভিনয় ও গৃহে ভাগবত অনুশীলন.

শ্রীরূপ তীব্র বিরহোৎকর্ষায় বৃন্দাবন অভিমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের অশেষধে গোড়দেশ পরিত্যাগ করিলে পর, শ্রীসনাতন উদ্বিগ্নচিত্তে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন।

তিনি বিচার করিলেন,—বিষয়ী রাজা আমাকে অত্যন্ত প্রীতি করে, কোনও প্রকারে তাহার অপ্রীতি-ভাজন হইতে পারিলে আমি উহার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি অসুস্থের অভিনয় করিলে,—গৃহে বিশ-ত্রিশজন শাস্ত্র-নিপুণ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলনে রত হইলেন। বাদসাহ সনাতনের অসুস্থ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, তিনি চিকিৎসায় নিপুণ কতিপয় বৈজ্ঞানিক সনাতনের নিকট পাঠাইলেন; বৈজ্ঞানিক সনাতনের অসুস্থতার কোন কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন, এদিকে সনাতনের অবর্ত্তমানে রাষ্ট্র-নীতি ও শাসন-পরিচালনাদি কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, বাদসাহ স্বয়ং প্রকৃত ব্যাপার অসুস্থ্যস্থানের জ্ঞান হঠাৎ একদিন শ্রীসনাতনের ভাগবত-সভায় উপস্থিত হইলেন; শ্রীসনাতনও উখিত হইয়া রাজাকে বসিবার আসন দিলেন।

রাজা বলিলেন,—আমার যাবতীয় কার্য্য তোমাকে লইয়া, তুমি সে-সব বিষয়ে উদাসীন হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলে ?

“মোর যত কার্য্য-কাম সব কৈলা নাশ।

কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥”

সনাতন কহে,—

“নহে আমা হৈতে কাম।

আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥”

কথিত আছে, সনাতন গোস্বামীকে বাদসাহ নিজ ‘কনিষ্ঠ-ভ্রাতা’র স্থায় মনে করিতেন। যখন সনাতন কৰ্ম্ম-ত্যাগের দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন হুসেনসাহ প্রণয়-রোষে বলিয়াছিলেন,—

“আমি তোমার বড়ভাই, আমি রাজ্য-পালন-বিষয়ে অনিপুণ; সৈন্ত-সামন্ত লইয়া আমি কেবল বুদ্ধাদির দ্বারা দেশ-বিদেশ লুটিয়া বেড়াই; তাহাতে আবার জাতিতে যবন হওয়ান গোড়-চাক্লার মধ্যে যুগয়া করিয়া বহু জীব-পণ্ডর প্রাণ

নাশ করি, এইমাত্র । আমার ভরসাই তুমি ; তোমার বড়ভাই আমি যখন দস্তা-
ব্যবহারে জীব-নাশ কার্যে রহিলাম, আর ছোটভাই তুমিও যখন সমস্ত কার্য
পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে, তখন রাজকার্য ক্রুরূপে চলিবে ?

সনাতন কহে,—তুমি স্বতন্ত্র গোড়েশ্বর ।

যে যেই দোষ করে, দেহ ফল তার ॥

এই বাক্যে সনাতনের গুঢ় রহস্য আছে,—তুমি গোড়েশ্বর, স্বতন্ত্র রাজা—
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ; যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাহাকে তাহার ফল দান কর ;
অর্থাৎ—রাজা নিজে দণ্ড বৎ কার্য করেন, অতএব তিনি তাহার ফল গ্রহণ করেন,
এবং আমি মন্ত্রী, রাজ-কার্যে অবহেলা-হেতু আমার কর্মচ্যুতি-ফল হউক ।—

এত শুনি' গোড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা ।

পলাইবে বলি' সনাতনেরে বান্ধিলা ॥

গোড়েশ্বর সনাতনের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কারাগারে
নিষ্ক্ষেপ করিলেন—যদি তাঁহার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয় ।

আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেনসাহ ১৪২০ শকাব্দা হইতে ১৪৪৩ শকাব্দা পর্যন্ত
গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৪২৪ শকাব্দায় হুসেনসাহ উৎকল-
বিজয়ে অভিযান করেন । স্মরণ্য এই সময়েই বাদসাহ শ্রীসনাতনের ভাগবত-
সভায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন ।

বন্দীশালে সনাতনের অবস্থা এবং তথা হইতে মুক্তির কৌশল

রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে ।
শ্রীরূপে করুণা করি' ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো-অধমে নহিল স্মরণে ॥

মোর কর্ম-দড়ি-কাঁন্দে, মোর হাতে-গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি' ।

আপন করুণা-কাঁসে, দূঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ নিকটে লহ তুলি' ॥

পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে জুড়িল ব্যাধ বাণ ।

কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িলা বিষম প্রাকে,
তুমি নাথ কর পরিত্রাণ ॥

জগাই মাধাই হেলে, বাহুদেব, অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার ।

করুণা আভাস করি' সনাতনে পদ-তরী,
দেহ যেন ঘোষণে সংসার ॥

এ দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্ম জন ।

হেনকালে অতঃপানে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন ॥

রূপের লিখন পেয়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরান্ন ধ্যান ।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ
পত্র পেয়ে করিলা পয়ান ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী বন্দীশালে আছেন, ইতিমধ্যে শ্রীরূপের পত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বত্বর শ্রীচৈতন্য-চরণ প্রাপ্তির ভাষ্য উপায় সৃষ্টি করিলেন । তিনি যবন কারা-রক্ষককে বহু প্রশংসা-বাক্যে বন্দী-দশা হইতে নিম্নোচন করিয়া দিব্যর জগৎ যথেষ্ট অমুরোধ জানাইলেন, এবং পূর্বকৃত উপকারের কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার সমুখে পাঁচসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া বলিলেন,—তোমার পুণ্য ও অর্থ দুইই হইবে, আমাকে ছাড়িয়া দাও ; ইহাতেও কারারক্ষক রাজভয়ে স্বীকৃত হইল না দেখিয়া তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্তির জগৎ অনেক পরামর্শ ও প্রবোধ দিলেন । সনাতন বলিলেন, তুমি রাজভয় করিও না ;—

‘তাঁহাকে কহিও, সেহ বাহুকৃত্যে গেল ।

গঙ্গার নিকটে গঙ্গা দেখি’ বাপ দিল ॥

অনেক দেখিল তার লাগ্ না পাইল ।

দাড়ুকা সহিত ডুবি’ কাহা বহি গেল ॥

কিছু ভয় নাহি, আমি এ দেশে না র’ব ।

দরবেশ হঞা আমি মক্কাতে যাইব ॥”

‘তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা ।

সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥” (চৈঃ চঃ)

সনাতন যবন-কারারক্ষকের নিকট সাত-সহস্র মুদ্রা রাখি করিলেন ; মুদ্রা দেখিয়া লোভী যবনের মতি পরিবর্তিত হইল ; রাতে দাড়ুকা কাটিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিল । মহাচতুর-ধিরোমণি শ্রীসনাতন শুদ্ধ-হরিভজনার্থে আপাতঃ দৃষ্টিতে স্নানীতি-বিগর্হিত কার্য্য ও মিথ্যাবাক্যকে অমুকুল-কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন ; স্তবরাং তাহাতে তাঁহার নীতি-বিগর্হিত কার্য্যের কোনও প্রকাশ ঘোষণা স্পর্শ করে নাই,—ভগবদ্ভক্তের উহাই সত্য-ধর্ম্ম ।

“মন্নিমিস্তে কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃত্য ধর্মোহপি পাপং শ্রান্নংপ্রভাবতঃ ॥” (সাত্ত্বত-শাস্ত্র)

ভগবান্ বলিতেছেন,—আমার নিমিত্ত আপাত-দৃষ্টিতে যদি কোন পাপও কৃত হয়, তথাপি উহাই ধর্ম-রূপে পরিগণিত ; আমাকে অনাদরপূর্বক ধর্মের অভিনয়ও আমার প্রভাব-বশতঃ পাপেই পরিণত হয় । নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আপাত-দৃষ্টিতে যে বিষয়কার্য্য, তাহা মায়াবদ্ধ জীবের ত্রায় নহে । মায়াবদ্ধ জীব মোহবশতঃ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু পরমমুক্ত-শিরোমণি গৌর-পার্ষদ উক্ত গোস্বামীদ্বয় মায়াদোষ-সংস্পর্শ-শূন্যবস্থাতেই নির্লিপ্তভাবে রাজকার্য্যাদি পরিচালনা করিয়াছেন, এবং তাহাতে যে তাঁহাদের কোনপ্রকার আসক্তি নাই—সেই বিস্তৃত আদর্শ জগতে প্রদর্শনের জন্ত নব-যৌবনাবস্থাতেই বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে ধারণ করিয়া “বিষয়গন্ধ ধ্বংসকৃতিঃ” ইত্যাদি চৈতন্যচন্দ্রামৃতের উক্ত বিচার আচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সমগ্র বিষয়-সংঘর্ষ চিরন্তনে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; মায়া তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই । (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজ্ঞানাপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

তটস্থ-ধর্মবশতঃ জীব মায়া-কবলিত

তটস্থ-ধর্মবশতঃ জীব ভগবদ্ দাস্তাভাবে নিকটস্থ মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া পড়িয়াছে । যে-শক্তি চিদচিদ উভয় জগতে বিচরণের উপযোগী, তাহারই নাম ‘তটস্থা’ । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত আছে,—

‘নিত্যবদ্ধ’—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ ।

নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥

সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ।

আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি’ মারে ॥

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাখি খায় ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈষ্ণৱ পায় ॥

তাঁর উপদেশ মজে পিশাচী পলায় ।

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥ (টৈ: চ: ম: ২২।১২-১৫)

জীব সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন,—

বলাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ ।

তাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তরায় কল্পতে ॥ (খেতাখ: ৫।২)

তাৎপর্য এই যে, জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম অপ্রাকৃত তত্ত্ব। জড়ীয় কেশাণ্ডকে শতভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগকে শতভাগ করিলে জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। জীব এত ক্ষুদ্র হইলেও অপ্রাকৃত বস্তু, কিন্তু অনাত্ম-ধর্মের যোগ্য। জীবের স্থলশরীরে জী, পুরুষ ও নপুংসক-ভাব লক্ষিত হয়। কর্মফলে জীব যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি অবস্থান করেন। বস্তুতঃ জীব আত্ম-বস্তু। বাহ্যদর্শনে পশু-পক্ষী, জী-পুরুষ হইলেও, জড়দেহের পরিচয় তাহার পক্ষে যথার্থ পরিচয় নয়। সর্বত্র জীবের নিজ-স্বরূপের পরিচয় আবশ্যক; সেইজন্তই মহাপ্রভুর নিকট সনাতন গোস্বামিপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“কে আমি, কেন মোরে জ্বারে তাপত্রয়।” প্রথমে ‘কে আমি’—ইহা সাব্যস্ত না হইলে তাহার ধর্ম বা কর্তব্য সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

জীব স্বীয় কর্মফলে স্থল ও সূক্ষ্ম অনেক রূপ প্রাপ্ত হন। এবস্তূত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসার-গহন মধ্যে পতিত-অবস্থায় কদাচিৎ সাধুসদ্বলে জ্ঞাতশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তিবৃত্তির দ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। জীবের বদ্ধ-অবস্থার ক্রম এইরূপে সূত্রিত হইয়াছে। পরমেশ্বর হইতে বিমুক্ত হইয়াই জীবগণের দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং সেই কারণেই তাহাদের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। স্বরূপ-ভ্রমবশতঃ তাহাদিগকে ভয়ানক কর্মবদ্ধ গ্রাস করিয়াছে। স্থল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার-ক্লেশের কারণ। জীব চিদন্তঃ; তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থশক্তি-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া, চিচ্ছগৎ ও মায়িক জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন।

ভগবদ্-জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া বাহারা চিদভিলাষী হইলেন, তাঁহারা নিত্য ভগবদ্-উন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-পার্বদরূপে চিচ্ছগতে নীত হইলেন। আর বাহারা স্বেচ্ছাক্রমে অপাশ্রিতা মায়াতে মোহিত হইয়া তাহার ক্রিয়ায় লোভ করিলেন, তাহারা মায়া-কর্তৃক মায়িক জগতে আকৃষ্ট হইয়া মায়াধীশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার-কর্তৃক জড়জগতে নিষ্কিপ্ত হইলেন। ইহা কেবল তাহাদের নিত্য ভগবদ্-বহিঃসুখতার ফল। মায়া-মধ্যগত হইবামাত্র মায়াবৃত্তি অবিজ্ঞা তাহাদিগকে লিপ্ত করিল। অবিজ্ঞা-লিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করত তাহারা কর্মচক্রে পড়িলেন। এস্থলে উপনিষদের মন্ত্রটি আলোচ্য—

হা সুপর্ণা সমুজ্জা সখান্না সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে ।

তয়োৱতঃ পিপ্ললং সাধত্যনন্নম্নোহভিচাক্ষীতি ॥ (খৈতামঃ ৪।৬)

কীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য-জগৎরূপ অশ্বথবৃক্ষে দুই সখার তায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব—স্বীয় কর্ম্মাভ্যাসে পিঙ্গল সৈবন করিতে লাগিলেন। অপরজন অর্থাৎ পরমাত্মা—ভোগ না করিয়া সাক্ষীরূপে দেখিতে লাগিলেন। উক্ত উপনিষদে আরও দেখা যায়, “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহমানঃ” অর্থাৎ সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়াসহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।

শ্রীভাগবতে (১১।২।৩৭) লিখিয়াছেন—“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্রাদীশাদপেতস্ত বিপৰ্য্যয়োহস্বতিঃ।” অর্থাৎ দৈশজ্ঞান হইতে পরাজুথ হইয়া দ্বিতীয় অবিজ্ঞা মায়িক বস্তুর অভিনিবেশহেতু জীবের সংসার-ভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহা হইতেই বিপৰ্য্যয় (দেহে আত্মবুদ্ধি) ও অস্বতি (স্বরূপ-ভ্রম) হইয়াছে। বিপৰ্য্যয়-ভাবই স্ব-স্বরূপভ্রম। ইহাই অবিজ্ঞা-সংসর্গের প্রথম ফল। কৃষ্ণদাসের বিস্মৃতি-হেতুই চিৎ-স্বরূপ তুলিয়া জড়গত স্বরূপে ‘অহম্’-অভিমান হইয়াছে। অবিজ্ঞা মায়া জীবের চিৎস্বরূপের উপর লিঙ্গ অর্থাৎ শূন্য ও তদুপরি স্থল—এই দুইটা আবরণ প্রদান করিলেন। মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন—এই চারিটা শূন্যজড়-কর্তৃক লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্য-রূপ ছয় রিপুণের অবস্থান। ইহা হইতে জীবের কখনও পুণ্য ও কখনও পাপ-প্রভৃতি হইয়া থাকে। লিঙ্গশরীরে যে আমিশ্বারোপ, তদ্বারা জীবের শুদ্ধ-চিদহঙ্কার আচ্ছাদিত হইয়া গেল। জড়ীয় লিঙ্গদেহের ভোগায়তন সিদ্ধির জন্ত জীবের শূন্যদেহের উদয়। চক্ষু, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র প্রভৃতি সপ্তর্ধাতু-নির্ম্মিত স্থলদেহ হইল এবং তাহাতে অস্তিস্থ, পরিণাম, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ বিকার আরোপিত হইল। স্থলদেহ লাভ করিয়া জীবের জড়াহঙ্কার ঘনীভূত হইল, তখন স্থলদেহকে ‘আমি’ বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবশ্বকার স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইতে স্থলদেহে অত্যাশক্তি-হেতু বিবিধ কর্ম্ম, অকর্ম্ম, ষিকর্ম্ম অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়েন; ফলে পুণ্য ও পাপরূপ বন্ধন জীবকে দৃঢ়রূপে মায়াবদ্ধ করিয়া ফেলিল। স্থল-লিঙ্গ-দেহে অনেক অনর্থ ঘটে। যথা, বৃহদারণ্যকে—“স বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকায়ী সাধুভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।” (৪।৪।৫ ব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ সেই বা এই (স্থল-লিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু-আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা

দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন। পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপকর্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতে (৩৩.১৭),—

স দহমান-সর্কাক্ষ এষামুদ্বহনাদিনা ।

করোত্যবিরতং মূঢ়ো ছুরিতানি ছুরাশয়ঃ ॥

কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই ছুরাশয় মূঢ়ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে ; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

উক্ত বচনদ্বয়ের স্পষ্টার্থ ও তাৎপর্য এই যে, জীব স্থূল-লিঙ্গাভিমাণে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুণ্য ও পাপদ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন। ভগবৎসন্দর্ভ-ধৃত সর্কাক্ষ-মূঢ়বাক্য—

হ্লাদিগ্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।

স্বাবিভা-সংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥

সচ্চিদানন্দ-পরমেশ্বর হ্লাদিনী এবং সন্নিঃ-শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত বিগ্রহ। জীব নিজ-অবিভা-আচ্ছাদিত হইয়া সংসারে স্বাবর্তী ক্লেশ ভোগ করে।

তাৎপর্য এই যে, মায়াশক্তির বিত্তা ও অবিত্তা দুই বৃত্তি। বিত্তাবৃত্তি মায়ার অকপট কৃপা-জাত। অবিত্তাবৃত্তি মায়ার অপরাধ-দণ্ডান শক্তিবিশেষ। সেই অবিত্তার আবার দুইটী বৃত্তি, আবরণাত্মিকা বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকা। জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানকে আবরণ করিয়া আবরণাত্মিকা বৃত্তি বর্তমান থাকে। বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি অতঃপ্রকার জ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া জীবকে অজ্ঞান করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বদ্ধজীবের অবস্থা-বর্ণনে কারিকায় বলিয়াছেন—

“সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসত্ত্বাঃ ।

ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যান্নিগুণো জীব এব হি ॥

চেতনঃ কৃষ্ণদাসোহহমিতিজ্ঞানে গতে পরে ।

প্রকৃতেগুণসংযোগাৎ কর্মবন্ধোহশ্রু সিধ্যতি ॥

কর্মচক্র গতশ্রান্ত স্তুত্বদুঃখাদিকং ভবেৎ ।

ষড়্গুণাক্ষি নিমগ্নশ্র স্থূললিঙ্গ ব্যবস্থিতঃ ॥”

“বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি অপরা জড় প্রকৃতির গুণ। জীব স্বভাবতঃ নিগুণ। ক্ষুদ্রতাবশতঃ ভগবৎদৈমুখ্য দ্বারা যখন দুর্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল প্রদল হইয়া তাঁহাকে পরাভব করিল। সুতরাং “আমি চেতন পদার্থ কৃষ্ণদাস”—এরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে প্রকৃতিগুণ-সংযোগবশতঃ জীবের কর্মবন্ধ সিদ্ধ হইল। কর্মচক্রগত জীবের স্থূল-শরীর ও লিঙ্গশরীর দ্বারা ষড়্গুণসমুদ্রে পতন ও ক্রমশঃ নিমগ্নক্রমে সমগ্ন

সুখ-দুঃখাদি উদয় হয়। এই অবস্থার নামই শুদ্ধ জীবের মায়া-কবলিত দুরবস্থা। ইহা জীবের ভাব বা গঠনসিদ্ধ তটস্থ-ধর্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব শুদ্ধ-বস্তু, মায়াবৃত্তি অবিজ্ঞা তাঁহার উপাধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক-রূপ তাপত্রয় ঐ উপাধির ফল।”

শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (সেবা-সুহৃদ)

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

এই বৎসর গত ২৮শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট, বুধবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অল্পগত বাবতীয় মঠ-মন্দিরে ও প্রতি-ভক্তগৃহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত উপবাসমুখে সর্বসতোভাবে পালিত হইয়াছে। এইবার অষ্টমী অক্ষণোদয়-বিদ্যা না হওয়ায় এবং পরতিথি নবমীযুক্ত হওয়ায়, জন্মাষ্টমীর ব্রত এবং উপবাস ঐদিনই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এবং এই বিচার অবলম্বন করিয়া এই বৎসর সকলেই এই দিবসেই ব্রত-উপবাসাদি করিয়াছেন। সুখের বিষয়, গোস্বামীবর্গের মধ্যে এবৎসর কোন মতভেদ উপস্থিত হয় নাই।

সমিতির প্রধান প্রচারকেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে এইবৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত জন্মাষ্টমী-ব্রত পালিত হয়। মঠাশ্রিত ও তদল্পগত গৃহী ও ত্যাগী ভক্তগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়-কাল রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরঙ্কুশ উপবাসী থাকিয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনমুখে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। এইদিন প্রত্যুষে ৫।০ টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ১ম অধ্যায় হইতে পারায়ণ আরম্ভ হয়। এই ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ শেষ করিতে দিবারাত্র অতিবাহিত হইয়া পরদিবস সকাল ৬টায় উহার সমাপ্তি-হয়। বলা বাহুল্য, ১০ম স্কন্ধের বঙ্গানুবাদই সর্বসময়ে পঠিত হইয়াছিল। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বিশেষভাবে পঠিত হয় এবং ভোগরাগ, অর্চন, পূজা-পদ্ধতি বাবতীয় কার্য্যই অল্পভাবে সূক্ষ্ম হইতে থাকে। শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ের মূল শ্লোকগুলি তাঁহার স্বভাব-সুশ্রুত স্মৃতির কণ্ঠে পাঠ করেন। তৎপরে সমিতির আচার্য্য ও সভাপতি-মহারাজ রূপাপূর্ব্বক উপস্থিত মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। তাহার মধ্যে দু'একটি কথা নিম্নে সংগৃহীত হইয়াছে—

আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

‘জন্ম’ ও ‘আবির্ভাব’ এই দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা আজ জন্মাষ্টমী পালন করিতেছি, আবির্ভাবাষ্টমী নহে। ‘আবির্ভাব’-শব্দটি গৌরবময়, ‘জন্ম’-শব্দটি মাধুর্য্যপূর্ণ। শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব-তিথি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির ব্রত-উদ্‌যাপনই আমাদের অত্যাধিকার কৃত্য। প্রতি জন্মাষ্টমীতেই বসুদেব-তনয় বাসুদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা আমরা বাসুদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করিতেছি—রূপ মনে করা উচিত নয়। আমাদের সহিত কৃষ্ণেরই সম্বন্ধ হইয়াছে। তাকে কৃষ্ণেরই অষ্ট আর একটি নাম—বাসুদেব। যেহেতু নন্দ-মহারাজেরই ‘বাসুদেব’ আখ্যা আছে। মা-যশোদাকে ‘দেবকী’ বলা হয়। তজ্জন্ম বাসুদেব বলিলেই আমরা ‘নন্দভ্রাতৃ’ কৃষ্ণকেই বুঝি। বাসুদেব বসুদেবের ভ্রাতৃ নহেন; তিনি দেব দীর কর্ণে দীক্ষামন্ত্র প্রদানের দ্বারা ভগবানের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলেন। চতুর্ভুজ বাসুদেব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, কিরীট-কুন্তল-কুণ্ডল, বেশভূষা-অলঙ্কারাদি-সম্পন্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ না করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তজ্জন্মই বাসুদেবের আবির্ভাব—জন্ম নহে। অনাবশ্যকহেতু বাসুদেবের নাড়ীচ্ছেদাদি জাতকর্ম্ম হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণ যশোমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণের এই জন্মলীলারই উপাসক। “কৃষ্ণের ষতক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।” নরলীলায় ‘জন্ম’ই প্রধান—‘আবির্ভাব’ গুপ্ত। স্মরণ্য বাসুদেবের আবির্ভাব অপেক্ষা কৃষ্ণের জন্মের মাধুর্য্য এত অধিক যে, আবির্ভাবাষ্টমী না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ‘জন্মাষ্টমী’ বলিয়াই নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার মাধুর্য্যময় পার্থক্য কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ বৈষ্ণববর্গই অনুধাবন করিতে সমর্থ। অতএব, অষ্ট জন্মাষ্টমী-বাসরে আমাদের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগত্যই কাঙ্ক্ষণের নিকট প্রার্থনীয়।

—প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউজ্জ্বল

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১২২ পৃষ্ঠার পর)

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা

২রা নভেম্বর, ১৫ই কার্তিক, শুক্রবার—প্রত্যুষে ৫টাটার সময় যাত্রীগণ “জয় গিরিরাজ” শব্দে গগনমণ্ডল মুখরিত করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে

উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্তন করিতে করিতে গিরি-গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় বহির্গত হন। গোবর্দ্ধন-গ্রাম হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে চন্দ্রসরোবর ও তৎপূর্বে পরাসোলি-গ্রাম অবস্থিত। এই “পরাসোলি”-গ্রাম শ্রীকৃষ্ণের বসন্তকালীন মহী-রাসস্থলী। রাসলীলা-কালে চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নামানুসারে ‘চন্দ্র-সরোবর’ হইয়াছে। যাত্রিগণ এস্থান দর্শন করত ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অবস্থিত পৈঠগ্রামে উপস্থিত হইয়া ‘চতুর্ভূজ নারায়ণ’ ও নারায়ণ-সরোবর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গোপীগণকে এস্থলে চতুর্ভূজ নারায়ণ-রূপ প্রদর্শন করেন। এবং শ্রীরাধা-দর্শনে চতুর্ভূজ রক্ষা করিতে না পারিয়া পুনঃ দ্বিভূজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর-মূর্তিতে প্রকাশিত হন। এস্থলে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমার নিকট শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-চেষ্টা পরাভূত হয় এবং তিনি নিত্য মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীনমদনরূপে নিজস্ব-স্বরূপ শ্রীরাধার নিকট প্রকট করিতে বাধ্য হন।

এস্থান হইতে যাত্রিগণ ২১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদেবর বিশ্রামস্থান, শ্রীগোপালদেবের প্রকট ও অন্নকুট-পূজার স্থান দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণের পর ইন্দ্র নিজকৃত অপরাধ ফালনের নিমিত্ত সর্ব্বতীর্থের জল দ্বারা এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করেন। এই গোবিন্দকুণ্ডের তীরেই শ্রীগোপালদেব দুগ্ধদানছলে গোপ-বালকরূপে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন। প্রাপ্ত হইয়া পুরী গোস্বামী এই কুণ্ডের উত্তরে মৃত্তিকাচ্ছাদিত গোপালের অভিষেকাদি ও মহাসমারোহে অন্নকুট মহোৎসব করিয়াছিলেন। কিয়দূর অগ্রসর হইয়া যাত্রিগণ অশ্বরী কুণ্ড, পুছুরি (গোবর্দ্ধনের পুচ্ছদেশ), সুরভি কুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন-ধারণস্থান, গোপাল পুরা বা যতিপুরায় শ্রীনাথজীর মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধন-মুখারবিন্দ প্রভৃতি পরিক্রমানুখে দর্শন করিয়া দানঘাটা হইয়া যথাসময়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাকালে যে-যে স্থানসমূহের পর পর দর্শন হইয়া থাকে, পাঠকবর্গের সুবিধার্থ নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :— কুসুম-সরোবর, তৎপশ্চিমে উদ্ধবকুণ্ড, নারদকুণ্ড, রত্নসিংহাসন, গোয়ালপুকুর, বিহারকুণ্ড, কিল্ললকুণ্ড, মানসীগঙ্গা, গোবর্দ্ধন-গ্রাম, ঋণমোচন ও পাপমোচন কুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজ বেদী, চন্দ্রসরোবর, পরাসোলি, বলরামকুণ্ড, বলদেবজীর-রাসমণ্ডল, শৃঙ্গারমন্দির, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, পৈঠগ্রাম, নারায়ণ সরোবর,

মানিরোর গ্রাম, সৰ্ব্বধনকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নীপকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্র-
পুরীর বিশ্রামস্থান, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোপাল বা শ্রীনাথজীর প্রকটস্থান,
মুকুট পূজার স্থান, শক্রতীর্থ, শ্রীনৃসিংহদেব, অঙ্গরাকুণ্ড, পুছরি, রাঘবপণ্ডিতের
গুহা, মুকুটচিহ্ন, স্রবভিকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণস্থান, হরজীকুণ্ড,
গোপালপুরা বা যতিপুরা, শ্রীনাথজীর মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধন-মুখারবিন্দ, বল্লভা-
চার্যের বৈঠক, বিলুছুকুণ্ড, জান-অজ্ঞানবৃক্ষ, হনুমান্জী, দানীরায়ের মন্দির,
দানঘাটী, শ্যামাসলিলা, চক্রেখর মহাদেব, সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটার,
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মন্দির, মুকুট-চিহ্ন, শ্রীহরিদেব, শ্রীমানসীদেবীর মন্দির,
শ্রীব্রহ্মকুণ্ড, শ্রীহনুমান্ প্রভৃতি।

শ্রীগোবর্দ্ধন 'হরিদাসবর্ষ্য' বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছেন। ইনি সাক্ষাৎ
ত্রিগিরিধারীর শ্রীঅঙ্গ। এই গিরিরাজ রসিককুল-নায়ক শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত
লীলা-বিলাসাদির সাক্ষীস্বরূপ এবং নিত্যবিহারস্থলী। ভগবদ্ধামে অদ্বৈতজ্ঞান স্বরাট-
লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় ভোক্তার অধিষ্ঠান নাই—ইহা জানাইবার
জ্ঞ ও ইচ্ছাদি দেবতাগণের স্বতন্ত্র-ভোক্তাভিমান দূরীকরণার্থ ভগবান্ ব্রজবাসি-
গণের ইন্দ্রপূজা নিবারণ করাইয়া গোবর্দ্ধন-পূজার প্রচলন করিলেন। অপরপক্ষে
যাঁহারা সর্বৈশ্বরেখর ব্রজেন্দ্রনন্দনকে 'স্বয়ং ভগবান্ ও একমাত্র আরাধ্যদেবতা'
না জানিয়া অত্যাচার আধিকারিক দেবদেবীর আরাধনায় তৎপর হইয়া কৃষ্ণকে
তাহাদের সমপৰ্য্যায়ে গ্রহণ করেন, সেইসকল 'নানাদেবৈকসেবী' ও 'চিহ্নজড়-
সময়বাদি'গণের দুৰ্ভুদ্ধি নিরাসকল্পেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার জ্ঞ সংগৃহীত
থাবতীয় দ্রব্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনরূপী তাঁহার নিজের পূজা করাইলেন। অত্যা-
দেবদেবীর পূজা না করিয়া সর্বৈশ্বরেখরের পূজা করাই যে একমাত্র কর্তব্য এবং
তিনিই যে সর্বৈশ্বরের ভোক্তা ও প্রভু—এহলে তাহাই শিক্ষার বিষয়। ব্রজজন-
বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরে গিরিরাজকে ছত্রের ছায়া ধারণ
করত ইন্দের দর্প চূর্ণ করেন এবং কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণকে সর্বতোভাবে
রক্ষা করিয়া এক্ষেত্রে আশ্রিত-জন-বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন।

লার্টাবন বা ডিগ্

৩রা নভেম্বর, ১৬ই কার্তিক, শনিবার—সকাল ৫।০ টার সময় নগর-
সকর্তন-শোভাযাত্রাধোগে যাত্রিগণ গোবর্দ্ধন হইতে ৯ মাইল দূরবর্তী ডিগ্ বা
লার্টাবনে উপস্থিত হন। পশ্চিমধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থলী গাঁঠুলি এবং

শুভলালকুণ্ড, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর উপবেশন-স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়।

ডিগ্ ভরতপুরের অন্ততম রাজধানী। এখানে ভরতপুররাজের প্রাসাদ ও পুরাতন কেল্লা সগর্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজও অতীতের গৌরব-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

সহরের প্রান্তদেশে বৃহৎ কুণ্ডতীরস্থ শিবিরশ্রেণী সুশোভিত ও বৃক্ষছায়া-সম্বিত মনোরম উপবনতুল্য এক ধর্মশালায় যাত্রিগণের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বলা বহুল্য, যাত্রিগণ প্রত্যহই পরিক্রমা ও দর্শন ব্যতীত সন্ধ্যাকালে নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতাাদি শ্রবণের সুযোগ পাইতেন। এস্থলেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। পরিক্রমা-সভ্য ডিগ্-সহরে উপস্থিত হইলে তথায় বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায় এবং তথাকার শিক্ষিত ধর্মপিপাসু সঙ্জনগণের বিশেষ আগ্রহে ঐদিন রাত্রে ধর্মশালা-প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরিক্রমা-সভ্যের নিয়ামক-মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব প্রভু (বর্তমান নাম—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবৈদ্যাস্ত নারায়ণ মহারাজ) উক্ত সভায় হিন্দীভাষায় “সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীনামতত্ত্ব” সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারপূর্ণ চিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সভা-ভণ্ডের পর যাত্রিগণ প্রাসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

কাম্যবনাভিমুখে যাত্রা

৪ঠা নভেম্বর, ১৭ই কা্তিক, রবিবার—অতি প্রত্যুষে ভক্তগণ শিবিকা-বাহিত শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দের অনুগমনে উচ্চ-সকীর্তনমুখে কাম্যবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ডিগ্ হইতে কাম্যবন প্রায় ৭ ক্রোশ। অল্প পরিক্রমা-পথ কিছু বেশী থাকায় যাত্রিগণের সুবিধার জন্ত পথিমধ্যে ৮ মাইল দূরে তাঁহাদের মধ্যাহ্নকালীন প্রাসাদ-সেবার বন্দোবস্ত করা হয়। “ঘাট্টা” নামক স্থানে এক শ্বেতপর্বতের পাদদেশে অসংখ্য বৃক্ষরাজি-রচিত ছায়ামণ্ডপে প্রাসাদ সেবন-কালে যাত্রিগণের অনেকেই ‘বন-ভোজনে’র কথা স্মরণ হইয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে ভক্তগণ পুনরায় এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কাম্যবনে উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব ধর্মশালার প্রকোষ্ঠে ও শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কাম্যবন-মাহাত্ম্য

কাম্যবন দ্বাদশ-বনের অন্তর্গত চতুর্থ বন। এই বনের বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ দ্বাদশ-বনে যত লীলা করিয়াছেন, এই কাম্যবনেও সে-সকল লীলার স্থান রহিয়াছে। এজন্ত ইহার অপরা নাম—দ্বিতীয় বৃন্দাবন। কাম্যবনে বহু দর্শনীয় স্থান আছে।

কাম্যবন-পরিক্রমা ও বিবিধ দর্শনীয় স্থানসমূহ

এই মতেষ্বর, ১৮ই কার্তিক, সোমবার—প্রাতঃক্রিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া যাত্রীগণ শ্রীবিজয়বিগ্রহের আশুপুণ্ডে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে গিয়া ক্রমাগত শ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীগোপীনাথজীউ, শ্রীমদনমোহনজীউ, চৌরশী খাঙ্গা, স্তরভিকুণ্ড, পিছলপাহাড়ী বা খিসলি শিলা, ব্যোমাসুরের গুহা ও পর্বতোপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্ত ও চরণচিহ্ন, ভোজনস্থলী প্রভৃতি দর্শন করেন। অপরাহ্নেও তাঁহারা কামেশ্বর শিব, বিমলাকুণ্ড, বরাহদেব, পঞ্চপাণ্ডব, লুকলুকি কুণ্ড, চরণপাহাড়ী প্রভৃতি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনের “শ্রীগোবিন্দ,” “শ্রীগোপীনাথ,” “শ্রীমদনমোহন”জীউর প্রতিভূ-তিই বর্তমানে কাম্যবনে বিরাজিত। উক্ত আদি-বিগ্রহত্রয় স্নেহভয়ে জয়পুরে গাত হইলেও, শ্রীবৃন্দাদেবী ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিবেন না সঙ্কল্প করায়, আজও তিনি কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। চৌরশীটী কারুকার্য-বিশিষ্ট প্রস্তরের খাম্বুক বৃহৎ গৃহই “চৌরশী খাঙ্গা” নামে পরিচিত। উহা ৮৪ লক্ষ যোনির প্রতীক এবং ইহা দর্শন করিলে ৮৪ লক্ষ যোনিতে আর প্রবেশ করিতে হয় না—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ যে পাহাড়ে পিছল বা গড়ানি খেলিতেন, তাহাই “খিসলি শিলা” নামে বিখ্যাত। গোচারণ-কালে গোপবালকগণ-সহ ভগবান্ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে ব্যোমাসুর সখার রূপ ধারণ করত গোবৎস হরণ করিয়া পর্বত-গুহায় লুকাইত রাখিলে, শ্রীকৃষ্ণ উহাকে বধ করিয়া বৎসগণকে উদ্ধার করেন। উক্ত স্থানকেই “ব্যোমাসুরের গুহা” বলে। “ভজনস্থলীতে” বালকৃষ্ণ সখাগণে পরিবৃত্ত হইয়া গৃহ হইতে আনীত দধির প্রভৃতি ভোজন করিতেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভক্তবানের উক্তরূপ আচরণ লক্ষ্য করিয়া মোহিত হন। “লুকলুকি কুণ্ডে” শ্রীকৃষ্ণ গোপবালিকাগণের সহিত জলে লুকলুকি খেলা করিয়াছিলেন। উক্ত খেলায় শ্রীকৃষ্ণকে খুজিয়া না পাওয়ায় ব্রজবালিকাগণ বিলাপ ও রোদন করিতে থাকিলে, ভগবান্ পর্বতোপরি অবস্থিত হইয়া বংশী-ধ্বনি করিলে তাঁহার পদতলস্থ প্রস্তরখণ্ড দ্রবীভূত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন ধারণ করিয়া উহাই “চরণ-পাহাড়ী” নামে বিখ্যাত। (ক্রমঃ) —প্রকাশক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬; কার্তিক—১৩৫৯

১৬ দামোদর, ২ কার্তিক, ১২ অক্টোবর, রবিবার—গৌর-প্রতিপৎ রা ৪।৭। পর্বাঙ্কে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

১৭ দামোদর ৩ কার্তিক, ২০ অক্টোবর, সোমবার—গৌর-দ্বিতীয়া রা ৪।১। শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

২৩ দামোদর, ৯ কার্তিক, ২৬ অক্টোবর, রবিবার—গৌরষ্টমী রা ৬।৫৫।
শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের
তিরোভাব।

২৬ দামোদর, ১২ কার্তিক, ২৯ অক্টোবর, বুধবার,—গৌরৈকাদশী দি ১।১৪৯।
উথানৈকাদশীর উপবাস। শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী-
মহারাজের তিরোভাব।

২৭ দামোদর, ১৩ কার্তিক, ৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৯।৩৬।
পূর্বাঙ্ক ৯।২৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। দ্বাদশারম্ভপক্ষে চাতুর্মাশ্য ও
উর্জ্জ্বত সমাপ্ত। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল
গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব।

২৯ দামোদর, ১৫ কার্তিক, ১ নভেম্বর, শনিবার—গৌর-চতুর্দশী প্রাতঃ ৫।৫০।
পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্মাশ্য-ব্রত ও উর্জ্জ্বত সমাপ্ত। শ্রীল ভৃগুভ
গোস্বামী ও শ্রীল কালীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

১ কেশব, ১৬ কার্তিক, ২ নভেম্বর, রবিবার—কৃষ্ণ-প্রতিপদ রা ২।২৭। শ্রীকৃষ্ণের
রাসযাত্রা।

১২ কেশব, ২৭ কার্তিক, ১৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ৩।৪৯।
উৎপল একাদশীর উপবাস।

১৩ কেশব, ২৮ কার্তিক, ১৪ নভেম্বর, শুক্রবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।১৩।
দি ৯।৩১ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীকাল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব,
মহোৎসব।

অগ্রহায়ণ—১৩৫৯

২৬ কেশব, ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী রা
১০।১৯। মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব, ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী রা ৮।৩৭।
পূর্বাঙ্ক ৯।৩৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।

৪ নারায়ণ, ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার—কৃষ্ণ-চতুর্থী রা ৯।৮।
জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তজিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সমুদয় মঠে ষষ্ঠদশ
বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব।

১২ নারায়ণ, ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর, শনিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ৯।৩০।
সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৯।৫৫।
পূর্বাঙ্ক ৯।৪৫ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের
তিরোভাব।

১৪ নারায়ণ, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী দি ৯।৪৯।
শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্মঃ যমুগুপ্তিতঃ পুংসাং বিষকুসেন-কথাত্ম যঃ ।

নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ব ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিমুগ্ধ ॥

অত্ম ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম

৪র্থ বর্ষ { বাসুদেব, ১৫ কেশব, ৪৬৬ গৌরাদ্দ
রবিবার, ৩০ কার্তিক, ১৩৫৯; ইং ১৬।১১।৫২ } ৯ম সংখ্যা

শ্রী শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণঐশ্যায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

- ১। অন্ত্যেকঃ পরমোপায়ো ভবতঃ পাপনিবৃত্তৌ ।
সর্বভক্ষাখ্যদোষস্ত বদরীং শরণং শ্রয় ॥২৮॥
- ২। যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্বেদেবো জনার্দিনঃ ।
ভক্তানামপ্যভক্তানামঘহা মধুসূদনঃ ॥২৯॥
- ৩। তত্র গঙ্গান্তসি স্নাত্বা কৃত্বা প্রদক্ষিণং হবঃ ।
দশবৎ-প্রণিপাতেন সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥৩০॥

*৪। ততো ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা স্বামীণামনুবাদতঃ ।

উত্তরাভিমুখো বহির্গঙ্গমাদনমাযযৌ ॥৩১॥

৫। ততো বদরিকাং প্রাপ্য স্নাত্বা গঙ্গাস্তসি স্বয়ম্ ।

নারায়ণাশ্রমং গত্বা নত্বা প্রোবাচ ভক্তিমান ॥৩২॥

অগ্নিরুবাচ—

৬। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘনং পুরাণং, সনাতনং বিশ্বসৃজাং পতিং গুরুম্ ।

অনেকমেকং জগদেকনাথং, নমাম্যানস্তাশ্রিত-শুদ্ধবুদ্ধিম্ ॥৩৩॥

৭। মায়াময়ীং শক্তিমুপেত্য বিশ্ব-কর্তারমুদ্दिश্য রজোপযুক্তম্ ।

সদেব চাস্ত স্থিতিহেতুমুগ্রমথো তমোভিগ্রসিতারমীড়ে ॥৩৪॥

৮। অবিদ্যা বিশ্ববিমোহিতাত্মা, বিদ্বেকরূপং বিততং ত্রিলোক্যাম্ ।

বিদ্যাশ্রিতত্বাং সকলজ্ঞমীশ মবিদ্যা তু জীবোহহং প্রপত্তে ॥৩৫॥

৯। ভক্তেচ্ছয়াবিস্কৃত-দেহযোগমাতোগ-ভোগাপিতযোগযোগম্ ।

কৌশেয়-পীতাম্বর-জুটশক্তিং, বিচিত্রশক্ত্যফটময়েফটমীড়ে ॥৩৬॥

১০। অথ প্রসন্নো ভগবান্ স্তুতঃ সর্বৈবহৃদি স্থিতঃ ।

প্রোবাচ মধুরং বাক্যং পাবকং পাবনার্থিনম্ ॥৩৭॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

১১। বরং বরয় ভদ্রস্ত বরদোহহমুপাগতঃ ।

স্তুবেনানেন তুষ্টোহস্মি বিনয়েন তবানঘ ॥৩৮॥

অগ্নিরুবাচ—

১২। জ্ঞাতং ভগবতা সর্বং যদর্থমহমাগতঃ ।

তথাপি কথয়াম্যেতদীশ্বরাজ্ঞানুপালনম্ ॥৩৯॥

১৩। সর্বভক্ষ্যে ভবাম্যেব নিবৃত্তিস্তু কথং ভবেৎ ।

অত্যন্ত-ভয়সম্পত্তিরেতস্মাজ্জায়তে মম ॥৪০॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

১৪। ক্ষেত্রদর্শনমাত্রেন প্রাণিনাং নাস্তি পাতকম্ ।

মৎপ্রসাদাং পাতকস্ত ত্বয়ি মাশ্ব কদাচন ॥৪১॥

১৫। ততঃ প্রভৃতি ভূতাত্মা পাবকঃ সর্বতো ভূশম্।

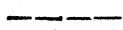
কলয়াবস্থিতশ্চাত্র সর্বদোষ-বিবর্জিতঃ ॥৪২॥

১৬। য এতৎ প্রাতিরুখায় শৃণোতি শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ।

অগ্নিতীর্থ-কৃতস্নানফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে বিমুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে অগ্নিকৃত-

বদরীনারায়ণ-স্ততিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।



শ্রী শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১। (শ্রীব্যাস বলিলেন),—হে বৈশ্বানর! আপনার পাপ-নিষ্কৃতির এক পরম উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনি বদরীর শরণ গ্রহণ করুন, তবেই আপনার সর্বভুক-নামের দোষ উপশম হইবে ॥২৮॥

২-৩। যে-স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্রন বিরাজ করেন এবং সেই মধুসূদন কি অভক্ত, কি ভক্ত, সকলেরই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; আপনি তথায় গমনপূর্বক জাহ্নবীজলে স্নান, হরির প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করুন। এইরূপ করিলেই আপনার সকল পাপ ক্ষয় হইবে ॥২৯-৩০॥

৪। অনন্তর বৈশ্বানর শ্রীব্যাসের মুখে এবিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক ঋষিগণের অনুমোদনক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া গন্ধমাদনে গমন করিলেন ॥৩১॥

৫। তিনি ক্রমে বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়া গঙ্গাজলে স্নান করত নারায়ণাশ্রমে গমনপূর্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—॥৩২॥

৬। অগ্নি বলিলেন,— যিনি বিষ্ণু, বিজ্ঞানঘন, পুরাণ, সনাতন, প্রজাপতিপতি, গুরু, অনেক, এক, জগতের একমাত্র নাথ, অনন্ত, আশ্রয় ও শুদ্ধবুদ্ধি—আমি সেই বিড়কে নমস্কার করি ॥৩৩॥

৭। যিনি বিশ্ব-সৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় মায়াময়ী শক্তির আশ্রয়ে রজোযুক্ত হইয়াছেন, বিশ্বপালনের জন্ত ঐহার সত্ত্বমূর্ত্তির বিকাশ এবং সেই বিশ্বের

গ্রাসের জ্বলই যিনি পুনরায় উগ্র তমোমূর্তি অবলম্বন করেন, আমি সেই বিছুকে পূজা করি ॥৩৪॥

৮। যিনি অবিষ্টাধারা বিশ্বকে বিমোহিত করেন, ত্রিলোকে বাহার একমাত্র বিষ্টা-রূপ বিস্তৃত, বিষ্টার আশ্রয়ে যিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, আমি অবিষ্টাহত জীব তাঁহার শরণাগত হই ॥৩৫॥

৯। যিনি ভক্তের ইচ্ছায় দেহযোগের আবিষ্কার করেন, এবং ভক্তের ইচ্ছাতেই ভোগ-ব্যাপার প্রকাশপ্রকাশ করেন ; যিনি কৌশল্য পীত-বসনধারী ও শক্তির সহিত মিলিত এবং যিনি বিচিত্র অষ্টশক্তিময়, আমি সেই ইষ্টদেবকে স্তব করি ॥৩৬॥

১০। অনন্তর সর্বভূতের দেহবিহারী প্রসন্নাত্মা ভগবান্ এইরূপে স্তুত হইয়া পাবনার্থী পাবককে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—॥৩৭॥

১১। ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—হে অনঘ ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরদরূপে সমাগত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর ॥৩৮॥

১২-১৩। অগ্নি উত্তর করিলেন,—হে ভগবন্ ! যদিও আপনি সমস্তই জানিতে পারিতেছেন যে, কিজন্ত আমি উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করা আমার উচিত ; এই কর্তব্যবোধে বলিতেছি—হে বিভো ! আমি যদি সর্বভক্ষ্যই হইলাম, তবে আমার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে ? এজন্ত আমার অত্যন্ত তীতি জন্মিতেছে ॥৩৯-৪০॥

১৪। শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে অগ্নে ! এই ক্ষেত্র দর্শনমাত্রেই প্রাণি-গণের পাতক বিনষ্ট হইবে, আর আমার অমুগ্রহে কদাচ তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥৪১॥

১৫। হে স্বল্প ! তদবধি ভূতাত্মা পাবক সর্বদোষ-বিবর্জিত হইয়া পূর্ণ-কলায় সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥৪২॥

১৬। যে শুচি মানব প্রভাতে শয্যা-পরিত্যাগের পর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, নিঃসংশয়ে তাহার অগ্নিতীর্থ-জ্ঞানের ফললাভ হয় ॥৪৩॥

ইতি শ্রীকন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে অগ্নিকৃত

শ্রীনারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮২ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় দর্শন

২০ বৎসর পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ঠাকুরের পুনঃ

শ্রীজগন্নাথের সেবা গ্রহণ

শ্রীনীলাচল হইতে অশ্রুত নানাস্থানে বিংশ-বর্ষকাল কার্যোপলক্ষের আবরণে হরিসেবায় অবস্থিতি করিবার পর, পুনরায় খৃষ্টীয় বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভের প্রথম-দশকে শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথের আভ্যন্তরিক প্রয়োজনা-মুঠানে ব্যাপ্ত ছিলেন। ঠাঁহাই তাঁহার শেষবারের নীলাচল-নাথের সেবা। এইকালে তিনি বাপ্পীয়-যানের সাহায্যে তৃতীয় বারের যাত্রা-সমূহে শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া সমুদ্রোপকূলে স্বর্ণ-বালুকায় কুটীর নির্মাণপূর্বক স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমসেবায় কালান্তিপাত করেন। প্রেমাঙ্গনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনের দ্বারা কিরূপে শ্রীনীলাচল-পতির সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহা প্রদর্শনের জন্তই তাঁহার তৃতীয়বারের যাত্রা।

তৃতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

শ্রীল জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত, শ্রীল কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভজন-রহস্যের উদ্দিষ্ট বিষয়ের আশ্বাদনে—বিপ্রলভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরহৃদয়ের অমুসরণে কি প্রকার ভজনময় জীবন স্বরূপ-সিদ্ধ-বিগ্রহে অবস্থিত, তাহার সন্দেশ বাহাদের প্রয়োজন,—তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রচুর সন্ধান লাভ করিবেন। জগতের মঙ্গল-মুখে—সাধকের হিতার্থে যেরূপ শ্রবণ-কীর্তনের প্রয়োজন, তাদৃশ অভিধেয়-সাধন-বিচার তাঁহার মধ্যম যাত্রায় লক্ষিত হয়। এই তৃতীয়বারের যাত্রা-সমূহে তিনি পূর্বযাত্রা হইতে কিরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শনযাত্রা প্রদর্শন করিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ধর্ম-ধ্বজী কপটাচারিগণের সংস্কার-চেষ্টা

তিনি ভজনের বাহু অমুঠানমুখে কীর্তনের পরিবর্তে কীর্তনকারিগণের মঙ্গল-বিধানের জন্ত বাহুবৈষ্ণবতা পরিহার করিয়া লোকসজ্জের সহিত মিলনের অপ্ৰয়োজনীয়তা দেখাইয়াছিলেন। ‘সজ্জন-তোষণী’ নামী পত্রিকা ‘ক্ষেত্র-সামিনী’ চর্চাল বিষয়বস্তু হরিভজনের বিনিময়ে নিষ্কপটভজন-ফল

অনেকগুলি কথা তাহা হইতে জানা যায়। শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অর্জন-ছলনায় জগতের বিষয়ের সেবা, কীর্তন-কৈতবে জগতের কপটতার সেবা, তীর্থবাস-অচিলায় জগতের ব্যবসায়, বক্তৃতা-কীর্তনের ভাণে জগতের উদর-ভরণ-চেষ্টা প্রভৃতি নারকীগণের নৃত্যের দর্শক-সূত্রে উহাদের অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঠাকুরের লৌকিক আচার-দর্শনে সাধারণের ভ্রান্তি ও বিদেহ

তাঁহার অলৌকিক স্বভাব যে কত শত কপট বিষয়ীর ভক্তির ছলামুষ্ঠানকে লোকচক্ষে গর্হণের বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করাইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কপট সামাজিকগণ ভগবদ্ভক্তগণকে কত প্রকারে নির্ধাতন করিতে সমর্থ, তাহা প্রদর্শনের জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ অসীম সহিষ্ণুতা দেখাইয়া যে-সকল আদর্শ রাখিয়াছেন, তাহা নির্বাপ্যিক ভক্ত-সমাজে জলন্ত উদাহরণ।

ঠাকুরের ঐশীশক্তি, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা—বিদেহী

পাষগুণেরও মুন্ধকারিণী

ভগবান্ ভক্তের মহিমা-বর্দ্ধনকল্পে যে-সকল অলৌকিকী ঐশীশক্তি তৎকালে প্রকট করাইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে অসচেষ্টা অন্তর্হিত হইয়া আলোচকের অভাবনীয় কল্যাণ আনয়ন করিবে। তাঁহার অপার করুণা—যাহা একটা বিরোধী-কপটের নির্ধ্যাণ কালে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে মনুষ্য প্রকৃত সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে পারে, 'অসামান্য ক্ষমা' কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পারে। দৈবদণ্ড-প্রভাবে ভক্তি-বিদেষিকুলের গতি পর্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে, পরমসহিষ্ণু ভগবদ্ভক্ত দুর্দান্ত পাষগুণের অসহনীয় উদ্বেগ কিরূপে অমান-বদনে সহ্য করিতে পারেন এবং ভগবান্ কিরূপে তাহাদিগের দণ্ডবিধান করেন।

ঠাকুর—আপাত-বিরোধ-গুণের সামঞ্জস্যকারী ও সর্বগুণে গুণী

পরিশেষে মর্কট-বৈরাগিকুল বিরাগের তাৎপর্য-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া শব্দের ভারমাত্র বহনপূর্বক যে বিষয়য় ভ্রমে পতিত এবং ভক্তের প্রকৃত অমুষ্ঠান বুঝিতে অক্ষম হয়, তাহার জাজ্ঞল্যমান দৃষ্টান্ত এই লোকাভীত মহাপুরুষের বিচার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহু-অমুষ্ঠানে ক্রটি ও তাহার সংশোধন এবং অন্তঃসিদ্ধি উভয়ের মধ্যে যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহা ভারবাহি-সমাজ বুঝিতে পারে না; স্বেচ্ছাচার-সারগ্রাহি-ভক্তগণই তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে সমর্থ।

ক্ষান্তি, অব্যর্থক লব্ধ, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকর্ষা, নামগানে-
সদারুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি, তদ্বসতিস্থলে প্রীতি ও আত্মনিষ্কম্প-প্রমুখ
ভাবসমূহ লক্ষ্য করা—সাধারণের ভাগ্যের কথা নহে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর)

জীবের প্রাকৃত জগতে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা

এক্ষণে প্রতিবাদিগণ আর একটি কুতর্ক উঠাইতে পারেন। তাঁহারা
জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পরমেশ্বর জীবগণকে সেই অপূর্ব ধামে না রাখিয়া
এই অসম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে কি নিমিত্ত রাখিয়াছেন? যদি জীবসকল তদ্ব্যবসায়
যোগ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তবে কি কারণে তাহারা তথায় থাকিল না? এ
বিষয়েও বিশ্বাস ও যুক্তি উত্তর প্রদান করিবে।

সমাধি-বৃত্তির দ্বারাই অপ্রাকৃত-তত্ত্বের অনুভূতি

হে ভাগবত মহোদয়গণ! আপনাদিগের আত্মার নিগূঢ় প্রদেশে আর
একবার স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা এই তত্ত্বের বিচার করুন।
সমাধি ব্যতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বের কোন ভাব উপলব্ধি হয় না। যে
সকল পুরুষ সমাধি-বৃত্তির আলোচনা করেন না, তাঁহাদের পক্ষে আত্মতত্ত্ব
নিতান্ত দুর্লভ। সমাধির দ্বারা জীব বাহ্য দ্বারসকল রুদ্ধ করত অন্তর্বৃত্তি দ্বারা
অপ্রাকৃত ধামে বিচরণ করত অপ্রাকৃত তত্ত্বসকল সাক্ষাৎ দর্শন করেন। যখন
আমরা সমাধিযোগে সেই পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সন্নিহিত হইয়া
সাক্ষাৎকার লাভ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণ পরমপ্রেমে উৎফুল্ল হয়।

সমাধিযোগে পূর্বকৃত অপরাধের অনুশোচনা

কিন্তু তখন আমাদের পূর্বকৃত কোন অপরাধের জন্ত অহুতাপ উপস্থিত
হয়। আমাদের তখন ভোগেচ্ছার দ্বারা মায়া-স্বীকাররূপ যে অকার্য্য, তাহা
স্মরণপথাক্রম হইয়া আমাদের বিলম্বিত ও সন্তপ্যমান করে। আমরা তখন
বিবেচনা করি, হায়! আমরা কেন এমত অপূর্ব পূর্ণানন্দ পরিত্যাগ করিয়া
মায়ার ক্ষুদ্রানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলাম! এমতদয়ালু পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ

করিয়া সামান্য জড়স্থলের বাঞ্ছা করিয়াছিলাম! কিন্তু পরমেশ্বর কি দয়াবান! তিনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় ধামের সহিত আমার নিকট বর্তমান আছেন, আমি যে অবস্থায় পতিত হই না কেন, তিনি স্ব-স্বরূপে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। আমার কেবল দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। এইরূপ ভাব-সমাধিতে আমাদের মনে সততই উদ্ভিত হয়। ইহার কারণ কি? আমরা যে, কোন কালে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি, ইহাই প্রত্যক্ষ বোধ হয়।

জীবের জগৎ-প্রবেশের কারণ নির্দেশ

স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় হইতে বার্তাসমূহের কেবল বীজ পাওয়া যায়, বার্তা জানা যাইতে পারে না। ঐ বীজ হইতে যুক্তি দ্বারা ও শাস্ত্র-বিদ্যার দ্বারা সমগ্র বার্তা সংগৃহীত হয়। মহাপ্রভু সনাতনকে কহিয়াছেন—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।

এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥

এতাবৎ উপনিষৎস্বরূপ প্রভু-বাক্যের দ্বারা কি সংগৃহীত হয়? বোধ হয় যে, জীব কোনসময়ে নিজ-স্বভাব কৃষ্ণভক্তি বিশ্বতিক্ষমে ভোগেচ্ছাবশতঃ মায়ায় হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কারারুদ্ধপ্রায় অবস্থিতি করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি-কালই দণ্ডকাল

অসম্পূর্ণ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের দ্বারা জীব কালযাপন করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি-কাল জীবের দণ্ড-কাল বলিতে হইবে। জীব স্বীয় কর্মফলে অন্ন স্থলে, নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের যতদূর প্রাকৃত উন্নতি হয়, আমাদের ততদূর বন্ধনের দৃঢ়তা স্বীকার করিতে হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতিতে আমাদের মুক্তির কারণ কিছুই নাই। জীবের এই পতিত অবস্থাটি যে নিশ্চয় সত্য, তাহা সর্বদেশের শাস্ত্রবেত্তারা স্বীকার করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-বিশ্বতিক্ষি বন্ধনের কারণ

খ্রীষ্টধর্মের আদমের পতন যেরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভক্ষণই তাহার পতনের কারণ। কৃষ্ণের অধীনস্থ পরিত্যাগপূর্বক যে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা স্বাধীন হইয়া ভক্তি-সুখকে বর্জন করে, তাহার আর মঙ্গল কোথায়? জীব কৃষ্ণদাসত্ব পরিত্যাগপূর্বক শয়তানের অর্থাৎ মায়ায় হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ পাইতেছে, ইহা

কোরাণেও স্বীকৃত। জীবের স্বতঃসিদ্ধ সন্তাপের মূলই সমুদায় বিবরণে দৃষ্ট হয়। যद्यপি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের স্বীকার করত তাহা হইতে কোন বিশেষ সত্যের আবিস্ক্রিয়া না করা যায়, তবে আমাদের যুক্তিশক্তির দ্বারা কি ফল হইল? আমরা পশু হইতে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলাম?

**কৃষ্ণ-বিস্মৃতির কারণ—স্বতন্ত্রতা, তাহার সদ্যবহারে উন্নতি ও
অসদ্যবহারে জগতে প্রবেশ**

এক্ষণে প্রতিবাদী প্রশ্ন করিবেন যে, জীব কি-নিমিত্ত ঈশ্বরের দাসত্ব ভুলিয়াছিল এবং পরমেশ্বরই বা কি-নিমিত্ত তাহাকে এরূপ বিস্মৃত হইবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন? এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমে জ্ঞাতব্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানের আকর যে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়, তাহা কদাচ সমাধি ব্যতীত বিবেচিত হইতে পারে না। অতএব হে ভাগবত-মণ্ডলি! আপনারা আর একবার সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অন্তঃপুর ধামে প্রবেশ করুন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বস্বরূপ ভগবদীপিকা তথায় অনবরত সঙ্কর্ষণ-মুখ হইতে শ্রুত হয়। যেরূপ সনকাদি ঋষিগণ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের নিকট হইতে সাস্বতী শ্রুতি ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, আপনারাও তদ্রূপ শ্রবণ করুন। বিস্মৃত-সদ্ব্যম আত্মা সঙ্কর্ষণ অনন্ত কহিতেছেন,—শ্রবণ কর, পরমেশ্বর সর্বমঙ্গলময়। তিনি জীবের অনন্ত উন্নতি করণ করত জীবের স্বভাবকে স্বীয় দাসত্বে পরিণত করিলেন। **কৃষ্ণ-দাসত্বই জীবের স্বভাব হইল।** দাসত্ব-স্থখে জীব পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু জীবের যে অগত্যা দাসত্ব, তাহাতে জীবের কোন বিশেষ গৌরব না থাকায় অধিকতর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে না। পরমকরুণাময় জগদীশ্বর জীবকে স্বাধীনতারূপ একটি অপূর্ণ রত্ন দান করিলেন। ঐ স্বাধীনতার সদ্যবহার করত যে-সকল জীব ঈশ্বর-সেবায় অধিকতর ভক্তি করিলেন, তাঁহারা উন্নত অবস্থার অধিকারী হইলেন; কিন্তু যাহারা ঐ স্বাধীনতার অসদ্যবহার করত ভোগ-বাসনা করিয়া দাসত্ব পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা গুণবতী নায়াকর্তৃক আকর্ষিত হইয়া মায়ার অপকৃষ্ট সেবায় রত হওত কখনও দুঃখ, কখনও স্মৃৎ ভোগ করিবার জন্ত ভোগায়তন প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিলেন।

• **জীব স্বয়ং তাহার বন্ধনের কারণ**

এই বার্তাটি পুরঞ্জন-উপাখ্যানে দৃষ্ট হইবে। যে-সকল পুরুষ পরমেশ্বরকে

বিশ্বাস করেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রযুক্ত হন না, তাঁহারা এই প্রকার সিদ্ধান্তেই বিশ্রাম করেন। পরমেশ্বরের অসীম দয়াতে কেবল মাত্র বিশ্বাস করিয়া যাহারা ওদ্বন্দ্বনানন্দে কাল যাপন করেন, তাঁহারা নির্যোধ হইয়াও সুখী এবং যাহারা এই তত্ত্বে বিশেষ বিচার করত এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদেরও দুঃখ অপগত হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যবর্তী, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ পান। যথা বিদুরোক্তি, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে—

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।

তাবৃত্তৌ স্থপমেধেতে ক্লিশ্বতাস্তুরিতৌ জনঃ ॥

হে ভাগবত মহোদয়গণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জীবের ক্লেশের কারণ জীব ব্যতীত আর কে হইল? পরমেশ্বর আমাদের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবার জন্ত প্রাকৃত জগতেও আবির্ভূত হইয়া ব্রজলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণার অবধি নাই। এই অপ্রাকৃত ব্রজলীলার যে গম্ভীর তত্ত্ব, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইলে আর জীবের দুঃখ কোথায়? সংসারের মধ্যে যে-সমস্ত কর্মকাণ্ড আর্ধ্য-ধর্ম বলিয়া বেদসকল ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে জীবের যথার্থ কি মঙ্গল হইতে পারে? (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিনী

ভক্তিশাস্ত্র-মহিমা (৩)

পুরাণ ও স্মৃতিতে শিবউক্তি—পুরাণ বিষ্ণু-দাস জী তাহা না শুনিবে কাণে।

শুন দেবী, এবে কহি সাঙ্গিক পুরাণ,— শুনি'ল হারাবে সব পুণ্য-রতনে ॥

ভাগবত, বিষ্ণু, পদ্ম, বরাহ মহান্ ॥

স্মৃতি

নারদীয়, গরুড়—এই ছয় পুরাণেরে।

বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর আদি।

মোক্ষদাতা জানি' সদা রাখ মনে ধ'রে।

রচিল সাঙ্গিক স্মৃতি ভক্তি-মতবাদী ॥

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রাহ্ম, বামন।

যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, তিত্তিরি, কাত্যায়ন।

মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য যে পুরাণ-রতন ॥

ভোগের রাজস স্মৃতি করিল রচন ॥

রাজসিক এই ছয় স্বর্গ-দাতা জান।

গৌতম, বৃহস্পতি, শঙ্খ, শুক্লাচার্য্য।

তামসিক পুরাণ পুনঃ কহি এবে শুন—

রচিল তামস স্মৃতি নারকীয় কার্য্য।

অগ্নি, মৎস্ত, কুর্ম, স্বন্দ, আর লিঙ্গ, শিব।

তামসিক স্মৃতি মানে যত ছরভাগ।

এ ছয় পুরাণ শুনে অধম যে জীব ॥

বুদ্ধিমান্ জন সঙ্গ করে পরিত্যাগ ॥

তামসিক পুরাণে মোর মহিমা অধিক।

অতএব জান দেবী, মোর দোষ নাই।

তথাপি নিন্দি তারে করি' শত ধিক্ ॥

প্রভু-আজ্ঞামতে সদা আমার বানাই ॥

শাস্ত্র-শিরোমণি—ভাগবত

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—অবিচ্ছিন্ন-তিমির
চারিবিধ কৈতবের প্রাচীর বাহির ॥
ত্রিতাপ নাশিনা সত্য দীপ্তরে জানাতে ।
ভাগবত-শুভোদয় এই অবনীতে ॥
শুকবাণী—ভাগবত, কৃষ্ণভক্তি-সার ।
তাতে বেদশাস্ত্র হ'তে মহত্ব অপার ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন ।
'সত্যং পরং ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন ॥
ভারত-ব্রহ্মসূত্র-গায়ত্রীর ভাষ্য ।
বেদার্থের তাৎপর্য ভাগবত বৃষ্য ॥
সাধুর লিখনে দেখি ভাগবত-মাহাত্ম্য ।
তাহার সামান্য নিম্নে লিখিলাম তত্ত্ব ॥ —
“চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয় ।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্, বিষয়, বচন ।
ভাগবতে সেই ঋক্-শ্লোক-নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ।
ভাগবত-শ্লোকে বেদ কহে একমত ॥
যেই সূত্রকর্তা, যদি সে কল্পে ব্যাখ্যান ।
তবে সে সূত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥
অতএব ভাগবত—সূত্র-অর্থ-রূপ ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ-ভাষ্য-স্বরূপ ॥
অতএব ভাগবত কয়ই বিচার ।
ইহা হৈতে পাবে সূত্রের অর্থ-সার ॥
জীবের তারণ লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিতে হয় সর্বনাশ ॥”
“কৃষ্ণতুলা ভাগবত—বিভূ, সর্বাশ্রয় ।
প্রতি-শ্লোকে, প্রতি-বর্ণে নানা অর্থ কয় ॥
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে ।
চতুর্দ্বি বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥”

“এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র ।
আর এক ভাগবত—ভক্তিরস-পাত্র ॥
হুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস ।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য দীপ্তর-বুদ্ধি ধার ।
সে জ্ঞানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে ভাগবত জানি ।
জগদগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান ।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥”
“সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয় ।
প্রেম-রূপ ভাগবত চারিবেদে কম ॥
চারিবেদ দ্বিধি, ভাগবত নবমীত ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥”
“আচ্ছ, মধ্য, অষ্টে, ভাগবতে এই কম ।
বিষ্ণুভক্তি—নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয়, অব্যয় ॥
ভাগবত-শাস্ত্রে সেই ভক্তিতত্ত্ব কহে ।
ত্রেত্রি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে ॥
যেন রূপ মৎস্ত, কুর্শ্ব-আদি অবতার ।
আবির্ভাব-তিরোভাব, যেন তা' সবার ॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয় ।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয় ॥
দীপ্তরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায় ।
এইমত ভাগবত—সর্বশাস্ত্রে গায় ॥
প্রেমময় ভাগবত কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ ।
বাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥

হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া ।
 নিভ্যানন্দ নিন্দা করে, তত্ত্ব না জানিয়া ॥”
 “দুইস্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র ।
 গ্রন্থ-ভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র ॥
 মহাচিন্ত্য ভাগবত -সর্বশাস্ত্রে কয় ।
 ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায় ॥
 ‘ভাগবত বুঝি’ হেন যার আছে জ্ঞান ।
 সে না জানে কতু ভাগবতের প্রমাণ ॥
 মুই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ-ভাগবতে ।
 যা’র ভেদ আছে, তারে নাশো ভালমতে
 যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ।
 তা’রাও না জানে এ গ্রন্থ-অমূল্য ॥
 শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কৰ্ম্ম করে ।
 শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি’ মরে ॥
 ভাগবত যে না মানেন, সে যবন-সম ।
 তার শাস্ত্রা আছে জন্মে-জন্মে প্রভু যম ॥”
 প্রথম হৈতে দ্বাদশ ভাগবত-স্কন্ধ ।
 চরণ হৈতে শির, হয় কৃষ্ণ-অঙ্গ ॥

আদিদেব দয়াধার, মঙ্গলাবতার ।
 ভাগবত-সেতু ভজি তরিতে সংসার ॥
 অবৈষ্ণব-মুখে হরিকথা নাহি শুন ।
 বিষমিশ্র দুষ্ক-সম ঘটাবে মরণ ॥
 নারদ পঞ্চরাত্র—সর্ববেদ-সার ।
 অদ্ভুত হরিকথা, অতি চমৎকার ॥
 পঞ্চরাত্রে পঞ্চজ্ঞান আছে সদা তাই ।
 ভাগবত-সম পঞ্চরাত্রে জ্ঞান ভাই ॥
 শাস্ত্রবিধি ছাড়ে যেবা কামাচার-বংশে ।
 শাস্তি, সিদ্ধি, সেবা-সুখ সব তার নাশে
 বেদ-স্মৃতি-পঞ্চরাত্র-বিধি ছাড়ি’ যেই ।
 দেখায় হরিভক্তি, দুষ্ট জ্ঞান সেই ॥
 হরি লাগি যে ক্রিয়া শাস্ত্রে দেখা যায় ।
 সেই সে ভক্তি পরে প্রেমভক্তি হয় ॥
 হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা-কাঞ্চাল ।
 ভক্তি-তরঙ্গিণী গায় আনন্দগোপাল ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী,
 আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

জ্ঞানকথা

“কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই ‘মুক্তি’ নয় ।

এই কহে—নামাভাস-মাত্রে সেই ‘মুক্তি’ হয় ॥”

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১২২)

দাসগোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ প্রভুর পূর্বাশ্রমের পিতা ও খুল্লতাত হিরণ্য-
 গোবর্দ্ধন মজুমদার পুরাতন সপ্তগ্রামের জমিদার ছিলেন । তাঁহাদের কর্মচারী
 আরিন্দা-ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্তী নামক একব্যক্তি ‘ঘটপটিয়া’-মুখতা প্রকাশ
 করিবার জন্য নামাচার্য্য শ্রীল হরিন্দাস ঠাকুর মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রতর্কে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার জিজ্ঞাস্তা ছিল—মুক্তি কি অবস্থায় হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শাস্ত্র-প্রমাণে বুঝাইয়াছিলেন যে, সূর্য্য উদয় হইবার পূর্বেই যেমন তমসাস্চ্ছন্ন রাত্রির চৌর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় নাশ হয়, সেইপ্রকার শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইবার পূর্বেই অর্থাৎ ‘নামাভাসে’ই (নামাপরাধে নহে) পাপক্ষয় ও জড় হইতে মুক্তি লাভ হয়। শুদ্ধনাম উচ্চারণ মুক্তকুলই করিয়া থাকেন, সুতরাং সেইপ্রকার নামের ফল—পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম। ‘ঘট-পটিয়া’-মূর্থ আরিন্দা ব্রাহ্মণ তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে শুদ্ধবৈষ্ণবের এই কথা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত গোপাল চক্রবর্তী হরিনামে অর্থবাদ করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে ভাবুক স্থির করিয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রোষ বচনে বলিয়াছিলেন—‘ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ।’

তর্কনিষ্ঠ মায়াবাদী বা আধ্যাত্মিকগণ বুঝিতে পারে না যে, তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ লাভ না হইলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি লাভ হইলেই জ্ঞানালোচনার লক্ষিত বস্তু যে অজ্ঞানান্ধকার নাশ, তাহা সহজেই হয়। এ-বিষয়ে আমরা ‘ভক্তিকথা’-প্রবন্ধে বহুপ্রকারে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, মনুষ্যজীবনে কেবল জ্ঞান লাভ করাই অর্থাৎ অতত্ত্ব-বস্তুকে তত্ত্ববস্তু হইতে পৃথক্ করা বা অতত্ত্ব-বস্তুকে নিরাস করিয়া তত্ত্ব-বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতেই একীভূত হইবার যে জন্ম-জন্মান্তর চেষ্টা, তাহাই জ্ঞান-কথা। তাঁহাদের মতে সেইপ্রকার জ্ঞান, জ্ঞানী ও জ্ঞেয়বস্তু এই ত্রিবিধ ভেদ নাশ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া লীন হইয়া যাওয়াই সবচেয়ে বড় কথা বা মায়ামুক্তি। এই মায়ামুক্তি কথাটিকেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর ‘ভবমহাদাবাগ্নিনির্ঝাপণ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণকীর্তনকারী গুড়-ভক্ত সেইপ্রকার মায়ামুক্তি যে সহজেই লাভ করেন, তাহা তিনি শাস্ত্রপ্রমাণে বহুস্থানে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তর্কনিষ্ঠ মায়াবাদিগণ পঞ্চমপুরুষার্থ যে চিদ্বিলাস তাহা না বুঝিতে পারিয়া, ভগবদ্ভক্তগণকে ভাবুক-সম্প্রদায় বলিয়া অনেক সময়ে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায়—বাস্তবিকই একপ্রকার প্রাকৃত-ভাবুক-সম্প্রদায় ‘মিছাভক্তি’র আশ্রয় করিয়া পরিশেষে উপরিউক্ত মায়াবাদই গ্রহণ করিয়া তথাকথিত সিদ্ধ-অবস্থায় ভগবানের সহিত লীন হইয়া যাইবেন—এইপ্রকার অসদ্-বাসনা পোষণ করেন। এইসকল মিছাভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া নামে অভিহিত। ইহারা মায়াবাদীর মত ভগবান্ ও ভগবানের লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব

উপলব্ধি না করিতে পারিয়া ভগবানকে এবং ভগবানের লীলাদিকে মানসিক
কল্পনা করিয়া ভক্তিপথের কণ্টক হইয়া যথেষ্টাচার করেন। এইসকল মিছা-
ভক্তগণ রূপাভুগ গোস্বামীদর্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া মায়াবাদেব আশ্রয়
গ্রহণ করিলেও, বাস্তবিক মায়াবাদিগণের পাণ্ডিত্য-প্রভাব হইতে বহুদূরে
অবস্থান করেন এবং শাস্ত্রাদি আলোচনা-বিধায় বা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-গ্রহণে আদৌ
উৎসাহিত নহেন। তাঁহারা (সহজিয়া শ্রেণী) শাস্ত্র-আলোচনাকেই জ্ঞানবাদ
মনে করেন, আর মূর্খের যথেষ্টাচারকেই রাগমার্গীয় ভক্তিপথ মনে করেন।
তাদৃশ মিছাভক্তগণের চরমে মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত থাকায়, তাঁহারা
অনেকেই মায়াবাদ-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত মূর্খ ভাবুক-সম্প্রদায়, কিন্তু রূপাভুগ-
বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নহেন। এই মূর্খ ভাবুক-সম্প্রদায় সুবিধামত কতকগুলি চর্চাদি
জড়ীয় ভক্ত-ভাব আবিষ্কার করেন বলিয়া, প্রাকৃত মায়াবাদিগণও তাঁহাদিগকে
নিজসম্প্রদায়ের রহিতু'ত সম্প্রদায় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই
প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শুদ্ধবৈষ্ণব এবং মায়াবাদী উভয় সম্প্রদায়েরই
বহিষ্কৃত হইয়া, ত্রীল রূপ-গোস্বামীর মতে 'ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনাকারী
উৎপাতী সম্প্রদায়' বলিয়া অভিহিত হন।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিঃ বিনা।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিরূপাতায়ৈব কল্পতে ॥ (ব্রহ্মসামল)

অর্থাৎ—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রিকী বিধি-নিষেধ বাদ দিয়া যে
শুকগিরি আর অবতারের বহু প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পারমার্থিক রাজ্যের
একপ্রকার উৎপাত মাত্র।

সেইপ্রকার অত্যাভিলাষী, জ্ঞানী, কর্মী, মায়াবাদী ও মিছাভক্তগণকে রূপা-
কল্পনার জন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে যে জ্ঞানযোগের কথা আলোচনা
করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্মার্থ 'জ্ঞানকথা'-প্রবন্ধে কিছু প্রকাশ করিতে চেষ্টা
পাইব।

ভক্তবস্ত হইতে অতত্ত্ব-বস্তকে নিরসন করাই জ্ঞানালোচনা, এবং সেই তত্ত্ব-
বস্তর যে চরম কথা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও যিনি অংশী, সেই ভগবদ্-বিগ্রহের
সহিত নিত্যকাল সেবারত অবস্থায় যুক্ত হওয়া বা তাঁহার সেবায় প্রতিষ্ঠিত
হইবার জন্ত যে বিস্তৃত জ্ঞানালোচনা বা চিদালোচনা, তাহাই প্রকৃত জ্ঞানযোগ।

ব্রহ্ম যাহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মা যাহার একাংশ মাত্র, সেই ষড়ৈখ্য-
পূর্ণ ভগবানের সেবা বাদ দিয়া কেবলমাত্র তত্ত্ব ও অতত্ত্ব বস্তর যে 'নেতি নেতি'

বিচার বা আলোচনা, তাহা কখনও জ্ঞানযোগ নহে; পরন্তু তাহাই উপরিউক্ত আরিন্দা ব্রাহ্মণের 'ঘট-পটাদি'-বিচারপূর্ণ মায়াবাদ অসদালোচনা।

বলাই-পুরোহিত তারে করিল। ভৎসন।

'ঘট-পটাদি'-মূর্থ তুমি, ভক্তি কাহা জ্ঞান ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১২২)

অপরপক্ষে শুদ্ধ জড়জ্ঞান এবং ভগবজ্জ্ঞান উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা না বুঝিয়া যে হরিভক্তির ছলনাযুক্ত মায়াবাদ, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ বা রূপাত্মগ-বিরুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা। অতএব জ্ঞানযোগ অর্থে শুদ্ধ নির্কিংশেষ জ্ঞানালোচনা নহে বা অচিদ্বিলাস-পরায়ণ (ব্যভিচারী) প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী মিছা-ভক্তগণের প্রাকৃত ভাব-প্রবণতাপূর্ণ উচ্ছ্বাসময়ী বাল-চমৎকারকারিণী প্রচেষ্টাও নহে। যথার্থ জ্ঞানযোগের দ্বারা শুদ্ধ-জ্ঞানি-সম্প্রদায় বিশুদ্ধভাবে জ্ঞানালোচনা করিলে ঘড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ ভগবানের জড়াতীত আনন্দ-চিন্ময়-সমুচ্ছল-বিগ্রহের ও আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রভাবিত-চিদ্বিলাসের কথা বুঝিতে পারিবেন। আর শুদ্ধজ্ঞানীর অহুগত জড়-রস-বিলাসী মিছাভক্তগণও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব অহুভব করিয়া তাঁহার সেবায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস।

ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে হৃদয় মনস ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সেই তত্ত্বানুসন্ধান-ফলে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা বস্তুতঃ জীব-তত্ত্ব এবং শরীর ও মন অতত্ত্ব-বস্তু। জীব পরাশক্তি-সম্ভূত 'ক্ষেত্রজ' নামে পরিচিত, আর শরীর ও মন অপরাশক্তি-সম্ভূত 'ক্ষেত্র'-নামে অভিহিত। জীব যেমন তাহার শরীর সম্পর্কে 'ক্ষেত্রজ'-নামে অভিহিত, সেইপ্রকার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর সম্পর্কে ভগবান্‌ই 'ক্ষেত্রজ' নামে পরিচিত।

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।” (গীঃ ১৩।২)

সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম ক্ষেত্রজ-বিচারে একই তত্ত্ব। কিন্তু ক্ষেত্র-বিচারে জীবের কর্তৃত্ব অণু, আর ভগবানের কর্তৃত্ব বিরাট্। অতএব অণু ও বিরাট্-বিচারে জীব ও ভগবান্‌ পৃথক্ তত্ত্ব। জীব তাহার কর্মফলগত শরীর ও মনকে ব্যাপ্ত করিয়া শরীরের সর্বত্রই যেমন তাহার সত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখে, ভগবান্‌ও সেই প্রকার তাঁহার বিরাট্ শরীর দ্বারা জগতের সর্বত্রই তাঁহার সত্তা বিস্তার করেন। জীব যেমন সবিশেষ হইয়াও নির্কিংশেষ-ভাবে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকেন, সেই প্রকার ভগবান্‌ও নির্কিংশেষ-ভাবে বিরাট্‌রূপ বা বিশ্বরূপ ব্যাপ্ত করিলেও তিনি

নিত্যকাল সবিশেষ-তত্ত্ব গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ । “গোলোক এব নিবসত্য-
খিলান্নভূতো” । (ব্রঃ সং ৫।৩২)

এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য বুঝাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদঙ্গীতায়
‘ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ’ সম্বন্ধে বলিলেন—তিনি যে ক্ষেত্রজরূপে বর্ত্তমান, তাহা সর্ব-
ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত ।

‘ঘট-পটিয়া’ মায়াবাদিগণ বলেন যে, শরীর-রূপ ‘ঘটে’ জীবরূপ যে
নির্বিশেষ আকাশ বা ব্রহ্ম আছে, সেই শরীররূপ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে বৃহৎ
নির্বিশেষ মহাকাশের সহিত মিশিয়া যায় । ইহারই নাম ‘ঘট-পটিয়া’-বিচার ।
কিন্তু এই ‘ঘট-পটিয়া’ বিচারে যে সূক্ষ্ম ফাঁকি আছে, তাহা ধরিবার চেষ্টা করা
আবশ্যক । জীব—চেতন বস্তু, আর আকাশ—অচেতন বস্তু । স্মরণ্য
দার্শনিক বিচারে চেতনের সহিত অচেতনের তুলনা হইতে পারে না ।
এইপ্রকার চিহ্ন-সম্বন্ধবাদী মায়াবাদিগণ যে বৃথা পরিশ্রম করিয়া থাকেন—
তাহাই শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা । সেইপ্রকার জ্ঞানালোচনা কখনই জ্ঞানযোগ আখ্যা
পাইতে পারে না । মায়াবাদীর সাযুজ্য-মুক্তির বিচারে ক্ষুদ্রচেতন জীব বা অণু-
ক্ষেত্রজ ও বৃহৎক্ষেত্রজ ভগবান্ বা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন ।
তাহাতে বৃহৎ-চেতনের কোনই লাভলাভ নাই । কিন্তু সেইপ্রকার ব্রহ্মসাজুয়া-
মুক্তির দ্বারা ক্ষুদ্র-চেতনের কি-ভাবে আত্মঘাত হয়, তাহা ঘট-পটিয়ার বুদ্ধির
অগোচর বস্তু । (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবাদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

শ্রী শ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্বে প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীসনাতনের ঐশ্বর্য্য-শ্রী ত্যাগ ও বৈরাগ্য-শ্রী লাভ

“গোড়েন্দ্রস্ত সত্যবিভূষণমণিস্তান্মা য স্নান্য শ্রিয়ং,

রূপাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে ।

অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণঃ সরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ

শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদামিতি ॥”

(চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক)

অর্থাৎ গোড়দেশ-অধিপতির রাজ-সভার সভ্যগণেরও বিভূষণ মণি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর অগ্রজ শ্রীসনাতন মহান্ সমৃদ্ধ 'ঐশ্বর্য-শ্রী' পরিত্যাগ করিয়া নবীন 'বৈরাগ্য-শ্রী' ধারণ করিয়াছিলেন।

সনাতন সমগ্র ঐশ্বর্য-সম্পদ বিষয়ং পরিত্যাগ করিয়া ঈশানকে সঙ্গে লইয়া পাত্‌ড়া পর্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে একজন সদল দহ্ম্যপতি পথিক যাত্রীদের প্রাণ নাশ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত, তাহার সহিত একজন হাত-গণকও ছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী দৈবক্রমে সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া দহ্ম্যপতিকে বিনয়-নম্র বচনে নিবেদন জানাইলেন,—আমি বিপদ-গ্রস্ত; তুমি আমাকে এই পর্বতটী উত্তীর্ণ করাইয়া দাও। এদিকে ভূঞার নিকটস্থ গণক ভূঞাকে জানাইয়া দিল,—এই গোস্বামীর নিকট অষ্ট মোহর আছে। তুমি অল্প রাত্রেই ইহার প্রাণবিয়োগ করিয়া মূল্যবান অর্থগুলি হস্তগত কর। দহ্ম্যপতি হাত-গণকের প্ররোচনায় সনাতনকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিল।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ঈশানের নিকট যে আটটি মোহর ছিল তাহা তিনি জানিতেন না, এবং ঈশানও এ-সম্বন্ধে সনাতনকে কিছুমাত্রও অবগত হইতে দেন নাই। এদিক দহ্ম্যপতিও সনাতনকে রক্ষনাদির জন্ত বহুপ্রকার সাগরী ও সম্ভারাদি আনাইয়া দিল; উদ্দেশ্য—সেই রাত্রেই সনাতনকে হত্যা করিয়া মোহরগুলি হস্তগত করা। সনাতনও দুই দিবস উপবাসের পর স্নান, রক্ষন এবং ভোজনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। বৃহস্পতি অপেক্ষাও মহাবুদ্ধিমান সনাতন অন্তরে বিচার করিলেন, এই ভূঞা কি-উদ্দেশ্য আমাকে এত যত্ন করিতেছে? সংসারে নিঃস্বার্থ-সেবা অতি বিরল। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গী ঈশানের নিকট কিছু রজত-কাঞ্চনাদি দ্রব্য থাকিবে, যাহার লোভে ভূঞা আমার এত যত্ন করিতেছে। শ্রীসনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নিকট কি দ্রব্য আছে? ঈশান কহিল,—আমার নিকট সাতটি মোহর আছে।

“শুনি’ সনাতন তারে করিলা ভৎসন।

সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল-যম?” (চৈঃ চঃ)

শ্রীসনাতন তখন ঈশানের নিকট হইতে সাতটি মোহর লইয়া ভূঞার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—

“এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার।

ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি’ পর্বত কর পার ॥

রাজবন্দী আমি, গড়দ্বারে যাইতে না পারি।

পুণ্য হবে, পর্বত আমা দেহ’ পার করি’ ॥ (চৈঃ চঃ)

দম্পত্যপতির সংসঙ্গ-প্রভাবে চিত্ত-পরিবর্তন

শ্রীল সনাতনের অকৃত্রিম সাধু-ব্যবহারে ভূঞা মহাশয়ের চিত্ত হইতে দুষ্পু বৃত্তি দূরীভূত হইল, এবং সে বলিল,—আমি জানিতাম, তোমার সেবকের নিকট আটটি মোহর আছে ; আমি যদিও মোহর-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তোমার প্রাণবিন্যাস-রূপ ভীষণ অপরাধমগ্ন ও পাপরূপ অসং-সংকল্প চিত্তে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তোমার মায়াশূন্য নিরুপাধিক সাধু-ব্যবহারে আমার চিত্ত পরিবর্তিত হইল ; মোহর আর লইব না, পরন্তু তোমাকে পুণোর জন্ম পর্কত পার করিয়া দিব ।

সনাতন কহিলেন,—বিষয় সঙ্গে থাকিলে পুনরায় পথিমধ্যে এইরূপ বিপদ হইতে পারে ; তুমি বরং এই অর্থগুলি গ্রহণ করিয়া আমার হরি-পাদপদ্ম প্রাপ্তির জন্ম প্রাণটী রক্ষা কর । তখন ডাকাতির সর্দার ভূঞা মহাশয় চারিজন পাইক দ্বারা রাত্রে রাত্রে বনপথে সেই পর্কত পার করিয়া দিল । পর্কত পার হইয়া সনাতন ঈশানকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—গনে হয়, তোমার নিকট আরও কিছু দ্রব্য আছে । ঈশান বলিল,—একটা মাত্র মোহর আছে । সনাতন বলিলেন,—“মোহর লঞা যাহ’ তুমি দেশ ।” (৫৫: ৫ঃ)

অকিঞ্চন নিঃসম্বল সনাতনের একাকী গমন

তারে বিদায় দিয়া গৌসাক্ষি চলিলা একলা ।

হাতে করোঁয়া, ছিঁড়া কান্দা, নির্ভয় হইলা ॥ (৫৫: ৫ঃ)

সনাতন ঈশানকে বিদায় দিয়া একাকী চলিতে চলিতে দিবাবসানে পাটনার অপর পারে হাজিপুরের নিকটবর্তী একটি উত্তানে উপস্থিত হইলেন ; তথায় গোস্বামীজীর ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত মহাশয় বাস করেন ; তিনি টুঙ্গির উপর হইতে সনাতনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট একজন সর্দাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন । উভয়ে পারমাণ্বিক বন্ধ-মোক্ষ-বস্তু ইষ্ট-গোষ্ঠীর দ্বারা সর্বরাত্রে অতিবাহিত করিলেন । শ্রীকান্তজী রাজমন্ত্রী শ্রীসনাতনকে দুই তিন দিবসকাল অবস্থিতির জন্ম এবং মলিন বসন পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের জন্ম অনুরোধ জানাইলে নিরপেক্ষ ধর্ম্মের মূর্ত্য-বিগ্রহ শ্রীসনাতন তাহা অঙ্গীকার না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । শ্রীকান্ত অগত্যা সনাতনকে যত্ন করিয়া একখানি ভোট-কম্বল সঙ্গে দিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিলেন । সনাতন অকিঞ্চন হইয়া একাকী ভ্রুগৌরহৃন্দরের বিরহে উন্মত্ত হইয়া বারাগসী অভিমুখে চলিলেন ।

শ্রীসনাতনের কাশীতে শুভাগমন

ক্রমে-ক্রমে সনাতন বারাগসী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । শ্রীচৈতন্যদেব তথায়

শুভবিজয় করিয়াছেন অবগত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের গৃহের বহির্দ্বারে দৈন্ত-বশতঃ অবস্থান করিতেছেন ; সর্বাস্ত্রধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমস্তই অবগত হইয়াছেন।

নিত্যসিদ্ধ সহজ-পরমহংস বৈষ্ণববর শ্রীসনাতনের বাহু-বেষ-বিষয়ে অপেক্ষা না থাকায় মহাপ্রভু অত্যন্ত উৎকর্ষাবশতঃ সেই বৈষ্ণবকে নিজ নিকটে আনয়নের জন্ত চন্দ্রশেখরকে পাঠাইলেন। চন্দ্রশেখর সনাতনের বাহ্যিক বৈষ্ণবোচিত বেষ দেখিতে না পাইয়া ‘বাউল’ বা ‘দরবেশ’-বিচারে প্রভুকে সংবাদ দিলেন,—প্রভো! গৃহের বহির্দ্বারে কোন ‘বৈষ্ণব’-মূর্তি আমা-কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইল না; একজন দরবেশী মাত্র বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছে। প্রভু কহিলেন,—তাহাকেই আনয়ন কর। চন্দ্রশেখর দরবেশ-বেশী সনাতনকে প্রভুর আজ্ঞা জানাইলে শ্রীসনাতন পরমানন্দে মহাপ্রভুর নিকট গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

সনাতন-দর্শনে দ্রুতবেগে প্রভুর আগমন ও আগমন

“তঁাহারে অঙ্গনে দেখি’ প্রভু ধাঞা আইলা।

তাঁরে আলিঙ্গন করি’ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥

প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন।

‘মোরে না ছুঁইহ’ কহে গদগদ-বচন ॥

দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।

দেখি’ চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার ॥

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি’ লঞা গেল।

পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা ॥

শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জন।

তেঁহো কহে,—“মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন ॥” (চৈ: চ:)

প্রভু-কর্তৃক সনাতনকে মহাভাগবতোচিত গৌরব দান

“প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি আত্ম-পবিত্রিতে।

ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥”

“ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।

তীর্থীকূর্ম্মস্তি তীর্থানি স্বাস্তঃস্থেন গদাভূতা ॥” (ভা: ১।১৩।১০)

তোমার দ্বায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তোমরা ভগবানকে সত্তত হৃদয়ে ধারণ-জন্ত পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ।

“ন মেহভক্তচতুর্ধদী মদুভক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথাহম্ ॥” (ইতিহাস-সমুচ্চয়)।

চতুর্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয় ; ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র ; আমার প্রিয় ভক্তগণ আমার গ্রাম পূজ্য ।

“বিপ্রাদৃষিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

পাদারবিন্দ-বিমুখাং স্বপচং বরিষ্ঠম্ ।

মন্ত্রে তদপি-মনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুন্যতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥” (ভাঃ ৭।২।১০)

কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশগুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাহার কৃষ্ণ মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অপিত, এবং তুত স্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি ; কেননা তিনি স্বীয় কুলকে পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না ।

“অক্লোঃ ফলং তাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং তাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ ।

জিহ্বা-ফলং তাদৃশ কীর্তনং হি হৃদ্বল্লভা ভাঃ বতা হি লোকে ॥”

হে ভক্তভাগবত ! তোমার গ্রাম শুদ্ধভক্তকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল ; তোমার গ্রাম বৈষ্ণবের গাত্রস্পর্শ করাই শরীরের ফল ; তোমার মত মহানুজনের গুণ কীর্তন করাই জিহ্বার ফল ; কেননা, জগতে ভাগবতেরাই হৃদ্বল্লভ ।

“এত কহি কহে প্রভু,—শুন সনাতন ।

কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন ॥

মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার ।

কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গভীর অপার ॥”

শ্রীসনাতনের প্রভুকে অভিন্ন কৃষ্ণ-জ্ঞান

সনাতন কহে,—আমি কৃষ্ণ নাহি জানি ।

আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥

‘কেমনে ছুটিলা’ বলি’ প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।

আত্মোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা ॥” (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমন্তক্‌তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র

আলোলচন্দ্রক-নসদ্বনমালা-বংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়-কেলিকলা-বিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়ম-প্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩॥

চন্দ্র-সম শোভা জন-মন-লোভা,
গলে বনমালা দোলে ।

(ঘাঁর) বংশী, রত্নমালা হস্ত করে আলা,
দরশে ভকত ভোলে ॥

প্রণয়-কেলিতে, বিলাস করিতে—
রত থাকে সদা যিনি ।

ললিত ত্রিভঙ্গ, সুন্দর শ্যামাঙ্গ,
শ্রীগোবিন্দদেব তিনি ॥

শ্রীগোবিন্দরূপ, অতি অপরূপ,
তুলনা নাহিক তার ।

সব ছাড়ি' মন ! গোবিন্দ-চরণ
ভজ তুমি নিরন্তর ॥৩॥

অজ্ঞানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পাস্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ হয় চিদানন্দময় ।

কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত, জড়বস্তু নয় ॥

নাম-রূপ-গুণ-লীলা সকলি চিন্ময় ।

প্রাকৃত বস্তুর সম নশ্বর না হয় ॥

যদিও চিচ্ছক্তি-ছায়া বহিরঙ্গা মায়া ।

তথাপিহ এক নয় বুঝ মন দিয়া ॥

জড়িতে হেয়ক দোষ আছেয়ে সতত ।

কিন্তু এই দোষ-শূন্য হয় চিৎতত্ত্ব ॥

কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ একতত্ত্ব হয় ।

বদ্ধজীব-আত্মা, দেহ কভু এক নয় ॥

অঙ্গী হ'লেও কৃষ্ণের সব আছে পূর্ণ ।
 অঙ্গও শ্রীকৃষ্ণ হ'তে নহেক অপূর্ণ ॥
 চিদানন্দময় দেহ পরম উজ্জ্বল ।
 সর্ববন্দিয়ে সর্বকর্ম্য করয়ে একল ॥
 চিৎ-অচিৎ অনন্ত জীব-সমুহেরে ।
 নিয়তই দর্শন-পালন যিনি করে ॥
 সেই আদি গোবিন্দের চরণ-যুগল ।
 ভজহ সতত মন হ'য়ে নিরল ॥ ৪ ॥

—ত্রিদিগ্ভিশ্রামী শ্রীমন্তকিনুদ সন্ত মহারাজ

স্মার্তমত ও বৈষ্ণবমত

স্মৃতি-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত অথবা স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ মনীষীবৃন্দের মতকে স্মার্তমত বলা হয়। বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় জনকে বৈষ্ণব ও ইহাদের মতকেই বৈষ্ণবমত বলা হয়। কশ্মিগণের ভোগপর ও জ্ঞানিগণের নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মসন্ধান-রহিত একমাত্র সেবামূল্য বৃত্তিদ্বারা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনার পন্থাকেই বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবমত কহে।

সর্বপ্রথম আলোচ্য—‘স্মৃতি’ কি? কেনই বা ‘স্মৃতি’ নাম হইল? সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে, ধর্মশাস্ত্রের নামান্তর ‘স্মৃতি’। ‘স্মৃ’-(ভাবে)-‘ক্তি’ প্রত্যয় হইলে—অনুভূত বস্তুর ‘কালান্তরে জ্ঞান’ বুঝায় ও ‘স্মৃ’-(কর্ম)-‘ক্তি’ প্রত্যয়ে স্মৃতি হইলে—মহা দ-প্রণীত ধর্মশাস্ত্র বা ‘ধর্ম-সংহিতা’ বুঝায়। স্মৃতি-শব্দে যদি আমরা ধর্ম-সংহিতাকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে কর্মকাণ্ড-বোধক বেদের শাখাবিশেষকেই স্মৃতি বালিয়া মানিয়া লইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন—যে-শাস্ত্রে সর্বকর্ম-প্রবৃত্তিতে বিষ্ণুর নিরবচ্ছিন্ন স্বরণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই স্মৃতি। ‘সাস্বত’ ও ‘স্মার্ত’-ভেদে স্মৃতি দ্বাবধা। এই দুই স্মৃতির অস্মৃত ধর্মমতও সাস্বত বা পারমার্থিক-বৈষ্ণব-মত এবং স্মার্ত বা আর্থিক-মত—এই দুইভাগে বিভক্ত।

‘অর্থ’-শব্দে প্রয়োজন ও ‘পরমার্থ’-শব্দে পরম-প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করা হয়। যাহারা কৃষ্ণের বা বিষয়ের বা তাৎকালিক সুখ ও সম্পদ-দায়ক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহারা আর্থিক-ধর্মতৎপর এবং যাহারা পরম-প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্য গোলোক বৃন্দাবনের নিত্যসেবা নিরন্তর কামনা করেন, তাহারা

পরমার্থ-ধর্মপর। যাহারা দেহ ও মনে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কোন সাধন বা অভিধেয়েকে অবলম্বন করত দেহানন্দের অনুসন্ধান করেন অথবা মনের সহিত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কেবলমাত্র দুঃখাভাবকেই প্রয়োজন মনে করেন, তাহারাই আর্থিক ধর্মযাজী বা স্মার্ত-মতাবলম্বী। আর দুঃখাভাবই যদি প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ কখনই মোক্ষের কথা বলিতেন না। তাহারা বলেন—ইহা স্তব-স্বরূপ। দুঃখাভাব রোগরূপ দুঃখের অবসান মাত্র, কারণ আরোগ্য-লাভ করিলেই সমস্ত শেষ হইয়া যায় না। আরোগ্য লাভের পরে যদি স্তব-লাভের যাবতীয় প্রবৃত্তি ও উপকরণ পরিপূর্ণভাবে না থাকে, তাহা হইলে সেই দুঃখাভাব অস্থায়ী হইয়া পড়ে। যাহারা ভগবৎপ্রীতিকে পরম-স্বতন্ত্র-মাত্রাজ্ঞীরূপা নিবেচনা না করিয়া তাহাকে আর্থিক বা নৈতিক বিধির অধীনা মনে করেন, তাহারা জীবের দেহ ও মনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপর লক্ষ্য করিয়া চতুর্কর্গ-ফলাভিসন্ধান-তৎপর হন এবং আধিকারিক দেবতাগণকে সর্গতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া ফলানুষ্ঠান করেন ও করাইয়া থাকেন, তাহারাই স্মার্তমতাবলম্বী বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হন।

যে-মহত্ত্বের অধিক আর মহত্ত্ব নাই এবং যাহার সমানও আর নাই, তাহাই চরম বা পরম-বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্য। তাহারই অনুগত মতাবলম্বী সজ্জনগণই বৈষ্ণব বা সাত্ত্ব-মতাবলম্বী বলিয়া কথিত হন। মোক্ষে আত্মা জড়মুক্ত হইয়া যখন নিতাদর্শ ভগবৎ-প্রীতিরূপ পরম-প্রয়োজন লাভ করে, তখন তাহা ‘পরমার্থ’ পদবাচ্য হইয়া থাকে। একমাত্র পরমার্থের অনুসন্ধান ব্যতীত যেখানে যত ধর্ম, অর্থ, কাম ও দুঃখাভাবরূপ মোক্ষের অনুসন্ধান, তাহা সমস্তই আর্থিক বা স্মার্ত-মত মধ্যে গণ্য। যে-সকল কর্ম কেবলমাত্র জগতের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক হিতসাধক, সেইসকল কর্ম স্মার্ত-মতের অন্তর্ভুক্ত। স্মার্তমতে ইচ্ছা, সঙ্কল্প, বন্দনা, যজ্ঞেশ-পূজা প্রভৃতি যে ঈশ-আরাধনার চাক্ষুষ অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নহে। কারণ, এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম-কর্তা ও কর্ম-কারয়িতা উভয়ের জড়ভাব-পুষ্টি বা অস্থায়ী সমাজের কিছু উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে মাত্র। ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধী-ভক্তের ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম। ইহা অনিত্য অর্থ প্রসব করিয়া কখনও নিরস্ত হয় না; পরন্তু নিত্যকালই পরম-প্রয়োজন-স্বরূপ নিত্য-ভগবৎসেবাতে নিমগ্ন করাইয়া রাখে। স্মার্ত ও বৈষ্ণব-মতের বাহ্যতঃ অনেক স্থলে মৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও ইহাদের মধ্যে অন্তর-নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পগত পার্থক্য যথেষ্টরূপে বিরাজিত। তজ্জগৎ স্মার্ত ও সাত্ত্ব-মত নামে জাতি দুই প্রকার স্মৃতি প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণব ও স্মার্ত উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম স্বীকার করেন ; দেবতাকে মাগ্ন করেন ।
 ক্ষুপ্জা করেন ; একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান করেন ;
 গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা করেন ; শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহার্চন করিয়া
 করেন । বাহু-দৃষ্টিতে তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেও দেখা যায় । বিষ্ণু-
 সাদ, চরণামৃত, নির্মাল্যাদি বৈষ্ণবের ত্রায় গ্রহণ করেন । গুরু বরণ করেন, মন্ত্র
 হণ করেন, শালগ্রাম অর্চন করেন, তুলসী সেবা করেন, তুলসীমালা ধারণ ও
 লক-ধারণ করেন । গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করেন । পুরুষোত্তম-তীর্থ গমন,
 ন করেন । সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন । চাতুর্মাস্ত্রাদি ব্রতানুষ্ঠান করেন । সংস্কারাদি
 হণ করেন । গোত্র এবং বংশ স্বীকার ইত্যাদি সমস্তই করেন । এখন জিজ্ঞাস্য
 ই যে, যদি উভয়ের মধ্যে বাহুতঃ এতগুলি সৌসাদৃশ্য থাকিল, তবে স্মার্ত ও
 ষ্ণবে ভেদ কোথায় ? তদন্তরে বলা যায় যে, বাহু (সৌসাদৃশ্য) থাকিলেও বৈষ্ণব
 স্মার্ত কখনও এক হইতে পারেন না । কারণ ইহাদের মধ্যে অন্তর-নিষ্ঠা, উদ্দেশ্য
 ভূতির সহিত অগ্রান্ত্র আচরণের আকাশ-পাতাল ভেদ বর্তমান, অর্থাৎ পরব্যোম
 দেবীধাম-গত বিপুল ভেদ রহিয়াছে । এমন কি, 'বৈষ্ণব'-নামধারী ব্যক্তির
 ধ্যও বাহ্যচরণ এক দেখা গেলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে এক নহে । বাহিরের দিকে
 মুভজন কিম্বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা, মালা-তিলক-ধারণ, বৈষ্ণবের যাবতীয়
 জ-সজ্জা, হাব-ভাব, চাল-চলন রক্ষা করিয়াও, তাঁহারা অন্তরে কর্মজড়-স্মার্তনিষ্ঠা
 ষণ করায় কার্যতঃ স্মার্ত হইয়া পড়িতেছেন । একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ব-বিশ্ববিজ্ঞ সদ্-
 ষ্যই জীবের অন্তরের এইসকল ব্যাধির কথা জানেন । যেখানে অন্তর-নিষ্ঠা নাই,
 থানে যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা আত্মজিয়-প্রীতিমূলা ; সেখানে পারমার্থিকতা নাই ।
 স্মার্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু একজন
 ব-বর্ণাশ্রমী ও অপরজন অদৈব-বর্ণাশ্রমী । শাস্ত্রে এরূপ দেখা যায়—

স্বোভূতসগো লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপশ্যয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

একজন বর্ণাশ্রম-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও বিষ্ণু-প্রীতিবিধান করেন, তাঁহার সেবা-
 ষ্টবের জগ্ন আবশ্যক হইলে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর
 ষ্যণে সচেষ্ট হন । বিষ্ণু-তোষণার্থ যাবতীয় চেষ্টা নিযুক্ত করেন এবং প্রয়োজন-
 ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেও প্রস্তুত থাকেন । অর্থাৎ ধর্মাদ্বৈত-বিচারকে হৃদয়ের প্রভু
 করিয়া, বিষ্ণু-প্রীতিকেই একমাত্র কৃত্যরূপে বরণ করিয়া থাকেন । আর একজন

শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত যাজ্ঞিক বিপ্রগণের যজ্ঞাহুষ্ঠান ও তদীয় পত্নীগণের ভগবৎ-সেবা। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ তৎকালে নৈষ্ঠিক-বর্ণাশ্রম-যাজনকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিপ্রগণ বর্ণাশ্রমী হইলেও কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ও যাজ্ঞিক পত্নীগণের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া নিজদিকে দিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্ত্বিগ্ ত্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।

ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে স্বধোক্ষজে ॥ (ভাঃ ১০।২৩।৪০)

এ প্রসঙ্গ দ্বারা জানা যায় যে, বাহ্যতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম-পালনকারী হইলেও সাধুকগণের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বিद्यমান।

স্মার্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হইলেও উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ ও অন্তরতঃ বহু পার্থক্য বা বৈষম্য বিद्यমান। বৈষ্ণবের বিচারে বিষ্ণু স্বতন্ত্র, স্বরূপ-পুরুষ; বৈষ্ণব বিষ্ণুর নীত্যাশ্রয়; বিষ্ণুর নীতি-সেবাই তাঁহার নীতিধর্ম। স্মার্তগণের বিচারে বিষ্ণুর পরম স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হয় না। যদিও তাঁহারা “ও তাদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ” প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করেন, তথাপি তাঁহারা বিষ্ণুকে পরম-স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। এবং তাঁহারা বিষ্ণুকে নিজেদের কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন। সমস্ত কর্ম্মের শেষে স্মার্তগণ সর্বকামদ, বরদ ও সর্বফলদাতা কর্ম্মাধিপতি বিষ্ণুর প্রতি ‘কৃষ্ণার্ণবমস্ত’ নামক একটি বাক্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ফলতঃ জানা যায় যে, ভগবান্ একনিষ্ঠ ভক্তগণের অর্থাৎ প্রহ্লাদ, অমরীষ প্রভৃতি ভক্তগণের পূজা ব্যতীত দুর্লভ, যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের নানাবিধ উপচারে ও আড়ম্বরে পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। একজন বিষ্ণুর অহৈতুকী কৃপামুসন্ধান করেন, অপরজন বাহ্যতঃ বিষ্ণুপূজার সাজ-রক্ষা করত ‘শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাজিয়া’ থাইবার যোগাড় করিয়া থাকেন।—অর্থাৎ বিষ্ণুদ্বারা নিজ-নিজ ভোগৈশ্বর্য্যাদি চতুর্কর্গ সাধন করিয়া লইবার কামনা পোষণ করেন। অতএব উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুপূজার পার্থক্য স্বদীপ্তের সহজবোধ্য।

উভয়েই দেবতাগণকে সম্মান করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ‘একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ’ এট বাক্যকে অবলম্বন করিয়া, সর্ব-দেব ও সর্বজীব তাঁহার লীলার সহায়ক সেবক মাত্র বলিয়া মনে করেন এবং “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়ে হি জুহুতি”—এই বাক্য স্মরণ করিয়া মানদ-ধর্ম প্রতিপালন করত সর্বদেবে ও সর্বজীবে ঋণাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন। স্মার্তগণ দেবতামাত্রকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর অথবা শক্তি,

গণেশ, সূর্য্য; রুদ্র ও বিষ্ণুকে সম-পর্ধ্যায়ে গ্রহণ করিয়া অকিঞ্চিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন।

উভয়েই ব্রতাদি-পালন করেন। কিন্তু ঐ সকল ব্রতকে বৈষ্ণবগণ তন্মাত্র বা কৃষ্ণসেবা-রসের উদ্দীপক-স্বরূপ মনে করেন, আর স্মার্তগণ ব্রতকে শারীরিক, মানসিক ও ধর্ম্মার্থ-সাধক কর্ম্মাক্রুরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উভয়েই গঙ্গা-স্নানাদি করেন। বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, সিন্ধু প্রভৃতি তীর্থাদির দর্শন ও স্পর্শন মাত্রই বৈষ্ণব-গণের বিষ্ণু-স্মৃতির উদ্দীপনা হইয়া থাকে। আর স্মার্তগণ স্বকৃত পাপরাশি, অপবিত্রতা, অশৌচাদি যাবতীয় শারীরিক-মানসিক ক্রোদাদি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতে চান। বৈষ্ণবগণ গঙ্গাকে সাক্ষাৎ ভক্তিরস-স্বরূপা সেব্যা মূর্ত্তি বলিয়া জানেন, কিন্তু স্মার্তগণ তাঁহাদের যাবতীয় কুবাসনা ধৌত করিবার যন্ত্র-বিশেষ মনে করেন। অতএব, বৈষ্ণব ও স্মার্তের গঙ্গাপূজা ও স্নান কখনই এক হইতে পারে না।

স্মার্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই ত্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহার্চনাদি করিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবগণ জানেন,—

“প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন” এবং “ঈশ্বরের ত্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার” ইত্যাদি। আর স্মার্তগণ মনে করেন—ভগবদ্বিগ্রহ কাঠ, পাথর, মাটি, অষ্টধাতু ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। ইহাতে কল্পনা করিয়া ‘ভগবন্তা’ আরোপিত হইয়া থাকে, কার্য্যসিদ্ধি হইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়। বৈষ্ণব বিগ্রহ ও বিগ্রহীতে ভেদবুদ্ধি করেন না, স্মার্তগণ ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের বিগ্রহ নিত্য, শাশ্বত এবং স্মার্তের বিগ্রহ তাৎকালিক স্বার্থসাধক অনিত্য। বৈষ্ণব অস্তরের অন্তঃস্থলে নিত্য-বিরাজিত স্বরাট্ লীলাময় পুরুষোত্তম দেবতাকে বিগ্রহ-রূপে প্রকটিত করেন। স্মার্তগণ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া কোনও শিল্প কাঠ, পাথর, মাটির পুতুল করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু অথবা দেবদেবীর আকৃতি বা কল্পনা করেন এবং সেই অচেতন বস্তুকেই সচেতন মনে করিবার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা তদ্বারা নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করেন ও পূজাস্তে তাহা বিসর্জন করেন। (ক্রমশঃ)

--শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বর্তমান জগৎ

বর্তমান কর্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা—হরিকথা-দ্বারা জীবের উপকার হওয়া কেবলমাত্র কথার কথা। সুতরাং হরিকথা প্রচার-চেষ্ঠা বন্ধ করিয়া দরিদ্রের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, পীড়িতের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান প্রভৃতি করাই মানব-জীবনের বিশেষ এবং একমাত্র কর্তব্য। আগে জীবন ধারণ না করিলে হরিকথা কে শুনিবে?—এইরূপ যুক্তি ও ধারণা এই-সকল কথা অবতারণার সুযোগ প্রদান করে। রোগ-শোক-দুঃখে জর্জরিত হইয়া হরিকথা শ্রবণের সময় কোথায়? বর্তমান সময়ে সমগ্র জগদ্ব্যাপী এইরূপ নাস্তিক্যবাদ প্রচারের সুর ধ্বনিত হইতেছে এবং বেশীর ভাগ লোকই এই কথার আদর করিতেছে। কিন্তু স্কন্ধভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এই বিচারের মূলে বিচারকগণের অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা বর্তমান। সেই অতৃপ্ত ভোগ-বাসনাই ইহার সৃষ্টিকর্তা। এইপ্রকার দেশ-সেবা, সমাজ-সেবা প্রভৃতির মূলে নিজ নিজ সুবিধার চেষ্ঠা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। গত “নির্বাচনই” (First Election of Free India, 1952) ইহার প্রধান উদাহরণ। যাহারা নির্বাচনীতে বিধান-সভার সদস্য হইবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট আদায় করিবার জন্য ফতই না বুলি আওড়াইয়াছেন। ইহারা নাকি দেশের Patriot; ইহারা দেশের সেবা, পীড়িতের সেবা ইত্যাদি কার্য্য করিবার এই যে চেষ্ঠা করেন, এইসকল কার্য্যে নিজের বিন্দুমাত্র সুবিধার আকাঙ্ক্ষা যদি বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের কেহই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া উক্ত বিষয়সমূহ সাধনের জন্য যত্নবান হইতেন না।

এইসকল কর্মজড়বাদিগণের অল্পরূপ আবার কতকগুলি লোক ‘আগে খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান করিয়া দেশের উন্নতি করিয়া পরে হরিকথা শ্রবণ করিব ও ভগবৎ সেবা করিব’—এইরূপ বিচার-পরামর্শ হন। তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান করা ও দেশোন্নতি করার পিপাসার কোনদিনই শাস্তি হইবে না। সুতরাং, ফলে হরিসেবা-বৃত্তিও আসিবে না। কারণ, আগে নদীর জল শুষ্ক হউক, পরে নদী পার হইব—এইরকম বুদ্ধি লইয়া যে-সকল লোক অপেক্ষা করেন, তাঁহাদের নদী পার হইবার আশা বিফল; নদীও শুকাইবে না, তাঁহাদের পার হওয়াও হইবে না। খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় থাকিলেই যে

লোকে হরিভজন করে, তাহাও নহে; তাহা হইলে জগতে হরিসেবারত লোকের প্রাচুর্য দেখা যাইত। বাতুলেরা আগে উপসর্গ কমাইয়া পরে মূল-রোগ চিকিৎসার বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমেই মূল-রোগ ধরিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। সুবিজ্ঞ মালী পাতায় পাতায় জল না দিয়া গোড়ায় জল দেয়, যাহাতে বৃক্ষ সঞ্জীবিত হইয়া মনোহর মূর্তি ধারণ করে ও ফল-ফুলে সুশোভিত হয়। প্রাণে আহার প্রদান করিলেই সমস্ত শরীর সবল হয়; প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৃথকভাবে আহাৰ্য্য প্রদানের আবশ্যকতা নাই।

এই জগৎটা মহামায়ার জেলখানা; বদ্ধজীবের আবাসভূমি। ইহা সর্ব-প্রকার অভাব-অসুবিধায় পরিপূর্ণ। জেলখানায় আসিয়া আরাম খোঁজা, সুবিধা খোঁজা, সুখভোগ খোঁজা বাতুলতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও এখানে সুবিধা হইবে না। যতদিন আমরা ভগবানকে ভুলিয়া থাকিব, ততদিন অসুবিধা থাকিবেই। তবে কখনও সোণার খাঁচা, কখনও লোহার খাঁচা—এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব। শৃঙ্খল কিন্তু কোনও সময়ই দূর হইবে না। ভগবদ্বিমুখ অবস্থায় তথাকথিত দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, পীড়িতের সেবা প্রভৃতির চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কখনও এইরূপভাবে অসার কার্যে রত হইয়া দুর্লভ মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করেন না। তাঁহারা জন্মার্জিত কার্যের ফলে সুখ-দুঃখ যাহা আসে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সর্বদা ভগবৎ-পাদপদ্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রার্থনা করেন।

হরিসেবা-বিমুখ হইয়া বাঁচিয়া কোন লাভ নাই। অশুখবৃক্ষ বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। কামারের হাঁপও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। গ্রাম্য-শূকরও মানুষ হইতে অধিকবার খাদ্য গ্রহণ করে। সুদুর্লভ মানবজন্ম খাওয়া-দাওয়া, থাকা ও নরকে যাওয়ার জন্তই কি শুধু লাভ হইয়াছে?—“আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।” হরিভজনকারীর সামান্য খাওয়া-দাওয়া, থাকার অভাব ত' নাইই; এমন কি, ইচ্ছাধিপত্য, অষ্টসিদ্ধি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুপ্তিত হইবার জন্ত, ভক্তের সেবার জন্ত সমস্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ নিজে বলিয়াছেন,—ভক্তের যাবতীয় বোঝা আমি স্বয়ং বহন করি। যথা,—

“অনন্তাশ্চিস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পৰ্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥” (গীঃ ৯।২২)

কিন্তু আমরা এতদূর বিমুখ ও নাস্তিক যে, বেদবাণীতে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। যে-পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হইবে, সে-পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম, কর্ম, সমাজসেবা, দেশের উন্নতি সমস্তই বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

ধর্মঃ স্বহৃদ্বিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথাস্থ যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এবাহ কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১:২৮)

বহু পুঞ্জীকৃত স্বকৃতি-ফলে জীবের হরিসেবা-প্রবৃত্তিতে আসক্তি হয়। হরিসেবায় প্রীতি হইলে জীবের যাবতীয় অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়। পাপ, পাপবীজ ও অবিद्या সমূলে বিনষ্ট হয়। অনিত্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জন-পিপাসা দূর হয় ও নিত্য মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। দান, ধ্যান, যোগ প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্যকল্যাণ হইতে পারে না। কারণ তাহা আত্মার স্বরূপ-ধর্ম নহে। মহারাজ পরীক্ষিত মুমূর্ষু কালে দান, ধ্যান, তপস্যা হইতে বিরত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়া ছিলেন। সুতরাং এইরূপ স্থলে হরিকথা শ্রবণে বিরত থাকায় অত্যাভিলাষি-গণের জীবন-যাপনে বৃথা আয়ু নষ্ট হইতেছে।

হরিকথা কীর্তনই একমাত্র শ্রেষ্ঠদান। যিনি জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্ত সর্বদা হরিকথা কীর্তন করেন, তিনি মহাবল্লাভবর। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও গৌরপার্বদগণ সকলেই মহাবল্লাভ। হরিকথা যাবতীয় কামনা-বাসনা বিনষ্টকারিণী ও সর্বশক্তি-সমম্বিতা। যাহারা এই সংসারে বীর্ষ্যবতী হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহাদের মত মহা-দানবীর আর নাই। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি যত প্রকার দানই হউক না কেন, তাহা তৎকালিক অভাব মোচন করে। কিন্তু হরিকথা দানই শ্রেষ্ঠ দান। তাহার দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল হয়।

তবকথামুতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্যাণাপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ ॥ (ভাঃ ১:৩১৯)

সাদুগুণ অনিত্য দানের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা জীবের স্থায়ী মঙ্গল বিধান-রত। তাঁহারা জাগতিক অভ্যুদয়, ধর্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি প্রভৃতির আদর করেন না। তাঁহারা একমাত্র হরিকথা দানেই পূর্ণানন্দ লাভ করেন। সুতরাং হরিকথা-প্রচারই জীবের চরম আদর্শ। জীবের মিত্য-ধর্মই শ্রীভগবানের সেবা।

শ্রীভগবান্ গীতাং বলিয়াছেন,—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।” (গী: ১৫।৭)

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” (গী: ১০।৪২)

জীব ভগবানের অণুঅংশ ; অংশের কর্তব্য হইতেছে অংশীর সেবা করা । অংশী অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দময় ও সর্বৈশ্বরেশ্বর জগৎপিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের সেবা ব্যতীত জীবের পরিভ্রাণের উপায় নাই । কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন,—“মন্তুক্ত-পূজাভ্যধিকা” । সুতরাং জীবের নিত্যধর্ম হইতেছে—শ্রীভগবানের সেবা ও হরিসেবারত জনগণের সঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ।

‘সাধুসঙ্গ,’ ‘সাধুসঙ্গ’—সর্বশাস্ত্রে কয় ।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

“হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাং

চৈতন্তচন্দ্র-চরণে কুরুতামুরাগম্ ॥”

সাধু-কুপাপ্রার্থী—

—শ্রীহরিদাস রায়
নারায়ণ (মেদিনীপুর)

ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির উপায়

অনুকূলভাবে শ্রবণাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হয় । ‘ইহলোকে ও পরলোকে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্তসমস্ত কামনা নিরসনপূর্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্ব লাভ করাই ভজনের উত্তম ফল । এই ভজনই নৈকর্ষ্য এবং আনুসঙ্গিকভাবে মোক্ষদায়ক । নারদপঞ্চরাত্রে এই উত্তমা-ভক্তি বা ভজনের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; যথা—

সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরশ্চেন নির্মলম্ ।

হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিকচ্যতে ॥

অর্থাৎ—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্ত অভিলাষই উপাধি । অনাত্ম স্থলদেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনের বৃত্তিকে অন্তাভিলাষরূপ উপাধি বলে । সেইসকল দেহধর্ম ও মনোধর্মরূপ উপাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিমুক্ত, সর্বতোভাবে ভগবানে নিষ্ঠা-বিশিষ্ট ও জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত অর্থাৎ নির্মল হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা

ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ‘ভক্তি’ নামে উক্ত হইয়াছে ।

উক্ত ভক্তি নয় প্রকারে সাধিত হয় । যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।

অৰ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাশ্রয়নিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চৈবলক্ষণা ।

ক্রিয়ৈত ভগবত্যাঙ্ক তন্মত্তেহধীতমুত্তমম্ ॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

অর্থাৎ—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-সম্বন্ধিনী কথার শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, বিষ্ণুর পরিচর্যা, পূজন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও কাম্যমনোবাক্যে আশ্রয়নিবেদন (অর্থাৎ গবাদি পশু যেমন নিজ পালন-চিন্তা করে না, তদ্রূপ বিষ্ণুতে সর্বস্ব সমর্পণপূর্বক নিজ পোষণ-চিন্তারহিত হইয়া ভগবদনুশীলন)—এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ যদি কেহ সর্বপ্রথমে বিষ্ণুর শরণাগত এবং ফলাকাজ্জ্বল্যরূপ ব্যবধান-রহিত হইয়া সাক্ষাদ্-ভাবে যজ্ঞন করেন, তবে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন,—এইরূপ মনে করি ।

যদি দেবতাজ্ঞানে সাধু ও গুরুসেবা অমুষ্ঠিত হয়, তবেই এই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়, নতুবা অশ্রু কোন উপায়েই উহা লাভ করা সম্ভবপর নয় । ‘দেবতাজ্ঞানে’ সাধুসেবার কথা শ্রুতিতেও দেখা যায়, যথা—“দেবতাজ্ঞানে বৈষ্ণব-অতিথির সেবা করিবে ।” সেই সাধুসেবা দ্বারাই যে ভক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

নৈষাং মতিস্তাবদ্রুকক্রমাজ্জিৎ, স্পৃষ্টত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং, নিক্ষিঞ্চনান্যং ন বৃণীত যাবৎ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

অশাস্ত ইন্দ্রিয়, গৃহত্রত, বহিস্মৃখ জনগণের মতি কিছুতেই অনর্থোন্মূলকারী শ্রীভগবানের চরণকমল স্পর্শ করিতে পারিবে না, যে-পর্যন্ত না ঐসকল ব্যক্তি নিক্ষিঞ্চন মহাত্মভব বৈষ্ণবগণের পদরজে অভিষিক্ত হন ।

অনন্তর দেবতা অর্থাৎ ভগবদ্জ্ঞানে গুরুসেবা প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা, (তৈত্তিরীয় শ্রুতির ১ম বল্লীর ১০ম অনুবাক্)—“আচার্য্যদেবো ভব ।” “দেবতাজ্ঞানে আচার্য্যের সেবা করিবে” ।

ঋতাশ্রতর উপনিষদেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

যস্ত দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তন্ত্রৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাম্মনঃ ॥ (ঋতাশ্রঃ ৬।২৩)

“যাঁহার পরমদেবতার (বিকৃতে) পরাভক্তি আছে, আবার যেমন দেবতাতে তেমনই গুরুদেবেও পরাভক্তি বর্তমান, সেই মহাত্মার নিকট শ্রুতি উপদিষ্ট হইলে একমাত্র তাঁহারই হৃদয়ে শ্রুতি-তাৎপর্য প্রকাশিত হয়।” গুরুসেবাদ্বারাই যে ভক্তি লাভ হয়, তাহা ভাগবতের বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যতে জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাঙ্গে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ ।

অমায়মাত্মবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্ট্যেদাত্মাত্মদো हरिः ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

প্রবুদ্ধ ঋষি কহিলেন,—অতএব যিনি উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সদগুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিবেন। সেই সদগুরুর লক্ষণ এই যে, তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে নিপুণ ও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে নিমগ্ন এবং জড়াভিনিবেশজ কাম, ক্রোধ ও লোভাদিতে বশীভূত নহেন। শ্রীগুরুদেবকে আত্মার সদৃশ প্রিয় ও ভগবানের তুল্য আদর করিয়া নিষ্কপট গুরুসেবা-সহকারে যে ধর্মদ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সদগুরুর নিকট হইতে সেই ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা করিবে।

অবাণ্ড-পঞ্চসংস্কারো লব্ধদ্বিবিধভক্তিকঃ ।

সাক্ষাৎকৃত্য हरिं তস্ত ধ্যামি নিত্যং প্রমোদতে ॥

অত্যাগত ভক্তিভেদ-প্রদর্শনার্থ প্রবুদ্ধঋষি কহিলেন,—যিনি পঞ্চবিধ সংস্কার এবং বৈধ ও রাগাভ্যুগ এই দ্বিবিধ ভক্তিতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করত তাঁহার নিত্যধামে সেবানন্দে নিত্যকাল বিরাজ করিবেন।

সেই পঞ্চ সংস্কার কি কি, তাহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে ; যথা, পান্মোত্তর-ধোও,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মস্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটি সংস্কার দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তি উদ্ভব হয়। প্রথমে—‘তাপ’ শব্দের অর্থ তপ্তচিহ্নাদি ধারণ অর্থাৎ ‘তপ্তমুদ্রা ধারণ’—ইহাতে হরিনামাদি মুদ্রা ধারণই লক্ষিত হয়। তপ্ত-চক্রাদি-ধার কলিহত জীবের পক্ষে দুষ্কর বিবেচনা করিয়া পতিতোদ্ধারণ ভগবান্ শ্রীমন্নৃপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাচীন মহাজন-কর্তৃক বীকৃত, চন্দন-বারা নামা নের আত্ম

প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন,—

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমক্ষয়েচ্চন্দনাদিনা।

স লোকপাবনো ভূত্বা তস্মৈ লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ (স্মৃতিবচন)

“যিনি চন্দনাদি দ্বারা নিজগাত্রে হরিনামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোক-পাবন হইয়া ভগবন্তের প্রাপ্ত হন।” ‘পুণ্ড্র’-শব্দে উর্দ্ধপুণ্ড্র। তাহা শাস্ত্রে বহুবিধ উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ হরিপদাকৃতি দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্রকে বিশেষ শুভাবহ করিয়া থাকেন। উর্দ্ধপুণ্ড্রের নামান্তর—‘হরিমন্দির তিলক’। হরি-দাসত্ববোধক কোন একটা বৈষ্ণব-নাম-গ্রহণকে বৈষ্ণবগণ ‘নাম’ বলিয়া থাকেন। যে-সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা-প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটা হরিদাস্তম্ভক ‘নাম’ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্তির অমুরূপ অষ্টাদশাক্ষরাদি জপ্য মন্ত্রই ‘মন্ত্র’ নামে উক্ত। ‘যাগ’ শব্দে, শালগ্রামাদির পূজা। এই পঞ্চ-সংস্কার-বিষয়ে বহু বহু প্রমাণ বহু পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।—

নবধা ভক্তিবিধিরূচিপূৰ্ণা দেধা ভবেদ্ যদা কৃষ্ণঃ।

ভূত্বা স্বয়ং প্রসন্নো দদাতি তত্তদীপিতং ধাম ॥

অবগ-কীর্তনরূপা যে নববিধা ভক্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে, উহা বৈধী ও রাগানুগ-ভেদে দ্বিবিধ। এই ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া ভক্তগণকে স্বয়ং তত্তদ্বাস্তিত ধাম প্রদান করেন।

ভক্তিভেদে ভজনীয় বস্তুরও ভেদ দৃষ্ট হয়। বৈধীভক্তি দ্বারা ভগবান্ চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ ইত্যাদি রূপভেদে পূজিত হন এবং ঋচিগার্গে রূপানুগ ভক্তিদ্বারা অপ্ৰাকৃত দ্বিভুজ বিগ্রহ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরিপূজিত হইয়া থাকেন। বৈধী ভক্তির অঙ্গসমূহ এই—“শ্রীতুলসী, অশ্বখ, ধাত্রীপূজন, শ্রীমথুরাদি-ধামে বসতি অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলে এই শরীরের দ্বারা, সামর্থ্যভাবে মানসে তত্তৎ ধামে বাস বুঝায়। জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতি হরিব্রতের সম্মান। ঐ সকল তিথি অশ্বোদয়-বন্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই সকল কথার বিস্তারিত বহু বিচার আছে।”

স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ—এই ত্রিবিধ ব্যক্তি ভক্তির অধিকারী। তন্মধ্যে স্বনিষ্ঠ ব্যক্তি কোনও একটা আশ্রমে অবস্থানপূর্বক নিজ বর্ণাশ্রমানুযায়ী অহিংস-কর্ম ফলোদয় পর্য্যন্ত নিষ্কামভাবে আচরণ করিবেন। নিরপেক্ষ পুরুষ হরিনিষ্ঠ; তিনি মানসে শ্রীহরির অর্চনাদি করেন। তিনি কোনও আশ্রমের অন্তর্গত নহেন বলিয়া তাঁহার স্বরূপেই কর্মত্যাগ হইয়াছে; এবং যিনি পরিনিষ্ঠিত পুরুষ, তিনি

আশ্রমস্থ। তিনি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোক সংগ্রহের জন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ভক্ত্যুদ্দেশক কর্মের প্রক্রিয়ার অহুষ্ঠান করেন; কিন্তু ভক্তির প্রাধান্ত ত্যাগ করেন না অর্থাৎ ভগবৎসেবাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহা ভুলেন না। তিনি যত্ন-সহকারে দশবিধ-নামাপরাধ পরিবর্জন করিবেন—“দশনামাপরাধাংস্ত যত্নতঃ পরিবর্জয়েৎ।”

যানাদিযোগে হরিমন্দিরে গমনাদি সেবা-অপরাধের বিষয় বরাহ-পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে; স্মৃতরাং সেইসকল বর্জনীয়। নিরন্তর হরিসেবা দ্বারা সেইসকল সেবা অপরাধের স্থালন হইতে পারে। পদ্মপুরাণে যে-সকল নামাপরাধ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিয়ে বর্ণিত হইল,—(১) শ্রীহরিসেবাপরায়ণ সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সঙ্গুপ্তর নিন্দা, (৩) দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইহাদিগের গুণ-নামাদিসকল বুদ্ধি দ্বারা পৃথকরূপে দর্শন, অর্থাৎ ‘সদাশিব’ একটি পৃথক্ স্বতন্ত্র শক্তি-সিদ্ধ ঈশ্বর এবং ‘বিষ্ণু’ একটি পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহুবিশ্বর-বাদ আসিয়া পড়ে। তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্তভক্তির বাধা জন্মে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্বৈশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব। অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তিসিদ্ধতা নাই—এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। (৪) শ্রুতি ও তদনুগ সাত্ত্বত বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্থ তমাত্র মনে করা, (৬) রাম-কৃষ্ণাদি নাম ঋক্ষিগণের কার্য্য-সিদ্ধির জন্ত কল্পিতমাত্র ইত্যাদি কল্পনা, (৭) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, (৮) বর্ণাশ্রম ও দান-ধর্ম্মাদি সমস্ত শুভদ কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ সর্বকর্ম্ম-ফলত্যাগরূপ ত্রাসধর্ম্ম, বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদির সহিত হরিনামের সাম্যবুদ্ধি, (৯) অশ্রদ্ধালুকে অর্থ-যশঃলোভে হরিনাম মহামন্ত্র দান, (১০) এই মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে প্রীতি-রহিত থাকা—এই দশবিধ অপরাধ যত্নের সহিত বর্জন করিতে বহুস্থানে শাস্ত্রে ব্যবস্থা লিখিত আছে। এইরূপ দশ অপরাধ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। মহাজনগণ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নিত্য-শান্তিপ্রদ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন। এই কথা ও কার্য্য সর্বসময় স্মৃতিভাবে পালিত হইলে, আমরাও অবশ্য নিত্যসেবানন্দ-লাভ করিতে পারিব।

বিশুদ্ধ শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার অশুদ্ধতা

আমরা পূর্বে বহুবার শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার বহু ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছি। পঞ্জিকাখানির নামে “বিশুদ্ধ পঞ্জিকা” এইরূপ না লিখিয়া “অশুদ্ধ পঞ্জিকা” লিখিলেই আমরা নিশ্চিত হইতে পারিতাম। জনৈক পরশ্রী-কাতর, আত্মনাম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত অশুচিত-বাম বর্ষ একখানি বেনামী পত্রের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমরা নাকি ‘শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা’ অনুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি। উক্ত ‘অশুচিত বর্ষ’ বেনামদারের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্তা—নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় লিখিত যে উপবাসাদির ব্যবস্থা; তাহা কি বৈষ্ণবগণের পালন করা কর্তব্য নহে? তবে ঐ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইল কেন? ঐ পঞ্জিকা মানিয়া লওয়ায় আমাদের যে ক্রটি, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে কোন আপত্তি নাই। কারণ ‘বিশুদ্ধ পঞ্জিকা’ দেখিয়া কাজ না করিলে কি দেখিয়া কাজ করিব? কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখনই বিশেষ করিয়া উক্ত পঞ্জিকার ব্রত-উপবাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, তখনই তাহার মধ্যে মারাত্মক ভুল দেখা যায়। আমরা অশুচিত বর্ষার বেনামী পত্রের মূর্খতা নিবারণ-কল্পে সময়াত্তরে উপযুক্ত লগুড়ের নীতি অবলম্বন করিব।

বর্তমানে পূজাপাদ শ্রীশ্রমণ মহারাজের সম্পাদিত শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার অসংখ্য ভুলের মধ্যে আরও একটি মারাত্মক ভুলের উল্লেখ করিয়া গোড়ীয়-বৈষ্ণব সাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি।—

আগামী ২৮শে পৌষ, ১২ই জানুয়ারী, সোমবার—“দিবা ৯৫৭ মধ্যে একাদশীর পারণ” নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা একটি মারাত্মক ভুল। একাদশীর পরদিন দ্বাদশীদিবসে পূর্নাক্ষে পারণের ব্যবস্থা আছে—ইহা সকলেই অবগত আছেন। মাননীয় শ্রমণ মহারাজ এইরূপ বিধি উল্লঙ্ঘন করেন নাই সত্য। তবে তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, দ্বাদশীর প্রথম-পাদের নাম ‘হরিবাসর’ এবং দ্বাদশীর প্রথম-পাদের মধ্যে পারণ নিষিদ্ধ। পূর্নাক্ষের মধ্যে পারণ করিতে হইলেও, দ্বাদশীর প্রথম-পাদ বাদ দিয়া পরে পারণ করিতে হইবে—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিচার। অতএব ২৮শে পৌষ, সোমবার—দ্বাদশীর প্রথম-পাদ (তাঁহার তিথি-মানের হিসাব-অনুসারে) “দিবা ৭১৬ মিনিটের মধ্যে পারণ” হইতে পারে না। তাহার পর পূর্নাক্ষ-মধ্যে পারণ হইবে। শ্রমণ মহারাজের পঞ্জিকায় লিখিত “দি ৯৫৭ মিনিটের মধ্যে পারণ” বলিলে, সূচ্যোদয় হইতে উক্ত সময়ের যে-কোন সময় পারণ করিলেই চলিবে—এইরূপ

বুঝায়। হতরাং তাঁহার পঞ্জিকায় বিশ্বাস করিয়া সূর্য্যোদয়ের পর দি ৭।১৬ মিনিটের মধ্যে যদি কেহ পারণ ক'ন, তবে হরিবাসরে অন্ন-ভক্ষণজনিত যাবতীয় পাপ ও দোষ অবশ্যই স্পর্শ করিবে। শ্রমণ মহারাজ কি তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন?

উক্ত অশুদ্ধ পঞ্জিকাকর্তার হাতে-কলমে দোষ ধরিয়া দিলেই তিনি উত্তরে বলিয়া থাকেন—আমি ভূমিকায় সমস্ত ব্যবস্থা দিয়া রাখিয়াছি। অতরাং দিন-পঞ্জিকায় ভুল থাকিলেও তাহা ভুল নহে। এস্থলে আমাদের বক্তব্য—তিনি আগামীতে দিন-পঞ্জিকা বাহির করত প্রতারণা না করিয়া কেবল ভূমিকা প্রকাশ করিলেই ‘বিশুদ্ধ পঞ্জিকা’ প্রকাশিত হইয়া যাইবে! যাহারা হরিবাসরে উপবাস করিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ শ্রমণ মহারাজের ভূমিকা দেখিয়াই ঘরে বসিয়া হিসাব করিতে করিতে পঞ্জিকাকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিক্ষেপ করিবেন! ভূমিকায়ও গলদ বাহির হইলে তিনি হয়ত বলিবেন,—“আমি ত’ লিখিয়াছি, ‘ত্রীপঞ্জিকায় ত্রীহরিভক্তিবিলাসের বিচার অনুসৃত হইয়াছে’। অতরাং দিনপঞ্জী দেখিবার আবশ্যক নাই, হরিভক্তিবিলাসেই সমস্ত বিশুদ্ধ মত দেওয়া আছে।” এইরূপ কৈফিয়ৎ দিলে কি স্মৃতিসমাজ স্তম্ভিত হইবে? মূল স্মৃতিগ্রন্থ পড়িয়া বা পঞ্জিকার ভূমিকা দেখিয়া দিন স্থির করিতে পারিলে এত পরিশ্রম করিয়া দিন-পঞ্জিকা লিখার কোন আবশ্যক হইত না। যাহা হউক, আমরা নিম্নে উক্ত পঞ্জিকার ভ্রান্তি-স্থলের পরিবর্তে বিশুদ্ধ অংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

“১২ মাঘ, ২৮ পৌষ, ১২ জানুয়ারী, সোমবার * * * দি ২।৫৭ মধ্যে একাদশীর পারণ” স্থলে “দিবা ৭।১৬ মিঃ গতে ২।৫৭ মধ্যে পারণ” হইবে।

সাবু সাবধান! আপনারা যেন শ্রমণ মহারাজের প্রকাশিত “সচিত্র বিশুদ্ধ ত্রীনবদীপ-পঞ্জিকা”র উপর নির্ভর করিয়া ব্রত-উপবাসাদি পালন না করেন।

ত্রীনবদীপ-পঞ্জিকায় ব্রতাদি-বিষয়ে অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত পঞ্জিকার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বিবিধ প্রবন্ধে জনসাধারণকে অনেক সাবধান করিয়াছি। তজ্জন্তু বিভিন্ন স্থান হইতে আমাদেরিগকে প্রকৃত বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশ করার জন্ত বহু স্মৃতিমণ্ডলী অনেক আবেদন-নিবেদন জানাইতেছেন। অতরাং ত্রীগৌড়ীয়-বদান্ত সন্থি বাধ্য হইয়া আগামী বর্ষে বিশুদ্ধভাবে পঞ্জিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিতেছেন।

শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন যে, এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীবদ্রীনাথ ও কেদারনাথ পরিক্রমার বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। আনন্দবাজার ও যুগান্তর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতেও এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব-নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন ও আহ্বান-অনুসারে বিগত ১২শে ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮টার সময় ডুন ঐক্সপ্রেসে সমিতির সংরক্ষিত (Reserved) গাড়ীতে প্রায় একশত যাত্রী শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ-পথে হরিদ্বার অভিমুখে মহাসমারোহের সহিত যাত্রা করেন। অন্যান্য পরিক্রমার দ্বায় এবৎসরও বদরিকাশ্রমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমাকারী সকলেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ বাম্পীয়যানের সংরক্ষিত কক্ষাভ্যন্তরে স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িয়া দেয়। তখনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ও গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক সমাপনান্তে নৈশভোগ প্রদত্ত হয়। তৎপরে সমস্ত যাত্রীবৃন্দকে পুরী, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ মহাপ্রসাদ অপরিমিত পরিমাণে পরিবেশন করা হয়। ইতোমধ্যে ঐক্সপ্রেস্ গাড়ী বর্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথা হইতে কয়েকজন মহিলা-ভক্ত বদ্রীনারায়ণ-যাত্রীস্বরূপে পূর্বনির্দেশ-অনুসারে আমাদের সংরক্ষিত কক্ষে আরোহণ করিলেন। কয়েকজন ব্রহ্মচারী ব্যতীত অধিকাংশ যাত্রীই প্রসাদ সেবাস্তে ক্রমশঃ নৈশ-নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ব্রহ্মচারীবৃন্দ যাত্রিগণের সুবিধার জ্ঞ ও তাঁহাদের সন্দের দ্রব্যাদি সংরক্ষণ-কল্পে সারারাত্রি প্রহরী-স্বরূপে জাগ্রত ছিলেন। বাম্পীয় যান হ-হ শব্দে চলিতে লাগিল।

যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই বদ্রীনারায়ণ-পথের ইতিহাস তাঁহাদের স্বদেশবাসী বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত ও দ্রুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহারা অশ্রুশ্রবণে ও নিরাপদে পরিক্রমা করিবার প্রার্থনা জানাইয়া কৃপা-আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলে সকলকেই অভয় ও আশ্বস্ত করিয়া জানান হয় যে, “আপনারা যাহাদের নিকট বদরিকাশ্রমের দুর্গমতার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-মাসে হিমালয়-পর্বতের তীর্থস্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলকেই কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে-সময়ে যাইতেছি, ইহা শ্রীবদরীনাথ, তুঙ্গনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-সমূহ পরিক্রমার সর্বোত্তম সময়। ভাদ্র-মাসেই অর্থাৎ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই বদরিকাশ্রম যাতায়াতের নিরাপদ সুবর্ণ সুযোগ। অধিকাংশ লোকই ঐ অঞ্চলের

বর্তমান সময়ের আবহাওয়ার সহিত পরিচিত না থাকায় তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়া থাকেন। আপনারা কোনপ্রকার ভীত হইবেন না। নিষ্কিষ্মে অনায়াসে আপনাদের পরিক্রমা সুসম্পন্ন হইবে।”

যাত্রিগণের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—“বদরিকাশ্রমের পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়া এত ক্রেশ স্বীকার করিয়া তথায় যাইবার সার্থকতা কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই তথায় যান নাই, আগমদের যাইবার সার্থকতা কি?” এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে—বিষ্ণুতীর্থ মাত্রই বৈষ্ণবগণের যাওয়া কর্তব্য। তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য সাধুসঙ্গ হরিকথা শ্রবণ ও তীর্থাদির মাহাত্ম্য আলোচনামুখে কর্ণের দ্বারা শ্রীধাম ও তীর্থ-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তজ্জন্মই প্রতিবৎসর আপনাদিগকে ভারতের সমুদয় তীর্থস্থান পরিভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। সমিতির এইরূপ সেবানুষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আধুনিক বহু বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসীই বলিয়াছিলেন,—

“তীর্থযাত্রা পরিশ্রম,

কেবল মনের ভ্রম,

সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ। (শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম)

মহাজনের বাক্য সর্বদাই শিরোধার্য। তবে উক্ত উপদেশটি কন্ঠী, জ্ঞানী, অগ্রাভিলাষী প্রভৃতিদের পক্ষেই প্রযুক্ত। যাহারা হরিকথা-প্রচার, সাধুসঙ্গ-লাভ ও জগন্মঙ্গল-কামনায় রত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার বাহ্যার্থ প্রযুক্ত নহে। উক্ত উপদেশের অন্তর্নিহিত সত্যই—ভগবান্ ও তদ্ধাম-মহিমা কীর্তনমুখে সেবাই সর্বতোভাবে সকল সাধকের কর্তব্য। আনন্দের বিষয় এই যে, যাহারা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এইরূপ প্রচারের প্রতি কটাক্ষ করিতেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ প্রচার-ধারার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাহাই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে বজ্রীনারায়ণ-তীর্থ দর্শন-প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ পার্শদসেবক শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ার বিশেষভাবে আলোচ্য—

(তা’সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।)

বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ ॥

কতদিন নয়-নারায়ণের আশ্রমে।

আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জনে ॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে ।

ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে ॥

সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা ।

প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা ॥

(চৈ: ভা: আ: ২।১৪০-১৪৩)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবদ্রীনারায়ণ-ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং তথাকার যাবতীয় তীর্থাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন । বৃদ্ধ ব্যাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আতিথ্য করেন ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই নিত্যানন্দ । গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধব-গোড়ীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত । শ্রীমন্ মহাপ্রভু মাধব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকেই দীক্ষা-গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন । তদবধি শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর অঙ্গুগত রূপাঙ্গ গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধব-গোড়ীয় নামে অভিহিত । সুতরাং মধ্বমুনিই আমাদের পূর্বাচার্য্য । গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্বাচার্য্য আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি বদরিকাশ্রমে আসিয়া শ্রীব্যাসের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া-ছিলেন । তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সাক্ষাৎ-শিষ্য বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন এবং সেইভাবেই তিনি সর্বত্র পরিচিত । মধ্বমুনি শ্রীব্যাসদেবকে বিষয়জাতীয় ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানেন এবং ব্যাসের অর্চাবিগ্রহ পূজাকল্পে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী ব্যাসের শক্তিরূপে স্থাপিতা হইয়া থাকেন । ইহাই মধ্বাচার্য্যের ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য । অত্ৰ সর্বসম্প্রদায়েই শ্রীব্যাসদেব ভগবানের শক্ত্যাবিষ্ট অবতাররূপে পূজিত হইয়া থাকেন ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মাধবগোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য, এবং ঐকান্তিক গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিগুরু ও মূলপুরুষ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু উভয়েই বদরিকাশ্রম তীর্থ-ভ্রমণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন । এতদ্ব্যতীত জগৎগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহুবীর বদরীক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । নানা-প্রকার বাধাবিল্ল উপস্থিত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত অভিলাষ কার্য্য পরিণত হয় নাই । সুদীর্ঘকাল পরে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির চেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছে । অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু সাক্ষাৎ প্রকট-বিগ্রহে বদরীনাথে না

গোলেও তাঁহাদের অর্চা এই বৎসর তথায় যাইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তগণের স্বক্কে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চা অত্যাচ্চ হিমালয়ের পথসমূহের দুর্গমতা অগ্রাহ্য করিয়া তত্ত্ববাহু পূরণের জন্য শিবিকাযোগে বিশালাক্ষেত্রের তীর্থসমূহ তীর্থীভূত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনাদের স্বক্লম সাধু এবং পূর্ব-আচার্য্যবর্গের অনুষ্ঠিত; স্মরণ্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা নির্বিশেষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদেবের কৃপায় তাঁহাদের আনুগত্যে পরিক্রমা-সেবা সুসম্পন্ন করিব। (ক্রমশঃ)

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬; পৌষ—১৩৫৯

১৮ নারায়ণ, ৪ পৌষ, ১২ ডিসেম্বর, শুক্রবার—গৌরা-তৃতীয়া রা ২।৫৬।
শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব।

২৬ নারায়ণ, ১২ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর, শনিবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৪৫।
পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

২৭ নারায়ণ, ১৩ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর, রবিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ২।৫২।
পূর্বাহ্ন ২।৫২ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

৩০ নারায়ণ, ১৬ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর, বুধবার—পূর্ণিমা দি ১০।১২।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।


৩ মাঘ, ১২ পৌষ, ৩ জানুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ২।৪৮। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৫ মাঘ, ২১ পৌষ, ৫ জানুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ৭।৬। শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন যাবতীয় গঠনসমূহে বিরহ-মহোৎসব।

৯ মাঘ, ২৫ পৌষ, ৯ জানুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণ-নবমী রা ১।১১। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মাঘ, ২৭ পৌষ, ১১ জানুয়ারী, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১।২৫।
ঘট্টিলা একাদশীর উপবাস।

১২ মাঘ, ২৮ পৌষ, ১২ জানুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১২।৪৮।
দিবা ৭।১৬ গতে পূর্বাহ্ন ৯।৫৭-মধ্যে একাদশীর পারণ।

ধর্মঃ সমুদ্ভিতঃ পুংসাং বিষকুসেন-কথাভূ যঃ ।	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে ।</p> 	নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না সুপ্রসীদতি ॥		
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্রম-পরসন্ন । অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূ ॥	অশ্রু ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পশু সেই শ্রম ॥	
৪র্থ বর্ষ	সঙ্কর্ষণ, ১৪ নারায়ণ, ৪৬৬ গৌরাঙ্গ সোমবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯; ইং ১৫।১২।৫২	১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

- ১। মার্কণ্ডেয়স্ততঃ শ্রদ্ধা তীর্থাটন-পরিশ্রমম্ ।
দর্শনং নারদস্তাসীন্মথুরায়াং ষড়ানন ॥৪৮॥
- ২। পূজিতো বন্দিতস্তেন নারদো মুনিসত্তমঃ ।
কথয়ামাস মাহাত্ম্যং বদর্য্য যত্র কেশবঃ ॥৪৯॥

নারদ উবাচ—

- ৩। কিমিতি ক্লিষ্টতে সাধো তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ ।
বদর্য্যাখ্যং মহাক্ষেত্রং সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥১০॥
- ৪। তত্র যাহি যত্র সান্ধাদ্রিং পশ্যসি চক্ষুষা ।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়োপেতো বিশালামাযষাবৃষিঃ ॥১১॥
- ৫। স্নাত্বা শিলামুপবিশন্ জজাপাফ্টাক্ষরং পরম্ ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ত্রিরাত্র্যন্তে জনার্দনঃ ॥১২॥
- ৬। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-বিভূষণম্ ।
তং দৃষ্ট্বা সহসোথায় প্রেমগদগদয়া গিরা ।
তুষ্টিব প্রণতো ভূত্বা মার্কণ্ডেয়ো জনার্দনম্ ॥১৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

- ৭। অশাশ্বতে চ সংসারে সারে তে চরণাশ্বজৈঃ ।
সমুদ্রারঃ কথং নৃণাং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর ॥১৪॥
- ৮। তাপত্রয়-পরিশ্রান্তমনেকাজ্ঞান-জুস্তিতম্ ।
সংসার-কুহরে ভ্রান্তং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥১৫॥
- ৯। অনেক-ঘোনিযন্ত্রেষু নিঃসৃতেন্তনুবেদনাম্ ।
গর্ভবাসকৃতাং প্রাপ্তং ত্রাহি মাং করুণাশ্বধে ॥১৬॥
- ১০। কুমিভঙ্কিত-সর্ববাস্তং ক্ষুৎপিপাসাকুলঞ্চ হি ।
অন্ত্রমালাকুলে গর্ভে ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥১৭॥
- ১১। অমেধ্যাদিভিরালিপ্তং নিশ্চেষ্ট-শ্রমমাকুলম্ ।
স্বরন্তং নিজকর্মোথং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥১৮॥
- ১২। বচনাদাননিঃশ্বাসাশক্তং ভয়মুপাগতম্ ।
গর্ভবাসমহাদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥১৯॥
- ১৩। জরা-মরণ-বাল্যাঙ্গি-দুঃখ-সংসার-পীড়িতম্ ।
দুঃখাকৌ স্তম্ববুদ্ধিং মাং কৃপাসিঞ্চো প্রপালয় ॥২০॥

১৪। কদাচিৎ কৃমিতাং প্রাপ্তং কদাচিৎ শ্বেদ-জন্মিতাম্ ।

“ কদাচিদ্ধুস্তিজ্জহৎ কদাচিন্নরতাং গতম্ ॥৬১॥

১৫। সর্বযোনি-সমাপন্নং বিপন্নং বিগতপ্রভম্ ।

অনাথং হ্রাং সমাপন্নং ত্রাহি মাং কুপয়াচ্যুত ॥৬২॥

১৬। উপস্থানমিদং পুণ্যং সর্বপাপ-প্রণাশনম্ ।

শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে গতিম্ ॥৬৩॥

ইতি শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়ব্রহ্ম-
বদরীনারায়ণ-স্ততিবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১-২ । (শিব বলিলেন,—) হে ষড়ানন ! অনন্তর মার্কণ্ডেয় তীর্থ-পর্যটনের

শ্রমের বিষয় আলোচনা করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় নারদের দর্শন
লাভ করত সেই মুনিসত্ত্বমের পূজা ও বন্দনা করেন । নারদ মথুরায় অবস্থান-
পূর্বক হরির আবাস বদরীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিলেন ।

তিনি মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—॥৪৮-৪৯॥

৩-৫ । নারদ বলিলেন,—হে সাধো ! তুমি তীর্থাটন-পরিশ্রমে কেন ক্লিষ্ট
হইতেছ ? বদরী-নামক মহাক্ষেত্রের সম্মিধানে হরি নিত্য বিদ্যমান ।

সেই বদরীবনে গমনপূর্বক সাক্ষাৎ হরিকে চক্ষু দ্বারা দর্শন কর । মুনি
মার্কণ্ডেয় দেবর্ষি নারদের বাক্যে বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিশাল
বদরীক্ষেত্রে গমনপূর্বক স্নান করিয়া শিলায় উপবেশন করত অষ্টাঙ্গের পরম মন্ত্র
জপ করিতে লাগিলেন । অনন্তর রজনীত্রয় অতীত হইলে ভগবান্ জনার্দন প্রসন্ন
হইয়া মার্কণ্ডেয়-সমীপে উপনীত হইলেন ॥৫০-৫২॥

৬ । মার্কণ্ডেয় জনার্দনের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-শোভিত ও বনমালা-বিলম্বিত
রূপরাশি দর্শন করিয়া সহসা উখিত হইলেন, এবং প্রণত হইয়া প্রেমগদগদ বাক্যে
তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

৭ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অনিত্য সংসারে আপনার পাদপদ্মই একমাত্র
সার । সংসাররত নরগণের কিরূপে উদ্ধার হইবে ? হে পরমেশ্বর ! আমাকে
ত্যাগ করুন ॥৫৪॥

৮। হে অচ্যুত ! আমি এই সংসারকুহরে পড়িয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রেয় পরিশ্রান্ত ও অনেকরূপ অজ্ঞানে বিজৃম্বিত হইয়াছি, কৃপাপূর্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥৫৫॥

৯। হে করুণানিধে ! আমি অনেক যোনিষন্তে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভবাস-ক্লেশ ও পরে নির্গমনের বেদনা অহুভব করিয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥৫৬॥

১০। আমি যখন নাড়ীমালাকুল গর্ভে বাস করিয়াছি, তখন আমি ক্ষুধায় পিপাসায় আকুল হইলেও কৃমিকুল আমার সর্বাঙ্গে দংশন করিয়াছে ; হে মধুসূদন ! আমাকে ত্রাণ করুন ॥৫৭॥

১১। গর্ভবাস-সময়ে আমার কোনই চেষ্টা ছিল না, তথাপি আমি শ্রমাকুল হইয়াছি। যখন অতি অপবিত্র মল-মুত্রাদিতে আমার সর্ব শরীর বিলিপ্ত হইয়াছিল তখন আমি কেবল আমার স্বীয় কর্ম স্মরণ করিতাম ; হে মধুসূদন ! আমাকে ত্রাণ করুন ॥৫৮॥

১২। গর্ভবাসে পরিভাষণ, আদান বা নিশ্বাস-ত্যাগ-সামর্থ্য থাকে না, সর্বদা ভীত হইয়া বাস করিতে হয় ; হে মধুসূদন ! গর্ভবাসে অতীব দুঃখ, আমাকে ত্রাণ করুন ॥৫৯॥

১৩। জরা, মরণ ও বাল্যাদি দুঃখে সংসার অতীব দুঃখগম্য ; কিন্তু সেই ক্লেশ-বহুল সংসার-সাগরে আমার স্নখবুদ্ধি হইয়াছে ; হে কৃপাসিন্ধো ! আমাকে রক্ষা করুন ॥৬০॥

১৪-১৫। আমি কখনও কৃমিযোনি, কখন শ্বেদজ-জন্ম, কদাচিৎ উদ্ভিদযোনি এবং কখন নরদেহ এইরূপে সর্ববিধ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছি, আমার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে, হে অচ্যুত ! আমি অনাথ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, কৃপাপূর্বক আমাকে ত্রাণ করুন ॥৬১-৬২॥

১৬। এই পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণে সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব এই উপাখ্যান শ্রবণ করে বা কাহাকেও শ্রবণ করায়, তাহার গোবিন্দে গতি লাভ হয় ॥৬৬॥

ইতি শ্রীকন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে মার্কটেশ্বরকৃত-
বদরীমারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় ।

সুনীতি ও দুর্নীতি

সুনীতি ও দুর্নীতির সংজ্ঞা নিরূপণ

সংসারে যাহা গ্রামসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্বারা জগতের মঙ্গল হয় বলিয়া উহাকে 'সুনীতি' বলে। সুনীতি-প্রভাবে সাংসারিক অমঙ্গলের কথা থাকে না ; কিন্তু যাহাতে নিজের অপকার ও পরের অপকার হয়, তাহা গ্রামপুঙ্খ নহে। উহা অগ্রায় ও অবৈধ বলিয়া 'দুর্নীতি' নামে কথিত হয়।

দুর্নীতির উদাহরণ ও তাহার প্রতিকার

যে নীতি বা নীতি-বিগর্হিত ক্রিয়া সংসারের অমঙ্গল সাধন করে, তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়—সমাজহিতৈষী সকলেই এই কথা সমস্তরে অভিব্যক্ত করেন। মিথ্যাকথা বলা, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিয়া লোককে বিপদে পাতিত করা সামাজিকের চক্ষে গ্রামসঙ্গত নহে, সুতরাং উহা—দুর্নীতি। পরদ্রব্য অপহরণ, পরদার অপহরণ বা ঐ সকল অপকার্যের সহায়তা করা, উৎকোচের আদান-প্রদানের দ্বারা নিজেকে বা অপরকে লাভবানু করা—এসকলই দুর্নীতিপর্যায় গণিত। নীতিবিরোধী ক্রিয়াগুলি অপরাধ-মধ্যে গণ্য হওয়াতে অপরাধীকে পাপী ও দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিচার করা হয়। পরহিংসা, পরদ্রোহ স্থলস্থল-ভেদে নানা প্রকার পাপ আনয়ন করে। লৌকিক স্মার্তগণ এই সকল পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করাইবার জন্ত পাশব-নীতি লঙড়ের ব্যবস্থা করেন। মানুষ ক্রেশ চায় না, সুতরাং অপর মানুষের বিবেচনায় তাহাকে ক্রেশের অন্তর্ভুক্ত করাইলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষালাভ ঘটিবে।

সুনীতি-পরায়ণ জনের আদর, দুর্নীতিক্রমের অনাদরই কর্মীর নীতি

গ্রামপরায়ণ জনগণকে লোকে আদর করে এবং পুণ্যবান বলে। গ্রামপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপের সংসর্গে আত্মনিয়োগ করেন না। পাপী ও পুণ্যবানের কথা জগতে বহু অনাদর ও আদর লাভ করিয়াছে। ইহা কর্মীদিগের কৃত্যের অন্তর্গত হওয়ায় একজন কুকর্মী, অপর জন সৎকর্মী নামে আখ্যাত হন। পাপের ফলে অধর্মবশে জীবের দুর্গতি ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে। পুণ্য-প্রভাবে আত্মমঙ্গল সাধিত হয় ও অগ্ন্য পুণ্যবানের ক্রিয়ায় উপকৃত হয়। সুতরাং প্রপঞ্চে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্যের স্বখাণ্ডি-বাহা মানবের চিন্তা-শ্রোত অধিকার করে। এইগুলি কর্মীর নীতি মাত্র। নৈয়ামিকগণ কর্মীর নীতিতে আবদ্ধ হইয়া একপ্রকার তর্কহত-বুদ্ধিবশে

সংকল্পের পক্ষপাতী হন ও ভ্রান্তগণের প্রতিকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। জীব যখন আপনাকে সংসারের, সমাজের অংশবিশেষ মনে করেন, তখন তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি উপকারকারীর সহিত সহযোগ ও অপকারকারীর সহিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করে।

জ্ঞানিগণ নীতি-দুর্নীতি হইতে নিরপেক্ষ

জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন বস্তু সহিত প্রীতি স্থাপন বা মৌহর্দ্দ রহিতভাবে আবদ্ধ হইবার বিচার করেন না; তাঁহারা প্রকৃতি সর্গের অতীত বিষয়ের জগৎ অগ্রসর হন।

নীতি-দুর্নীতিজাত পাপ-পুণ্যের হস্ত হইতে নিবৃত্তি-লাভের

জগৎ যোগিগণের যম-নিয়মাদির ব্যবস্থা

এইপ্রকার কৰ্ম্মাগ্রহীর বিচারে সংসারে যোগপদ্ধতির আহ্বান লক্ষিত হয়। নিবৃত্ত-জীবনই পাপ-পুণ্য হইতে জীবকে রক্ষা করিয়া শান্তি দিবে,—এইরূপ ধারণা প্রবল করায়; তখন তিনি পূর্বের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্জিন-বাস ও জাগতিক কার্যে নিরুৎসাহিতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার এতাদৃশ কার্য-সমর্থনের জগৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি আলোচ্য হইয়া পড়ে। **কৰ্ম্মবীরসমূহ** জাগতিক বিচারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহির্জগতের স্থূলহুশ্ম বিষয় হইতে স্বীয় চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার জগৎ যত্নবস্ত হন। কখনও বা বিচারাশ্রয়ে লৌকিক জ্ঞানাহুগমনে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্বিশেষ বা কৈবল্য-বিচারকে আদর করিতে থাকেন। বুদ্ধি সম্প্রদায় যেরূপ ভোগ-তাড়নায় আপনাকে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে নিযুক্ত করে, নিবৃত্তিপরা কৃচি সেরূপভাবে জীবকে কৰ্ম্মবীর সাজাইবার পরিবর্তে ফলভোগ-বাসনা-রহিত জ্ঞানবীর সাজাইবার উত্তেজনা-মূলা কৃচি প্রদান করে। ইহাও কৰ্ম্মচেষ্ঠার রূপান্তর মাত্র।

জ্ঞানীর নৈকৰ্ম্ম্যবাদে আলস্যের প্রশ্রয়হেতু উহা অনাদরণীয়

তজ্জগৎ ইহাকে জ্ঞানচেষ্ঠা-বিচারে নৈকৰ্ম্ম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জাগতিক জাত্যই আরাধ্য বলিয়া প্রতিপাদন করে। নৈকৰ্ম্ম্য-বাদের যে চিত্র নিবৃত্ত-জীবনে কৰ্ম্মীর নগ্নে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রবৃত্ত-কৰ্ম্মী-সম্প্রদায় কেহ বা ভালচক্ষে, কেহ বা মন্দচক্ষে দেখিয়া থাকেন। আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া যাহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন না, তাঁহারা ভিক্ষা-জীবগণকে আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাদৃশ নিশ্চেষ্ট-জীবন জীবকে কুকর্মে লইয়া যাইবে, সুতরাং

কর্মময় প্রবৃত্ত-জীবনই জীবের পক্ষে বরণীয়-বিচারে নৈকস্ম্যবাদের হেয়তা প্রতিপাদন করিতে কচি পোষণ করেন। তাঁহারা জ্ঞানিগণকে নির্বিশিষ্ট ও কর্মজগৎ হইতে নিবৃত্ত মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে আদর করেন না।

নির্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র ও অচিন্মাত্র-বাদের সমন্বয়-চেষ্টা

নাস্তিক্য-বাদেরই নামান্তর বলিয়া অনাদরণীয়

আবার বহির্জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় যাহারা কান্দ হইয়া “আর নাহে বাপ,” বলিয়া স্তব্ধ হন, তাঁহাদের কচিও স্মৃতিপূর্ণ নির্বিশিষ্ট-বিচারের অনুমোদন করে। কর্মফল-ভোগপর-বিচার আশ্রয়-জ্ঞান-রাহিত্যে প্রকৃতিতে লীন হইবার যত্ন দেখায়, আর কতিপয় ব্যক্তি মুক্ত অবস্থায় নির্বিশিষ্টপূর্ণ বিচারে নিমগ্ন হইয়া কেবল-চেতন-নামক চিন্তা-শ্রোতের প্রাধাণ্য দিয়া থাকেন। নৈকস্ম্য-বিচারে অচিন্মাত্রবাদ নামক দুইটা বিচারই গ্রাস্যসত্তা বলিয়া মনে করেন, সেই ভুলে তাঁহারা পরস্পরের বৈষম্য নিরাকরণপূর্ব্বক সমন্বয়বাদী হইয়া চেতনের নিত্য্যাদিষ্টানে রাহিত্য ও সাহিত্যের মধ্যে ভেদ অপসরণ করেন। এই অচিন্মাত্রবাদী, ও চিন্মাত্রবাদী, উভয়ের অবস্থার বৈষম্য কর্ম-বাদের অন্তরালে দৃষ্ট হইলেও উভয়েই যে নাস্তিক্য ও আনুষ্ঠিক্য-বাদ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য-স্থাপনের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া চিদ্বিলাসপরায়াণ সম্প্রদায় এই বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়কে আদর করিতে পারেন না।

চিন্মাত্রবাদীর মুমুক্ষা ও অচিন্মাত্রবাদীর বুভুক্ষা অপেক্ষা

চিদ্বিলাসবাদীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্য স্থাপন

মানবের জাগতিক, চিন্তা-প্রাচুর্য্যে অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদে তাহাদের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করে; যেহেতু চিদ্বিলাসবাদের অবিমিশ্র অস্তিত্ব তাহাদের হৃদয়-সিংহাসনাধিকৃত হয় না। চিদ্বিলাসবাদ চিন্মাত্রবাদের সহিত এক পর্যায়ে গণিত হইবার বিচারে অচিন্মাত্রবাদী কর্মচেষ্টাপর জনগণের চক্ষে দৃষ্ট হন। কিন্তু উহাদের পরস্পরের বৈষম্য-নিরূপণ করিতে প্রপঞ্চোন্মত্ত বুভুক্ষু জীবকুল সমর্থ হয় না। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা এবং এতদুভয়ের গ্রাস ও অগ্রাস, বৈধ ও অবৈধ বিচারি চিদ্বিলাস-ভূমিকায় যাইতে অসমর্থ। মুমুক্ষু জ্ঞান-পদ্ধতির অহুকূলে যে-সকল গ্রাস্য ঈশান, তাহার সহিত অচিন্মাত্রবাদী কর্মীর বিচার-প্রণালীর সঙ্গতি নাই। বন্ধের মোচন-চেষ্টা মুক্তের সেবন-চেষ্টা হইতে পৃথক্, কিন্তু বুভুক্ষু তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া চিদ্বিলাসবাদকে অচিন্মাত্র-বিলাসবাদে পর্য্যবসিত করিবার জন্ত ব্যগ্র হন। আমরা এই প্রকার গ্রাসের অহুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে

পারি না। জাগতিক ভূমিকায় জাগতিক ভূতাকাশে যে স্থনীতি ও কুনীতির বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বিভাগ চিদ্বিলাসময় পরব্যোমে লইয়া যাওয়া ক্ষীণ-বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। চেতনের বিলাসে স্থলতা নাই বা জাগতিক সূক্ষ্মতার প্রতীতির অভাব।

চিন্মাত্রবাদ ও অচিন্মাত্রবাদের অতীত ও পৃথক্ তত্ত্বই চিদ্বিলাসবাদ এবং তাহা মায়াবাদী মুমুকুর আয়ত্তের বাহিরে

জীব যখন বুদ্ধি-নীতি পরিহার করিয়া মুমুক্ষা-নীতির ঢাকা-বাদক সাজেন, তখন তিনি অচিন্মাত্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্রবাদের সম্মান করিতে করিতে যে আত্মবিনাশ করেন, তাহাতে চিদ্বিলাস-বিচারের উপযোগিতা নাই। মুমুকুর নীতি ও দুর্নীতি বিচার-পর্যায় বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হয় না; আবার বুদ্ধি ও মুমুকুর নীতির, বুদ্ধি-মুমুক্ষা-চাঞ্চল্য-রহিত জনগণের পক্ষে উপযোগিতা নাই। চিদ্বিলাস-বাদের নীতি মুমুকুর চিন্মাত্রবাদের নীতির সহিত প্রচুর ভাবে ভেদভাব জ্ঞাপন করে। মুমুক্ষু যে-কালে মায়াবাদী সাজিয়া ব্রহ্মবাদ ও প্রকৃতিবাদের বৈষম্য অপসারিত করিয়া অদ্বয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে চিদ্বিলাসের বিচিত্রতা তাঁহার পক্ষে দুরারোহ হইয়া পড়ে। আধ্যাত্মিক জড়দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-প্রমত্ত চিন্মাত্রদর্শন তাঁহাকে প্রপঞ্চের ধূলিতে লুটাইয়া দেয়। সুতরাং পরব্যোমের বিচিত্রতা তাঁহার দর্শনের অতীত ব্যপার হইয়া পড়ে। বুদ্ধি ও মুমুক্ষা—এই বাসনা-পিশাচীদ্বয় তাঁহার অস্মিতার জননী বা ধাত্রী-বিচারে পরিদৃষ্ট না হইলে তিনি ভক্তিস্থ-সমুদ্রের সন্ধান লাভ করেন; কিন্তু ভক্তি ও মুক্তি, পিশাচীদ্বয়ে তাহার জননী বোধ থাকিলে ভক্তির নিরুপাধিক ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের মঙ্গলময়তায় অবস্থান তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইয়া পড়ে।

চিদ্বিলাসীর প্রতি জ্ঞানীর অবৈধ ধারণা

জ্ঞানীর নীতিতে কর্মপথ বা উপাসনা-পথের আদর নাই। তিনি চিদ্বিলাসময়ী উপাসনাকেও জড়ের বিলাসের সহিত সমস্তরে স্থাপন করায় তাঁহার ত্রায় নৈয়ায়িক চিদ্বিলাসের নিত্যবৃত্তি ভক্তিকেও ক্ষণভঙ্গুর কাম-ক্রোধাদি-পর্য্যয়ে গণনা করেন। সুতরাং নির্দ্বিষ্ট জ্ঞানীর আত্ম-প্রতিরিত বোধের মধ্যে অনাত্মরূপ দুঃসঙ্গ থাকায় সংসঙ্গভাবে ভক্তি-স্থনীতিকে দুর্নীতিপর্য্যয়ে গণনা করিবার ধৃষ্টতা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

জড়েন্দ্রিয়-ভাঙিত জ্ঞানীর ভক্তিবিদ্বেষ দুর্নীতির অন্তর্গত

জড়েন্দ্রিয়ের অসতী উত্তেজনা তাঁহার বৈধ্য বিলুপ্ত করিয়া চিদ্বিলাস-

বৈচিত্র্যের প্রতিকূলে ভক্তিবিশিষ্ট দুর্নীতিপুষ্ট জড়নির্কিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী আসামী-
মাত্রে পরিণত করে; সুতরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মাত্মসন্ধিংসু জ্ঞানীর দুর্বলতা ও কপটতা—
ভগবদ্ভক্তি-নীতিপরায়ণের দুর্নীতি মাত্র।

ভক্তের নীতি ভগবৎ-সেবাময়ী

ভক্তিপরের স্ত্রীতি কেবল ভগবৎ-সেবাময়ী; তাঁহার কেবল-ভক্তিতে অবস্থান
বিষ্ণু-মায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া এবং বিষ্ণুমায়ার-রচিত নির্কিশিষ্ট ভাবগাত্তরের
প্রতি সমাদর-দ্বারা অপূর্ণতা লাভ করে না। তিনি কর্মীর স্ত্রীতি, জ্ঞানীর স্ত্রীতি,
এবং কর্মীর দুর্নীতি ও জ্ঞানীর দুর্নীতিকে সমপর্য্যায়ে দেখিবার নিরপেক্ষতা লাভ
করায় তাঁহার স্ত্রীতির পরমোচ্চতা দর্শন করিতে কেবল উন্নতিকামী সকলই সমর্থ।
জড়ভোগপর কর্মী বা নির্ভেদ-ব্রহ্মাত্মসন্ধিংসু, প্রকৃতিবাদী, প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, নাস্তিক,
জ্ঞানী চিহ্নিলাস-রাজ্যের স্ত্রীতি ও দুর্নীতির বিচার-সৌষ্ঠব দর্শন করিতে অসমর্থ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

প্রবৃত্তি-মার্গের হেয়ত্ব ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণ-বাক্য

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে (দ্বিতীয় শ্লোকে)—

সুখায় কর্ম্মাণি কৰোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বাত্ত্বদুঃখমং বা ।

বিন্দেত ভুয়ন্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥

[শ্রীবিদুর বলিলেন—হে মুনে, লোকসমূহ জড়স্বখের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া
থাকেন, কিন্তু তদ্বারা জড়স্বখ অথবা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু
তৎসমুদায় হইতে পুনর্ব্বার দুঃখলাভই হইয়া থাকে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব
এই সংসারে আমাদের পক্ষে যাহা কর্তব্য, তাহা কীর্তন করুন।]

কঠোপনিষৎ অষ্টাবিংশ মন্ত্ৰ, যথা :—

অজীৰ্ণাতামমৃতানামুপেত্য জীৰ্ণান্নর্ভাঃ ক্কাধঃস্থঃ প্রজানন্ ।

অভিধ্যায়ন-বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমতে ॥

শঙ্করাচার্য্যাকৃত ভাষ্যার্থঃ,—জরামরণশূন্য যে দেবতা-সকল, তাঁহাদের নিকট
আসিয়া, উত্তম বর ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমনত জানিয়া জরামরণ-

বিশিষ্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য, সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক ? আর গীত, রতি, প্রমোদ এ'তিনের কারণ যে অপসরাসকল হইয়াছেন, তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমাযুতে আসক্ত হইবেক ?

নিবৃত্তি-মার্গস্বরূপ বৈরাগ্যের অপূর্ব ফল ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব

এই সমুদয় তত্ত্ববিচার করিলে কোন্ বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি-মার্গে অশ্রদ্ধা না জন্মায় ? কোন্ ব্যক্তিই বা এই সংসারকে কারাগার বলিয়া না বোধ করেন ? বণিগ্‌বৃত্তির নীরস অস্থি চর্চণ করিয়া কোন্ জীবের রস-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয় ? সিংহাসনস্থ কোন্ ব্যক্তিই বা স্বীয় রাজমুকুট পরিত্যাগ-পূর্বক নিবিড় বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরিতোষণ-তপস্রায় প্রবৃত্ত না হয় ? কোন্ অস্ত্রধারী পুরুষ বা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক হরিনামের মালা গ্রহণ না করেন ? আহা ! বিরাগের কি আশ্চর্য্য ফল ! অপূর্ব হস্ত্য অট্টালিকা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, পরমাত্মন্দরী যুবতীগণের কটাক্ষ, বহু ধনপূর্ণ অর্থভাণ্ডার, গো-মহিষাদি গৃহ-পশুসকল কখনই গোস্বামী রঘুনাথ দাসের হ্রায় বিবেকী পুরুষদিগকে বাধ্য করিতে পারে না । সমস্ত বঙ্গদেশের মন্ত্রিস্ব-পদ ও বহুজনকৃত সম্মান ও রাজার বিপুল স্নেহও শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর হ্রায় কোন মহাপুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না । আহা ! অপ্রাকৃত তত্ত্বের কি অদ্ভুত মাধুর্য্য ; যে ব্যক্তির অপ্রাকৃত চক্ষু সেই পরম-রমণীয় দেশ-কালাপরিচ্ছিন্ন ব্রজলীলা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার আর ক্ষুদ্র সংসার কোথায় থাকে ? তথাপি দশমে রাসপঞ্চাধ্যায়ে—

কং জ্ঞাপ্ত তে কল-পদায়ত-বেণুগীত-

সম্মোহিতাৰ্য্য-চরিতায় চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।

ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং

যদগো-দ্বিজ-ক্রম-মুগাঃ পুলকাত্তবিভ্রন্ ॥ (ভাঃ ১০।২৩।৩০)

[হে কৃষ্ণ, তোমার স্নগধুর ও দীর্ঘ মুচ্ছ'নায়ুক্ত অমৃতময় মৃদুত্বে মোহিতা হইয়া ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে যে, নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? তোমার ত্রিজগতের মানসাকর্ষী রূপ-দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয় ।]

এতদ্বিচারের দ্বারা বৈরাগ্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল ।

বৈরাগ্য ও জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ, এবং জ্ঞান হইতে

বৈরাগ্যের উৎপত্তি

কিন্তু বৈরাগ্য যে কি পদার্থ, তাহা এক্ষণে স্থির করা কর্তব্য । জ্ঞান হইলে

বৈরাগ্য হয়। জ্ঞান কাহাকে বলি? অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ যে-জ্ঞানের দ্বারা স্থির হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলি।

অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা এবিষয়ে যদিও অনেক বিচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অতিজ্ঞান-দোষের ক্রেশ সহ করিতে হয়। প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ যে অনিত্য, তাহা তাঁহারা স্থির করেন, কিন্তু জীবাশ্মার বিষয়ে তাঁহাদের একটা একরূপ গাঢ়তর ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম বাতীত জীবাশ্মার লয়-স্থল আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যকে জ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সাধুপুরুষেরা ইহাকে অতিজ্ঞান বলিয়া থাকেন।

জ্ঞান ও অতিজ্ঞানের পার্থক্য

জ্ঞান ও অতিজ্ঞানে বিশেষ ভেদ আছে। জ্ঞানের দ্বারা পদার্থের সত্যতার নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু অতি-জ্ঞান-কর্তৃক সহজ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া কূট তর্কের উদয় হয়। ঔষধের দ্বারা রোগের নিবারণ হয়, কিন্তু বিষাক্ত ঔষধের দ্বারা পুনরায় অগ্নতর রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, একরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অদ্বৈতবাদী মহাশয়েরা যন্ধিও সংসাররূপ বৃহদ্রোগের শান্তি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদরূপ আর একটা ততোহধিক গুরুতর রোগের দ্বারা জীবকে আক্রমণ করত শান্তি-পথের বিরোধ করেন। অনেকানেক বিজ্ঞ অদ্বৈতবাদীর সহিত আমাদের বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক বোধ হয়।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য কখন—অতিজ্ঞানীর ভ্রান্তি.

প্রথমতঃ তাহারা একরূপ কুতর্ক করেন যে, জীব যৎকালে প্রাকৃত ভ্রম হইতে স্বতন্ত্র হন, তখন তাঁহার ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন আবরণ না থাকায় জীবের ব্রহ্ম সংঘটন অবশ্যই হয়। আহা! অদ্বৈতবাদী এত বিচার করিয়া মূল-বিষয়ে ভ্রান্ত হইলেন! অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এতদুভয় তত্ত্বের ভেদ করিয়াও রোগগ্রস্ত হইলেন; ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়! অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কাহাকে বলি? প্রকৃতির অতীত যে পদার্থ, তাহাই অপ্রাকৃত। প্রকৃতির যত প্রকার গুণ আছে, তাহা অপ্রাকৃত পদার্থে সম্ভব হয় না।

অপ্রাকৃত পদার্থের লক্ষণ ও অদ্বৈতবাদীর তৎসম্মুখে প্রাকৃত বিচার

অপ্রাকৃত পদার্থ জ্ঞান ও আনন্দ এই লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয়। ইহাতে প্রাকৃতি, বিসৃতি, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি প্রাকৃত গুণসকল থাকিতে পারে না। দেশ ও কাল তথায় প্রভু হইতে পারে না। যথা, ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে, নবম অধ্যায়ে (দশম শ্লোকে)—

প্রবর্তিতে যত্র রজস্তুমন্তয়োঃ সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল-বিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেররহস্ততা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥

[সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই । রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্ব নাই ।

সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্তমান । সেখানে কালের বিক্রম নাই, অত্যাঁত্ রাগ-দ্বেষাদি
ত' দূরের কথা, সেখানে লৌকিক স্থখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই ।
তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন ।]

যে পদার্থে দেশ ও কালের অধিকার নাই, তাহাতে আবরণ ইত্যাদির ভাব
অসম্ভব, যেহেতু আবরণ ও ঐক্য এই দুইটা ভাব দেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
নদীসকল সমুদ্রে পতিত হওয়ায় উহাদের জল নদীত্ব-ভাব পরিত্যাগ-পূর্বক সমুদ্রত্ব
প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার উদাহরণের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ জীবের চরমে ব্রহ্মত্ব
প্রতিপাদন করেন । আহা! এই উদাহরণটি কি প্রাকৃত হইল না? তবে
অদ্বৈতবাদীর অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান কোথায় হইল? বাস্তবিক অদ্বৈতবাদিগণ অপ্রাকৃত
তত্ত্বকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে না পারায় “ঐক্য”, “আবরণ”, “অভেদ” এই
সমস্ত বাক্য অপ্রাকৃত জীব ও ব্রহ্মত্বের আরোপ করিয়া আপনাদিগকে সত্য
হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখেন । ফলতঃ তাহাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ, এ'কারণ তত্ত্বের
প্রকাশ হয় না । অপ্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জগতের উদাহরণ সম্ভব নহে ।
অতএব তদ্বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় ব্যতীত আর জ্ঞান নাই । (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

চুঁচুড়ায় শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

বিগত ২রা কা্তিক, রবিবার শুক্লাপ্রতিপদে চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা না থাকায়, ঐ
দিন বিরাটভাবে অন্নকূট মহোৎসব হইয়াছে । শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদকের
পর্য্যবেক্ষণে ২৩ প্রকার ভোগ প্রস্তুত করিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুকে নিবেদন করা হয় ।
চুঁচুড়া-সহরবাসী অন্নকূটের এই বিরাট আয়োজন দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও স্তুতিত
হইয়া যান । তাঁহারা সকলেই একবাক্যে মঠের ভূয়সী প্রসংশা করিয়া বলিতে
থাকেন যে, এবম্বিধ অভিনব ভোগের ব্যবস্থা আগাদের কল্পনার অতীত ।
বেলা অহুমান ২টার সময় সকলকে প্রচুর পরিমাণে সেই প্রসাদ সর্বতোভাবে
বিতরণ করা হয় । অত্কার গৌ-পূজা ও গোবদ্ধন-পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

—ভক্ত উপেন্দ্র, (আসান)



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্ত্রিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুরের বিরহ-বাসরে দীন-হীনের
ভক্ত্যুপহৃত দুর্বাদল

(আজি) বিশ্ব তোমার পূজিছে চরণ
নিয়ে হৃদিভরা আকুলি দৈন্য ।

(আমি) কি দিয়ে পূজিব তোমার চরণ
হৃদয় আমার ভকতি শূন্য ॥

(তুমি) গৌর-প্রিয়জন পতিত পাবন,
করুণার তব নাহিক পার ।

(তব) করুণাতে পেল কতই কাণ্ডাল
শচী দুলালের করুণা-ধার ॥

(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
তব অহৈতুকী করুণা-বলে ।

(যেন) লুটাইতে পারি জগদ্বন্দ্য

তোমারি অভয় চরণের তলে ॥১॥

(আজি) করুণায় তব এ দীন সেবক

তোমার যুগল চরণ বন্দে ।

(আজি) গাহিব তোমার করুণার গাথা

বিশ্ববাসী সনে ললিত ছন্দে ॥

(কর) প্রদীপ্ত,—আমার কলুষ-কালিমা

মলিন হৃদয় ঘুচায়ে ভ্রান্তি ।

(মোর) হৃদয়ে ঢালিয়া করুণা অমিয়

দাও বিকশিয়া ভকতি কান্তি ॥

(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

তব অহৈতুকী করুণা-বলে ।

(যেন) লুটাইতে পারি জগদ্বন্দ্য

তোমারি অভয় চরণের তলে ॥২॥

(দাও) অনর্থের বন কুহেলী-তিমির

বিনাশি, সরলা শুদ্ধভক্তি ।

(তব) চরণ পূজিতে দাও কৃপা করি'

হৃদয়ে আমার অমিতাশক্তি ॥

(তব) মহিমার গীতি গাহে বিহঙ্গম

কুলু-কুলু নাদে তটিনী গায় ।

(পত্রে) গাহে মর্ম্মরিয়া অটবী বিটপী

বিশ্ব লুটিছে তোমার পায় ॥

(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

তব অহৈতুকী করুণা-বলে ।

(যেন) লুটাইতে পারি জগদ্বন্দ্য

তোমারি অভয় চরণের তলে ॥৩॥

(আজি) হ'য়েছে আমার হিতাহিত জ্ঞান

অলীক মোহের ছলনে লুপ্ত ।

(প্রভে) জাগাও চরণ পরশে আমারে

আমি যে সতত মায়াতে সুপ্ত ॥

(তব) করুণা বারিতে করগো ধৌত

আমার মলিন-বিকল চিত্ত ।

(যেন) তোমার অভয় যুগল চরণ

অকপটে পারি সেবিতো নিত্য ॥

(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

তব অহৈতুকী করুণা-বলে ।

(যেন) পারি লুটাইতে জগদ্বন্দ্য

তোমারি অভয় চরণের তলে ॥৪॥

(মম) কামনা অনল দগ্ধ হৃদয়ে

ঢাল করুণার অমৃত বিন্দু ।

(আমি) বন্দিব তব যুগল চরণ

তুমি যে অমল করুণা সিন্ধু ॥

(মোরে) দাও সহিষ্ণুতা, দৈন্য, সরলতা,

দর্প অভিমান করিয়া চূর ।

(তুমি) শোধহ আমারে করিয়া করুণা

আলস্য জড়তা করিয়া দূর ॥

(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

তব অহৈতুকী করুণা-বলে ।

(যেন) পারি লুটাইতে জগদ্বন্দ্য

তোমারি অভয় চরণের তলে ॥১॥

(মোর) অসার কামনা, বিষয় বাসনা

অকপটে সব করগো দূর ।

(আজি) বন্দি তোমার যুগল চরণ

মায়ার আমিহ করগো চুর ॥০

(আমি) ঘৃণ্য সারমেয় হইতে অধম

হে দয়াল ! মোরে করুণা কর ।

(তব) • করুণা শক্তি আজ যেন মোরে

শ্রীগুরু-সেবাতে করে তৎপর ॥

(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

তব অহৈতুকী করুণা-বলে ।

(যেন) পারি লুটাইতে জগদ্বন্দ্য

তোমরি অভয় চরণের তলে ॥৬৥

দীন সেবক —

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

নারমা (মেদিনীপুর)

জ্ঞানকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

চেতনের স্বভাবানুযায়ী একটি স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই প্রকার ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে ক্ষুদ্র-চেতনের সহিত বৃহৎ-চেতনের মিশিয়া যাওয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ তাহা স্বীকার করিলে জীবের স্বাতন্ত্র্যের কোন অর্থ হয় না। যাহারা আত্মহত্যা করিয়া স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য রাখিতে চাহেন, তাহাদের কথা পৃথক। সেই প্রকার আত্মঘাতিগণই কেবল দ্বৈতবাদী। কিন্তু যাহারা নিজের বিশুদ্ধাত্মা বা নিজস্ব নিত্যকালই বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁহারা শুদ্ধদ্বৈতবাদী। সেই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধাত্মার বিকাশ হইলে, জীব সহজেই মায়া-মুক্ত অবস্থায়ও নিজ ব্যক্তিত্বের লোপ করিয়া দেন না। পরন্তু সেই প্রকার শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব বা স্বরূপ-সিদ্ধিতে সেই পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবায় নিয়োজিত হইয়া আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত চিদ্বিলাসী হন। অতএব এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানালোচনাই 'জ্ঞান' নামে অভিহিত এবং সেই প্রকার শুদ্ধজ্ঞান ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই 'জ্ঞানযোগ' আখ্যা লাভ করে।

এই প্রকার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সৃষ্টিকে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবার জন্য সকল দেশে সকল সময়ে দেশ-কাল-পাত্রবিচারে বহুপ্রকার আলোচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে ষড়-দর্শনের আলোচ্য-বিষয় আছে, তাহাও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সৃষ্টিকেই 'নানামুনির নানামত'-সম্বলিত শুষ্ক-জ্ঞানালোচনা মাত্র। সেইগুলির কোনটী জ্ঞানযোগ আখ্যা পাইতে পারে না। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের কথা পৃথক্ আলোচিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের বিশুদ্ধ ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মত। এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের বিচার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এযাবৎ কাল বিদ্বৎ-সমাজে বেদান্ত-সূত্রের ভিত্তির উপরই মায়াবাদ এবং সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান। যে সম্প্রদায়ে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য নাই, তাহা পণ্ডিত-সমাজে অপসম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। মায়াবাদিগণের মধ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরিক-ভাষ্য'ই প্রধান। আচার্য্য রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের ভাষ্য ব্যতীত শ্রীমন্ মহাপ্রভু-স্বীকৃত মাধব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরম্পরা-ধন্তন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের, শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য'ই প্রধান। যাহারা তত্ত্ব-দর্শন সৃষ্টিকে বিশদ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বেদান্ত-দর্শন বিশেষভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেদান্ত-তত্ত্ববিৎ বলিলেই যে কেবলমাত্র শঙ্কর সম্প্রদায়ই বুঝায়, তাহা নহে, পরন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণই অপ্রাকৃত মায়ামুক্ত বেদান্ত-তত্ত্ববিৎ জানিতে হইবে।

সমস্ত ঋষিবাक্য, বেদবাक্য ও বেদান্ত-বাक্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত। অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের কারণ—প্রকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি দশটী কৰ্ম ও জ্ঞান-বিচারে বাহ্যেন্দ্রিয়। মন অন্তরেন্দ্রিয়—'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। নিরীক্ষর কপিলের সাংখ্য-দর্শনে এই সমস্ত তত্ত্ব-বিষয় বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। সেই প্রকার চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিই 'ক্ষেত্র'-তত্ত্ব। এবং সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরস্পর বিনিময়ে যে বিকার-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাই প্রাকৃত ইচ্ছা, দ্বেষ, স্নেহ, দুঃখ, সংঘাত ইত্যাকারে পঞ্চমহাভূতের পরিণাম—দেহ। মনোবৃত্তিরূপ চেতনাভাস ও ধৃতি ঐ ক্ষেত্রেরই বিকার বুঝিতে হইবে। 'ক্ষেত্রজ'-তত্ত্ব এই সকল 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্র'-বিকার তত্ত্ব-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্,—তাহা ক্রমে আলোচিত হইবে। সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সৃষ্টিকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে লেইহ যে বিংশতি প্রকার সদৃশ্যের প্রয়োজন-হয়, তাহা ভগবদগীতায় এইভাবে বলা হইয়াছে। যথা—

অমানিষ্মদস্তিষ্মমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং শৈথ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি-দুঃখদোষাহুদর্শনম্ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তব্রহ্মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

ময়ি চানুযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহনুথা ॥ (গীঃ ১৩।৮-১২)

অর্থাৎ জাগতিক মান-লাভে স্পৃহাহীনতা, বিদ্যা-বুদ্ধি বা ধন-জনের দণ্ডহীনতা, অহিংসা, সহগুণ, গুরুবর্গের পরম্পরা অনুসারে সেবা, শৌচ, ধৈর্য্য, অন্তরেক্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্তি-স্বরূপ সুখভোগে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদি প্রভৃতির যে দুঃখ তাহার দোষ দর্শন, পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা অর্থাৎ তাহাদের সুখ-দুঃখে উদাসীনতা, সর্বদা চিন্তের সমতা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অনন্য-অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম জ্ঞানই নিত্য—এই প্রকার বুদ্ধি, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা ইত্যাদি জ্ঞান-সাধনের উপকরণ । এই সকল সদগুণ-বর্জিত ব্যক্তির জ্ঞানযোগ আলোচনা করিবার অধিকারই নাই । কিন্তু কুতর্কিকগণ এইসকল জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইবার উপায়গুলিও ইচ্ছা-দেষ প্রভৃতি ক্ষেত্র-বিকারের সমতুল্য করিয়া ক্ষেত্র-বিকারই মনে করেন । কিন্তু এই সদগুণগুলি প্রত্যক্-জ্ঞান-স্বরূপ । তार्কিক সম্প্রদায়ের বিচার গ্রহণ করিলেও এই-সকল বিকার মোহ, স্মৃতি-বিভ্রম, অজ্ঞান,—কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি অজ্ঞান-স্বরূপ বিকারের সমতুল্য নহে । একপ্রকার বিকার ক্রমশঃ জীবকে, সর্বনাশের পথে লইয়া যায়, আর জ্ঞান-স্বরূপ উপাদানগুলি সেই সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করে । রোগ ও ঔষধ দুই বস্তু প্রকৃতিসম্মত ব্যাপার হইলেও একটি মৃত্যুমুখে লইয়া যায়, অপরটি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করে । সুতরাং অল্প মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তির ‘যত মত তত পথ’-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত রোগ ও ঔষধ একই পর্যায়ভুক্ত মনে করিয়া বিষংসমাজে হাশাস্পদ হইতে হইবে না ।

উপরিউক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানসাধন উপাদানগুলির মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু । জীবের চিত্ত-

দর্পণ মার্জিত করিবার জগুই প্রথম অষ্টাদশ প্রকারের উপাদানগুলির আবশ্যকতা আছে। চিত্ত-দর্পণ মার্জিত হইয়া ভব-মহাদাবায়ি নির্কাপিত হইলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হয়।

“বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।

কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥” (শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর)

অপরপক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তির উন্মেষ দেখা গেলে ব্যতিরেক-ভাবে অগ্ন্যাগ্ন অষ্টাদশ প্রকার গুণগুলি স্বতঃই দেখা যায় —“যশাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা সর্কৈশ্চৈগৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ”। দশটাকা, বিশটাকা, একশত টাকা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুঁজিগুলি বহুদিন ধরিয়া একত্রিত হইলে লক্ষ টাকার সংগ্রহ হয়। কিন্তু একসঙ্গে লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলে আর পৃথকভাবে দশ টাকা, বিশ টাকার জগু সময় নষ্ট করিতে হয় না। অতএব ভগবান্ শ্রীমহানন্দ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্ত-ভক্তি থাকিলে অগ্ন্যাগ্ন বিষয়গুলি অবাস্তব ফলস্বরূপ আবিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের অব্যভিচারিণী ভক্তিকে বাদ দিয়া অপর অষ্টাদশ প্রকার সাধনাদি প্রাপ্ত হইলেও, প্রাকৃত লোকসমূহের নিকট ক্ষণিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে চরমসিদ্ধি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

হরাবভক্ত্য কুতো মহদগুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।” ভগবানের পাদ-পদ্ম অনাদর করিয়া এবং ভক্তি-বিষয়িণী সাধনা বাদ দিয়া কেবলমাত্র বাহ্যিক ‘আঁকুপাকু’-ভাব দেখাইয়া অমানিত্ব-অদস্তিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি—ক্ষণভঙ্গুর। সেইগুলির প্রাকৃত কিছু মূল্য থাকিলেও নিত্যস্থ কিছুই নাই। ভক্তিদেবীর সিংহাসন-স্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান অর্থাৎ সবিজ্ঞান জ্ঞান বলিয়া জানিতে হইবে, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই অজ্ঞান। প্রাকৃত ‘ঘট-পটিয়া’-জ্ঞানের ত’ কথাই নাই, তাহাও অজ্ঞান-বিশেষ।

তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিবার উপরিউক্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করিলে অধ্যাত্ম-চিত্ত লাভ হয় এবং সেইপ্রকার অধ্যাত্ম-চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই ক্ষেত্র-জ্ঞান বা জড়জ্ঞান হইতে ক্ষেত্রজ-জ্ঞান বা চিদজ্ঞানে উপস্থাপিত হওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ‘ক্ষেত্রজ’-শব্দে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই বুঝায়। প্রকৃতিকে যে অনেক সময় ‘ব্রহ্ম’ বলা হয় তাহার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম ‘কারণ’ হইতে প্রকৃতি ‘কার্য্য’ এবং তাহার শক্তিও ‘কারণে’র সমতুল্য। কিন্তু সেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই প্রকৃতিরূপ মহদ-ব্রহ্মে জীবরূপ ব্রহ্মের বীজ গর্তাধান করেন।

যথা,—

মম যোনির্মহদ্বন্দ্বস্ত তস্মিন্ গর্তুং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভরতি ভারত ॥ (গী: ১৪।৩)

‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ এই শ্রুতিবাক্যের সমাধান এইস্থানে । বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্রহ্ম—জীব এবং প্রকৃতি এক তাৎপর্যার্থক । বৈষ্ণবগণ এই বিচারে শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদী । পূর্বে আমরা যে ‘ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি: সূর্যতে সচরাচরম্’ শ্লোক আলোচনা করিয়াছি, তাহারই পরিস্ফুট অর্থ এই শ্লোকের দ্বারা জানিতে পারা যায় । (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবাদাস্ত

এডিটর, ব্যাক-টু-গডহেড্

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২ম সংখ্যা, ৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

সনাতনের ভিক্ষা ও ভদ্র-বেশ

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু সনাতনকে জানাইলেন যে, তাঁহার দুই ভাই শ্রীরূপ ও অম্বুপমের সহিত তাঁহার প্রয়াগে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল । তাঁহারা উভয়েই বৃন্দাবনে গিয়াছেন । প্রভু সনাতনকে তপন-মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইবার জন্ত জানাইলে তপনমিশ্র সনাতনকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইলেন ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরকে পুনরায় ডাকাইয়া শ্রীসনাতনের দরবেশ-বেশ দূর করাইয়া তাঁহাকে ক্ষৌর করাইবার জন্ত জানাইলেন । মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী চন্দ্রশেখরও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে ভদ্রোচিত ক্ষৌরাদি করাইয়া গঙ্গাস্নান করাইলেন ।

এখানে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপর মহাপ্রভুর ক্ষৌরকার্যের আদেশে বাউল-সম্প্রদায়ের অভ্যুদ্যোতিত নথ-রোমাডি-ধারণ-রূপ অবৈধ বিচার নরহৃদয়ের তীক্ষ্ণ শানিত ক্ষুরে ছিন্ন হইয়া বিধ্বংসাদোদ্ভূত জাহ্নবীর চিন্ময় বারিতে বিধৌত হইয়া গেল, এং লোক-লোচনে বিগুহ বৈষ্ণবাচার্যের ভদ্র-স্বরূপও পরিদৃষ্ট হইল । তখন চন্দ্রশেখর সনাতনকে নূতন বস্ত্র পরিধানের জন্ত আনয়ন করিলে মহাবৈরাগ্যবান্ সনাতন তাহা অস্বীকার করিলেন । ইহা শুনিয়া সনাতনের প্রাণনাথ শ্রীপৌরহন্দর পরমানন্দিত হইলেন ।

মধ্যাহ্নে তপনমিশ্রের গৃহে সনাতনের প্রভু-ভুক্তাবশেষ প্রাপ্তি

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন-কালে ভিক্ষার জন্ত সনাতনকে সঙ্গে লইয়া তপনমিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন ; প্রভু সনাতনকেও ভিক্ষা দিতে জানাইলে, তপনমিশ্র কহিলেন,—“সনাতনের কিছু কৃত্য আছে, তুমি অগ্রে ভোজন কর; তোমার অবশিষ্ট অধরামৃত প্রসাদ তোমার ভোজনান্তে আমি তাঁহাকে দিতে পারিব।” এদিকে মহাপ্রভু ভোজনান্তে বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন, সনাতনও মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে প্রেমোদীপ্ত-হৃদয়ে প্রসাদ সেবন করিলেন।

সনাতনের জীর্ণ-বস্ত্র গ্রহণ

সনাতনের প্রসাদ-সম্মানান্তে তপনমিশ্র একখানি নূতন-বস্ত্র পুনরায় সনাতনকে গ্রহণের জন্ত অনুরোধ জানাইলেন, আচাৰ্য্য-শিরোমণি সনাতন তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সনাতন কহিলেন,—

“মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।

নিজ পরধান এক দেহ’ পুরাতন” ॥

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।

তৈহো দুই বহির্কাস-কৌপীন করিলা ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৭-৭৮)

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লের নিমজ্জণ-গ্রহণে সনাতনের অসম্মতি

শ্রীমন্ন্যহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীমন্ন্যহাপ্রভুর রূপা-পাত্র ছিলেন ; মহাপ্রভু তাঁহার সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে সাক্ষাৎ করাইলেন। সেই বিপ্র সনাতনকে কহিলেন,—“আপনি যাবৎকাল এই বারণসী-ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন, তাবৎ আমার গৃহে নিত্য স্থল-ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আমি যৎপরোনাস্তি অল্পগৃহীত হইব।”

সনাতন কহে,—“আমি মাধুকরী করিব।

ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৮১)

সনাতনের ভোট-কঞ্চল ত্যাগ ও ছিন্নকঞ্চা গ্রহণ

সনাতনের বিশুদ্ধ বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকান্ত-প্রদত্ত ভোট-কঞ্চলটীর দিকে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সনাতনও প্রভুর হৃদগত আশয় অবগত হইলেন। ভগবান্ নিজের অতি প্রিয়-জনের প্রেমভক্তির ব্যাঘাতকারক বহিরঙ্গ-দ্বাতীয় সামান্য বিষয়-গন্ধও রাখিতে চান না,—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নিজজনগণের প্রতি অন্তরঙ্গ দৃষ্টি। মূল্যবান্ ভোট-

কঞ্চল-ধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত আনিয়া সনাতন উহা অবিলম্বে পরিত্যাগের
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

একদিন সনাতন গঙ্গায় মধ্যাহ্ন-স্নানের জন্ত গমন করিলেন, তথায় একজন
গৌড়ীয়া কহা ধুইয়া শুকাইতে দিয়াছে, দেখিতে পাইলেন ।—

তারে কহে,— “ওরে ভাই, কর উপকারে ।

এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ’ মোরে ॥”

সেই কহে,—“রহস্য কর প্রামাণিক হঞা !

বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লঞা ?”

তঁহো কহে,—“রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী ।

ভোট লহ, তুমি দেহ’ মোরে কাঁথাখানি ॥”

এত বলি’ কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া ।

গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৮৫-৮৮

মহাপ্রভু ও সনাতনের মধ্যে কঞ্চল-ত্যাগের বৃত্তান্ত আলোচনা

প্রভু কহে,—“তোমার ভোট-কঞ্চল কোথা গেল ?”

প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥

প্রভু কহে,—“ইহা আমি করিয়াছি বিচার ।

বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥

সে কেনে রাখিরে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ ?

রোগ খণ্ডি’ সন্নিহিত না রাখে শেষ-রোগ ॥

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস ।

ধর্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥”

গোসাঞি কহে,—“যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ ।

তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥”

প্রভুর প্রতি সনাতনের প্রশ্ন

প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ।

তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥

পূর্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।

তাঁর শক্ত্যে রাগানন্দ তার উত্তর দিলা ॥

ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন ।

আপনে মহাপ্রভু করে ‘তষ’ নিরূপণ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৮৯-৯০)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া দন্তে তৃণ ধারণ-
পূর্বক সदैন্ত্রে বিনতি করিতে লাগিলেন,—

“নীচ জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম ।

কুবিষয়-কুপে পড়ি’ গোড়াইলু জনম !!

অপনার হিতাহিত কিছুই না জানি !

গ্রাম্য-বাবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি !!

কৃপা করি’ যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ।

আপন-কৃপাতে কহ ‘কর্তব্য’ আমার ॥

“কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ।

ইহা নাহি জানি—কেমনে ‘হিত’ হয় ॥

‘সাধ্য,’ ‘সাধন-তত্ত্ব’ পুছিতে না জানি ।

কৃপা করি’ সব তত্ত্ব কহ ত’ আপনি ॥’ (চৈঃ চঃ মঃ ২০১২-১০৩)

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে সনাতনের মাহাত্ম্য বর্ণন ও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর

প্রভু কহে,—“কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ।

সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥

কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ।

জানি’ দার্ঢ্য লাগি’ পুছে—সাধুর স্বভাব ॥

সন্ধর্ম্মস্থাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ।

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ । (নারদীয় বাক্য)

[সন্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্ত যাহাদের মতি দৃঢ়, তাহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত
সর্বার্থ-সিদ্ধি হয় ।]

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে ।

ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥

জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’

কৃষ্ণের ‘তটস্থা-শক্তি’ ‘ভেদাভেদ-প্রকাশ’ ॥

সুখ্যাংগ-কিরণ, যেন অগ্নি-জ্বালাচয় ।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার ‘শক্তি’ হয় ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ২০১৩-১০২)

‘কে আমি ?’—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিতেছেন যে, “তুমি—
জীব । এই জড়-সম্মত শরীরটি কি তুমি ? তাহাও নহে ; অথবা তোমার মন,

বুদ্ধি, অহঙ্কার-স্বরূপ লিঙ্গ-শরীরটী কি তুমি ? তাহা নহে । তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি কৃষ্ণের তটস্থ-শক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ,—এই দুইয়ের মধ্যগত সীমায় অবস্থিত হইয়া তোমার উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায়, তুমি ‘তটস্থ’-শক্তি । শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার অচিস্ত-ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ ‘সম্বন্ধ’ । চিন্ময়-ধর্ম-সম্বন্ধে তুমি কৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ এবং অণুত্ব-বশতঃ বৃহৎ-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদাংশ-প্রকাশ । কৃষ্ণসহ তোমার ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ । জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে । জীব—সূর্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণের অংশ-কিরণ, অথবা বৃহদগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ জীব-সমূহের উদাহরণ-স্থল । জীবের নিত্য-সত্তা আছে বলিয়া জীব ‘সৎ’ । জীব চৈতন্য বস্তু বলিয়া ‘চিৎ’ এবং তাহাতে আনন্দধর্ম আছে বলিয়া জীব ‘আনন্দ’-স্বরূপ ; কিন্তু জীব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্রায় পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নহে । জীব অণু-বস্তু ; কৃষ্ণ বৃহৎ বা বিভূচৈতন্য-স্বরূপ ।

সনাতনের সহিত প্রভুর জীবশক্তি-বিচার

“যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যাক্তরস্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বানি ভূতানি ব্যাক্তরস্তি ।” (বৃহদারণ্যক ২।১।২০)

অর্থাৎ অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ উদ্ভিত হয়, তদ্রূপ সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদ্ভিত হইয়াছে ।

“একদেশস্থিতশ্রাগ্নেজে’্যাংস্মা বিস্তারিণী যথা ।

পরশ্চ ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥” (বিষ্ণুপুরাণ)

এক-স্থানস্থিত অগ্নির জ্যেষ্ঠাংস্মা বা আলোক যেক্রপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগতে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ।

“অপরেয়মিতস্ত্বত্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥” (গীঃ ৭।৫)

আমার এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—‘অপরা’ বা ‘জড়’ । ইহার নাম ‘মায় প্রকৃতি’ । ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী ‘পরা-প্রকৃতি’ আছে । সেই প্রকৃতিই জীব-স্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ । (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তক্টিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যব্যাস্য ও বিষ্ণুপাদপূর্ব্বস্ত
 শ্রীশ্রীমতো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিনঃ
 প্রভুপাদস্য তিরোভাব-তিথৌ
 “আন্তি-স্বরাজঃ”

নমস্তে প্রভুপাদায় গৌরাঙ্গ-প্রেষ্ঠ-মূর্ত্তয়ে ।

ভক্ত-বৎসল-রূপায় ননস্তে করুণাক্ষয়ে ॥১॥

শ্রীচৈতন্য-মনোহরীক্ষং পূরয়িতুং মহীতলে,

পুণ্য-নীলাচলে ধাম্নি রূপয়াবততার যঃ ।

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-

মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ॥২॥

আবিভূয় জগন্নাথ-প্রেম-প্লাবিত-পত্নে,

গৌরাবির্ভাব-দেশং যো ব্যখ্যাপয়দ্ মহীতলে ।

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-

মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ॥৩॥

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠকুর-

বাণী-বৈভব-রূপেন লেভে যমিহ মেদিগ্ভাম্ ।

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-

মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ॥৪॥

কুসিদ্ধান্ত-তমোরাশিঃ সমূলে ন বিনাশ্য যো,

ভক্তিসিদ্ধান্ত-শুভ্রাংশুমুদয়ামাস ভূতলে ।

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-

মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ॥৫॥

মায়াঙ্ক-চেতসাং ছিন্না মায়া-নিগড়-বন্ধনং,

গৌরপ্রেম-সিঙ্কৌ যন্ত নিমজ্জয়াঞ্চকার তান্ ॥

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ॥৬॥

যঃ প্রভুরিহ মেদিষ্ঠাং গৌরবাণ্যাঃ কলেবরং,
স্বয়ং ভক্তি-সদাচারৈঃ শিক্ষয়ামাস কিস্করান্ ॥

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ॥৭॥

পারমার্থিক-গৌড়ীয়-পট্টেষ্ঠ পরিচারকৈঃ
অচীকীর্তং হরেন্নাম স্বয়ং গতাপি ভূতলে ॥

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ॥৮॥

শ্রীশ্রীগৌরাজ-গান্ধর্ব-বৃন্দাবন-বিসারিণাং
লীলাগায়ন সঙ্গমাজ্জলীং মহাপ্রেম-রসার্ণবে ॥

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ৯॥

বৃন্দাবন-লতাকুঞ্জে পরিচর্য্যারতঃ সদা,
যো বার্ষভানবী-দেব্যা দয়িতেতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
মর্দীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্মৃটম্ ১০॥

ভো ! ভো ! প্রভো ! কৃপাসিক্তো ! হে দীনজনতারণ !
কদা মূঢ়াধমে দাসে দদাতি স্বপদাস্তিকম্ ॥

ভূত্বা তব পদাজস্য দাসস্তানুগ-কিস্করঃ ।

তিষ্ঠামি প্রতিজ্ঞেতি জনোহয়মভিকাঙ্ক্ষতে ॥১১॥

শ্রীগৌরাজ-বিদ্যালয়ঃ
শ্রীরাধাকুণ্ডম্ (মথুরা)

}

তবতঃ শ্রীচরণকমলয়োদীশাহুদাসহ
—শ্রীমধুসূদনদাস-ব্রহ্মচারিণঃ

বর্তমান সমাজের আচার

“তাহারে সে বলি ধর্ম, কর্ম, সদাচার।

ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে, সম্মত সবার ॥” (চঃ ভাঃ অ-৩।৪৪)

যে আচার পালন করিলে কৃষ্ণে প্রীতি হয়, তাহাকেই সদাচার বলে। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণভক্তি। সুতরাং শাস্ত্র-সম্মত আচারই সদাচার।

“যঃ শাস্ত্রবিদ্বিমুংস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥” (শ্রীঃ ১৬।২৩)

অর্থাৎ—শাস্ত্রের বিচার পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি মনোধর্মের অনুবর্তন করে, -সে কখনও সুখ, সিদ্ধি ও পরা গতি লাভ করিতে পারে না।

কামাচারীর হুচিস্তিত্ত সদাচারও অসদাচার। তাহা দ্বারা জীব পরাগতি লাভ করিতে পারে না এবং শাস্ত্রাচারীর আচার তাহাদের দৃষ্টিতে অসদাচার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা সদাচার। তাহা দ্বারা জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হন।

কৃষ্ণ-ভক্তির অঙ্গকুল আচার নির্দেশ করিতে গিয়া সাহিত্য-স্মৃতি বিস্ময়ামলে লিপিয়াছেন,—

কৃতে শ্রুত্যুক্ত-মার্গঃ শ্রীঃ ত্রেতায়াং স্মৃতি-সম্ভবঃ।

ঋপরে পুরাণোক্তঃ কলাশাগম-সম্মতঃ ॥

অর্থাৎ—সত্যে শ্রুতি-মার্গে, ত্রেতায় স্মৃতি-মার্গে, ঋপরে পুরাণ-মার্গে এবং কলিযুগে তন্ত্র-মার্গে হরিভক্তির আচরণ বিহিত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র—এই শাস্ত্র-সকল পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন নয়। সাধা ও সাধন সম্বন্ধে সকলেই একমত। শ্রোত-পথে লব্ধ দিব্যজ্ঞানই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারাই জগতে মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়া ‘শ্রুতি’ নাম ধারণ করেন। শ্রুতি পুনঃ সেবোন্মুখী স্মৃতি-পথের বিষয়িনী হইয়া ‘স্মৃতি’-সংজ্ঞা লাভ করেন। স্মৃতি আবার প্রাচীন আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রুতির উপদেশ-সকল প্রচার করিয়া ‘পুরাণ’ নামে অভিহিত হন, এবং পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়ই অল্পবুদ্ধি মানবগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে বিস্তারিত হইয়া ‘তন্ত্র’-নাম ধারণ করেন। সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে তন্ত্র ত্রিবিধ। তামস ও রাজস তন্ত্র, তামসিক এবং রাজসিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানবের যোগ্যতামূলে রচিত হইয়াছে। তাহা সত্য-পথের অত্যন্ত বিষ-কারক বলিয়া সাহিত্য তন্ত্র ও সাহিত্য শাস্ত্র সমূহ উহা বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বিমল ‘হরিভক্তি’ সাহিত্য-তন্ত্রের

একমাত্র কীর্তনীয় বিষয়। এই সাহিত্য তন্ত্রই ‘পঞ্চরাত্র’ নামে অভিহিত হইয়াছেন।
‘শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র’ প্রভৃতি সাহিত্য তন্ত্রের অন্তর্গত।

সারভূতঞ্চ সর্কেষাং বেদানাং পরমাদ্বৈতম্।

নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু স্নতুল্লভম্ ॥ (নারদ পঞ্চরাত্র ১।১।৬১)

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র সর্ববেদের সার বলিয়া, পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

পঞ্চরাত্রশ্চ কৃৎসন্ত বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।

সর্কেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ॥

(পরমানন্দ-সন্দর্ভ, ১৮ সংখ্যাপ্রতি মহাভারত-বাক্য)

পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্। হরিভক্তি সেই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই ভাবে মহাভারতে পঞ্চরাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মযামলেও উক্ত হইয়াছে,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিৰূপাত্ম্যৈব কল্পতে ॥ (ব্রহ্মযামল)

পঞ্চরাত্রে হরিভক্তি করিবার যে-বিধি আছে, তাহা উল্লঙ্ঘনপূর্বক স্বতন্ত্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্তী হইয়া ভক্তি-অমুষ্ঠানে (?) প্রবৃত্ত হইলে, ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা ত’ নাই-ই, বরং তাহা ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া সমাজের ঘোর অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভাগবতের আলোচনার দ্বারাই সর্বার্থ-সিদ্ধি হইলেও পঞ্চরাত্রকে বাদ দিতে পারা যায় না। পঞ্চরাত্র উল্লঙ্ঘন করিতে গেলে ভক্তির অমুষ্ঠান উৎপাত মধ্যে পরিগণিত হইবে। বিষ্ণুযামল, তত্ত্বসাগর, ভরদ্বাজ-সংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি সাহিত্য-স্মৃতি এবং পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি সাহিত্য-তন্ত্রে উপদিষ্ট পন্থা ভিন্ন অথ কোন উপায়েই কলিহত জীবের উদ্ধার নাই—ইহা শাস্ত্রে সর্বত্রই প্রমাণিত হইয়াছে।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্লা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

ভেষাগাগমমার্গেণ শুদ্ধিন্ শ্রৌতবজ্রনা ॥ (বিষ্ণুযামল)

কলির শ্রৌক-ব্রাহ্মণগণেরও শুদ্ধি নাই। তাঁহাদের বৈদিক কাম্যমুষ্ঠান-মার্গে নির্মলতা না থাকায় তাঁহারা পবিত্র হইতে পারেন না। পাঞ্চরাত্রিক বিধানই তাঁহারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে যখন পারমার্থিক বিচারের অবনতি আরম্ভ হইল, তখনই হিন্দু-সমাজে ব্যবহারিক শৌক-জাত্যাদির বিচার প্রাধান্য লাভ করে এবং তখনই হইতে তদ্ব্যাক্ত সাধনের ভাণ করিয়া অপসার্যপরতা-মূলে শৌক-ব্রাহ্মণগণ তামসিক ও

রাজসিক তত্ত্বের উপদেশসমূহকে পরমার্থ-সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন। ফলে, সমাজে মত্ত-মাংসের বাবহাৰ অবাধে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আজ গৌড়ামিগণ ও ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়া ভাগবত-ধর্মের প্রতিকূল স্মার্ত-আচারেরই অনুবর্তন করিতেছেন। তাঁহারা আজ পঞ্চরাত্রের নামই জানেন না। আজ তাঁহারা নারদকে ভুলিয়াছেন এবং নারদও তাঁহাদিগকে ভুলিয়াছেন। সমস্ত দেশেরই আজ এই অবস্থা।

সমাজের এই দুর্দিনে একদিন পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর** যে পরম শক্তিদ্বর মহাপুরুষ একহাতে "ভাগবত ও অগ্ৰহাতে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র লইয়া ধর্ম সংরক্ষণ পরিকল্পে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর দ্বারা সমগ্র ভারতের সমস্ত মনোবর্ষ, অপবর্ষ, চলবর্ষ ও কাপটা ধর্মাদিকে স্তম্ভিত করেন এবং পরম নির্ম্মমসর সাধকগণের বিমল পারমহংস জ্ঞানের কথা জানাইয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যেক মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজ সেই মহাপুরুষের হুসিদ্ধান্ত-বাণী সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানবের অনুধাবনের বিষয় হইয়াছে।

—শ্রীদনংকুমার দাসাধিকারী,

ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

(আসাম)

শ্রীঅম্বরীষ-রাজার উপাখ্যান

পূর্বকালে অম্বরীষ নামে এক রাজা ক্ষত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি মহাভাগবত ছিলেন। রাজা হইলে কি হয়?—তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পিতার হায়ে স্নেহে প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জল-প্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব উৎপাত ছিল না। প্রজারা সুখ-শান্তিতে কাল-যাপন করিত। তিনি মনকে শ্রীকৃষ্ণ-চরণাবিন্দে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠ-গুণামুগুণ অর্থাৎ শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, বশঃ-কথ্যতে, কর্ণকে অচ্যুত-কথা শুনিবার জন্ত, পদদ্বয়কে শ্রীহরি-ক্ষেত্র-সমূহ পরিভ্রমণ করিবার জন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নাসিকাকে

ভবং-পাদপদ্ম-অপিত সচন্দন তুলসীর আশ্রাণে এবং যাবতীয় কাম শ্রীহরি-দাস্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা অম্বরীষ সর্বোদ্ভিদ দ্বারা জমীকেশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

এক দিবস তিনি রাজ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার উপরে সুনীল চন্দ্রাতপ। সিংহাসনের চতুর্দিক শ্বেত, নীল, পীত, রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণের, অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত, বৈদূর্য্য ইত্যাদি বহু মূল্যবান মণি-হীরকাদি উজ্জল রত্নদ্বারা আলোকিত হইয়াছিল। রাজ-কিস্করগণ শ্বেত চামর দ্বারা রাজাকে বীজন করিতেছিল। দিব্য স্তুতি দ্বারা ভাটগণ রাজার যশো-গুণ গাহিতেছিল। প্রহরীগণ সশস্ত্রে রাজাকে বন্দনা করিতেছিল। রাজ-পুরোহিত এবং অগ্ন্যাদি ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। রাজ-সভা কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এমত সময়ে, মহারাজ অম্বরীষের দ্বাদশী-পারণ-দিবসে—রুদ্র-অংশে অবতীর্ণ যোগ-বিভূতিমান মহা-তেজস্বী শ্রীদুর্ব্বাসা-ঋষি অকস্মাৎ ‘হর-হর,’ ‘ব্যোম ব্যোম,’ ‘জয় জয় শঙ্কর’ রবে চতুর্দিক নিনাদিত করিয়া, সূর্য্যসম জ্যোতির্ধ্বরূপে রাজসভায় উপনীত হইলেন। রাজ্যি অম্বরীষ সহসা ঋষিকে সমাগত দেখিয়া, সমস্ত্রমে রাজ-সিংহাসন হইতে উখিত হইয়া শ্রীদুর্ব্বাসা ঋষির পাদ-বন্দনা করত বসিতে রত্ন-খচিত আসন প্রদান করিলেন। বিবিধ স্তব্ধ পুষ্পমালাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঋষিবরের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও করযোড়ে বিনীত-ভাবে রাজা দণ্ডায়মান রহিলেন। **দুর্ব্বাসা** রাজার আতিথ্য-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতি-সহকারে রাজাকে বলিলেন,—“হে রাজন্! গতকল্য হইতে উপবাস করিয়া আছি। অত আপনীর এখানে পারণ করিব—এই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।”

রাজা ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা পরম আনন্দ-সহকারে স্বীকার করিলেন।

মহামুনি বলিলেন,—“নিকটস্থ নদী-তীরে স্নান, সন্ধ্যা, আত্মিকাদি সমাপন করিয়া আসিতেছি—তুমি সেবার আয়োজন কর।” এই কথা রাজাকে বলিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি নদীতীরে গমন করিলেন। রাজাও চর্য্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় উপাদেয় চতুর্বিধ ভগবৎ-প্রসাদের আয়োজন করিলেন।

এদিকে তিনি মহা-সঙ্কটে পড়িলেন; পারণের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করাইয়া কি-প্রকারেই বা নিজে পারণ করিবেন—এই চিন্তায় রাজা আকুল হইয়া পড়িলেন। যথাসময়ে পারণ না করিলে **মৃত বন্ধা হয় না**, আবার ব্রাহ্মণ-লজ্জনেও অপরাধ; এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া

রাজা 'যাহাতে মঙ্গল হয়, অথচ অধর্ম স্পর্শ করিতে না পারে' তৎসম্বন্ধে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ সহ বিচার করিয়া স্থির করিলেন,—“এখন আমি কেবলমাত্র জলপান করিব, তাহাতেই পারণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের মর্যাদাও রক্ষিত হইবে। যেহেতু শাস্ত্রকারগণ জলপানকে ভক্ষণ অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন।”

রাজা এই বাক্যানুযায়ী জল পান করিলে, পরম যোগী ব্রাহ্মণ দুর্কাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। যথাসময়ে ঋষিবর রাজসভায় উপনীত হইলে রাজা তাঁহাকে অভিযর্থনা করিলেন।

কিন্তু দূর হইতেই রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত দুর্কাসা বলিলেন,—“রে দুর্মতে! তুমি ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিয়া, আমা-হেন অতিথিকে তুচ্ছ করত অগ্রেই ভোজন করিয়াছ, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ,—তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ার এতদূর সাহস যে, ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে। আমি এখনই ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।”

—এই বলিয়া, রুদ্রাংশভূত মহা-তেজস্বী ঋষি, ক্রোধ-ভরে স্বীয় মস্তক হইতে এক বৃহৎ জটা সমূলে উৎপাটীত করিয়া পৃথিবীতে সবেগে নিক্ষেপ করিলেন; ঐ জটা হইতে এক ভীষণ মূর্তি ‘কৃত্যা’র সৃষ্টি হইল; তাহার শরীর হইতে জলন্ত অনল সহস্র-শিখার আয় জ্বলিতে লাগিল; —যেন অকালেই প্রলয়ের সৃষ্টি হইল! সেই কৃত্যার হস্তে ভীষণ ত্রিশূল শোভা পাইতেছিল।

দুর্কাসা সেই কালায়িতুল্যা কৃত্যা-মূর্তিকে আজ্ঞা করিলেন,—“যাও, এখনই ঐ দুর্মতি রাজাকে ধ্বংস কর, বধ কর—ভক্ষ কর।” এই আজ্ঞা পাইবামাত্র ঐ জলন্ত কৃত্যা রাজাকে নিধন করিবার জন্ত ছফার করিয়া ত্রিশূল-হস্তে তৎপ্রতি ধাবিত হইল।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াও মহাভক্ত রাজা অমরীষ স্বস্থান হইতে একপদও বিচলিত হইলেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। অন্তর্ধানী ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণু, ভক্তের এই সঙ্কট-অবস্থা দেখিয়া হস্তস্থিত ‘সুদর্শন-চক্রকে’ আজ্ঞা করিলেন,—“হে ভক্তরক্ষক সুদর্শন! তুমি এখনই যাইয়া রাজাকে রক্ষা কর।”

বৈকুণ্ঠ হইতে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞা মস্তকে বহন করিয়া ‘সুদর্শনচক্র’ কোণী সূর্যের আয় দীপ্তি প্রকাশ করত প্রথমেই ঐ ভীষণ মূর্তি কৃত্যাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন; পরিশেষে দুর্কাসাকে নিধন করিবার জন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দুর্কাসা সহসা এই বিপদ দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে

লাগিলেন,—কিন্তু আজ আর রক্ষা নাই ! সুদর্শনের অসহ্য তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ঋষি যোগবলে—অগ্নির ভিতর, কখন জলের ভিতর, কখন আকাশে, কখন শূণ্ণে, কখন বা পর্বত-গহ্বরে লুকাইলেন । কিন্তু কোথাও নিস্তার নাই ! সমস্ত স্থানেই পশ্চাতে ফিরিয়া ঋষি দেখিতে পাইলেন, তাহাকে নিধন করিবার জন্ত চক্র তাঁহার অভিমুখেই আসিতেছেন । পরিশেষে নিরুপায় হইয়া ঋষি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ।

ব্রহ্মা ঋষিবরকে কম্পিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে মূনে ! তুমি কি-নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে ?” এই কথাই উত্তরে ঋষি বলিলেন,—“দেখুন, আপনি লোক-পিতামহ সকলের রক্ষাকর্তা, আমাকে পশ্চাৎস্থিত ঐ ভীষণ সুদর্শন চক্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন ।”

ব্রহ্মা সহাস্ত্রে বলিলেন,—“ও-ষে বিষ্ণুচক্র ; আমার সাধ্য নাই যে, ঐ চক্র হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি ।”

তখন দুর্ভাসা প্রাণভয়ে শিবলোকে গমন করিলেন । ভক্ত শ্রীশঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে ঋষিবর ! তুমি কি-জন্ত ভয়ে কম্পিত হইয়াছ ? সবিশেষ ঘটনা দুর্ভাসা শিবকে জানাইলে তিনি বলিলেন—“এ-সুদর্শন চক্র হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না । ঋহাচক্র, বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তুমি সেই শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন ।”

মহাদেবের এই বাণী শুনিয়া দুর্ভাসা বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিলেন । শ্রীনারায়ণ অন্তর্যামীসূত্রে সমস্ত ঘটনাই জানেন, তথাপি প্রকাশে বলিলেন,—“হে মূনিবর ! তুমি কি-নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে ?”

এই কথা শুনিয়া দুর্ভাসা কম্পিত-হৃদয়ে সজল নয়নে আমাকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—“হে অভয়দাতা ! ঐ দেখুন, আপনার ভীষণ অস্ত্র সুদর্শন আমাকে আঘাত করিবার জন্ত পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে ।”

ভগবান বিষ্ণু হাস্য করিয়া বলিলেন,—“হে দ্বিজ ! এ-চক্র হইতে অব্যাহতি দিবার আমার কোনও প্রকার ক্ষমতা নাই ।”

তখন সবিস্ময়ে দুর্ভাসা বলিলেন—কি আশ্চর্য্য ! আপনার হস্তস্থিত চক্র হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না ? সুদর্শন ত’ আপনারই ভূত্য ।

ভগবান বিষ্ণু তখন ঋষিকে বলিলেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদয়স্তহম্ ।

মদন্তঃস্ত ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (ভাঃ ৯।৪।৩৮)

“হে ঋষিবর ! আমি আর আমাতে নাই ; এ’জ্ঞ আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না । কারণ সাধুদের হৃদয় আমি, তাঁহারা আমাকে ভিন্ন অণু কাহাকে জানে না । আমিও সাধু-ভিন্ন অণু কাহাকেও জানি না । ভক্ত-কর্তৃক আমি জিত । অতএব আমি তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি,—‘তুমি যদি সত্যসত্যই প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে যে ভক্তের নিকট তুমি অপরাধ করিয়াছ সেই মহাভক্ত অশ্বরীষ রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও ।’ তিনি ভক্ত, স্বভাবতঃই দয়ালু ; অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া গমন কর ।”

ভগবানের এই আজ্ঞা পাইয়া ঋষি প্রাণভয়ে উর্দ্ধ্বাসে ছুটিলেন । অবশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা এখনও পূর্বের মত দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন । কারণ তাঁহার ভবন হইতে অতিথি অভূক্ত অবস্থায় গমন করায়, তিনি আর কিছুমাত্রও আহার গ্রহণ করেন নাই । রাজার এই অবস্থা—এই ভাব, দুর্কীসা ঋষির মনোবুদ্ধির অগোচর ।

তিনি ভাবিলেন, আমি যাহাকে নিধন করিবার জ্ঞ অত্যাগ্র ‘কৃত্যার’ সৃষ্টি করিলাম, তিনি আমার জ্ঞই অনাহারে একপদে দাঁড়াইয়া আছেন । ধন্থ, ধন্থ, এই সহগুণ ধন্যতিধন্থ !!! আমি প্রাণ-ভয়ে কত-শত-স্থানে দ্রুত-গতিতে যোগবলে পলায়ন করিয়াছি, কিন্তু ইনি নির্ভীকভাবে একস্থানেই বিরাজ করিতেছেন ।

আজ হইতে জানিলাম—ধিক্ ধিক্ আমার ব্রাহ্মণত্বে ! ধিক্ আমার ব্রত-তপস্যায় !! “ভক্তই বড়” এই কথা আমি উর্দ্ধবাহ হইয়া সকলকে জানাইতেছি । এই ভক্তের দর্শনে আমিও ধন্থ ও পবিত্র হইলাম । এই বলিয়া ঋষি যখন সাষ্টাঙ্গে মহাভাগবত অশ্বরীষ রাজার পদতলে নিপতিত হইলেন, তখন সঙ্কুচিত হইয়া রাজা বলিলেন,—“অহো মহামুনে ! আপনি কি করিতেছেন !”

ঋষি বলিলেন—“আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন ; আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর কোনও গতি নাই ।”

এই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি সম্মুখস্থ শ্রীহৃদদর্শন চক্রকে প্রণাম ও স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে, চক্র দুর্কীসাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমন করিলেন ।

পরিশেষে রাজা অতিথি দুর্কীসা ঋষিকে আনন্দসহকারে পরম উপায়ে ভোজ্য মহাপ্রসাদদান করিয়া ও ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

আত্মানুসন্ধানে

মৃত্যু মানব-জীবনের সর্বাপেক্ষা অনিশ্চিত ঘটনা। ভাবের দিক্ হইতে মৃত্যু—অভাব, মৃত্যু—সর্বনাশী, মৃত্যু—ভয়ঙ্কর। তাই নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। মানুষ একটা আশা অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, মৃত্যুই সেই আশা-বৃক্ষের মূল-উৎপাটক। তাই আমাদের এত ব্যথা।

মৃত্যু বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি—মৃত্যুই এ'জীবনের শেষ। বস্তুতঃ দেহ হইতে আগ্নার বিচ্ছেদই মৃত্যু। জড়বাদি-সম্প্রদায় যাহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহাদের মতে 'চৈতন্য' মস্তিষ্কের স্পন্দনমাত্র,—স্থূল দেহের বিনাশের সঙ্গে-সঙ্গেই সব ফুরাইয়া যায়। জীবনের অস্তিত্ব বা আয়ত্ত্ব তাহাদিগের নিকট মিথ্যা। কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মায় যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আত্মা সম্বন্ধেও কিছু কিছু চিন্তা করেন। জীব অন্তঃকালে কি গতি লাভ করিবে? কোথায় কি-প্রকারে নব জীবন আরম্ভ হইবে—এই চিন্তাই তাঁহাদের চিত্তে উদ্ভিত হয়।

আত্মার সম্বন্ধে অনুধাবন করার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। কারণ, স্থূল-দর্শী মানুষ স্থূল-জ্ঞানেই বিমূঢ় থাকে। প্রায়ই দেখা যায়—পার্শ্বিক বিষয়াসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি মরণের শেষ-মুহূর্ত্তেও পার্শ্বিক বিষয়-ব্যাপারের চিন্তাই করিয়া থাকে। চিত্ত হইতে সংস্কারগুলি দূর করিতে সমর্থ হন না। ফলে, পূর্ব-জন্মার্জিত সংস্কারগুলির প্রভাব পরবর্ত্তী জন্মেও থাকিয়া যায়। এই জগত্ই জীবনের প্রারম্ভে সংঘম ও ত্যাগাভ্যাসের অনুশীলন না করিলে অস্তিম দিনে কোন-ক্রমেই চিত্তকে নিষ্কিষয় করা যায় না। চিত্তকে পার্শ্বিক ব্যাপার হইতে বিমুক্ত করিতে হইলে যে-প্রকারের সাধনার প্রয়োজন, দেহ-ত্যাগের বহু পূর্ব হইতে তাহার অভ্যাস রাখা দরকার।

বাসনা ত্যাগের প্রয়াস—এক কঠোর সাধনা। অনেক সময় কঠোর তপস্যাতেও সফল লাভ হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সম্বন্ধে বহু সত্বপদেশ আছে। এইসকল উপনিষদ্-বাক্য জ্ঞানি-লোক কর্তৃকই পঠিত হয়। সংস্কারাসক্ত ব্যক্তিগণও উহা পাঠ করেন; কিন্তু তাহদের সে পাঠে কোন ফল হয় না। উপদেশ-বাক্যগুলি চিত্তের সমক্ষে ক্রিয়ানীল সজীব মূর্ত্তির হ্রায় প্রতিফলিত না হইলে চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না। মানব-হৃদয়েও উপদেশ-বাণীব সমুজ্জল মূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজমান না হইলে কেবল পঠনে উহার ফল লাভ হয় না। বিশ্বত দেবতাকে স্মরণ-পথে আনিতে সাধনায় প্রয়োজন হয়। এ সাধনার একমাত্র উপায়— ভগবদ্ভক্তি।

ভক্তিব্যোগের দ্বারাই সাধনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্তি-বীজেই প্রকৃত বৈরাগ্য ও অহৈতুকী ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিব্যোগঃ প্রযোজিতঃ ।

জনয়ত্যাশুবৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ (ভাঃ ১২।৭)

ভক্তিব্যোগের সাহায্যে বাসনা-ত্যাগ সম্ভব হয়। চিত্ত যদি আনন্দ-রস-বিগ্রহের মধুর মূর্তি, মধুর নাম এবং সর্বচিত্তাকর্ষণী লীলাকথা দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে পার্থিব বিষয়-সংস্কার আর সে-হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না। পার্থিব বিষয়-সন্তোষ-বাসনাসমূহকে বিতাড়িত করিয়া যদি হৃদয়-ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তি স্প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভগবানের শ্রীনাম, গুণ, রূপ, লীলাদি স্মরণ-কীর্তন-মনন করিতে করিতে আত্ম দেহত্যাগ করিতে পারেন, তবে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

—ডাঃ শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার

পুরাণ-ভক্তি-কাব্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-বিশারদ

বেলঘোরিয়া (২৪ পরগণা)

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্বে প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর)

মনে মনে ভগবান্কে ডাকলে কি ভগবান্ পাওয়া যায় না?—তোমার এই কথাটা হইতে তোমার হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির অমূলক ক্রিয়া-মুদ্রা গ্রহণ করিতে তোমার চক্ষু বা ঘৃণা হইতেছে, তজ্জন্ত তুমি ফাঁকির আশ্রয় লইতে চাহিতেছ। ইহা তোমার ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে অতীব্রতা বা শৈথিল্যের পরিচয় দিতেছে। অথবা জ্ঞান-যোগাদি সাধন প্রভাবে অরূপ-ত্রস্ত ও নির্বিকলাস পরমাত্ম-গতিকেই ভগবৎ-প্রাপ্তি বলিয়া তুমি জ্ঞান করিতেছ। প্রথম ক্ষেত্র সম্বন্ধে বক্তব্য হইতেছে—মনে মনে ভগবান্কে ডাকিতে শক্তি লাভ করিবার জন্যই অমূলক ক্রিয়া-মুদ্রা। এইগুলি সাধকের মনটিকে ভগবৎ-স্মৃতি দ্বারা পবিত্র করিবে। অপবিত্র বা মলিন মনে ভগবৎ-স্মৃতি সম্ভব নহে। “মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ” (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫০)। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ভক্তিব্যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশুং পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ষ তদপাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১।৭।৪)

ভক্তিযোগের দ্বারা মন সম্যকরূপে নির্মল হইলে পূর্ণ-পুরুষকে ও তদাশ্রিত মায়াকে দর্শন করা সম্ভব হয়। এই ভক্তিযোগই মনকে সম্যকরূপে নির্মলতা প্রদান করিতে সক্ষম। এই ভক্তির বহু প্রকার অঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ৬৪ প্রকার প্রধান। মালা-তিলকাদি ধারণ এবং তুলসী-মালিকা-সহযোগে শ্রীহরিনাম গ্রহণ উক্ত ৬৪ প্রকার মধ্যে একবিংশতিতম পর্য্যায়। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি যাহাতে লাভ করা যায়, তজ্জন্মই শ্রীভগবৎ-প্রিয়তমা শ্রীশ্রীতুলসী-দেবীর আনুগত্যে শ্রীতুলসী-মালিকায় নাম-সংখ্যা রক্ষা করা হয়। যদি সংখ্যা রক্ষা না করা হয়, তবে অনর্থগ্রস্ত সাধক নাম-ভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অনর্থগ্রস্ত সাধকের মন শ্রীভগবানে রতিবিশিষ্ট নহে বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে চাহে না। সে সর্বদা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়াক্রষ্ট বলিয়া তদ্বিষয়েই লিপ্ত থাকিতে চাহে। ভগবৎ-চিন্তাদি তাহার রুচিকর হয় না। অথচ এই আপাত অরুচিকর বস্তুই তাহার অরুচি-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ এবং ব্যাধি-নির্মুক্ত অবস্থার স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য-স্বথ। যেক্রপ আপাত রুচিকর কুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করিলে ব্যাধিমুক্ত ও স্বাস্থ্যস্বথ লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তি ভবব্যাধির সূচিকিৎসক শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করত শ্রীনাম-ভজনে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে শ্রীনাম-গ্রহণে স্বাভাবিক তরুচি থাকা সত্ত্বেও শিষ্যত্বের লক্ষণ-স্বরূপ গুরু-বাক্য ও শাস্ত্রবাক্যে তাহার গাঢ় শ্রদ্ধাহেতু সে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ সর্বতোভাবে পালন করিতে থাকে। শ্রীগুরুদেব তাহাকে শ্রীভগবৎ-স্মৃতিতে নৈরন্তর্য্য লাভ করিবার জন্ম নামগ্রহণ-কালে প্রথমতঃ সংখ্যা রক্ষা করিতে উপদেশ করেন। শ্রীগুরুবাক্য-রক্ষাব্রতী শিষ্য অনর্থ-যুক্তাবস্থায় অনর্থের আক্রমণে শ্রীনাম গ্রহণ হইতে বিরত হইতে ইচ্ছা করিলেও, সে গুরুবাক্য-রক্ষাব্রতী বলিয়া সংখ্যা অসম্পূর্ণ রাখিতে পারে না। অনর্থের প্রকোপ তাহাকে বাধা দিলেও সে যত্ন-সহকারে সংখ্যা পূর্ণ করিতে থাকে। তৎকালে তাহার অনর্থ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং সাধক নামে রুচি-রূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা এই নাম-গ্রহণে সংখ্যা রক্ষণে যত্নবান্ নহেন, তাহাদের অনর্থ ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে শ্রীনামসেবা হইতে প্রত্যাহত করিয়া বিষয়-সেবায় নিযুক্ত করে। ফলে তাহাদের দুঃখ-ভজ্ঞ জন্ম বার্থ হইয়া যায় এবং নিরয়গামী হইয়া দুঃখ-লাভ ঘটে। ভাই, তজ্জন্ম সংখ্যা-রক্ষাপূর্বক নাম-গ্রহণ করাই অনর্থযুক্তাবস্থায় সর্বতোভাবে সমীচীন। এইরূপ সংখ্যাপূর্বক নাম গ্রহণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই ভজন-পথে উন্নত হইতে পারিব এবং ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যযুক্ত ভগবৎ-স্মৃতি লাভ করত ধন্য হইব। শাস্ত্রোপদেশ, যথা—

“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভ্রাদৃণি চ শং তনোতি ।

সত্ত্বশ্চ শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

ভাই, তোমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া সনাতনধর্ম-শাস্ত্রানুবর্তনে শ্রীহরিনামের মালিকা তোমার নিকট অশোভন বলিয়া বিবেচিত হওয়া কি ঠিক ? দেখ, সনাতনী ব্যতীত পাশ্চাত্য-দেশীয় ধর্মমতেও আমরা মালিকা ব্যবহার-প্রণালী লক্ষ্য করিতে পাই। মুসলমান, খৃষ্টীয়ান (রোম্যান্ ক্যাথলিক) বৌদ্ধ, নানকপন্থী প্রভৃতি অনেকেই ত' এই সংখ্যাপূর্বক মালা জপার পক্ষপাতী। তুমি মস্তকে শিখা রাখিতে আতঙ্কিত, কিন্তু মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও শিখদের গৌফ-দাড়ি রাখাকে তদ্রূপ ভয়াবহ বলিয়া বিবেচনা কর না। তুমি বৈরাগ্যসূচক কোপীন-কাঁথা দেখিয়া কুণ্ঠিত হও, কিন্তু পাদ্রীসাহেবের অদ্ভুত আলথেল্লা দেখিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠ; গলদেশে তুলসী-মালিকা ধারণ তোমার নিকট অস্বস্তিদ ব্যাপার, কিন্তু নেক্-টাই, ক্রুশ-চিহ্ন, মুসলমানী তাবিজ, শিখদের লোহার বালা, মিলিটারীর নম্বর-পদক তোমায় পীড়ন করে না। ভাই, তোমার এক্রূপ অবস্থা দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করি। তুমি “হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন”-রচয়িতা কবি মাইকেলের উপদেশ অনুসরণ করিয়া নিজস্ব সম্পদে কচিবিশিষ্ট হইলে তোমার মঙ্গল হইবে; আমরাও আনন্দিত হইব।

নরেন্দ্র—ভাই, তুমি যে বিচার দেখাইতেছ তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি বলিতেছি—আমাদের হিন্দুধর্মে এমন অনেক ভক্তই রহিয়াছেন যাহাদের তোমাদের ত্রায় ত্রিলক-মালাদি গ্রহণ না করিয়াও সিদ্ধিলাভ ঘটয়াছে। স্বতরাং তোমার মতটাই যে মত, অগ্রুটি কিছু নহে—ইহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আমরা মহাজন-মুখে শুনিয়াছি—“যত মত তত পথ”। স্বতরাং তোমার ঐ গোড়ামি কেহই বরদাস্ত করিবে না। তোমার ঐ মত ভাল লাগে, তুমি উহা গ্রহণ কর; কিন্তু তাই বলিয়া সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে হইবে—এক্রূপ বিচার সঙ্গত নহে।

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। তোমার বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তুমি আমার ২য় অনুমান অনুযায়ী বিচার পোষণ কর। যাহা হউক, এতদূতরে আমার বিনোদ নিবেদন - আমি তোমার স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা রাখি না। তুমি তোমার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে চলিবে—ইহাতে আমার লাভ-ক্ষতি কিছু নাই। তবে, ফলাফলভোগী ত' তুমিই হইবে, তজ্জন্তু ভবিষ্যৎ-বিষয়ে

বিচার করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য এবং শুভাশুভ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া বন্ধুর কৃত্য। “যত মত তত পথ” কথাটি দ্বারা সমস্ত মতেরই পরিণতি একইরূপ হইবে—ইহা যদি তোমার ধারণা হয়, তবে আমি উহা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই তিন গুণের ক্রিয়ার ফল একই প্রকার—ইহা মিথ্যা। নানাদিক্ হইতে রাস্তা আসিয়া কোন বিন্দুতে মিলিত হইতে পারে—ইহা সত্য। ইহা সত্য বলিয়াই আমাদের বর্তমান অবস্থানের চতুর্দিকে নানা পথ প্রস্তুত দেখা যাইতেছে এবং আমরা ঐ সংযোগ-বিন্দুতে অবস্থান করিতেছি বলিয়াই যে-কোন একটা পথ গ্রহণ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু ঐ বিভিন্ন পথগুলি দ্বারা আমরা কখনই একই স্থানে পৌছাইতে সক্ষম হইব না, কারণ তাহা বিভিন্ন-মুখী। তাই নরকগামী রাস্তা অবলম্বন করিয়া নরকেই পৌছিব, বৈকুণ্ঠে যাওয়া ঘটিবে না। আবার বৈকুণ্ঠের পথ অকলম্বন করিলে বৈকুণ্ঠলাভই ঘটিবে, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে না। স্তবরাং বৈকুণ্ঠলাভের পথ—সেটা স্বতন্ত্র; বদ্ধ জীবের ইচ্ছানুসারে যে-কোন একটা গ্রহণ করিলেই চলিবে না।

শুদ্ধভক্তি-পথদ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ-মার্গ দ্বারা সেই একই ফল কখনই পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তি-পথে ভবগংগ্রেম-রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ হয়। আর ভক্ত্যানুগত্যবিহীন স্বতন্ত্র কর্ম-জ্ঞান-যোগপথ যথাক্রমে স্বর্গ-নরক-রূপ জাগতিক সুখ-দুঃখ, আত্ম-হত্যারূপ নির্দিশেষ ব্রহ্ম-সাবুজ্য ও অগ্নিমা-লঘিমাди অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। শুদ্ধ-ভক্তের স্থান চিহ্নয় গোলোক-বৈকুণ্ঠ, জ্ঞানী-যোগীর স্থান আধুনিক অস্ত্রোপচারকের ক্রৌঞ্চকর্ম করিবার টেবিল-স্বরূপ ব্রহ্মলোক; অর্থাৎ, অস্ত্রোপচার খুব ভালই হইয়াছিল বটে, কিন্তু রোগী মারা গেল। আর কর্মীর স্থান স্বর্গ-নরকাদি চতুর্দশ লোক। স্তবরাং সমস্ত পথই একস্থানে পৌছিতে পারিতেছে না। একাকার করিয়া গৌজামিল দিয়া সাধারণের চক্ষে ধুলি দেওয়া যায় বটে, কিন্তু সৎগুরু-কৃপাপ্রাপ্ত জীব উহা অনায়াসেই ধরিয়া ফেলে।

নরেন্দ্র—ভাই, তোমার কথার শেষাংশটুকু ভাবরূপ অনুধাবন করিতে পারিলাম না। তুমি কি ইহা বিস্তার করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিবে?

দেবেন্দ্র—তোমার যখন শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ইহা তোমাকে না বলিয়া আমি আর কাহাকে বলিব। তবে এখন রাত্রি হইয়া পড়িল, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে। অতঃপরে চল, আগামীকাল্য পুনরায় ঐবিষয়ে আলোচনা করিব।

আমাদের দুই বন্ধুকে আমরা অতঃ এইখানেই বিদায় দিলাম। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিশ্রামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

জগদগুরু শ্রীমন্তুক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষোড়শ-বার্ষিক বিরহ-উৎসব

গত ২০শে অগ্রহায়ণ, (ইং ৫।১২।৫২) শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণ-চতুর্থী তিথির শুভ মিলনে জগদগুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ সমীপে কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের সেবকদিগের ঐকান্তিক আগ্রহ মূর্তিমান হইয়া উঠে। অতি উষাকাল হইতে তদীয় অল্পগত সেবকবৃন্দ বন্দনা-বিরহাদি ও “জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়” গীতিটা কীর্তন করেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে তাঁহার অমিয় শব্দমূর্তি “শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী” (১ম খণ্ড) নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পারায়ণ করা হয়। পরম পূজ্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীল ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ বিরহতিথি সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে এই পারায়ণের পৌরোহিত্য করেন।

মধ্যাহ্নে—শ্রীল প্রভুপাদের রুচিসম্মত বিবিধ বিচিত্রভোগ শ্রীল প্রভুপাদকে নিবেদন করিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলীকে বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে—বিরহ কীর্তনের পর শ্রীমদ্ বামন মহারাজ আনন্দগোপাল প্রভু, ত্রিবিক্রম মহারাজ, দামোদর মহারাজ ও ধর্মেশ্বর প্রভু পর পর সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত ৩টা পত্র ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। জগদগুরু প্রভুপাদের অলৌকিক জীব-কল্যাণকর আদর্শ ও উপদেশ-সমূহ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্তুক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে মদীয় প্রভুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তুক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তাঁহার হৃদয়-ধন শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম সেবার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে গভীর গার্ভাধ্যাপূর্ণ অকপট-সত্য উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদের পরম কল্যাণ বিধান করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে শিক্ষালাভ করা যায় যে, বৈষ্ণবের বিরহ ও আবির্ভাব একই তাৎপর্য্যপন্ন। শরণাগতিই—সেবা; শরণাগতি-বিহীন আচার-প্রচারাতি সেবার নামে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি। (তাঁহার বক্তৃতা পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে।)

সর্বশেষে—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্তির আরতি করা হয়। আরতিকালে ভক্তবৃন্দ-কর্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেবের রচিত “জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি”-নামক আরতি-গীতিটা খোল-করতালাদিযোগে কীর্তিত হয়।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৬ ; মাঘ—১৩৫৯

২০ মাঘ, ৬ মাঘ, ২০ জাহ্নয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-পঞ্চমী দি ১১২ । শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব । শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব ।

২২ মাঘ, ৮ মাঘ, ২২ জাহ্নয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌরাষ্টমীরা ৩৩১। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস । শ্রীভীষ্মপঞ্চক ।

২৩ মাঘ, ৯ মাঘ, ২৩ জাহ্নয়ারী, শুক্রবার—গৌর-নবমী রা ২১৫। দি ১১৫-মধ্যে পারণ । শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব ।

২৪ মাঘ, ১০ মাঘ, ২৪ জাহ্নয়ারী, শনিবার—গৌর-দশমী রা ১১২৪ । শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের তিরোভাব ।

২৫ মাঘ, ১১ মাঘ, ২৫ জাহ্নয়ারী, রবিবার—গৌরৈকাদশী রা ১১২ । ভৈরবী একাদশীর ও বরাহদ্বাদশীর উপবাস ।

২৬ মাঘ, ১২ মাঘ, ২৬ জাহ্নয়ারী, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১১১১ । বরাহদেবের অর্চনান্তে দি ৭১৪ গতে পূর্বাহ্ন ১০১০ মধ্যে পারণ ।

২৭ মাঘ, ১৩ মাঘ, ২৭ জাহ্নয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১১৫০ । শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস ।

২৮ মাঘ, ১৪ মাঘ, ২৮ জাহ্নয়ারী, বুধবার—গৌর-চতুর্দশী রা ৩১০ । পূর্বাহ্ন ১০১০ মধ্যে পারণ ।

৪ গোবিন্দ, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ১০৪৭ । চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অত্র হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা আরম্ভ ।

৬ গোবিন্দ, ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ২১২২ । জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমন্ত্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব । শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সমাপ্ত ।

১২ গোবিন্দ, ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ২১৫৫ । বিজয়া একাদশীর উপবাস ।

১৩ গোবিন্দ, ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১১২৩ । পূর্বাহ্ন ১১৫৯ মধ্যে একাদশীর পারণ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষেজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্বশুত ॥

অত্ম ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪র্থ বর্ষ

অনিরুদ্ধ, ১৪ মাঘ, ৪৬৬ গোরাঙ্গ
বুধবার, ৩০ পৌষ, ১৩৫৯; ইং ১৪১১

১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রী বদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্ [শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

গরুড় উবাচ—

- ১। জয় জয় ত্রিভুবন-জন-মনোভবন বিদলিতাঘ-গুণ ।
সকল-গীর্বাণ-বন্দিত-চরণ-কমল-যুগল-পরিমল-
বহল-রিপু-বন-বিভঞ্জন বিদ্যোতমান্ সকল-সুরাসুর-
মুকুটকোটি-বিলসিত নিজপীঠ-কমল নিরসিত-নিজজন-

হৃদয়-তিমিরপটল-বহল হিমকর ইব ত্রিবিধ-সম্ভাপ-
 সন্দোহ-হরণ-চরণ, জগদুদয়-স্থিতি-লয়-বিলাস-বিলসিত-
 ত্রিবিধমूर्তি,-কীর্তিস্মুর্জিতজগদুদয়সন্দোহ দিনকর ইব,
 নিজজন-মানস-সরোজ-ষট্‌পদ-বিদিত-সকলবেদ-
 বিছোতমান-মানস-নিজজন-মুনিজন-বন্দিতপদ-মখনীৱ-
 পবিত্রীকৃত-গীর্বাণ-মুনি-মানস-বন্দিত-চরণরজঃ-
 প্রসাদ-সারভূত জগতামধীশ নমস্তে নমস্তে ॥১০॥

- ২। অপি চ অষ্ট-শক্তি-সহিতো বনমালী পীত-চৈল-কুশুমাবলি-শোভঃ ।
 পঙ্কজাকর-বিরাজিত-পাদঃ পাতু মামবহিতেন্দ্রিয়বর্গঃ ॥১১॥
- ৩। ভক্ত-হৃৎকমল-রাজিত-মূর্তির্দুর্দৈত্য-দলনোপ্তিত-কীৰ্ত্তিঃ ।
 বন্ধসেতু-রবিতাশ্রিত-লোকঃ পাতু মামনুদিনং ভুবনেশঃ ॥১২॥
- ৪। স্থির-চল-ত্রিবিধ-তাপ-হিমাংশুভাসমান-তরণি-প্রতিভাসঃ ।
 এক এব বহুধা কৃত-বেষো মায়য়াবতু মহামতিরীশঃ ॥১৩॥
- ৫। ভক্তচিন্তনকৃতে কৃতরূপঃ শৈশবেন বহুশাসিতভূপঃ ।
 বেদমার্গ উরুধা হিতকারী রীতিরীশি-তুরীয়াং গুণশালী ॥১৪॥
 যজ্ঞভুগ্-হৃদয়-বন্ধনধারী বিশ্ব-মূর্তিরবলাংশুক-হারী ।
 পালনেহপি মহতাং বহু-দেহো রাস এষ তনুমানবতাম্ ॥১৫॥
- ৬। প্রেমভক্তি-পুরুষৈরুপলভ্যঃ পুরুষঃ কৃত-সমস্ত-নিবাসঃ ।
 দাস্তবৃন্দহৃষিতো নিজ-দাসঃ প্রেক্ষণৈক-করণোহবতু বিশ্বম্ ॥১৬॥
- ৭। কণ্ঠ-লম্বিত-তরঙ্গু-নখাগ্র-ক্রুষ্ণ-গোপ-স্ময়ী-কুচভারঃ ।
 লীলয়া যুবতিভিঃ কৃত-বেষঃ শেষ এষ ভবতাদুপশাস্ত্যে ॥১৭॥
- ৮। দণ্ডপাণিরয়মেব জনানাং শাসিতাত্ম-নিয়মোক্ত-হিতানাম্ ।
 পাবনায় মহতামনুশালী বিশ্ব-দুঃখ-শমনো ভবতাম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীকান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে গরুড়কৃত-বদরীনারায়ণ-
 স্ততিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রী শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১। গরুড় বলিল —হে প্রভো ! ত্রিভুবন-স্থিত জনগণের হৃদয়ই আপনার বাস-ভবন। আপনার গুণে হরিত-রাশি বিদলিত হয়। যে-সকল দেবতা আপনার চরণ-কমল-যুগল বন্দনা করেন, আপনি তাঁহাদের রিপুরুপ বনরাজি বিভঞ্জন করিয়া থাকেন। আপনি নিম্নত প্রভা-যুক্ত ; আপনার পীঠ-কমলে সকল সুরাহরের কোটি কোটি মুকুট বিলুপ্ত হইয়াছে। আপনি শশধরের ত্রায় নিজ ভক্তজনের হৃদয়-তিমির-রাশি বিদূরিত করেন। আপনার চরণের শরণ লইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ আপনি হরণ করিয়া থাকেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জ্ঞাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ আপনার ত্রিবিধ মূর্তি প্রকটিত হয়। আপনি আবির্ভূত হইলে দিনকরের উদয়ের ত্রায় নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়। আপনি স্বীয় ভক্ত-গণের মানস-সরোরুহের ষট্‌পদ-স্বরূপ, নিখিল বেদ-বিজ্ঞা আপনার বিদিত, আপনার মন নিরন্তর বিচোত-মান। মুনিগণ আপনার নিজজন, তাঁহারা আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ত্বদীয় নখর-নীরে আত্মা পূত করেন। আপনার চরণেরেই আপনার অলুগ্রহের সারভূত জানিয়া সুর-মুনিগণ মনে মনে সেই চরণ-রেখা বন্দনা করেন ; আপনি বিশ্বের অধীশ্বর, আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥১০॥

২। আবার বলি,—যিনি অষ্ট-শক্তি-যুক্ত, ষাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত, পীত-বসন ও কুসুমসমূহে যিনি শোভিত, পদ্মাকরে ষাঁহার পাদপদ্ম বিরাজিত এবং ষাঁহার ইন্দ্রিয়-নিচয় সংযত, সেই জগদীশ আমাকে রক্ষা করুন ॥১১॥

৩। ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মে ষাঁহার মূর্তি নিম্নত বিরাজিত, দুই দৈত্যাদিগের দলন-জ্ঞাত ষাঁহার কীর্তি অভূতখিত, যিনি সেতু-বন্ধন করিয়াছেন এবং যিনি আশ্রিতের পালক, সেই ত্রিভুবন-পতি আমাকে পালন করুন ॥১২॥

৪। যিনি নিম্নত ও অনিম্নত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের হিমাংশু, যিনি স্বীয় প্রতিভায় ভানুর ত্রায় উদ্ভাসিত হন, মায়া এইরূপ বিবিধ বেশ রচনা করিয়া ষাঁহার মহিমা প্রকাশ করে, সেই ঈশ আমাকে রক্ষা করুন ॥১৩॥

৫। যিনি সত্যরূপ-ধৃত বলিয়া ভক্তগণ ষাঁহার চিন্তা করেন, শৈশবেই যিনি বহু অবনীপতিকে শাসন করিয়াছেন, যিনি বেদের পথস্বরূপ, যিনি স্বয়ংরূপে বহু হইয়াছেন যিনি অগতের হিতকারী, ষাঁহাতে এই ঐশ্বরীয়াতি বিজ্ঞমান, যিনি তুরীয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম, যিনি সর্ব-গুণশালী, যিনি যজ্ঞভুক, স্বেচ্ছায় যিনি বন্ধন ধারণ করেন, বিশ্বই ষাঁহার মূর্তি, যিনি অবলা গোপীগণের বসন-হরণ করিয়াছেন, মহীয়ান্‌গণের পালনের

জন্তু যিনি বহুদেহ ধারণ করেন, রাস-রসিক সেই শরীর-ধারী হরি আমাদেরকে রক্ষা করুন ॥১৪।১৫॥

৬। যিনি প্রেমভক্তিপূর্ণ পুরুষগণের লভ্য, যিনি পুরুষ-রূপে সর্বত্র বাস করেন, যিনি ভক্তগণের সেবা দ্বারা হৃষ্ট হন, যিনি স্বয়ং স্বাধীন, সেই হরি একমাত্র করুণা-কটাক্ষে বিশ্বকে রক্ষা করুন ॥১৬॥

৭। ষাঁহার কণ্ঠে গোপ-রমণীগণের কুচ-ভার গ্রস্ত হয়, যিনি ব্যাঘ্র নখের ত্রায় নখাগ্রভাগ দ্বারা গোপীদিগের কুচ্চয় আকর্ষণ করেন এবং যিনি লীলাবশতঃ যুবতী গোপীগণের সহিত বিবিধ বৈশ রচনা করেন, সেই অনন্ত আমাদের ভবতাপ উপশম করুন ॥১৭॥

৮। যিনি স্বেচ্ছাচার নরগণের শাসনের জন্তু দণ্ডধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পবিত্রতা রক্ষার্থ আনুকূল্য করেন এবং যিনি বিশ্বের দুঃখ দূর করেন, সেই ঈশ আমাদের ক্লেশ বিনাশ করুন ॥১৮॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে গরুড়-কৃত বদরী-
নারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চেপাসনা

ঔপনিষদ ব্রহ্ম, ও তন্মিরূপণে বিশিষ্টাঈত ও অঈত-বাদ

যাঁহা হইতে এই জড়জগৎ জাত হইয়াছে, যাঁহা হইতে জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহাতে এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত, যিনি জড়-জগতের ও জীবজগতের নিত্য-আশ্রয়রূপে আধিষ্ঠিত, জিজ্ঞাসুগণের যিনি জিজ্ঞাস্ত বস্তু, এবং জ্ঞানীগণের যিনি জ্ঞেয় বস্তু, ঔপনিষদ ব্রহ্ম-নামে তিনি সংজ্ঞিত হন। উপরিলিখিত শ্রুতি যে ব্রহ্ম-বস্তুর কথা বলিলেন, তিনি সবিশেষ কি নির্কিংশেষ, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই সম্প্রদায় বিশিষ্টাঈত ও কেবলাঈত-নির্কিংশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হ'ন।

নির্কিংশেষবাদীর ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে কল্পনা

নির্কিংশেষবাদী বলেন,—“জড়-জগতে ও জীব-জগতে যে কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ই অনিত্য ও মিথ্যা, যেহেতু ব্রহ্ম নির্কিংশেষ। জীব ও জড় জগতের বিশেষত্ব ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত-মাত্র; তাঁহাদের বাস্তব অধিষ্ঠান

নাই। দ্রষ্টা খণ্ড-দর্শনে দর্শন করিতে গিয়াই ঐরূপ মিথ্যা-ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম—শক্তি-রহিত এবং বিশেষ-রহিত বস্তু। ব্রহ্ম চিহ্নস্ত বলিয়া ব্রহ্ম-সত্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে। বিশেষত্ব বা ভেদ জড়মায়া-কল্পিত। মায়া-র অভাবে স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্যযুক্ত চিন্মাত্র অবস্থিত।”

সবিশেষবাদীর ‘ব্রহ্ম’-জ্ঞানে বিশেষ-ধর্মের নিত্যাবস্থান

সবিশেষবাদী বলেন,—“জড়-বিশেষে নশ্বর ধর্ম অবস্থিত, প্রতীতি সত্য, এবং ব্রহ্ম-বস্তুর বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণামে জগৎ উদ্ভূত। অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া তদ্রূপ-বৈভব এবং অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের অন্তরালে,—তটদেশে উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীব-জগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে বিশেষ-ধর্ম নিত্যাবস্থিত। বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণত জগৎকে বা অণুচিৎ জীব-জগৎকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক নাই।

জীব—অণু-চিৎ এবং তটস্থ-ধর্মবশতঃ চিৎ-

জগৎ হইতে পতনযোগ্য

চেতন ধর্মে তদ্বিপরীত অচিৎ-বস্তু-গ্রহণ-বৃত্তি অণুচিৎ-গঠনে বর্তমান থাকায় ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য-পরিণাম-রূপ বৈকুণ্ঠে অণুচিৎ-মাত্রেই সর্বক্ষণ অবস্থিত নয়। অণুচিৎ বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও অচিৎ-বস্তুর অনুশীলনে নিজের স্বরূপ-ভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ হয়, ব্রহ্মের বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণত জগৎ দর্শন করিতে করিতে অন্তরঙ্গা-শক্তি প্রকটিত জগদদর্শনে বিমুখ হন। সেই কালেই তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দেহ ও মনোরূপ অনাত্ম-বস্তুদ্বয়কে আত্মা বলিয়া মনে করেন। দেহ ও মনের ধর্ম—জড়-জগৎ ও বদ্ধজীব-জগতের ভোক্তৃত্বময়।

অধোক্ষজ কৃষ্ণের অনুকূল-সেবাই মুক্তির কারণ,

তদভাবে অদ্বৈতবাদীর বিষয়াসক্তি

আত্ম-চক্ষুর দ্বারা স্বরূপাবস্থা হইয়া জীব যখন ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার অচিৎ পরিচয় ন্যাগাধিক বিস্মরণ হয়। অনুকূলভাবে অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রতীতি থাকে না। ভগবৎ-সেবার অভাবেই জীব জড়ের বিষয়-সেবায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম-বস্তু দেহ ও মনের দ্বারাই জড়ের বিষয়-সেবা হয়। ভগবদ্বস্ত জড়দ্বিয়ের গোচরীভূত হন না। অতীন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। যে-কালে জীব আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণু-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ-দাস্ত্রের পরিবর্তে জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃত্তিতে চালিত হন, সেই কালে কৃষ্ণকে মায়াশক্তি বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়।

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী অদ্বৈতবাদীর বিষ্ণুতে পঞ্চ-দেবতার আরোপ ; কিন্তু নিষ্কাম সেবাই আত্মার নিত্যধর্ম

যে-কালে জড় অর্থসিদ্ধিলাভের জন্য নিত্য বিষ্ণু-সেবা পরিহার করেন, সেই কালেই বিষ্ণুকে গণেশ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-কালে প্রাপঞ্চিক অহুভূতি-বিশিষ্ট হইয়া ধর্ম-কামী দেহ ও মন বিষ্ণু-পূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে বিষ্ণু-দর্শনের পরিবর্তে 'সবিতা' দেখিয়া ফেলেন। ধর্মার্থ-কামী ভুক্তি-পরবশ হইয়া সূর্য্য, গণেশ ও শক্তির সেবাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করেন। আবার মোক্ষ-কামী হইয়া উপাস্ত বস্তুকে রুদ্র-রূপে দর্শন করেন। জড় কামনাই জীবকে বদ্ধাহুভূতিতে চতুর্ভুজের সেবক করিয়া তোলে। বিষ্ণু-উপাসনায় জীবের কোন জড় কাম নাই। সেখানে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রবল হইয়া আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয়। উহাই আত্মবিদগ্ধের নিত্য-ধর্ম।

শ্রীবিষ্ণুকে প্রাকৃত-গুণাচ্ছন্ন ও দেবতা-পঞ্চকের সমান মনে করাই অপরাধ

বিষ্ণু-মায়ায় সম্মোহিত হইয়া জীব কামনার বশবর্তী হন, ও চতুর্ভুজ-লাভের বাসনায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন একটা রূপ কল্পনা করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে পরব্রহ্ম জানিবার পরিবর্তে সগুণ অন্ধ প্রাকৃত গুণময় উপাস্ত জানা—তাহার অপরাধের পরিচয় মাত্র। জীব অনাত্ম-ধারণার বশবর্তী হইয়াই বদ্ধাভিমানে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোন সময় জড়কামনা প্রার্থনা করেন। তাদৃশ বিষ্ণু-উপাসনাও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। নিগুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সগুণ জ্ঞান করিয়া যে কামনাময়ী উপাসনা জগতে চলিতেছে, তাহার ভোক্ত্বরূপ দেহ ও মনকে বিবর্ত-বুদ্ধিতেই আত্ম-জ্ঞান হয়। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে কামদাস হইয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ ভগবান বিষ্ণুকে অপর সগুণ কাল্পনিক ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমজ্ঞান—অপরাধের লক্ষণ।

সগুণ বা পঞ্চোপাসনার উদ্দেশ্য—নির্বিশেষ ব্রহ্ম ; এবং নিগুণ উপাসনায় শ্রীবিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম

বিশুদ্ধসত্ত্ব-রূচিবিশিষ্ট জীব বিষ্ণু, সত্ত্ব-রজোমিশ্র-গুণবিশিষ্ট জীব সূর্য্য, সত্ত্ব-তমোগিশ্র-গুণবিশিষ্ট জীব গণেশ, রজ-স্তমো-গুণবিশিষ্ট জীব শক্তি এবং তমোগুণ-বিশিষ্ট জীব রুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনায় এই সম্প্রদায়-সমূহের লক্ষ্য বস্তু—নির্বিশেষ ব্রহ্ম। শুদ্ধজীবের আত্মা যে-কালে মায়া দ্বারা সম্মোহিত হয়, তখনই আপনাকে গুণদাস জানিয়া জীবের জড়চেতার উদয় এবং

জড়চেষ্ঠা-প্রভাবে বিশুদ্ধ স্বরাশ্রয়কে গুণাবতার-জ্ঞানে উপাসনার প্রবৃত্তি। নিজ স্বরূপের নিগুণতার উপলব্ধিতে সবিশেষ বিষ্ণু-বিগ্রহই পরব্রহ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস। আর উপাসকগণের হিতের জন্ত অনিত্য গুণোপেত কাল্পনিক মূর্ত্ত-ব্রহ্মগুলির শেব অভ্রান্ত পরিণাম—নির্কিংশেষ ব্রহ্ম। এবং নিজের অস্তিত্বাভাবহেতু উপাস্ত-উপাসক-ভ্রান্তির অপগমে নির্কিংশেষ ব্রহ্ম হইতে পারেন,—আশা করেন। পঞ্চোপাসনা এক্ষণে ‘চন্দ্রধিক্ষ্য’ ও ‘কেশ-যোগে’ সন্তোপাসনাবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে সকলেরই মুক্তিই লক্ষ্য। মুক্তিতে ঈশ্বর ও জীবে উপাস্ত-উপাসক-ভেদ নাই।

বুদ্ধের বোধরাহিত্য মতবাদ নির্কিংশেষবাদে পরিণত

শাক্যসিংহ মুক্তিতে বোধ-রাহিত্য স্বীকার করেন। কেবলাদ্বৈত নির্কিংশেষবাদী মুক্তিতে বোদ্ধা-বোদ্ধব্য ও বুদ্ধি-রহিত অথও বোধ স্বীকার করেন। বদ্ধজীব নানা প্রকার জড় ক্রেশের মধ্যে থাকিয়া নিজান্তিহে অল্পবিধা বোধ করিতেছিলেন। প্রতীতির সত্যতা অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অল্পবিধা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাঁহার আবশ্যক ছিল। কিন্তু নির্কিংশেষবাদীর হস্তে পড়িয়া তাঁহার নিজের বিনষ্ট হইয়া নির্কিংশেষ ব্রহ্মসাম্য হওয়ায় জানিতে পারায়, অল্প বস্তুরূপে পরিণত হইলেন অর্থাৎ সে জিনিষ রহিলেন না।

জীব ব্রহ্মে নির্কিংশেষ-লয়-প্রাপ্ত হইলে,

জীব অনিত্য হইয়া পড়ে

জীব নিজের নির্মল সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দ পরিহার করিয়া বিভূ বস্তুর সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দের নির্কিংশেষ অবস্থা ব্রহ্ম-করলে লীন হওয়ায়, তাঁহার নিত্য অণুচিৎ স্বরূপের বিলোপ সাধিত হইবে, বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য অণুচিৎস্বর্মে বদ্ধদশা-জনিত দোষাপগমের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া নিজ নিত্য অণুচিৎস্বর্মে ধ্বংস হউক—এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করা, সমীচীন মনে করা নিত্যত্বের ব্যাঘাত-কারক। মুক্ত অবস্থায় নিত্য অণুধর্ম বিগত হইলে তিনি আর সে বস্তু রহিলেন না।

জড়ের অণুত্ব অনুপাদেয়, কিন্তু চেতনের অণুত্ব

উপাদেয় ও হেয়ত্ব-বর্জিত

অবশ্য জড়ের অণুত্ব নানা অনুপাদেয়তা বা হেয়তা অবস্থান করে, কিন্তু চিন্ময় অণুস্বরূপে তাদৃশ অবরতার সম্ভাবনা নাই। সেখানে ভগবানের নিত্যসেবা বিরাজিত বলিয়া অনুপাদেয় ক্রেশাদির সম্ভাবনা নাই, অথচ নশ্বরতা ও হেয়তা তথায় আদৌ না থাকায় মুক্তির প্রাপ্য বিষয়সমূহ প্রকৃত-প্রস্তাবেই অবস্থান করিল।

বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকের তুলনায় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব

পঞ্চোপাসকগণ কালক্ষুদ্র নশ্বর ফলাকাঙ্ক্ষী। ঐকান্তিক বৈষ্ণব তাদৃশ নহেন। তিনি নিত্যকাল ভগবানের সেবক। পঞ্চোপাসকগণ—নিজ নিজ কামাভিলাষী, বৈষ্ণবগণ—নিত্য বিষ্ণু-দাস্তাভিলাষী। পঞ্চোপাসকগণ—কর্ম-ফলাধীন, বৈষ্ণবগণ—কর্মফলাতীত। বৈষ্ণবগণের নিজ বিচারে ভগবদ্-গঠন হয় নাই। জড়-বিচারের পূর্ন হইতে নিত্যরূপ ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থিত ছিলেন, নিত্যোপাসক বৈষ্ণবও ছিলেন; আর সাধকের হিতের জন্ত কামনাতুষারী ব্রহ্মের সত্ত্ব-‘রূপ’-কল্পিত পঞ্চোপাসনা—অল্পকালের জন্ত, পরিবর্তিত হইবার জন্ত, এবং কামী বদ্ধজীব-সৃষ্ট বা কল্পিত মাত্র।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিরতি

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-নিরূপণে তর্কের স্থান নাই

আমরা যখন এই পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত সমাধি-যোগে অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে একটা অকুণ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ ভক্তির্যোগের উদয় হয়। ঐ ভক্তির্যোগই আমাদের নিত্যস্বভাব, উহার গাঢ়ত্বই আমাদের অনন্ত প্রাপ্য এবং ভগবদানুগ্রহই আমাদের অপ্রাকৃত লক্ষণ। আমাদের বিকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে না, যেহেতু প্রাকৃত সৃষ্টি-দ্বারা আমাদের বুদ্ধি একেবারে প্রাকৃত ভাবে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই বদ্ধ অবস্থায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব সঙ্ক্ষে আমাদের তর্ক করা বৃথা। তথা ভক্তিরসামুতসিদ্ধ-যুত বচন,—

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাৎসর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্। (মঃ ভাঃ ভীঃ পর্ব ৫।২২)

[যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত।]

অচিন্ত্য বিষয়ে যুক্তি যোগ করায় অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মা-কর্তৃক এইরূপ দশম সঙ্কে (ভাঃ ১০।১৪।৪) তিরস্কৃত হইয়াছে :—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমদ্যস্ত তে বিভো ক্রিশ্চন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্ট্যতে নাহুদ্যথা স্থল-তুষাবঘাতিনাম্ ॥

[হে প্রভো, যে-সকল জ্ঞান-মার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথ-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল (ভক্তিশূন্য) জ্ঞান লাভের জন্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের অন্তঃসার-শূন্য স্থল তুষাবঘাতের ত্রায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে ।—তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না ।]

স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রকাশক

এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের মঙ্গলের মূল ; যথা চরিতাম্বিতে—

বিশ্বাসে পাইয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর ।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব তর্কের দ্বারা স্থাপনা বা বিচার করিতে গেলে আমরা হয় নাস্তিক, নতুবা অদ্বৈতবাদী হইয়া যাইব। অতএব হে ভক্ত-মণ্ডলি, অপ্রাকৃত তত্ত্বে তর্ক করিবেন না, কেবল নির্মল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে রত হউন ।

অপ্রাকৃত তত্ত্বে যে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যায় । জীব অপ্রাকৃত, ও অপ্রাকৃত পরমেশ্বরই জীবের উপাস্ত এবং অপ্রাকৃত ধামই জীবের নিজালয়,—এরূপ সিদ্ধান্তকে জ্ঞান বলা যায় ।

সংসার হইতে বৈরাগ্যের প্রয়োজন এবং তাহা প্রাপ্তির উপায়

ফলতঃ এই গায়াময় অপ্রকৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবের বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন । এই বৈরাগ্য যে কি-প্রকারে সাধিত হয়, তাহা বিবেচনা করা কর্তব্য ।

মূর্খ লোকেরা এই প্রকার সিদ্ধান্তের অসম্ভাবহার করত জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মঘাতী হইয়া পড়ে । তাহার ফল এই যে,—কারাগার হইতে অযথাকালে অত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে চাহিলে যেমন পুনর্দূত হইয়া গাঢ়ভাবে পুনরাবদ্ধ হয়, তদ্রূপ আত্মঘাতী জীবগণ নানাবিধ কষ্টের সহিত গাঢ়ভাবে বদ্ধ হয় । পরিত্রাণের গ্রাঘ্য-বিধি আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে পরিত্রাণ কিরূপে সম্ভব হয় ? বৈরাগ্য অবলম্বনই গ্রাঘ্য-বিধি,—ইহাতে সন্দেহ নাই ।

বৈরাগ্যের প্রকৃত লক্ষণ

যে-সকল দুর্বল পুরুষ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে, তাহারা লোক-সমাজ পরিত্যাগপূর্বক বনে গমন করিয়া বৈরাগ্য আচরণ করিয়াছি—এরূপ বিশ্বাস করে । ইহাকেও প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায় না । তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, (তৃতীয় শ্লোকে) বিদূর-বাক্য,—

জনস্ত কৃষ্ণাঙ্গিমুখস্ত দৈবাদধর্মশীলস্ত সুদুঃখিতস্ত ।

অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নুনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্ত ॥

[প্রাক্তন কণ্ঠবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহিস্মুখ, অধর্ম-নিরত, অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্যালোকে ভ্রমণ করেন ।]

তথাহি তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম-অধ্যায় (৪১ শ্লোকে)—

সর্বৈ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানাদি চানঘ ।

জীবাভয়-প্রদানস্ত ন কুবীরন কলামপ্তি ॥

[হে অনঘ, তত্ত্বোপদেশদ্বারা জীবের প্রতি অভয়দানের একাংশের সহিতও সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্তার তুলনা করিতে নাই ।]

তথাহি প্রথম স্কন্ধে, চতুর্থ অধ্যায়ে (দ্বাদশ শ্লোকে)—

শিবায় লোকস্ত ভবায় ভূতয়ে যং উত্তমশ্লোক-পরায়ণা জনাঃ ।

জীবন্তি নাআর্থমসৌ পরাশ্রয়ং মুমোচ নির্জিহ্ব কুতঃ কলেবরম্ ॥

[যে-সকল ব্যক্তি ভগবৎ-পরায়ণ তাঁহারা বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্যের নিমিত্তই জীবন ধারণ করেন—স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত নহে। তাহা হইলে ঐ রাজা পরীক্ষিৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রজাবর্গের আশ্রয়স্বরূপ স্বীয় দেহ কি-নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ?]

নির্জনে একাকী তপস্তা করা—স্বার্থপরতা, বৈষ্ণবতা নহে

সমস্ত জীবের উপকার-রূপ মুখ্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে-সকল লোক “একাকী তপস্তা” করিবার জন্ত বনে গমন করে, তাহারা স্বার্থপর ; অতএব বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না,—এইরূপ প্রহ্লাদ নিজে স্তবে কহিয়াছেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭৯।৪৪)—

প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ স্ব-বিমুক্তিকামা

মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ-নিষ্ঠা ।

[হে দেব, নিজ মুক্তিকামী মুনিগণ নির্জনে মৌন-ব্রত পালন করেন, (কিন্তু) তাঁহারা পরার্থপর নহেন ।]

এই সংসার-তরঙ্গে পতিত হইয়া যে পুরুষ ইহার প্রবাহসকল অকুণ্ঠভাবে সহ্য করত সর্ব জীবের প্রতি দয়া করেন এবং অহরহঃ সর্ব জীবের আধ্যাত্মিক ক্লেশ দূরীকরণার্থ ভগবানের নিকট আবেদন করেন, তিনিই বৈষ্ণব-পদবাচ্য মহাপুরুষ ।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের যথার্থ বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবতা

আহা! পবিত্র হরিদাসের অননুकरणीয় চরিত্র আলোচনা করিলে কোন্‌ দুর্ভাগ্য-পুরুষের ভগবদ্ভক্তি উদয় না হয়? তাঁহার স্বজাতীয় পাষণ্ডেরা যৎকালে তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল, তখন তিনি আধ্যাত্মিক দুর্দশা দৃষ্টি করিয়া সজল-নেত্রে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করিলেন,—“হে জগদীশ্বর! হে গোপী-জনবল্লভ! পীড়নকারী পুরুষেরা আপনার গভীর লীলা অবগত না হইয়া আপনার দাসের প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে, তাহা আপনি বিশাল কৃপার দ্বারা রক্ষা করুন এবং উহাদের অন্তঃকরণে ভক্তিরসের উদয় করুন, যাহা হইলে জীব আর জীবের প্রতি পীড়ন করে না।” আহা! ইহাই যথার্থ বৈরাগ্যের কার্য্য।

বৈরাগ্য দুই প্রকার—(১) লিপ্সার অভাব, আর (২) সংসার বর্জন

পরমারাধ্য মহাপ্রভু বৈরাগ্য-বিষয়ে রামানন্দকে এই প্রকার কহিয়াছেন :—

যথার্থ বৈরাগ্য লোকে বুঝিতে না পারে।

দণ্ড কমণ্ডলু ধরি' বৈরাগ্য আচরে ॥

কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগী বলায়।

কেহ বাঘাঘর পরি' দণ্ডাশ্রমে যায় ॥

যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাম।

আত্মার উৎকর্ষ, আর জ্ঞানে অনুরাগ ॥

ঈশ্বরেতে আত্ম-দান কর্তব্য-সাধন।

নিকাম হইয়া কার্য্য কর সম্পাদন ॥

ত্যাগ-শব্দে বৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝা যায়।

কিন্তু 'ত্যাগ'-শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দায় ॥

এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি' কত মহাশয়।

সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয় ॥

'ত্যাগ'-শব্দে দুই অর্থ করে বুধগণ।

'লিপ্সার অভাব', আর 'সংসার-বর্জন' ॥

লিপ্সা-হীন হওয়া, জান, হয় শ্রেষ্ঠতর।

অধিক শক্তির কার্য্য জান ভক্তবর ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিনী

ভক্তিবশ ভগবান্-মহিমা (৪)

তৃতীয় মহিমা এবে শুন স্বধীগণ ।

‘ভক্তিবশ ভগবান্’ যাহার কারণ ॥

গীতায় ভগবদ্-উক্তি—

“আমাকে ত’ যে-যে-ভাবে ভজে যেই জন
আমি সে-সে-ভাবে ভজি’ জান হে স্বজন ॥

মম পদে ভক্তি-হীন, হৃত-জ্ঞান যা’রা ।

অগ্গদেব পূজে নানা নিয়মেতে তা’রা ॥

সর্ব-যজ্ঞেশ্বর আমি ভোক্তা ও প্রভু ।

অতাত্ত্বিক জন ইহা না বুঝয়ে কভু ॥

চারিবিধ দুষ্কৃতি না ভজে আমায় ।

চারিবিধ সুকৃতি ভজে যে আমায় ॥

আমার চরণ সদা পাপহীন-জনে ।

সুখ-দুঃখ-মোহ ছাড়ি’ ভজে ধীর-মনে ॥

অজ্ঞেয়া মায়া’কে জয় করা বড় দায় ।

(কিন্তু) আমাতে শরণ লৈলে মায়া-মুক্তি পায়

বহুযোনি ভ্রমি’ জীব সাধু-দয়া-বলে ।

সর্বত্র আগার সত্তা দেখে কুতূহলে ॥”

“হ’য়েছে বিশ্বাস যা’র আমার কথায় ।

কর্ম্মী-জ্ঞানী নহে সেই, ভক্তি-যোগী হয় ॥

ত্যাগ করে লোকধর্ম্ম আমা লাগি’ যা’রা ।

হে উদ্ধব ! চিরকাল পাল্য মোর তা’রা ॥”

“ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত’ যাহারে ।

সেই সে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥”

ব্রহ্ম-যোগী শুকদেব শ্রীহরি-লীলায় ।

মুগ্ধ হই’ ভক্তিভাবে হরি-গুণ গায় ॥

যা’র মুখে বিষ’দিয়া পুতনা সে তরে ।

এ’হেন দয়া’লু ছাড়ি’ কোথা কে নিস্তারে ॥

গোপীগণে ডেকে কৃষ্ণ বলে—“কিবা কব ।

তোমাদের ঋণ আমি শোধিতে নারিব ॥”

হেন ভগবান্ কৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর ।

কেহ নাই তাঁর সম, তাঁহার উপর ॥”

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবৎ-বিচার—

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ধরে তিন রূপ ॥

এক রবি—দেখে তারে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ।

ব্যবধান-ভেদে দ্রষ্টা স্থান-অনুরূপ ॥

কিন্তু দেবগণ দেখে রবিরে যেমন ।

ভক্তি-যোগে ভক্ত তা’রে দেখয়ে তেমন ॥

জ্ঞান-যোগ-মার্গে তা’রে ভজে যেই সব ।

ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁরে করে অন্তত্ব ॥

শ্রীগোবিন্দই আদি-পুরুষ—

প্রকাশিতে নারে যারে এই রবি, চাঁদ ।

তাঁর আলোকেতে ঘুচে সব মায়া-ফাঁদ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে-প্রভা হৈতে ।

ভিন্ন ভিন্ন বৈভবে অশেষ জগতে ॥

নিষ্কল অনন্ত ব্রহ্মা উদ্ভবের সাজি ।

আদিপুরুষ সে গোবিন্দ, তারে আমি ভজি ॥

ব্রহ্ম তাঁ’র দেহ-কাস্তি নিরাকার প্রকাশে ।

রবি যেন চন্দ্র-চক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-গণ্ডল ।

উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল ॥

তঁারে নিষ্কিংশে কহে না মানি' । 'কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস
অর্দ্ধ-স্বরূপ মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ যে না মানে, তাঁর হয় সেই পাপে নাশ ॥'
পরমাত্মা যিহৌ, তিহৌ কৃষ্ণের এক অংশ
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ—সর্ব-অবতংস ॥

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
সর্ব-অবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—ইহা সবার অধিকার ॥
সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
সর্বৈশ্বর্য-বিশক্তি-সর্বরস-পূর্ণ ॥

কৃষ্ণই সর্বসেব্য—

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় ।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥
তিহৌ আপনাকে করেন 'দাস' ভাবনা ।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিহু আছে কোন্ জনা ॥
সহস্র-বদনে যৈহৌ শেষ, সঙ্কর্ষণ ।
দশদেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ ।
গুণাবতার তৈহৌ সর্বদেব-অবতংস ॥
তিহৌ করেন কৃষ্ণের দাস্ত্বের প্রত্যাশ ।
নিরন্তর কহে শিব মুণ্ডি কৃষ্ণ-দাস ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর ।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥
পিতা, মাতা, গুরু, সখা-ভাব কেনে নয় ।
কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবে 'দাস্ত্ব' সে করয় ॥
এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর ।
আর যত সব তাঁর সেবক ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর ।
অতএব আর সব তাঁহার ঈশ্বর ॥

অন্যান্য অবতার কৃষ্ণের কলা ও অংশ—

অবতার সব পুরুষের কলা-অংশ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব-অবতংস ॥
কৃষ্ণ-এক, সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্বধাম ।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় ।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
'কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন ।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥'
সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী কিশোর-শেখর ।
চিদানন্দ-দেহ, সর্বাশ্রয়, সর্বৈশ্বর ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ পর-নাম ।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁর, গোলোক নিত্যাধাম ॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার ।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥
গুণাবতার, আর মহন্তরাবতার ।
যুগ্মাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥

ভগবত্তার স্বরূপ—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অস্ত্রের ভগবত্তা ।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।
মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ।
আর এক শ্লোক শুন, কু-ব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥
'এতেচাংশ-কলা'-শ্লোকে কহে ব্যাসদেব ।
'কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং' সর্ব-দেবদেব ॥

স্বয়ং ভগবানের কৰ্ম নহে ভার হরণ ।
স্থিতি-কর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল ।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ।
পূর্ণ ভগবান্, অবতরে যেই কালে ।
আর সব অবতার তাতে আসি' মিলে ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ।
'বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অঙ্গুর সংহারে ॥'

অবতারের পরিচয়—

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্তি মর্তে অবতরে ।
সেই ঈশ-মূর্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।
বিশ্বে অবতারি' ধরে অবতার নাম ॥

গুণাবতারের পরিচয়—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তঁার গুণের অবতার ।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-কার্য্যে তিনের অধিকার ॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্ধামী, গর্ভোদক-শায়ী ।
সহস্র-শীর্ষাদি কহে গুণ অনুযায়ী ॥
বিরাট, ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্ধামী ।
ক্ষিরোদ-শায়ী, তিঁহো পালনকর্তা, স্বামী ॥

কৃষ্ণের 'ব্রহ্মা' রূপ ধারণ—

ভক্তি-মিশ্রকৃত-পুণ্য কোন জীবোত্তম,
রজোগুণে বিভাবিত করি' তার মন,
গর্ভোদক-শায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি'
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥

কৃষ্ণের রুদ্ররূপ ধারণ—

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমে'গুণ স্মরি' ।
সংহারার্থ মায়ার সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরি' ॥
মায়ার-সঙ্গে বিকারে রুদ্র তিম্মাভিন্নরূপ ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥

দুঃখ যেন অল্প-যোগে দধি-রূপ ধরে ।
দুঃখান্তর বস্তু নহে, দুঃখ হৈতে নারে ॥
শিব-মায়ার-শক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ ।
মায়াতীত, গুণাতীত—বিষ্ণু পরমেশ ॥
কৃষ্ণের বিষ্ণুরূপ ধারণ—
পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়্যাপার ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায় ।
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ বেদে হেন গায় ॥
ব্রহ্মা-শিব-আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার ।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥

অপ্রাকৃত তত্ত্বের পরিচয়—

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর ।'
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥
অসুমান প্রমাণ নহে ঈশ-ভক্তিবিনে ।
কৃপা বিনা ঈশ-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ।
সে-বিগ্রহ নহে সত্ত্ব-গুণের বিকার ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই'ত পাষণ্ডী ।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সে, হয় যম-দণ্ডী ॥

কৃষ্ণের দেহ-দেহী অভিন্ন—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ ॥
দেহ-দেহী, নাম-নামী কৃষ্ণ নাহি ভেদ ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপে বিভেদ ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের 'নাম' দেহাদি বিলাস ।
জড়োদ্ভূত-গ্রাহ্য নহে, হয় স্ব-প্রকাশ ॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা-কাজাল ।
ভক্তি-তরঙ্গিনী গায় আনন্দগোপাল ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের ষোড়শ-বার্ষিক অপ্রকট-তিথিতে

বিরহ-বিজ্ঞপ্তি

সর্বজন-বিশ্রুত, সমগ্র বিশ্ববাসী অসংখ্য অপ্রাকৃত বাণী-মন্দির-সংস্থাপকবর, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔবৈষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অন্তকার এই শুভ তিথিতে এই প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া নিত্য নিজানুগত বিরহী জনগণকে বিরহ-সাহিত্যের পর-বিদ্যামন্দিরে বাণী-পূজার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। মাদৃশ অর্ভক বরাকাদম শ্রীশ্রী রাধা-নিত্যজন শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুর অপ্রাকৃত বিরহ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অনন্ত শিক্ষা-সম্পত্তির জীবন্ত-আদর্শের কণা প্রদর্শন ও অমিয়-মধুর বাণী-রসের বিন্দুমাত্র পরিবেশন কার্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও দুর্বল হইলেও উৎকণ্ঠা অত্যন্ত প্রবলা। কলি-প্রভাবে বিবদমান তর্কাহত যুগে ব্যক্তিগত হৃদয় উচ্ছ্বাসের বিজ্ঞপ্তি-করণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়।

অপ্রাকৃত বাণী-মন্দিরেই পর-বিদ্যাবধু-স্বরূপা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বিরহ-সাহিত্যের আনন্দোৎসব হয়। এখানে ‘বিরহ’ অর্থে বস্তুর আত্যন্তিক অভাব নয়; বিরহই প্রকৃত মিলন। তাহা সচ্চিদানন্দ-ঘন-স্বরূপ স্বপরিষ্কর রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের গোকুল মহোৎসব। শ্রীবার্ষভানবীর ‘নয়ন-তারার’ শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু শ্রীল প্রভুপাদ সেই রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নালাসপর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সুখ-বর্দ্ধন-যজ্ঞের শ্রীরাধিকার প্রধান অন্তরঙ্গ। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বর্দ্ধন-যজ্ঞে যাঁহারা তাঁহার নিজ-জনরূপে সর্বাত্মভাবে নিত্য অকৃত্রিম সহায়ক, তাঁহারাি তাঁহার প্রকৃত অন্তরঙ্গ নিজজ. এবং তাঁহাদের দাসানুদাস-সূত্রে অপরাপর দৈব-বিধানাশ্রিত সকলেই ধন্য।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অন্তরঙ্গ নিত্য-স্বজনই বিদ্বৎ-সমাজে ত্রিদণ্ডী-স্বরূপে প্রকৃত বিদ্বৎ সম্যাসী। তিনিই ইহ জগতের পরবিদ্যাহুরাগী বিদ্যাধিগণের শিক্ষক-স্বরূপে আশ্রয়-প্রদাতা ও ভক্তিসঙ্গীবনী বাণী প্রদানে শ্রদ্ধাত্মার পুষ্টিবিধায়ক। তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীমন্দিরে প্রকৃত আর্ন্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও তথা-কথিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানী ব্যক্তি-সমূহ, এমন কি, জড়বিদ্যায় নিপুণ বৈজ্ঞানিক-সমাজ যদি পরবিদ্যা-ভক্তিপিপাসু হইয়া আগত হন, তাহা হইলে সেই শুদ্ধ ভাগবতোক্তমের রূপায় তাঁহারা পরবিদ্যা অনুশীলনে পরম লাভবান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ সেবা-সুখ অনুভব করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবেন। তাঁহারা প্রাণাঞ্চিক ‘জন্ম,’ ‘ঐশ্বর্য্য,’ ‘শ্রুত’ ও ‘শ্রী’র অভিমান, এমনকি, স্ব-স্ব প্রকৃতি-গত যাবতীয় পাখিব পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া শুদ্ধা

সরস্বতীর অবলম্বনাময়ী রূপায় বিরহ-সাহিত্যের অফুরন্ত চিত্রসময় ভাণ্ডারে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। তখন তাঁহাদের অস্মিতামূলে ভগবানের অপরা বিদ্যাশক্তির স্বল্প ও স্থূলগত প্রলেপ-স্বরূপ অবিद्या 'কল্মষ-রাশি' সম্পূর্ণ বিধৌত হইয়া তাঁহারা সেবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পরবিद्या-মন্দিরে স্বরূপ-শক্তির ষোলকলা বিদ্যার মধুর কাস্তি দর্শন করিবেন। সেই নিধূত-কষায় বিশুদ্ধ আত্মা অপ্ৰাকৃত বাণী-মন্দিরে চিন্ময় দেবালভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকেন,—অন্তে নহে।

বিরহ-বিভাবিত চেতন যেমন একদিকে অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অধিকতর বিরহ-প্রমত্ত হইয়া উঠেন এবং অপরদিকে বিরহের আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা অন্তরের শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমূর্তিরূপে প্রকাশিত করেন, তেমনি এই শব্দময় অক্ষজ জগতে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া তাঁহার নাম-কীর্তন করিতে করিতে বিরহ-ব্যথা অর্থাৎ সেবা-প্রগতিতে তিনি আর্তি-নিবেদন করিয়া থাকেন—‘হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে রাধিকা-রমণ রাম! হে গোপীজনবল্লভ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে নাথ! হে রমণ! হে প্রেষ্ঠ! হে চপল! হে গোকুল-মহোৎসব!’—এই সকল সম্বোধনাত্মক শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা-লালসাময়ী ব্যথার প্রসবণ-স্বরূপ। এই সমস্ত পরাবিদ্যার গুঢ়-রহস্যসমূহ শ্রদ্ধামূলে প্রদানার্থ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বাণী-মন্দিরে চিন্ময় সামগ্রী-রূপে উদ্ঘাটিত।

বৈষ্ণবের জীবন—বিরহেরই সাহিত্য। এজগতের বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,—এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ। কিন্তু অপ্ৰাকৃত রাজ্যের বিরহ, তাহা নহে। সেখানে বিরহ—প্রগাঢ়; বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠা। বিরহ সম্ভোগের পুষ্টিকর্তা।—বিরহের দ্বায়া প্রগতিশীল দ্বিতীয় বস্তু আর কিছু নাই। আকর্ষণের যত কিছু পূর্ণতম ‘অভিব্যক্তি’ ও ‘সমষ্টি’কে বিরহই ক্রোড়ীভূত করিয়া আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন—সাক্ষাৎ ভাগবতের মূর্ত্য-বিগ্রহ। তাঁহার অপ্ৰাকৃত তনু—ভাগবতী তনু। তিনি বার্ষভানবীয় দম্বিত-স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের, রূপ-রঘুনাথের বিরহের মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ। অতএব এই বিরহ-বাসরে এই অযোগ্য অধম তাঁহার অন্তরঙ্গ ও নিজজন পরম-পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আত্মগড়ে যাহা কিছু পরিবেশন করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর শরীরে পীড়িতাবস্থায় বর্ণনে আরও যত্নসহকারে সকলের হৃদয়গ্রাহী না হইলেও, শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ-দর্শনে রূপা করিয়া তাহা গ্রহণ করণ—ইহাই আমার সকাতির প্রার্থনা।

—শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া।

রুক্মিণী ও ভীষ্মক-রাজার উপাখ্যান

বিদর্ভপুরে ভীষ্মক নামে এক রাজা বাস করিতেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাঁহার একটি পরমাত্মন্দরী লক্ষ্মী স্বরূপিণী কন্যা ছিল। তাহার নাম রুক্মিণী দেবী। এই বালিকা পরম রূপবতী ছিল; তাহার বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণসম, আলুলায়িত কেশ-রাশি নবীন মেঘের সৌন্দর্য্যকেও খর্ব্ব করিয়াছিল; তিনি হরিণাক্ষী অর্থাৎ কুরঙ্গ-লোচনা; তাহার গজেন্দ্রের গ্রায় মম্বর-গতি ও হরিণের গ্রায় চঞ্চল চক্ষু সকলেরই মন হরণ করিত। লক্ষ্মীর অংশ বলিয়া গাত্রে পদ্ম-গন্ধের গ্রায় স্তম্ভুর গন্ধ বিরাজ করিত। শিশুকাল হইতেই এই বালিকার শ্রীকৃষ্ণের রতি মতি ছিল। উষ্যকাল হইতেই প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন, পুষ্পমালা ইত্যাদি বিষ্ণু-সেবার পূজোপকরণ সংগ্রহ এবং শ্রীতুলসী দেবীকে জল দান ও মন্দিরে আলিপনাদি চিত্র অঙ্কিত করিতে সিদ্ধ-হস্তা ছিলেন। ক্রমে এই বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিলে, পিতা মহাভক্ত ভীষ্মক রাজা তাঁহার কন্যাটিকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পুত্র রুক্মী বিষম কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিল। সে পিতার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে ভৎসনাপূর্ব্বক বলিল—

“পিতঃ! বৃদ্ধকালে আপনার মতিভ্রংশ হইয়াছে। আমার ভগিনীর উপযুক্ত বর আমি মনোনীত করিয়াছি। চেদীশ্বর দমঘোষের পুত্র শিশুপালই রুক্মিণীর উপযুক্ত বর। আমি শীঘ্রই এই উপযুক্ত সম্বন্ধ ঠিক করিতেছি, আপনি এ’বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ভীষ্ম ভীষ্মক রাজা, দুর্ধর্ষ পুত্রের এই উদ্ভিক্তে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এবং মনে মনে শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিয়া,—তিনি যাহাতে এই কন্যাকে গ্রহণ করেন, এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে,—রুক্মী চেদিরাজ্যে গমন করিয়া শিশুপালের সহিত বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া ফেলিল। এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী নির্জ্জনে অহর্নিশ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ যেন ‘বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের’ গ্রায় তাঁহার কোমল হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অশ্রু-প্রাবিত নয়নে কৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে অন্তর্ধামিনি, আমি মনে মনে তোমাকেই এই দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছি। তুমি আমাকে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তুমি যদুসিংহ, সিংহের ভাগ যেন শৃগালরূপী শিশুপাল গ্রহণ না করে। তাহা না হইলে আমি বিষ-পান কিম্বা জলে বাষ্প প্রদান করিয়া এ’পাপ প্রাণ বিসর্জন করিব।”—এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিবাহের সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণী দেবী একটা ব্রাহ্মণকে নিভূতে ডাকিয়া, তাহাকে নিজের গলার বহুমূল্য রত্নালঙ্কার প্রদান করত একটা বিস্তৃত পত্রিকা লিখিয়া দূতরূপে সেই ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রিকার মর্ম এইরূপ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।৭৬-২৭),—

“শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনসুন্দর। দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ ছুন্দর ॥
 সর্বনিষি লাভ তোর রূপ দরশন। স্তম্বে দেখে, বিধি যারে দিলেক লোচন ॥
 শুনি’ যদুসিংহ তোর যশের বাখান। নিলজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান ॥
 কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগমাঝে। কাল পাই’ তোমার চরণ নাহি ভজে ॥
 বিত্তা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে। সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ॥
 মোর ধার্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়। না পারি’ রাখিতে চিত্ত তোমায়ে মিশায় ॥
 এতেকে বরিল তোর চরণ যুগল। মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি তৌহে অপিল সকল ॥
 পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী। মোর ভাগে শিশুপাল নহক বিলাসী ॥
 রূপা করি’ মোরে পরিগ্রহ কর নাথ। যেন সিংহভাগ নহে শৃগালের সাথ ॥
 ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চন। সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত চরণ ॥
 তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর। দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর ॥
 কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে। আজি ঝাট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে ॥
 গুপ্তে আসি’ রহিবা বিদর্ভপুর কাছে। শেষে সর্ব-সৈন্ত-সঙ্গে আসিবে সমাজে ॥
 চৈত, শাল, জরাসন্ধ মথিয়া সকল। হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাছ-বল ॥
 দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়। তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয় ॥
 রিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা আপনে। তাহার উপায় বলে। তোমার চরণে ॥
 বিবাহের পূর্বদিনে কুলধর্ম আছে। নব-বধুজন যায় ভবানীর কাছে ॥
 সেই অবসরে প্রভু-হরিবে আমারে। না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে ॥
 যাহার চরণ ধূলি সর্ব অঙ্গে স্নান। উমাপতি চাহে,—চাহে যতেক প্রধান ॥
 হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে। মরিব করিয়া ব্রত, বলিলু’ তোমায়ে ॥
 যত জন্মে পাও তোর অমূল্য চরণ। তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন ॥
 চল চল ব্রাহ্মণ সত্ত্বর কৃষ্ণস্থানে। কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥”

ব্রাহ্মণ ঐ পত্র লইয়া সত্ত্বর দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ পত্রিকা প্রদান করত নমস্কার করিয়া কহিলেন,—“হে জগৎপতে! আপনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ছুটের কবল হইতে দেবীকে রক্ষা করুন।” শ্রীকৃষ্ণ সহাস্ত-বদনে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—“হে ব্রাহ্মণ! তুমি সত্ত্বর বিদর্ভ নগরে যাইয়া

দেবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বল যে, আমি শীঘ্রই দাক্ষককে সারথি করিয়া রাখ লইয়া যাইব এবং তাহাকে উদ্ধার করিব।”

ভগবান্ কৃষ্ণের এই অভয় বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণ পত্নম সন্তোষে বিদর্ভপুরে যাত্রা করিয়া কৃষ্ণিণী দেবীকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন।

শিশুপালের বিবাহে যাত্রা

এদিকে জরাসন্ধ, শাশু প্রভৃতি দুষ্ট-রাজগণ হস্তী, ঘোড়া, নানা সৈন্ত-সামন্ত সজ্জিত করিয়া মানাই, জয়ঢাক, মৃদঙ্গ-করতালাদি বাজভাঙ-ধ্বনিতে দিক্-দিগন্ত কম্পিত করিয়া জয়-জয়-ধ্বনি করত বিদর্ভ-পুরাভিমুখে যাত্রা করিল। রক্ত, শ্বেত, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের পতাকা উড়িতে লাগিল। শিশুপালকে বর বেশে সজ্জিত করিয়া, নানারঙ্গে বিভূষিত বিচিত্র দোলায় আরোহণ করাইয়া, বিপুল আনন্দে ও সমারোহে সকলেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

শিশুপালের মাথায় টোপর, চোখে কাজল, বিচিত্র জরীর জামা পরিধানে; শরীর উজ্জল কান্তি ধারণ করিয়াছে। গলে অগন্ধি মালা, হস্তে বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরী; দোলায় উপরে মনোহর চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছিল।

যথাসময়ে বরযাত্রীসহ বর শিশুপাল বিদর্ভপুরে প্রবেশ করিলে কৃষ্ণী বর এবং বরযাত্রীগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া, শ্বেত মর্ম্মর-যুক্ত অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় বসাইলেন। আতর, গোলাপজল, অগন্ধি দ্বারা সকলকে অভিষিক্ত করিলেন। বিদর্ভ-নগরে আজ আনন্দের সীমা নাই—ভীষ্মক-রাজকন্যা কৃষ্ণিণীদেবীর বিবাহ।

সহস্র সহস্র শিবির পড়িয়াছে। ঐ সকল বিচিত্র শিবিরে সৈন্ত-সামন্তদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইয়াছে। ‘দীয়তাম্’ ‘ভূক্তাম্’ স্ববে চতুর্দিক্ নিনাদিত। চর্ম্ম্য, চূষ্ম, লেহ, পেয় নানাবিধ পুরি, লুচি, মালপো, পরমান্ন, সরবৎ, পুষ্পান্ন, খেচরান্ন প্রভৃতি উপাদেয় ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া সকলেই আনন্দে আত্মহারা।—আগামীকল্য শুভবিবাহ।

কৃষ্ণিণী-হরণ

অত্ৰ অধিবাস বাসরে কুল-প্রথাহুযায়ী কন্যাকে লইয়া দেবী-মন্দিরে পূজা করিবার বিধি আছে; সেজন্ত ব্রাহ্মণীসকল, কুলবধুবৃন্দ ও বহু ~~কুল~~ যুবতী মঙ্গল-বরণ-ডালা লইয়া হলুধ্বনি দিয়া কন্যাকে স্ববাসিত জলে স্নান ও নানা সন্মালনকারে ভূষিত করিয়া দেবী-মন্দিরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কৃষ্ণিণীদেবী শঙ্কিতা হইয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।—এই দেবী-পূজায় স্ত্রীলোক ভিন্ন

পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই। এজন্য জরাসন্ধ দুষ্টমতি রাজগণকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। জরাসন্ধ বলিতে লাগিলেন,—“হে রাজত্ববৃন্দ! হে বন্ধুগণ! আপনারা সকলেই সশস্ত্রে উद्यোগী হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন; কেননা সেই চোরকে বিশ্বাস নাই, নন্দনন্দন কৃষ্ণ ত্রয়ানক চতুর, আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।” জরাসন্ধের এই বাক্য শুনিয়া সকলেই অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—“রাজন্! আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। শত-সহস্র অস্ত্রধারী বিরাট সৈন্তের মধ্যে বজ্রধারী সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও সাধ্য নাই যে, কুমারীকে হরণ করে। এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

এদিকে রুক্মিণী-দেবী কম্পিত-হৃদয়ে দেবীর পূজার সজ্জা, বরণভালা লইয়া শত-সহস্র রমণীবৃন্দের হনুধনিনর মধ্যে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী-দেবী অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া দেবীর স্তব-পাঠ করিলে, দেবী সাক্ষাৎ হইয়া,—“তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে” এই বলিয়া আশীর্বাদ-মালা রুক্মিণীকে প্রদান করিলেন। রুক্মিণী, দেবীর দুই মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

রুক্মিণীর একরূপ আশ্চর্য্যান্বিত ভাব দেখিয়া দেবী সহাস্তে রুক্মিণীকে বলিলেন,—“বৎসে! তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইও না—আমার এই দুই মূর্তি আমার রূপায় তুমি দেখিলে; অস্ত্রের জানিবার শক্তি নাই। আমার সম্মুখের মূর্তির নাম ‘যোগমায়া’; এই মূর্তিতে আমি কৃষ্ণের সেবকবৃন্দকে সেবোন্মুখী বুদ্ধি দিয়া—নিত্যধামে নিত্য সেবার অধিকারী করিয়া থাকি। আর পশ্চাৎস্থিত মূর্তি ‘মহামায়া’; আমি এই মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী অস্তুরগুলিকে মোহিত করিয়া, ঐ বহিঃস্থ জীববৃন্দকে যে-কাল পর্যন্ত না তাহাদের চৈতন্যের উদয় হয়—সাদু, গুরু, রূপা-প্রভাবে তাহারা সেবোন্মুখী না হয়, ততকাল পর্যন্ত অনন্ত যাতনা প্রদান করিয়া থাকি।”

শ্রীরুক্মিণী-দেবী ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিয়া যেমন মন্দিরের বাহির হইলেন, অমনি বিদ্যুৎ-গতিতে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের রথ মন্দিরের নিকট আসিল; সহসা এই অগণিত স্ত্রীবৃন্দের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া রথোপরি উঠাইয়া দ্রুত-গতিতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজগণের যুদ্ধ-যাত্রা

অকস্মাৎ স্ত্রী-মহলে ‘হাহাকার’-রব উঠিত হইল —কে বালিকাকে হরণ করিয়া লইল! বিকট ক্রন্দন-ধ্বনি আরম্ভ হইল। তখন দুষ্ট রাজগণ বলিতে লাগিল,—“বোধ হয়, সেই কৃষ্ণ বা লকাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।” জরাসন্ধ ক্রোধভরে

বলিতে লাগিল,—“আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না, এই বিপুল সৈন্য-সামন্ত লইয়া সেই মহা-চোরের পলাইবার পথ আটক করুন।”

তখন বিপুল শব্দে রণভেরী বাজিয়া উঠিল—‘মার-মার’, ‘কাট-কাট’ ভীষণ শব্দ আকাশে উঠিল। পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ অগণিত সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণের গুরুভ্রমর রথের চতুর্দিক ঘিরিয়া ফেলিল; সারথি দারুক আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। অশ্বের হ্রেষারব, গজের কুংহতিরবে ও সৈন্যদিগের বিকট চিংকারে দিক-দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল,—যেন অকালেই প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদেবী স্বভাবতঃ কোমল-স্বভাবা; এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে বেতসী-পত্রের তায় কাঁপিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাঁসিতে হাঁসিতে দেবীকে বলিলেন,—“অয়ি সতী! ভয় করিও না; এই যে আমার হস্তে স্নদর্শন অস্ত্র দেখিতেছ, ইহার প্রভাব তুমি অবগত নহ; যেষের কালদণ্ড, দেবরাজ-ইন্দ্রের বজ্র-দণ্ড, শঙ্করের ত্রিশূলোস্ত্র, দেব-সেনাপতি কাণ্ডিকের শক্তি-অস্ত্র, বরুণদেবের পাশ-অস্ত্র, এমন কি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্তও ইহার নিকট তুচ্ছ। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দারুক স্নদর্শন অস্ত্র বিপক্ষ সেনানীর উপর নিক্ষেপ করিলেন। অকস্মাৎ যেন শত-সহস্র সূর্য্য জলিয়া উঠিল—কালান্তক যমের তায় ঐ অস্ত্র কাহারও মুণ্ড, কাহারও হস্ত-পদ, নাসিকা, কণ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, সৈন্যের ছিন্ন মুণ্ড-সকল ধরাতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কালানল-সদৃশ চক্রের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, সিংহ-ভয়ে শৃগালের তায় হাহাকার শব্দে সকলে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভীষ্মক-নন্দন কৃষ্ণী ক্রোধে নিজ বিপুল সৈন্যদল লইয়া প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল; কৃষ্ণী ব্যঙ্গভাবে পলায়িত রাজগৃহ-বর্গের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল—ইহারা ভীকু কাপুরুষ—আমি নিজেই একা ভয়ীকে উদ্ধার করিব—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল।

এদিকে দ্বারকায় শ্রীবলদেব কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া, বিশেষ চিন্তিত হইলেন; পুরবাসীর নিকট বলদেব জানিতে পারিলেন, কৃষ্ণ অকস্মাৎ রথে দারুককে লইয়া বিদর্ভপুরে যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন।

রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব কনিষ্ঠের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সাত্যকি, গদ, শাশ্ব প্রভৃতি অগণিত যাদব-সৈন্য লইয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্ত বিদর্ভপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে কৃষ্ণদেবী ভ্রাতার এই অসীম সাহস দর্শন করিয়া ভ্রাতৃ-স্নেহবশতঃ অল্পপায় হইয়া কৃতাজলিপুটে, সজল-নয়নে কৃষ্ণকে সন্মুখেরে বলিলেন—“প্রভো! আপনি বন্ধুহস্তা হইবেন না। দয়া করিয়া আমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা

করুন।” ইত্যবসরে বলদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন; স্বর্ষ্যের নিকট (খগোলের গ্রায় রুম্মীর বিপুল সৈন্ত স্নান হইয়া পড়িল। তথাপি কৃষ্ণবিদ্বেষী রুম্মী যুদ্ধ হইতে বিরত না হইয়া পুনঃ পুনঃ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। রুম্মীগীর অদ্ভুত ভ্রাতৃস্নেহ দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতি বলদেব হাস্য করিয়া বলিলেন,—“দেবীর স্বামীর বিপক্ষ, যেই হউক না কেন, তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা উচিত নয়। তবে ইহা রমণী-জনোচিত কোমল স্বভাবের পরিচয় মাত্র। স্ততরাং বিপক্ষ যখন তোমার স্থালক (সম্বন্ধী), তখন উহাকে একেবারে বিনাশ না করিয়া উহাকে বিকৃত-দশায় পরিণত কর।” শ্রীবলভদ্রের এই বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন সম্মোহন অস্ত্র ত্যাগ করিলেন যে, সেই অস্ত্রের প্রভাবে রণক্ষেত্রে সকলেই অচেতন হইয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণ রুম্মীকে যুগপাঠে বন্ধ ছাগের গ্রায় রথের চাকায় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিলেন। এবং অস্ত্র দ্বারা কেশের বিকূপাবস্থা ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহা-সমারোহে যুদ্ধ জয় করিয়া, দ্বারকায় উপনীত হইয়া যথাশাস্ত্র রুম্মীগী দেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন। এদিকে—রুম্মী যুদ্ধে পরাজিত এবং অপমানিত হইয়া, অভিমানভরে আর রাজধানীতে প্রত্যাগমন না করিয়া, কুণ্ডিন নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধীর পরিণাম

জরাসন্ধ, শাষ প্রভৃতি পরাজিত হইয়া ক্রোধে পদাহত সর্পের গ্রায় ফৌস ফৌস শব্দে হলাহল উদ্বীর্ণ করিতে লাগিল। দুষ্ট রাজগণ নিভূতে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কিরূপে এই দারুণ লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে স্থির হইল, শিশুপালকেই বধু-বেশে সজ্জিত করিয়া দোলায় আরোহণ করাইয়া, বাতুভাণ্ডসহ সৈন্তদল লইয়া যাত্রা করা যাউক। কণ্ঠা-হরণের পর শিশুপালের যে দশা হইল, তাহা ভাষায় আর বর্ণনা হয় না। সে হতবুদ্ধি হইয়া তখন বলিতে লাগিল, “হায় ! হায় !! এমন সুন্দরী কণ্ঠা আমার ভাগ্যে মিলিল না !!”

শিশুপালের সকল আত্মীয়বর্গ তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিল—“বাপ ! আর কাঁদিলে কি হইবে? ভবিতব্যে যাহা লিখা ছিল, তাহা হইল। এখন ‘কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকাই ভাল।’—এই গ্রায় অল্পসারে তুমি এখন শাঁড়ি পরিয়া, হাতে বালা, মাথায় পরচুলা দিয়া, অলঙ্কারাদি পরিয়া হসজ্জিত পাণ্ডীর ভিতর উপবেশন কর।”

অনন্তোপায় হইয়া শিশুপাল তাহাই করিতে বাধ্য হইল। সে বধু-বেশে দোলায় আরোহণ করিলে—‘হৈ-হৈ’, ‘রৈ-রৈ’-শব্দে সকলেই তুমুল কোলাহলে দেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। পাকীর বাহকগণ পাকী হুঁহু-হুঁহু-শব্দে কল্পিত করিয়া যথাসময়ে চেদিরাজ্যে উপস্থিত হইল। নিরুৎসাহে রাজগণ নিজ নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন।

যাহারা কৃষ্ণ-কাঞ্চের ভোগে বাধা প্রদান করে, তাহাদের পরিণাম ফল এই-রূপই ঘটিয়া থাকে।

শুক্ৰাচার্য্য বলিরাজকে বামনদেবকে সর্বস্ব দান করিতে নিষেধ করায়, এক চক্ষু অর্থাৎ কাণা হইয়াছিলেন। ‘শ্রুতি এবং স্মৃতি’—দুই ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-চক্ষু। শ্রুতিতে সর্বস্ব ও সর্বস্ব দ্বারা ভগবৎসেবার কথা আছে। সেই শ্রুতির আজ্ঞা পালন না করিলে এক চক্ষু কাণা অর্থাৎ—পরিণামে দুইচক্ষুই নষ্ট হইয়া অন্ধ হইতে হয়।

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

‘স্ব’ শব্দের অর্থ ‘আত্মা’

‘স্বাবলম্বন’ মনুষ্য-জীবনের একটি মহদগুণ, ইহাকে সকলেই আদর করেন। কিন্তু স্বাবলম্বন কাহাকে বলে—ইহাই বিচার করা আবশ্যক। কেহ কেহ ‘স্ব’-শব্দের অর্থ শরীরকে, কেহ বা মনকে গ্রহণ করিয়া—শরীর ও মনের দ্বারা যাহাকে অবলম্বন করেন, তাহাকেই ‘স্বাবলম্বন’ বলেন। কিন্তু ‘স্ব’-শব্দের অর্থ সেরূপ নহে। ‘স্ব’-শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘আত্মা’। আত্মার ক্রিয়া বা আত্মার ধর্মই স্বাবলম্বন। সুতরাং যে অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া দ্বারা ভগবান্ পরিতুষ্ট হন, তাহাই স্বাবলম্বন বা আত্মধর্ম। “স্ব-ধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ”—গীতার (৩৩৫) এই বাক্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্ম-ধর্মই আমাদের একমাত্র নির্ভয়ে গ্রহণ-যোগ্য। দেহ বা মন অনাত্ম-বস্তু বলিয়া উহা ‘পরধর্ম’; সুতরাং তাহা কখনও গ্রহণীয় নহে। ‘স্ব’-জন বলিতেও আত্মীয় অর্থাৎ আত্ম-জন বুঝায়। দৈহিক বা মানসিক সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিকে আত্মীয় বুঝায় না। আজকাল সমাজে এই ‘আত্মীয়’-শব্দের অপব্যবহার চলিতেছে। যাহারা আমার আত্মার সহিত অগ্র আত্মা বা পরমাত্মার পরিচয় এবং সম্বন্ধ করাইয়া দেন—তাহারাই প্রকৃত আত্মীয় বা স্ব-জন। অগ্র পক্ষে, যাহারা দেহ-মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন বা করাইয়া দেন, তাহারা আত্মীয় নহে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
৬ই মাঘ, ১৩৫৯ সাল

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈধৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২১শে মাঘ, ১৩৫৯, ইং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩, বুধবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, সোমবার, হইতে ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবানুষ্ঠান সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সোমবার পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, মঙ্গলবার অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। বুধবার পূর্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীরামানুজাচার্যের উপদেশ

নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র গুরু-পরম্পরার মহিমাম্বিত নামাবলী কীৰ্ত্তন করিবে। যখন বৈষ্ণবগণ ভগবান্ বা ভগবন্তের নাম ও মহিমা কীৰ্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের যথাশক্তি পূজাবিধান করিবে। কিন্তু ইহাং তাঁহাদিগের নিকট হইতে উদ্ধিত হইয়া চলিয়া যাইও না, ঐ প্রকার যাওয়া মহাপরাধ। কোন বৈষ্ণব তোমার নিকট আসিতেছেন জানিলে তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিও না। এবং যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কিয়দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুব্রজ্য করিবে। এই প্রকার আচরণের লঙ্ঘন করিলে অপরাধ হয়।

বৈষ্ণবের অধীনে থাকিয়া তাঁহার সেবা দ্বারা জীবন-ধারণ কর। কিন্তু যাহারা বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত রূপালেশও প্রাপ্ত হন নাই, এই প্রকার ব্যক্তিগণের সেবা, তাহাদের গৃহে গমনাগমন, অথবা জীবিকা নির্বাহের জন্ত তাহাদের উপর নির্ভর প্রভৃতি কার্য অতি শীঘ্রই তোমাকে পতিত করিবে। ভগবানের মন্দির বা তাহার চূড়া তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভক্তিভরে করজোড় করিবে। কখনও বৈষ্ণবগণের ছায়া অতিক্রম করিবে না।

যদি কোন নিম্নাধিকারী বৈষ্ণব তোমাকে প্রথমে অভিবাদন করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিও না;—কারণ তাহা অপরাধ। যদি কোন বৈষ্ণবের নিদ্রালুতা, আলস্য, নীচকূলে আবির্ভাব প্রভৃতি কোন দোষের কথা অবগত হও, তাহা হইলে ইহা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। উহার কথা তোমার নিকট গুপ্ত রাখিয়া কেবল তাঁহার গুণাবলীই প্রকাশ করিবে। যাহারা ‘তত্ত্ব-ত্রয়’ ও ‘তাহার রহস্ত’র কথা অবগত নহে, তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না। কখনও তুমি নিজকে গুরু-বৈষ্ণবের সমান বলিয়া বিবেচনা করিও না।

ভক্ত ও ভগবানের সেবা ব্যতীত অত্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞানবান্ ও ভক্তিধনে বিভূষিত মহাজনগণকে দেহধারী পবিত্রাত্মা জানিয়া সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। জন্ম বা অন্ম কোন প্রাকৃত বিচার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিবে না। তাঁহাদের দর্শন অনুসরণপূর্বক তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তুমি আগ্ন-মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে; এইজন্ত, ভগবদ্ভিষ্মা তাহারা তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন,—ইহাই জানিবে। ভগবৎ-সান্নিধ্যাহেতু পবিত্রীকৃত তীর্থস্থলে ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করিতে কোন বিধাবোধ করিবে না। এমন কি, বিশ্বাস-হীন ব্যক্তিগণের সম্মুখেও তাহা গ্রহণে বাধা নাই। ভগবৎ-প্রসাদ

পরম পবিত্রতম বলিয়া জানিবে। ইহার সেবনে সকল-অনর্থ ভস্মীভূত হয়। “ইহা অমুক ব্যক্তির নিবেদিত, সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ নয়” এইরূপ কখনও বলিবে না।

বৈষ্ণবগণের নিকট কখনও আত্ম-প্রশংসা করিবে না। অথবা অপর কাহাকেও লজ্জা দিবে না। সর্বক্ষণ গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-কীর্তন অথবা তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। এবং প্রত্যহ কিছু সময় মহাজনগণের অথবা তোমার গুরুদেবের লিখিত পারমার্থিক বিষয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। যাহারা নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি অত্যাসক্তি ও অপস্বার্থপর, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। বৈষ্ণব-বেশ-ধারী কপট ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবে না। বৈষ্ণব-নিন্দক ও অপবাদ-রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। বৈষ্ণবের সহিত সংলাপ দ্বারা বৈষ্ণবের সহিত সংলাপ-জনিত দোষ হইতে মুক্ত হও। ভক্ত-নিন্দক ও ভক্তের অপমানকারী পামরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না এবং যাহারা গুরুর নিন্দা করে সেই নরাকৃতি ব্যাঘ্রদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। যাহারা ‘প্রপত্তি-ব্যাভীত মুক্তির অত্র পন্থা আছে’ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর এবং যাহারা সত্য-সত্যই শরণাগতের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাদের সহিত সতত বাস কর। বিষয়ী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গের অশ্বেষণ না করিয়া যথাসম্ভব ভগবন্তের সঙ্গ করিবে।

যদি কোন বৈষ্ণব তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না করিয়া আপনাকে সংযত-ভাবে রাখিবে। যদি তুমি ভগবানের বসতি-স্থল বৈকুণ্ঠে ফাইতে চাও, তাহা হইলে বৈষ্ণবের সেবা কর। বিষয়ী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিছু দিলেও তাহা গ্রহণ করিবে না। সংকুলে আকীর্ণত ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে। শাস্ত্র-বিহিত কৰ্ত্তব্য ভগবানের সেবা-বুদ্ধিতেই করিবে। ভগবানের নিজ-জনের সেবাই তোমার জীবাত্ম বলিয়া জান; তাহা দ্বারাই তোমার জীবনের পরম প্রয়োজন লাভ হইবে। কোন প্রকারে তাঁহাদের অসন্তোষ বিধান করিলে পারমার্থিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহারা ভগবানের অর্চাবিগ্রহে প্রস্তুত-বুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, সর্ব-পাপ-ধোতকারী পাদ-তীর্থে অশ্ব-বুদ্ধি, মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি এবং অপর সাধারণ দেবতার সহিত সর্বৈশ্বর্যের বিষ্ণুর সাম্য-জ্ঞান করে, তাহাদিগকে নারকী বলিয়া জান।

বিষ্ণুর পূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা অধিক ফল-দায়ক; বৈষ্ণবের চরণে অপরোধ, বিষ্ণুর প্রতি অপরোধ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। বিষ্ণুর পাদোদক অপেক্ষা

বৈষ্ণবের পাদোদক অধিক পাবনকারী। এই সকল কথা তুমি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার ভবিষ্যতের কথা কিছুই ভাবিবেন না, কারণ উহা সকলই ভগবানের হাতে। যদি কেহ শরণাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া বিন্দুমাত্রও ঐরূপ ভবিষ্যতের কথা ভাবনা করে, তাহা হইলে তাহার শরণাপত্তি অলীক ও প্রহসন মাত্র। বর্তমান অবস্থা তাহার পূর্ব কর্মের ফল, সুতরাং তাহার অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। বৈষ্ণব বর্তমান বা ভবিষ্যতের জ্ঞাত কখনও উদ্বিগ্ন হইবেন না। স্থানে স্থিৎ হইয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে অথবা তোমার গুরু-পাদপদ্মে সকল ভার অর্পণ-পূর্বক তত্ত্ব-বিষয় নিরন্তর ভাবনা কর।

জিতেন্দ্রিয়তা, জ্ঞান ও ভক্তিধনে বিভূষিত এমন একজন বৈষ্ণবের সন্ধান লও, যিনি তোমাকে তাঁহার প্রিয় ও আপন বলিয়া জানেন; এবং সর্বপ্রকার জাগতিক অভিমান-বর্জিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাক—ইহাই মঙ্গল লাভের সর্বশেষ ও একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত আমি আর অন্য কোন উপায় জানি না। এই প্রকার মঙ্গল-প্রার্থী ব্যক্তি মিত্র, শত্রু ও উদাসীন—এই ত্রিবিধ লোকের বিচার করিয়া চলিবেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার মিত্র, ভগবদ্বিদ্বেষী জনগণই তাঁহার শত্রু, এবং সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণই উদাসীন। যাহারা পরমার্থ লাভের প্রতি উদাসীন, তাহাদের প্রতি তুমিও কাষ্ঠখণ্ড ও প্রস্তরের প্রতি যে-প্রকার উদাসীন থাক, সেই প্রকার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে। যদি তাহারা তত্ত্বাত্মসন্ধানের একটু স্পৃহা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভগবজ্-জ্ঞান উপদেশ দিবে; অন্যথা, তাহাদিগকে শোচ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। ভগবৎ-পাদপদ্ম-আশ্রিত তোমাদের আচরণ এই প্রকার হইবে। সর্বদা বৈষ্ণবসঙ্গে থাক, তাহা হইলেই তোমার হৃদয় পরম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং তুমি চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। বিদ্বেষী জনের সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। তাহাদের সহিত কদাচ বাক্যালাপ করিবে না।

যদি তুমি ভগবদ্বক্তাকে অসম্মান কর এবং কোন প্রকার জাগতিক লাভের জ্ঞাত বিদ্বেষী জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে, কোন সম্রাটের সান্নিধ্যে তাহার প্রিয় ব্যক্তিকে অপমান করিলে তিনি যেমন মর্দ্যাহত হন, ভগবান্ও সেই প্রকার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং জাগতিক কোন প্রকার লাভের আশায় বিদ্বেষী-জনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যেন ভেতমোকে প্রলুব্ধ না করে। কারণ, তাহার নিকট তুমি যে সম্পত্তি লাভ করিবে, তাহা অতি নীচ হইবে। ভগবানের সহিত তোমার বিরোধ আনয়ন করিবে। জাগতিক স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত

হইয়া সংসারাসক্ত স্তুরাং পরমার্থ বিষয়ে উদাসীন কোন ব্যক্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও না। কারণ পরমার্থ ও জাগতিক স্বার্থ ঠিক বিপরীত ধর্ম-বিশিষ্ট; —একটি উজ্জল স্বর্ণ, আর একটি নিম্প্রভ লৌহ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

স্মার্তমত ও বৈষ্ণবমত

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৬ পৃষ্ঠার পর)

মঠ প্রতিষ্ঠা—সংপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, টোল বা সাধুগণের আবাস-স্থানকে মঠ বলে। সাধারণতঃ পারমার্থিক ছাত্রগণের শিক্ষা ও আবাস-স্থানই মঠ নামে খ্যাত। অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, স্বার্থপর ও মায়াবদ্ধ জীবকুলকে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়াধার কবল হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য, স্বরূপ, লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজীর সেবায় নিযুক্ত করাইতে, ও পরাশাস্ত্র-লাভের জগ্না শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা আচারে প্রচারে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জগতে আদর্শ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি আশ্রম-ধর্ম্মিগণ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সজ্জন বৈষ্ণবগণ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন বা করিতেছেন।

অর্চন—পদ্মপুরাণ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে,—দ্বাপরযুগ অর্চন-প্রধান ছিল। তৎকালে ভগবান্ শ্রীহরিকে অর্চনের দ্বারা লাভ করা যাইত। কিন্তু, কলিকালেও বৈষ্ণব ও স্মার্ত উভয় সম্প্রদায়ে অর্চনটী বিশেষরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। বর্তমান কালে অর্চনের প্রাধান্য যথেষ্টরূপে বিঘ্নমান থাকায়, মনে হয়, কলিকালেও আত্মসঙ্গিকভাবে অর্চনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে রহিয়াছে। কারণ, সর্ববৈদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস ঋষি বৈষ্ণবগণের ভজনাঙ্কুর-ক্রমিক স্তব-হিসাবে তর-তমতা বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে—

অর্চনামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে ।

ন তত্তত্তেষু চাত্রেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ (ভাঃ ১২।২৪৭)

কেবলমাত্র অর্চনা-বিগ্রহেই শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনকারী জনগণকে প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-ভেদে ভক্তগণ প্রায়ই সমস্ত যুগে ছিলেন বা বর্তমান আছেন। অবশ্য ইহাও বিচার্য্য যে, ক্রম-পন্থানুযায়ী যদি ভক্তগণের তারতম্য না থাকিত, তাহা হইলে এত প্রকার শাস্ত্র ও শাসন-পদ্ধতি বা শিক্ষা-পদ্ধতি প্রণয়ন করিবার কিছুই আবশ্যকতা থাকিত না। যদিও ‘কলৌ

তদ্ হরি-কীর্তনাং', তথাপি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে—‘যতপাশ্চা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য্যা, তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব’। অতএব কলিকালেও গৃহস্থগণের পক্ষে অর্চনের আবশ্যিকতা আছে ও সেইজন্তই বৈষ্ণবগণ ভজনের চরম-সীমা শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহন-জীউর নিত্য-সেবা লাভ করিবার জন্তই তাঁহাদের কনিষ্ঠাধিকারে অর্চনের প্রাধাত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। স্মার্তগণের পঞ্চদেবতার অর্চন ও মঠ-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, শিব-প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু-প্রতিষ্ঠা ও দোল বা তুলসী মঞ্চ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাহাদের সংকর্মের অধীন অনিত্য ফলপ্রসূ ব্যাপারমাত্র। যেহেতু স্মার্তগণ যাহা অনুষ্ঠান করেন, সবই কামনার বশবর্তী হইয়া করেন। ইহাদের পঞ্চ-দেবতার উপাসনা কাম্য-কর্মের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। স্মার্তগণ আত্যন্তিক-মঙ্গল লাভের জন্ত কোনও দিন কোনও ক্রিয়া-পদ্ধতির ব্যবহার করেন না; পরন্তু, জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন-মানসে সর্বকর্ম করেন ও করাইয়া থাকেন। বেদের কর্ম-কাণ্ডীয় বিভাগে ও স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতে যে সমূহ ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা কাম-কামীগণের কামনা-পরিপূরক সংকর্ম বা পুণ্য-লাভের পন্থা-স্বরূপ। স্মৃত্যুক্ত সং-কর্ম বা পুণ্যার্জনের অনুষ্ঠান-সমূহ জীব-কুলের আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের কারণ না হইয়া কেবলমাত্র বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যেহেতু গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন,—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গ-লোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ী-ধর্মমন্ত্রপ্রপন্না গতাগতং কাম-কামা লভন্তে ॥ (গী: ৯।২১)

কর্মীগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম-ফলে স্বর্গলাভ করেন। তথায় প্রভূত সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনঃ মর্ত্যালোকে আগমন করিয়া থাকেন। কাম-কামী ব্যক্তিগণ ত্রয়ী অর্থাৎ বেদের কর্মমार्গের অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকেন। অতএব বৈষ্ণব ও স্মার্তগণের মঠ-প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবধারা-বিশিষ্ট।

হরিনাম শ্রবণ বা গ্রহণ—স্মার্তগণ কাম্য-কর্মাস্তর্গত যজ্ঞ, তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ, বিবাহ শ্রাদ্ধ, দান প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের পরিপূরক অঙ্গ-হিসাবে শ্রীহরিনামের শ্রবণ-কীর্তনাদিকে গ্রহণ বা সমর্থন করিয়া থাকেন। নাগ যে সাক্ষাৎ হরি হইতে অভিন্ন বস্তু—ইহা স্মার্তগণ স্বীকার করেন না। যে-কোনও ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা সাধন-কল্পে স্মার্তগণ অস্তে শ্রীহরিনামের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা জানেন—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি -নারায়ণ-পরামুখম্ ।

ন নিপুনন্তি, রাজেন্দ্র সুরা-কুস্তম্বাপগাঃ ॥ (ভাঃ ৬।১।১৮)

নারায়ণ-পরামুখ ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তাদি যাবতীয় ক্রিয়া, সুরা-কুস্তম্বের জালর
জাল্য অপবিত্র বা নিষ্ফল হয় । এইজন্য স্মার্ত্তগণ সকল কৰ্ম্মের শেষে বলিয়া থাকেন—

যং সাঙ্গং কৃতং কৰ্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা ।

তৎসৰ্বং ভবতু সাঙ্গং শ্রীহরেনামাহুর্কীৰ্ত্তনাং ॥

অথবা আরও বলিয়া থাকেন—“কৃতে কৰ্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্বোধ-
প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ শরণমহং করিষ্যে” ইত্যাদি । বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবন্মাম শ্রবণ-
কীৰ্ত্তনাদি করিয়া থাকেন—কেবলমাত্র নামের ফল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি লাভ
করিবার নিমিত্ত বা নিত্যকাল নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধা-
মদন-মোহনজীউর নিত্য সেবা লাভ করিবার নিমিত্ত ।

চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণ—

অকাল-মৃত্যু-হরণং সৰ্বব্যাদি-বিনাশনম্ ।

বিষ্ণোৰ্পাদোদকং পিত্তা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

এই বাক্যকে স্বীকার করিয়া স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুর প্রসাদ বা চরণামৃতকে সৰ্বব্যাদি-
বিনাশক ও অকালে অর্থাৎ অল্প বয়সে মৃত্যু-নাশক ঔষধরূপে মনে করিয়া গ্রহণ
করিয়া থাকেন । কিন্তু, বিষ্ণুপাদধৌত চরণামৃত ও শ্রীমহাপ্রসাদকে স্মার্ত্তগণ
বিষ্ণুবস্তুরূপে স্বীকার করিতে পারেন না । আর, বৈষ্ণবগণ ‘অকাল’-শব্দে ‘কৃষ্ণ-
স্মৃতি-রহিত কাল’ ও ‘সৰ্বব্যাদি’-শব্দে ‘ভব-রোগ’ বা ‘আত্ম-ভোগপর স্বার্থপরতা’কে
লক্ষ্য করিয়া থাকেন । বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে,—শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ, নিম্মালায়,
চরণামৃতাদি গ্রহণ করিলে জীব-হৃদয়ে নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতি হইয়া থাকে ও অকালের
হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় এবং আত্ম-ভোগপর স্বার্থ-বাসনাদি
ভব-রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় । তাঁহারা জানেন—“মহাপ্রসাদ সেবা
করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ ভয় ।” এবং—

অশেষক্লেশ-নিঃশেষ-কারণং শুদ্ধভক্তিদম্ ।

বিষ্ণোৰ্পাদোদকং পিত্তা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

অর্থাৎ চরণামৃত লাভ দ্বারা শুদ্ধ-ভক্তিলাভ হইয়া থাকে ।

গুরুবরণ—

উভয়েই গুরু-বরণ করেন সত্য, কিন্তু স্মার্ত্তগণ মনে করেন—অত্যাংকষ্টে পুণ্যগয়
কৰ্ম্মফলবাহ্য জীবই গুরু হইবার যোগ্য । কারণ চৌরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে

‘মহুগু-জন্ম চারিলক্ষ’। এই মহুগু-জন্ম সমস্ত প্রাণী-জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যময়।

এতন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণের পুণ্য সর্বাপেক্ষা অধিক। এবং তাহাদের বিচারে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জাত কোন পুণ্যবান্ মহুগু-বিশেষই গুরু হইবার যোগ্য। এইরূপ সংকুলে জাত মানবের যদি প্রাপঞ্চিক সদাচার বা কেবল নীতি-শাস্ত্র-জ্ঞানাদি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই গুরু হইবার যোগ্য। স্মার্তগণের একরূপ বিচার নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, পারমার্থিক শাস্ত্র উক্ত প্রাকৃত ভ্রমপূর্ণ বিচার পরিত্যাগ করিয়া বলেন—

মহাকুল-প্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।

সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

ষট্‌কর্ম্ম-নিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তত্ত্ব-বিশারদঃ ।

অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্মাৎ বৈষ্ণবঃ স্বপচো গুরুঃ ॥

বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাস্ত গুরুবঃ শূদ্র-জন্মানাং ।

শূদ্রাস্ত গুরুবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎ-প্রিয়াঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

আধ্যাত্মিক জগতে শৌক্য-ব্রাহ্মণকুল-প্রসূত ও পারমার্থিক বিচারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গোরহরি কলি-মল-নাশন-মানসে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ত্রাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা, সেই গুরু হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

অর্থাৎ মহাভাগবতগণ যে কোনও কুলে অবতীর্ণ হউন না কেন, তিনিই একমাত্র নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-কুলের গুরু হইবার যোগ্য। এবং নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-সমাজ ও ভূত্বক-সমাজও তাহাদের নিজেদের মস্তক ও সর্বদ্বন্দ্ব যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাভাগবতগণের শ্রীচরণ-রঞ্জে অভিসিক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞতার সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। ইহাই হরিভক্তি-বিলাস ও সাহিত্য-শাস্ত্রসমূহ তারতম্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরাগবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

কল্যাণপুর, (মেদিনীপুর)

ছুঁছুঁড়ার শ্রীব্যাস-পূজা

উপলক্ষে বিরাট্ আয়োজন।

সকলে যোগদান করুন।

গুরু-কৃপা হি কেবলম্

বন্দনা ও প্রার্থনা

জয় জয় শ্রীগুরুদেব পাবনাবতার ।
 তব পদে করি আমি কোটী নমস্কার ॥
 জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দ্বৈত-চন্দ্র, জয় গদাধরানন্দ ॥
 জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তগণ ।
 নমি সদা মন প্রাণে সবার চরণ ॥
 নমো নমঃ শ্রীরাধিকা-মদন-মোহন ।
 সাবধানে বন্দি যেন যুগল চরণ ॥
 আর আর যত সব গুরু-ভক্তগণ ।
 তাঁদের চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥
 পৃথিবীতে যত আছে বৈষ্ণবের গণ ।
 সবার চরণ বন্দে এ অধম জন ॥
 তাঁদের চরণ-রেণু মস্তকে লইয়া ।
 কৃতার্থ হইতে চাহে এ পামর হিয়া ॥
 সবার চরণে মোর এই আকিঞ্চন ।
 শ্রীগুরু-গৌরাজ-পদে থাকে যেন মন ॥
 বৈষ্ণবের শ্রীচরণে লইবু শরণ ।
 তাহা হ'তে বিচলিত না হই কখন ॥
 'সতত চরণ সেবি'—এই হয় মনে ।
 নরকেতে পড়ে আছি যাইব কেমনে ?
 সকলেতে কৃপা করি' কর মোরে দ্রাণ ।
 তোমাদের কৃপা বিহু নাহিক এড়ান ॥
 গুরু বিনা অণ্ডে যেন নাহি ভালবাসি ।
 প্রার্থনা করে গো সদা এ অধমা দাসী ॥
 সবে মিলি এ অধমে কর আশীর্বাদ ।
 এ অধমা পায় যেন শ্রীগুরু-প্রসাদ ॥

শ্রীগুরু আমার !

আদেশ ক'রেছ যাহা এ'অধম জনে ।
 পালিব কেমনে প্রভো, তব শক্তি বিনে ॥
 তুমি যদি কৃপা করি' কর শক্তি দান ।
 অবশ্য পালিতে পারি তোমার বয়ান ॥
 আমার জিহ্বা-যন্ত্রের যন্ত্রী হও তুমি ।
 যা' বাজাবে-তা'ই প্রভু হইবেক ধনি ॥
 কাষ্ঠের পুতুল যেন মোর তনুখানি ।
 তাহে তুমি স্তম্ভধর হ'য়েছ আপনি ॥
 কেবল আমিগো প্রভু এই মাত্র জানি—
 তা' করিব যাহা মোরে করাবে আপনি ॥
 কে আনিল এথা মোরে কিবা স্বার্থ তাঁর
 কি সম্বন্ধ তাঁর সহ আছেয়ে আমার ॥
 মায়া'র হিল্লোলে কেন আপনা পাসরি ।
 ভাবিতেছি সদা 'আমি' সকলি 'আমারি'
 কিন্তু 'কেবা কার' হয়! না করি বিচার
 মোহে অন্ধ হ'য়ে কেন ভ্রমিছি সংসার ॥
 এ'সব নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারি ।
 কৃপা করি' বল প্রভু তব পদে ধরি ॥
 অন্ধের নয়ন তুমি অশক্তের বল ।
 তোমা বিনা অধমের কি আছে সম্বল ॥
 তব পাদপদ্মে থাকি' করিব সেবন ।
 তব শ্রীমুখের বাণী করিব শ্রবণ ॥
 না জানি 'সেবন', আর না জানি 'ভজন'
 শ্রীচরণ তলে থাকি করিব শিক্ষণ ॥
 এ' বাসনা চিন্তে মোর জাগে সর্বদাই ।
 তুমি কৃপা করি তাহাপূরবে গৌসাই ॥

কিন্তু হায়! বাঁধা আমি মাঝার বন্ধনে ।
 তব শ্রীচরণ প্রাপ্তে যাইব কেমনে ?
 শ্রীগুরুদেব! আমায় কর আকর্ষণ ।
 টুটে য'ক যতকিছু মাঝার বন্ধন ॥
 উদ্ধৃৎসে ছুটে যাই 'জয়গুরু' বলি—
 করিতে ভজন শিক্ষা স্বার্থে দিয়া বলি ॥
 উষর মরুর সম মোর যুট মন ।
 তাতে তুমি যে বীজের করিলে বপন ॥
 তাতে যদি কৃপা-বারি না কর দিখন ।
 কেমনে বাঁচিবে তাহা বলগো এখন ॥
 তাই বলি কৃপাবারি ঢাল অবিরাম ।
 এ মহা-মরুরে কর উজ্জান সমান ॥
 এ'ভব সমুদ্র মাঝে তুমি কর্ণধার ।
 একে একে কতজনে ক'রে দিলে পার ॥
 দূর হ'তে দেখি বটে, কত জন যায় ।
 কিন্তু হায়! আমি পড়ে রহিছু মোহায় ॥
 প্রাণ-হৃদা অস্ত্রাচলে যাইতে বসিল ।
 অধমা পামর অতি পতিতা রহিল ॥
 পৌছিতে এখনও বাকি থেয়ার নিকটে
 বুঝিতে না পারি আমি কি আছে ললাটে
 সর্বক্ষণ ভাবি তাই কি হ'বে উপায় !
 উপায় করগো প্রভু! ধরি তব পায় ॥
 শক্তি-দান কর প্রভু এ অভাগা জনে ।
 শক্তি-দাতা কেবা আর আছে তোমাবিনে

যদিও পাথের কিছু না আছে আমার ।
 দয়াল ঠাকুর তুমি করে দিও পার ॥
 তব শ্রীচরণে মোর এই আকিঞ্চন ।
 তোমা বিনা কে করিবে অভীষ্ট পূরণ ?
 অরণ্যে হরিণ যথা ধরিয়া শবরে ।
 সবধানে বদ্ধ করে পিঞ্জর ভিতরে ॥
 কত যদি পিঞ্জরের খোলা পায় দ্বার ।
 অমনি কুরঙ্গ ধায় কানন মাঝার ॥
 তেমনি চঞ্চল হয় মোর যুট মন ।
 ছুটিয়া যাইতে চাহে সংসার বন্ধন ॥
 তোমার গৃহই প্রভু 'স্ব'-গৃহ জানিব ।
 তোমার আশ্রিত জনে আত্মীয় মানিব ॥
 মাঝার কুহকে ভুলি আশার ছলনে ।
 'স্ব'গৃহ ছাড়িয়া ফিরি তাদের পিছনে ॥
 নিজগৃহ-পথ হায়! ভুলিছু সকল ।
 তোমা বিনে সেই পথ কে দেখাবে বল ॥
 কৃপাময় তব পদে এই আকিঞ্চন ।
 ছুটে যাক যত কিছু মায়া-প্রবন্ধন ॥
 সেই সেবা-বুদ্ধি প্রভু কর মোরে দান ।
 যাহাতে সেবিতে পারি তোমার চরণ ॥
 তোমার সেবনে মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন ।
 হ'তে যেন পারি আমি রাধা-পরিক্রম ॥
 শ্রীচরণে এই মোর কাতর মিনতি ।
 পাই যেন নিত্য-ধামে চরণেতে স্থিতি ॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষিনী—

—শ্রীউমারানী দেবী পাঁচবেড়িয়া, (মেদিনীপুর)

জৈবধর্ম

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে :

জৈবধর্ম প্রকাশিত হইবে :

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসনে সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

স্থান—উদ্বারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া।

সময়—রাত্র ৭ ঘটিকা।

তারিখ—শুক্রবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২, ইং ৫।১২।৫২

বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব—দুইটি একই বস্তু। তাঁহাদের এ'জগতে আসা ও যাওয়া—দুইই তাঁহাদের কৃপার পরিচায়ক। জগতের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহারা এ'জগতে আসেন, আবার কৃপা করিয়াই এ'জগৎ হইতে চলিয়া যান। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-কলাপ সমুদায়ই কৃপাময়। “বৈষ্ণব চরিত্র সর্বদা পবিত্র।” আনন্দ-প্রদানই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। দুর্দ্দেবগুণ ব্যক্তি ভোগবশে তাঁহাতে নিরানন্দ লক্ষ্য করে। ইহাই মাঘার আদিপত্য। কেহ যদি মনে করেন,—বৈষ্ণব এ'জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-চরিত্রে দোষারোপ করা হয়। তিনি দুঃখ দিবেন কেন? এই জন্তই বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘বিরহ-উৎসব’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ‘উৎসব’-শব্দের অর্থ—নিরানন্দ বা দুঃখ নহে। ইহা সুখ ও প্রীতিদায়ক। যে উদ্দেশ্য লইয়া বৈষ্ণব জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য অনিত্য নহে; তাৎকালিকতার ছায়াপাতও তাঁহাতে নাই। সনাতন বস্তুর রীতিও সনাতন। তাহাতে আবির্ভাব তিরোভাবের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এবং তিরোভাব আবির্ভাবের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে। আবির্ভাবের মাধুর্য্য ও তিরোভাবের উদার্য্য লইয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাব। এ' সাহিত্য শব্দ-ব্রহ্মেরই বিকাশ। ইহাতে শব্দ-সামাগ্রের কোন মলিন ছায়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। শ্রীল প্রভুপাদ—সিদ্ধান্ত সরস্বতী। অর্থাৎ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত বাণী-মন্দিরের গর্ভ বিস্তার-স্বরূপ।

অতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট তিথি। এই তিথির প্রতি দোষারোপ করিয়া আমরা যেন শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য মঙ্গলময় ক্রিয়া-কলাপের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ না করি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই তিথিকে প্রতি-বৎসরই সাদরে আহ্বান করিয়া থাকেন। তাই এ'বৎসরও সেই তিথির পূজা করিতে আপনারা সকলে আগ্রহ-সহকারে উপস্থিত হইয়াছেন; ইহা আনন্দেরই কথা।

সুখ ও দুঃখ দুইটিকে সমপর্যায়ে দর্শন করাই বৈকুণ্ঠ-দর্শন। বৈকুণ্ঠ-দর্শনে প্রত্যেক বস্তুতেই সাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাম্য পূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময়। জাগতিক বৈষম্য অপ্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাকার সুখ-দুঃখের প্রতিদ্বন্দ্বীতাময়ী

শক্তি পরম্পরের ভিতরে অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যময় সাম্য প্রকাশ করিয়াছে। একই পথে দুই সীমায় সূত্র ও ভূত্ব—দুইটী অবস্থিত। উভয় দিক হইতে উহা সমভাবে আগমন হইলে একই মধ্যবর্তী কেন্দ্রে মিলিত হয়। ইহারই নাম-সন্তোগে বিপ্রলম্ব এবং বিপ্রলম্বে সন্তোগ। ইহারই অধিদেবতা স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর। আবির্ভাব-তিরোভাবই সন্তোগ-বিপ্রলম্বের প্রতীক অবতারণ। মিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কাই মিলনকে প্রগাঢ়তর করিয়া থাকে। এবং মিলন-স্থলে যত গভীর-ভাবে বিরহ-চিন্তা হৃদয়ে জাগরুক হইবে, ততই মিলনের মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হইবে। বিপ্রলম্বেও সেই প্রকার মিলনের চিহ্ন যত প্রথরা হইবে, ততই বিপ্রলম্ব-ধর্মের নিত্য প্রশ্রয় হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিবে। ইহাই পরম-মুক্তগণের চরিত্রে উদ্ভাসিত।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। এবং তাঁহার অতিমর্ত্য ক্রিয়া-কলাপের কথা কীর্তনমুখে আলোচনা করিয়া থাকি। অতি-মর্ত্যতার বিচার ও চিন্তাশ্রোত সকলের এক নহে। যিনি যতটুকু অতিমর্ত্য-ভাবে বিভাবিত, তিনি ততটুকুই তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছেন। আমাদের ভোগবৃত্তি, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা, স্নেহেষণা প্রভৃতি অতিমর্ত্য দারণায় সহায়ক নহে। আমরা এইরূপ বৃত্তি লইয়া শ্রীশুরু-পাদপদ্মের প্রতি যে বিরহ জ্ঞাপন করি, তাহা ভোগেরই প্রতিচ্ছবি। ভোগ ব্যাঘাতের নাম ‘বিরহ’ নহে। ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী ত্যাগ বা বৈরাগ্যকেও তাহা হইলে ‘বিরহ’ বলা যাইত। বিরহী ব্যক্তির চরিত্রে ত্যাগ-বা বৈরাগ্য স্বতঃসিদ্ধভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া উহা ‘বিরহ’ নহে। আমরা আমাদের ভোগে ব্যাঘাত ঘটিলেই বিরহ বোধ করি। শ্রীল প্রভুপাদের ললিত-লাবণ্য রূপ, তাঁহার মধুর কোমল হাস্য, সরল উদার ব্যবহার, ভুবন-বিজয়ী অসমোর্ধ্ব পাণ্ডিত্য, সর্বদা হরিকথা কীর্তনে মুখরিত স্বভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সদয় করুণ স্নেহশীলতা আমাদের সর্বদাই আনন্দ-বর্দ্ধন করিত। এমন কি, veteran intellectualist (গভীর জ্ঞানবাদী) গণও তাঁহার বিচার-বুদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দ অহুভব করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সমস্ত গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বর্তমান তাঁহার অভাবে তাঁহার হৃৎখানুভব করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বক্তব্য,—ইহা বিরহ নহে, পবিত্র ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা-স্বরূপ। শুরুদেব সুপুরুষ, তাঁহার ব্যবহার ভাল, তিনি আমাদের প্রচুর সাহায্য করিয়া আনন্দ-বিধান করিতেন, তজ্জন্তই তাঁহাকে খুব ভাল লাগিত। এখন তাঁহার অবর্তমানে আমরা ঐগুলি পাইতেছি না বলিয়া ঘেঁহুখ উহা সমস্তই কামনা বা ভোগ।

আমরা জন্ম হইতেই পূর্ব-কৰ্ম্মানুসারে কতকগুলি ভাল-মন্দের বিচার লইয়া জীবন ধারণ করি। ইহা কতকটা *atmosphere & environment* (আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা) হইতে লাভ করিয়া থাকি। তদনুসারে আমরা যে বৃত্তি পাইয়াছি, তাহার দ্বারা যে সাধুতার কল্পনা করিয়া লই, তাহা প্রকৃত সাধুতা নহে। সেবা-বুদ্ধির দ্বারাই সাধুতার পরিচয় পাওয়া যায়। যতদিন সেবা, ততদিন ভক্তি। ভক্তিতে বা সেবায় প্রাকৃত *atmosphere or environment* (আবহাওয়া বা পারিপার্শ্বিকতা)র কোন আধিপত্য নাই। শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও অন্তঃকরণে ভক্তি বা সেবাবৃত্তি দেখিলেই তাহাকে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিতেন, নচেৎ তাঁহার নিজস্ব চিরদিনই বাহু জগতের নিকট অবগুষ্ঠিত। ভক্তির প্রধান লক্ষণ—শরণাগতি। নিজের নিজস্ব বিলাইয়া দেওয়াকেই শরণাগতি বলে।

শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি লাভ করিতে হইবে। গুরু-পাদপদ্মে যতই আত্ম-সমর্পণ হইয়াছে, ততটাই তাঁহার নিকপটে রূপা পাওয়া গিয়াছে। আমরা আত্মীয়-স্বজনের নিকট সুখ-স্বচ্ছন্দতাই আশা করি। শ্রীল প্রভুপাদের নিকটও সেইগুলিই আমরা আশা করিয়াছিলাম এবং তাহা পাইয়াও ছিলাম। ইহা কিন্তু বিরহের লক্ষণ নহে। আত্ম-সমর্পণের উপরই বিরহের বিচার। আত্ম-সমর্পণ বলিতে ‘আমি ও আমার’ যাহা কিছু, সমস্তই সম্যকরূপে, অর্পণ করা বুঝায়। সুতরাং গুরু-পাদপদ্ম হইতে কোন পার্থিব বস্তু, চিন্তাশ্রোত বা ক্রিয়া-কলাপ আশা করা—আত্মনিবেদনের লক্ষণ নহে। যেহেতু যে বস্তুটি আমার নিজস্ব বলিয়া মনে হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করাই ভক্তি। কেহ যদি মনে করেন,—গুরুদেবের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া উহা গুরুদেবকে সমর্পণ করিলে আত্মনিবেদন হইবে না কেন? কিন্তু, গুরুর নিকট হইতে এইরূপ কিছু আদায় করিয়া তাহাই গুরুকে দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? যদিও গণিতের বিচারে জমা-খরচ করিলে ইহা একই বলিয়া মনে হইবে, অর্থাৎ আমি সর্বস্ব গুরুদেবকে দেওয়ায় আমার তহবিল শূন্য হইয়াছে; এই শূন্য তহবিলে গুরুদেবের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা আদায় করিয়া লওয়ায় আমার তহবিলে শূন্যের সহিত যোগ দিয়া সহস্র মুদ্রা হইল। পুনরায় এই সহস্র মুদ্রাই গুরুদেবকে দেওয়া হইল; পরিশেষে শূন্যই রহিল। পূর্বে যে-প্রকার সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমার তহবিল শূন্য হইয়াছে, এখন গুরুর নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাহা সমর্পণ করায় তহবিল পূর্বের ত্রায়ই শূন্য হইল। (০+১০০০=১০০০; ১০০০-১০০০=০)। যদিও এই উভয় অবস্থা গণিতের বিচারে একই

বলিয়া গণ্য হইবে, তথাপি প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহা এক নহে। বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কারণ গুরুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা—শরণাগত ভক্তের লক্ষণ নহে। উপরন্তু, গুরু-সেবকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির ঐচ্ছা গুরুদেবের ইচ্ছা বা চেষ্টা-জনিত তাহার যে ক্রেশ উপস্থিত হয়, সেই ক্রেশ-প্রদানের ফলভোগ্য গুরু-সেবকের করিতে হইবে। হুতরাং গুরু-পাদপদ্মে কামনা—গুরু-সেবকের পক্ষে অত্যন্ত হানিকারক। গুরু-পাদপদ্মে প্রীতি-কামনাই অস্ত্র কামনার বিনাশক। ইহাই শরণাগতের লক্ষণ। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত

শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর)

৯ নং আপ্. ডুন্. এক্সপ্রেস্‌ ভোর ৬ টার সময় গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের যাত্রিগণ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। অনেকেই বলিতে থাকেন যে, গত বৎসর আমরা এই গয়াক্ষেত্রে এক দিবস থাকিয়া গয়ার যাবতীয় স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছি। এস্থলে পাঠকবর্গ অবগত আছেন, গত বৎসর বৃন্দাবন পত্রিক্রমা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি রিজার্ভড্‌ বগীযোগে গয়া, কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি হইয়া মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তাহার আনন্দ উপলব্ধি করিয়া যাত্রিগণ বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করেন। আর একটা অভিনব ব্যাপার এই যে, শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রাতঃকালীন আরতি-সময় উপস্থিত হইলে শ্রীমান্ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সেবাসুহৃদ শ্রীবিগ্রহের আরতি করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তাহার স্বভাব-শুলভ শুল্লিত কণ্ঠে আরতি-কালীন কীর্তন করেন। আমাদের বহু ব্রহ্মচারী ও যাত্রী তাহাতে যোগদান করেন। শ্রীগৌরবিদ্বিত সঙ্কীর্তনে তখন গয়া ষ্টেশন মুগ্ধিত হইতেছিল। ষ্টেশনের যাবতীয় কর্মচারী, কুলি, অগ্ৰাণ্ণ যাত্রী সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কক্ষের সম্মুখে করমোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া 'আরতি দর্শন' ও কীর্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ অবতারী পুরুষ, তাহার অর্চা কি-ভাবে সেবিত হইয়া থাকে, গয়া ষ্টেশনের দর্শকমণ্ডলী তাহা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যথাসময়ে গাড়ীর বিদায় ঘণ্টা বাজিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দর্শকমণ্ডলী একটা অভূতপূর্ব আকস্মিক শুভ মুহূর্ত হারাইয়া বিষন্ন-বদনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যথাযোগ্য একান্ত পঞ্চাঙ্গ প্রণতি-পূর্বক অত্যন্ত মনোবেদনা লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমাদের

যাত্রাসকল এই অপূর্ণ দৃশ্য-দর্শন করিয়া পরমানন্দে বহু কথা আলোচনা করিতে-
ছিলেন। এইরূপে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের অর্চাবিগ্রহের ষাণ্মাসিক
যাবতীয় সেবাই ট্রেনের মধ্যে পালিত হইয়াছিল। তৎপর ট্রেন চলিতে থাকিলে
প্রাতঃকালীন গুরুষ্টক, পঞ্চতন্ত্র, “উদিল অরুণ” প্রভৃতি কীর্তনসমূহ কীর্তিত হয়।

গাড়ী ক্রমশঃ কাশী অতিক্রম করিয়া বারাণসী ষ্টেশনে পৌছিয়াছে; বেলা
তখন ১১টা। এই বারাণসী ষ্টেশনের বর্তমান নাম বেনারস্ ক্যান্ট মেন্ট। আমরা
গত বৎসর বৃন্দাবন পরিক্রমার যাত্রামুখে কাশীতে এক দিবসের জন্ত আমাদের
সংরক্ষিত গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কাশী-ধাম দর্শন করিয়াছি। আজ পুনরায়
সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় সকলেই আনন্দের সহিত ইহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া
বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকেন।

বরুণা ও অসী নদীর মধ্যবর্তী পুণ্য-ভূমির নামই বারাণসী। সাধারণতঃ ইহা
শৈব ও জ্ঞানিগণের নিকট বিশ্বেশ্বরের স্থান বলিয়া কাশী নামে আখ্যাত হইয়াছে।
প্রকৃত-প্রস্তাবে এই কাশী বারাণসী বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অর্চা-লীলার অফুরন্ত বিকাশ-
ক্ষেত্র, বদরীনারায়ণের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা শ্রীমদ্ভাদেবী এই ক্ষেত্রের পূর্বদিকে
প্রবাহিতা হইয়া কাশী-ধামের মাহাত্ম্য সর্বতোভাবে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। বিষ্ণু-
পাদোদ্ভূতা গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুভক্ত জানিয়া শিব তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া
বিশ্ববাসী ধর্মপ্রাণ সজ্জনগণের নিকট বিষ্ণু মহিমা প্রচার করেন। এই কাশী-ধামই
প্রকৃত-প্রস্তাবে বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া স্বয়ং শত্ৰু অর্চামূর্তিতে জ্যোতিলিঙ্গ-স্বরূপে
অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু এই পুণ্য-ভূমির সর্বত্র অষ্টাদশ শত (আঠার
শত) অর্চা-মূর্তিতে বিরাজিত থাকিয়া ভগবদ্ভক্তের মহিমা জগতে প্রচার করিতে-
ছেন। শ্রীকাশী-ধামে শিবলিঙ্গ অপেক্ষা বিষ্ণু-মূর্তির সংখ্যা অনেক গুণে অধিক।
ইহা ক্ষুদ্রপুরাণের কাশী-খণ্ডে শিব-মাহাত্ম্য-বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব-অবতারের অবতারী পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-হৃন্দর তাঁহান্ন শ্রেষ্ঠ ভক্ত
শিবকে দর্শন দিবার জন্ত শ্রীশ্রীকাশীধামে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন
কাশী-ধাম সাক্ষাৎ নবদ্বীপ-ধামে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-আচার্য্য-কুল-মুকুট-
চূড়ামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী হুসেনশাহ বাদসাহের প্রধান মন্ত্রিস্ব পদ পরিত্যাগ
করিয়া এই বারাণসী-ক্ষেত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গয়্যার
কর্মক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী জ্ঞান-ভূমিকায় পশ্চিম-দেশীয় একদন্তী সন্ন্যাসী
প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য লইয়া জ্ঞানমার্গের অস্বাভাবিক
বিচার পরিত্যাগপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তদবধি ইহা জ্ঞান-ক্ষেত্রে পরিবর্তে জ্ঞান-মিশ্র। তন্ত্রের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।
অদ্বৈত-সিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতীও জীব গোস্বামীর বিচার ও যুক্তি-প্রাবল্যে
অদ্বৈত চিন্তাস্রোত পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-মিশ্র ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার
অধীন কালে 'ভক্তি-রসায়ণ' গ্রন্থ রচনা করেন।—আমরা বারাণসী ষ্টেশনে উপস্থিত
হইলেই বারাণসীর উক্ত মাহাত্ম্য-সকল আলোচনা ও স্মরণের বিষয় হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাক্ষের অর্চনকারী শ্রীমান্ ধীরকৃষ্ণ ঘণ্টাধ্বনি করিল,
ঠান্ডার ভোগারতি আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল;
নারায়ণ মহারাজ ভোগারতি কীর্তন ধরিলেন—“ভজ ভকত-বৎসল শ্রীগৌর-
হরি” (ঠান্ডার ভক্তি বিনোদ)। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের বহু যাত্রী, কুলি, রেল-
কর্মচারী, পুলিশ প্রভৃতি বহু লোক আমাদের গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীমন্-
মহাপ্রভুর অপূর্ণ চিত্তাকর্ষণী মূর্তি দর্শন করিয়া সকলে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া
শ্রীআরতি-কীর্তনাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমাদের বন্দীনারায়ণ যাত্রি-
গণ উল্লাস-ভরে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া এই ভোগারতি কীর্তনে যোগদান করেন।

এমন সময় বারাকপুরের শ্রীযুত রামবন্ধু পাল মহাশয় পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে
তাঁহার বাবু ও বিহানাপত্রসহ আমাদের গাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; ইনিও
আমাদের সহিত শ্রীবন্দীনারায়ণ দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সহযাত্রী হইলেন; তাঁহাকে
আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্ত আরও কয়েকজন ভক্ত ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনের
‘মধ্যেই সেবা-পূজা ভোগারাগ’, ‘আরতি কীর্তন প্রভৃতি অভিনব’ ব্যাপার দেখিয়া
স্তুভিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। আমরা তাঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর
মহিমা ও বারাণসী মহিমা কীর্তন করিলাম এবং তাঁহারা প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ ও
সৌভাগ্যবতী বলিয়া তাঁহাদের শুভাগমনের জন্ত দণ্ডবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তখনই
গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; আমাদের সেবকগণ বিশেষ তৎপর হইয়া
রামবন্ধু বাবুর আত্মীয়বর্গকে মহাপ্রভুর প্রসাদ পুরি, আলুর তরকারী ও কিছু
মিষ্টি দিলেন। মঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আরতি কীর্তনান্তে
বিভিন্ন বালুতি বোঝাই করিয়া বিভিন্ন প্রসাদ যাত্রীগণকে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ
করিলেন। গাড়ী নির্দিষ্ট সময় হইতে একটু বিলম্ব করিয়াই ছাড়িল। কে জানে,
শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার আকস্মিক অভাবনীয় সেবা-বিলাস বিকাশের ফলেই
স্বকীভূত হওয়ায় গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব হইয়াছিল কিনা। ষ্টেশনের বিমুগ্ধ যাত্রীগণ
করযোড়ে আমাদের দিকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন। (ক্রমশঃ)

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাক—৪৬৬ ; ফাল্গুন—১৩৫৯

১৫ গোবিন্দ, ১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণ-চতুর্দশী দি ৯।২৮।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রত।

১৬ গোবিন্দ, ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—অমাবস্যা ৭।১৩।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রতের পারণ—দিবা ৭।১৩ মধ্যে।

১৭ গোবিন্দ, ৩রা ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌর-দ্বিতীয়া রা ২।৩০।
শ্রীল রসিকানন্দ-দেব গোস্বামীর ও বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-দাস
বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।

২৪ গোবিন্দ, ১০ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌর-নবমী দি ৪।২।
শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ।

২৫ গোবিন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—গৌর-দশমী দি ৪।১১।
নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা
আরম্ভ।

২৬ গোবিন্দ, ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌরৈকাদশী দি ৪।৫।
আমলকী একাদশীর উপবাস।

২৭ গোবিন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—গৌর-দ্বাদশী সন্ধ্যা ৬।১।
দি ৯।৫৫ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব,
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীল হৃদয়ানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ গোবিন্দ, ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—গৌর-চতুর্দশী রা ৯।৩১।
শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্ত ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস কীর্তন।

৩০ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—পূর্ণিমা রা ১১।৩৭।
শ্রীশ্রীগৌর-জন্মস্তীর উপবাস ও পূর্ণিমাভ্যন্তে ৪৬৭ গৌরাক আরম্ভ।

গৌরাক—৪৬৭

১ বিষ্ণু, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ, রবিবার—কৃষ্ণ-প্রতিপদ রা ১।৪৪। পূর্বাহ্ন ৯।৫৩
মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মস্তীর পারণ। সহর-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ
গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ও সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

৩ বিষ্ণু, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া রা ৫।২২। কুমারহট্টে
শ্রীল ঈশ্বর-পুরীপাদের শ্রীপাটে শ্রীমন্নহাপ্রভুর আগমনোৎসব।

৬ বিষ্ণু, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ, শুক্রবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৭।২২। শ্রীশ্রীরাধা-
গোবিন্দের পঞ্চম-দোল। চন্দ্রকহট্টে উৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসাদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।

অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধত্ব ॥

অত ধর্ম স্প্রসাদে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

বর্ষ { কারগোদশায়ী, ১৪ গোবিন্দ, ৪৬৬ গোবিন্দ
বৃহস্পতিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৫৯; ইং ১২২১৫৩ } ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

শিব উবাচ—

- ১। যস্য দর্শন-মাত্রেন পাতকানি মহাস্ত্যপি ।
বিলীয়ন্তে ক্ষণানুব সিংহং দৃষ্ট্বা যুগা ইব ॥ ২৫ ॥
- ২। ধর্ম্যাধর্ম্যান্ বিজিত্যাথ বদরীশং বিভূং হরিম্ ।
দৃষ্ট্বা মুক্তিযুপায়ান্তি বিনায়াসং বড়ানন ॥ ২৬ ॥

- ৩। ত্যক্ত-প্রায়ানি তীর্থানি হরিণা কলিকালতঃ ।
বদরীং সমনুপ্রাপ্য সাক্ষাদেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭ ॥
- ৪। কলিকালমনুপ্রাপ্য মুক্তির্যেষামতীপিতা ।
দ্রুতব্যা বদরী তৈস্তু হিমা তীর্থানশেষতঃ ॥ ২৮ ॥
- ৫। বিনা জ্ঞানেন যোগেন তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ ।
একেন জন্মনা জন্তুঃ কৈবল্যং পরমশ্রুতে ॥ ২৯ ॥
- ৬। জন্মান্তর-সহশ্রৈস্তু যেন চারাধিতো হরিঃ ।
স গচ্ছেদ্-বদরীং দ্রুতং যত্র জন্তুর্ন শোচতি ॥ ৩০ ॥
- ৭। 'বদরী' 'বদরী' ত্যক্তা প্রসঙ্গান্ননুজোত্তমঃ ।
সংসার-তিমিরাবাধে দীপমুজ্জ্বলয়ত্যসৌ ॥ ৩১ ॥
- ৮। যথা দীপাবলোকেন তমোবাধা ন জায়তে ।
তথৈব বদরীং দ্রুতং পুংসো মৃত্যু-ভয়ং কুতঃ ॥ ৩২ ॥
- ৯। দর্শনাদ্-যন্তু পাপানি কদম্বব্যাহতানি চ ।
মুক্তি-মার্গমুপালক্ষ্য তং বন্দে বদরীপতিম্ ॥ ৩৩ ॥
- ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে শিবকৃত-বদরী-
নারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

- ১। শিব বলিলেন—ঋতাহার দর্শনমাত্র মহাপাপ সকলও সিংহ-দর্শনে মৃগের
ছায় ক্ষণ-কালমধ্যে বিলীন হয় ॥ ২৫ ॥
- ২। হে ঘড়ানন, যিনি নিখিল ধর্ম ও অধর্মকে জয় করিয়া বদরীর ঈশ্বরূপে
বিরাজিত, যে-বিত্ত হরিকে দর্শন করিলে বিনা আশ্রয়ে মানবগণ মুক্তি লাভ করে ॥ ২৬ ॥
- ৩। কলিকাল সমাগত দেখিয়া যিনি প্রায় সকল-তীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন,
সেই সাক্ষাৎ বিত্ত হরি সম্প্রতি বদরী-ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৭ ॥
- ৪। কলিকালে যে-সকল লোক মুক্তি অভিলাষ করে, অতীত তীর্থ-সকল
পরিত্যাগপূর্বক তাহারা বদরীক্ষেত্রে দর্শন করুক ॥ ২৮ ॥
- ৫। ছীব জ্ঞান, যোগ ও তীর্থ-পর্যটন-ক্লেশ ব্যতীতই বদরী-তীর্থ-দর্শনে
একজন্মেই কেবলা ভক্তি-স্বরূপা মুক্তি লাভ করিবে ॥ ২৯ ॥
- ৬। ঋতাহার সহস্র জন্মান্তরে হরির আরাধনা করিয়াছে, তাহারা

বদরী-তীর্থ-দর্শনের জন্ম গমন করিতে সক্ষম। এই তীর্থ দর্শনে জীবের কোন শোকই থাকে না ॥৩০॥

৭। যে মনুজোত্তম প্রসঙ্গক্রমে “বদরী বদরী” এইরূপ নামোচ্চারণ করে, ভীষণ বাধাযুক্ত সংসার-তিমিরে তাহার উজ্জল দীপ দর্শন হয় ॥৩১॥

৮। দীপ-দর্শনে যেক্ষণ অন্ধকারের বাধা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বদরী-দর্শনে মানবের মৃত্যুবাধা কেথায় ? ॥৩২॥

৯। ষাঁহার দর্শনে অব্যাহত পাপসকলও রোদন করে, মুক্তি-মার্গ উপলক্ষ্য করিয়া আমি সেই বদরীধরকে বন্দনা করি ॥৩৩॥

ইতি শ্রী কন্দ পুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে শিব-কৃত বদরী-
নারায়ণ-স্তুতিবর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায়।

বর্ষ-পরীক্ষা

কর্ম্মী ও জ্ঞানী—অধিরোহবাদী ; তাহাদের মঙ্গলের

জন্ম ভক্ত ও ভগবানের অবতার

শাস্ত্র বলেন, নম্বর রাজ্যে অনিত্য ধামে মিশ্র প্রভীতিতে নিরন্ত-কূহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভক্তবৎ পার্শ্বদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অধিরোহ-বাদিদিগের মঙ্গলের জন্ম প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহ-বাদিগণ নিজেব প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যে-কালে অক্ষয়-জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ বস্ত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাহার চেষ্টাকে ‘ভোগ’ বলা হয়। ইহারই নামান্তর ‘কর্ম্মবাদ’; ভগবদ্ভক্তি-ধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্য বস্ত্র, চিৎ বস্ত্র ও আনন্দময় বস্ত্র নিত্য ধাম হইতে অনিত্য, অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসে, তখন কর্ম্মকল-ভোগী কর্ম্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের স্বযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত্ত কর্ম্মবাদীকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাহার ভাষায় তাহার ভাষ্য-কালিক ব্যবহারের অনুকূলে ন্যূনাধিক মঙ্গ প্রদান করেন।

গুরু-করণ ও গুরু-শিষ্যের পরম্পর পরীক্ষা

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আশ্রয় দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য একবর্ষ-কাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে

একবর্ষ-কাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত অক্ষজ শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় গুরুদেবের পরীক্ষা কি-প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিরন্তরকুহক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্ত—শিষ্যকে পাইবার জন্ত এক বৎসরকাল কৰ্ম্মবাদীর গ্রায় অক্ষকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবা-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজ-জ্ঞানদৃষ্ট কৰ্ম্মবাদীর গ্রায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন?

শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যের প্রাথমিক অক্ষজ-দর্শন

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে-কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হ'ন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূৰ্ব্ব হইতেই ভক্তি-বৃত্তি—যাহা আত্মার নিজবৃত্তি—দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য ফল-ভোগময়ী চেষ্টার অগ্রতম-জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবকেও তাঁহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু-বিশেষ বলিয়া মনে করেন।

এক বৎসর-কাল অধোক্ষজ গুরুর সঙ্গ-ক্রমে ভোগী

শিষ্যের শিষ্যত্ব-লাভের অধিকার জন্মে

শিষ্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অগ্রতম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ-ক্রমে ক্ষীণতা লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরু-রূপা-লাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর-কাল অবস্থান-কাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্তে ক্রমশঃ নিরন্তরকুহক-সত্য নয়নে দেখিবার স্বেযোগ পান। চিকিৎসকের অধীনে যে-সময় রোগী আত্ম-সমর্পণ করেন, তখন তাহার রোগ প্রবল আছে, থানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকা কালে কখনই তাহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যে-কালে জীব কৰ্ম্মভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সে-কালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরন্তর-কুহক সত্য-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধাস্থিত হ'ন, তখন শিষ্যরূপ-জীব এক বৎসর কাল তাঁহার সেবা-নিরত হইবার স্বেযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কৰ্ম্মময়ী ভোগ-চেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইলে তাঁহার শিষ্যরূপ-ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হইবে।

শ্রীগুরুর প্রতি নিত্যদাস্যই শিষ্যের লক্ষণ, নচেৎ অতিবাড়ি হইয়া পতিত গুরুজ্যোহী হইতে হয়

আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষ-অধিরোহবাদীকে তাহার সঙ্গলাভ করাইবার স্বযোগ দিয়া থাকেন। পাছের তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না; সেরূপ শিষ্যক্রম গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। যে-কালে শিষ্যক্রম আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্যক্রমত্ব হইতে পতন হইয়া অতিবাড়ি নামে উপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুজ্যোহিতা করিয়া ফেলেন এবং ক্রোধকেই ধর্ম নামে চালাইতে থাকেন।

শ্রীগুরুর পতন বা গুরু-ক্রমত্ব লাভ

যদি কোন গুরুক্রম অক্ষ-কর্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরু-ক্রমত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, শিষ্যক্রমের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে আর গুরুক্রমত্বে স্থাপন করিবেন না।

গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ এক বৎসরে স্থাপিত না হইতেও পারে

তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্বেই বর্ষকাল পরীক্ষা-বিধি কিছু গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পর্ববর্তী সময়েই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরন্তরক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তিশাস্ত্রেও অতন্ত শিষ্যক্রমের একরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

—শ্রীল প্রভুপাদ—

জৈবধর্ম

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

শুষ্ক-বৈরাগ্য নিরস, স্তুতরাং বৈষ্ণবতার হানিকারক

সংসারে বিরক্তি জন্মিলে বৈরাগ্য হয় সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র বিরক্তিকে শুষ্ক-বৈরাগ্য কহা যায়। সংসারে বিরক্তি হইয়া যদি কোন পুরুষের সর্বভূতে দয়া এবং 'কৃষ্ণে নির্মল প্রেমভক্তি' উদয় না হয়, তবে সে-বৈরাগ্যে কিছুমাত্র রস নাই। এই বিষয়টাতে অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে। কেহ কেহ সাধনকুশল হইয়া সর্বভূতের প্রতি দয়া দূরে থাকুক, তাহাদের যে কিসে মঙ্গল হইবে, এইরূপ কোন প্রকার চিন্তা করেন না। ইহাতে তাহাদের বৈষ্ণবতার বিশেষ ক্ষতি হয়, স্বীকার করিতে হইবে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মসূক্তোক্তে,—

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈরাবাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকায়ৈঃ ।

যং সর্বভূতদয়্যাসদলভ্যৈকো নানাজনেষবহিতঃ স্তুতদন্তরায্মা ॥ (ভাঃ ৩।৭।১২)

[হে প্রভো, আপনি নির্মল প্রাণীতে অন্তর্ধামি-রূপে অবস্থিত ও সকলের একমাত্র বন্ধু। আপনি অভক্তগণের অলভ্য ও সর্বভূতে দয়াশীল বলিয়া আপনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হ, কিন্তু সকল দেবগণ নানাবিধ উপচার দ্বারা উপাসনা করিয়াও আপনার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না।]

এই ব্রহ্মবাক্য অতিশয় গভীর। সমস্ত বৈষ্ণবত্ব ইহাতে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সম্যক ভাষ্য হইলে আমাদের অত্যাচার প্রয়োজন সফল হইবে। অতএব মহাশয়েরা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করত বিচার করুন। এই শ্লোকের বাক্যার্থ এই যে, অসলোক-কর্তৃক অপ্রাপ্য অর্থাৎ সংলভ্য যে সর্বভূতে দয়া তদ্বারা আরাধিত হইলে ভগবান্ যতদূর প্রসন্ন হন, স্বার্থপর হইয়া উপচিত উপচারের দ্বারা সুরগণেরাও তাঁহার যে আরাধনা করেন তদ্বারা ততদূর প্রসন্ন হইবেন না; যেহেতু প্রচ্ছন্নভাবে ভগবান্ সর্বজীবের স্তুতি ও অন্তরায্মারূপে অবস্থিতি করেন।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কামনাই কপটতা বা ভণ্ডতা

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্কর্গ প্রাপ্তির যে কামনা, তাহাকে এই শ্লোকে কাম বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কাম বাহার ছন্দয়ে বদ্ধ আছে, তিনি যদিও ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে কেহ হন, তথাপি তিনি উপচিত উপচারের দ্বারা ভগবান্কে ততদূর প্রসন্ন করিতে পারেন না। ভণ্ডভাবে যদিও উপচিত উপচার ভগবান্কে অর্পণ করা যায়, তাহাতে তো কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনাই নাই; ইহা

নিশ্চয় আছে, যেহেতু ভগবান্ অন্তর্ধামী, অতএব বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা তিনি বিচার করেন না অর্থাৎ সাধকের অন্তর্বৃত্তি দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ ভগুতা পরিত্যাগ-পূর্বক সরলতা অবলম্বন করত পুঙ্খোক্ত কোন পুরুষ ভগবান্কে উপচিত উপচারের দ্বারা আরাধনা করেন, তথাপি ভগবান্ ততদূর প্রসন্ন হয়েন না। ‘আরাধনা’ শব্দ অন্তর্বৃত্তিবাচক এবং বাহ্য-নিষেধক। অতএব ‘আরাধনা’ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভগুতার প্রতিষেধ হইয়াছে।

“নাতি প্রসীদতি”-বাক্যের তাৎপর্য—অর্থাৎ ভক্ত সকাম

হইলে কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করেন

‘অতিশয় প্রসন্ন হন না’ শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, সকাম হইয়া ভজনা করিলেও ভগবান্ প্রসন্ন হন অর্থাৎ কামনার ফলমাত্র দেন এবং কখন কখন সম্যক বৈরাগ্যের উদয় করান। যথা—

অকামঃ সর্ব-কামো বা মোক্ষ-কামো উদারধীঃ।

তীরেণ ভক্তি-যোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

[পূর্বে অকামই থাকুক, সর্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদার-বুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীর শুদ্ধভক্তিযোগে পরম-পুরুষ কৃষ্ণের যজ্ঞ করিবেন।]

কিন্তু সর্বভূতের প্রতি দয়ার দ্বারা যে ভগবদারাধনা তাহাতে যতদূর তাঁহার প্রসন্নতা হয়, কামনাপ্রযুক্ত ততদূর হয় না। অকাম, সর্বকাম ও মোক্ষকাম হইয়া যে-সকল পুরুষ ভগবদারাধনা করেন, তাঁহাদের আরাধনা সমাপ্তির অর্থাৎ পূর্ণতার প্রতীক্ষা থাকে অর্থাৎ তজ্জন্ত পুনরাবৃত্তি ঘটনীয়, ইহাই জ্ঞাতব্য। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের গ্রায ভক্তিযোগ কদাচ ব্যথা হয় না, অতএব স্বার্থমূলক ভক্তিযোগের পরিণামে নিঃস্বার্থ সর্বভূত-দয়া উদয় হয়। স্বার্থভক্তি ভক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ, অতএব কালক্রমে ঐ পবিত্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং পরম-প্রেমরূপ ফলের জনক হয়। স্বার্থভক্তি সন্ধীর্ণ, অতএব যখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, তখন সর্বভূত-দয়ারূপ ভক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন কামনা করেন, তখন পরমেশ্বর তাহাকে মূর্খ জানিয়া স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদানের দ্বারা তাহার স্বার্থপরতা দূর করেন।

সর্বভূতে দয়াই ভক্তির লক্ষণ

সর্বভূতে দয়ারূপী ভক্তিই জীবের স্বভাব; অতএব বৈরাগী পুরুষদিগের তাহাই প্রাপ্য। পরমেশ্বরে যতদূর দৃঢ়ভক্তির উদয় হয়, ততই জীবের চরিতার্থতা হইয়া থাকে। সর্বভূতের প্রতি দয়াই এই ভক্তির লক্ষণ। জীব কি-জন্ত অথ জীবের

প্রতি দয়া করেন? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অহুস্কান করিতে গেলে কৃষ্ণভক্তিই ইহার হেতু একরূপ বোধ হয়। সমস্ত জীবের সুহৃদ ও অন্তরাত্মারূপে পরমেশ্বর লক্ষিত হন, অতএব তাঁহার প্রিয় জীবসকলের প্রতি আমাদের একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে। যেমত কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের স্বভাব, তদ্রূপ কৃষ্ণের জীবের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আমাদের স্বাভাবিক কার্য। অতএব অন্য সমস্ত জীবের কল্যাণ-চিন্তা ও তজ্জন্য চেষ্টা না করিয়া আমরা যে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকি, তাহা অসম্পূর্ণ।

বিষয়-রোগগ্রস্ত গৃহব্রত-সকল প্রকৃত বিরক্ত-বৈষ্ণবদের প্রতি

অযথা অশ্রায় ব্যবহার করিলেও তাঁহারা বিষয়-রোগীর

প্রতি ঔষধ প্রয়োগরূপ দয়া বিতরণে কুষ্ঠিত নহেন

এই সিদ্ধান্তের সহিত বৈরাগ্য-ধর্মের কি-প্রকার ঐক্য হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা যাউক। হে সাধুমণ্ডলি! বিবেচনা করি দেখুন যে, জগতে যত জীব আছে ঐ সকলের নিত্যমঙ্গল চিন্তা করা ও তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা আমাদের নিত্যমঙ্গল কর্তব্য। জীবের মঙ্গলসাধন যদি আমাদের কর্তব্য-কর্ম হয়, তবে আমরা কি-প্রকারে সংসার হইতে দূরে থাকিতে পারি? দ্বিতাপে তাপিত জীবগণ বনমধ্যে মুনিদিগের নিকট ঔষধি অন্বেষণ করিতে যান না, যেহেতু তাঁহারা (তাপিত জীবগণ) যে রোগগ্রস্ত, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারাই সুস্থ অন্তঃকরণে গৃহমেধ-যাগ করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন এবং যে-সকল ব্যক্তির বৈরাগ্যযোগে তাঁহাদিগকে দুঃখী কহেন, তাঁহারাই কোন বিশেষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই রোগ-বিশেষ। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই পাষণ্ডতা এবং ইন্দ্রিয়সুখই কার্য। যেমত বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি শীতল জলকে সমাদর করিয়া অধিকতর বিকারপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিষয়ী মানবগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করত বাসনারূপ রোগের বৃদ্ধি করেন। বাতুলেরা যে রূপ সুস্থ অন্তঃকরণের লোকদিগের অবস্থায় দুঃখিত হয়, সংসারী পুরুষও বৈরাগী দৃষ্টে দুঃখিত হইয়া থাকেন। মত্তপান করিয়া যে-সকল ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, তাহার। যেমত মত্তবিরত পুরুষদিগকে দুর্ভাগা জ্ঞান করে, সংসার-মধ্যে মুগ্ধ হইয়া অবিবেকী পুরুষেরাও তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষদিগের বৈরাগ্যকে দুঃখের কারণ জানিয়া ভাবিত হয়। হায়! এ' সমস্ত নির্বোধ লোকের উপায় কি? যখন ইহারা নিজ রোগকে জানিতে পারে না, তখন তাহাদের শাস্তি কিরূপে হইবে? আহা! কোন সহৃদয় বিবেকী পুরুষ ইহাদের অবস্থার পর্যালোচনা করত দুঃখ-সাগরে পতিত না হন? মহাত্মা ভাগবতসকল

যদি ঐ সকল লোকের প্রতি কৃপা না করেন, তবে উহাদের আর ভরসা নাই। অত্যাগ্ন লোকে কষ্ট স্বীকার করত বাতুলের ঔষধি বিধান না করিলে আর উপায় কি? বাতুলেরা যদিও উপকারীদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি হরিদাস কদাচও জগাই-মাধাইকে হরিনামামৃত পান করাইতে বিরত হইবেন না। হে বৈষ্ণবগণ! যদিও অবিবেকী পুরুষেরা আপনাদিগকে কটু বাক্য কহে এবং সময় সময় মারিতে উত্তত হয়, তথাপি আপনারা স্বীয় কার্য্য হইতে বিচলিত হইবেন না। সন্তানের যদি কোন অঙ্গে ক্ষয় হয় এবং ঐ অঙ্গ ছেদন করা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে ঐ বালকটী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কটু বাক্যাদি দ্বারা অপ্রতিষ্ঠা করিলেও দয়ালু পিতা কদাচ তাহার ইষ্টসাধনে বিমুগ্ধ হইবেন না। কৃষ্ণদাসেরাও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পুরুষদিগের মঙ্গলার্থ কোন-প্রকারে নিরস্ত হইবেন না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিনী

ভক্তি-সাম্রাজ্য ভক্ত-মহিমা (৮)

চতুর্থ মহিমা এবে শুন সুধীজন।
 ‘ভক্তি-সাধকের গুণ’ যাহা অগণন।
 শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী যোর গুরু।
 নিয়ত বস্তুক হৃদে আশা-কল্পতরু ॥
 স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—পরম ঈশ্বর।
 তাঁর সঙ্গ, তাঁর বড় কেহ নাহি পর।
 স্বভাব স্বরূপ জীবের, ঈশ্বর অধীন।
 অতএব স্বতন্ত্রতা ছাড়হ প্রবীন ॥
 জড়-মুক্ত জন রহে ঈশ্বর-নিকটে।
 অভিমানী জন রহে দুঃখের কপাটে ॥
 দেবতা-বাহিত পেয়ে যে নর-জনম।
 গোবিন্দ না ভজে, সে বঞ্চিত, অধম ॥
 বহু কোটি জন্ম ঘুরি’ এ’-নর শরীর।
 পাইয়া না হরি ভজে, সে-জন অধীর ॥

যতদিন দেখে জীব মায়াকৃত সুখ।
 ততদিন নাহি ছাড়ে এ’-ক্ষিতির দুঃখ ॥
 কিন্তু নরদেহে অনাচারী যদি রয়।
 তথাপিও মুক্ত হয়, গোবিন্দ-সেবায় ॥
 কর্ম-জ্ঞান ছাড়ি’ যদি ভজে হরি-পদ।
 পতিত হ’লেও তার ঘুচিবে বিপদ ॥
 হরি-পদ ছাড়ি’ যারা বর্ণাশ্রম-রসে।
 কোথা কবে সুখী হ’ল—বল সেই বশে ॥
 ওহে জীব! গুণ-দোষ বিচারিয়া যা’রা।
 মম আজ্ঞা মতে ভজে উত্তম তাঁহারা ॥
 যোগ-সিদ্ধি, মোক্ষ আদি যাহা কিছু হয়।
 শ্রীহরি-আশ্রিত জন কিছু না মাগয় ॥
 কায়-মন-বাক্যে সদা ‘হরিদাস আমি’।
 যেই বলে ভক্ত সে, শরণাগত নামী ॥

অভক্ত সদাই যারা ভক্তি অনাদরে ।
 কক্ষি বলে ভয় নাই, বিনাশিব তারে ॥
 ভক্ত-ছাড়া অগ্র যারা নিজে মুক্ত গায় ।
 ভক্তি-হীন বুদ্ধি-দোষে অধঃপাতে যায় ॥
 ভক্তি-বান্ধা ভক্তগণ পতিত না হয় ।
 হরি-রক্ষিত হ'য়ে নির্ভয়ে ভ্রময় ॥
 জলন্ত 'অনল' প্রভু ভক্ত লাগি' খায় ।
 ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥
 ভক্ত-বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে ।
 ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥
 ভক্ত-প্রিয়, সত্যবাক, বন্ধু, কৃতজ্ঞ ।
 হেন হরি ছাড়ি' অস্ত্রে নাহি ভজে বিজ্ঞ ॥
 ঈশ্বর মুখে বিষ দিয়া 'পুতনা' সে তরে ।
 এ-হেন দয়ালু ছাড়ি' কোথা কে নিস্তারে ॥
 উদ্ধবে কহিল কৃষ্ণ আমা হ'তে দৃঢ় ।
 জান তুমি সদাকাল ভক্ত-পূজা বড় ॥
 একবার শরণ যে লয়হে আমায় ।
 সদাকাল রাখি আমি জানহে তাহায় ॥
 কৃষ্ণ বলে, 'আমা' হ'তে ভক্ত-পূজা বড় ।
 বেদে ভাগবতে তাহা কহিলাম দৃঢ় ॥
 'হে দেব! জনার্দন! আমি যে তোমার' ।
 এই কথা যেই বলে আমি হই তার ॥
 সাধু-ধর্ম-রক্ষা আর পাপীরে বিনাশ ।
 করিবারে যুগে যুগে আমার প্রকাশ ॥
 বন্ধু হে অর্জুন! এই আগারে জানিতে ।
 দেখিতে বুঝিতে পারে ভক্ত ভক্তি-চিতে ॥
 ভক্তি-যোগে যথাযথ আমার বিশেষ ।
 সকল স্বরূপ জানি' করয়ে প্রবেশ ॥
 যোগ-যোগ-তপ-জ্ঞান না পারে সাধিতে ।
 হে উদ্ধব! ভক্তিবশ-আমি (জান ভালমতে)

সাধুজন-প্রিয় সদা ভক্তি-বশ আমি ।
 ভক্তি-বিরত জন তারে নীচ জানি ॥
 স্নহীলা পত্নী যথা, পতি বশ করে ।
 সেইরূপ ভক্তি-বশ আমি সাধু-দ্বারে ॥
 অধীন অভিন্ন আমি ভক্ত-হিয়া-বশ ।
 ভক্ত দাসের তাই গাই সদা যশ ॥
 সালোক্যাদি পঞ্চমুক্তি দিলেও তাঁর পিছু ।
 নিষ্কাম ভক্তি-সাধক নাহি চায় কিছু ॥
 কোটি সিদ্ধ-মুক্ত হ'তে এক হরি-ভক্ত ।
 শ্রেষ্ঠ বলি' গায় শাস্ত্র করি' কণ্ঠ মুক্ত ॥
 হরি-ভক্তে গুণ যত সকল সঞ্চারে ।
 অসং হিয়ায় সং-গুণ নাহি ধরে ॥
 শাস্ত্র-আজ্ঞামতে কাম ছাড়ি' হরি ভজে ।
 দেব, ঋষি আদি ঋণ নাশে সব বীজে ॥
 নিজেরে লুকাতে হরি নানা যত্ন করে ।
 তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥
 অস্তুর-স্বভাব যারা অভক্তের গণ ।
 উলূকের গত নাহি দেখে সে কিরণ ॥
 মুরারি আশ্রয় ঈশ্বর আপদ ভিতর ।
 গোপ্পদ সমান তাঁর এ'ভব-মাগর ॥
 হরি-বর্জিত হ'লে অবনী-ভিতরে ।
 পিতা, মাতা, ঔষধ রাখিতে না পারে ॥
 ততদিন ভয় থাকে ধন, জন-তরে ।
 যতদিন হরি-পদে শরণ না ধরে ॥
 নিজ লাভে পূর্ণ হরি, সম ও প্রশান্ত ।
 ছাড়ি' অগ্র ভজে যেই, সে হয় দুর্দান্ত ॥
 অতি নীচ জাতি ঈশ্বর দাসের আশ্রয়ে ।
 বিমলতা লভে সেই হরি সেধাময়ে ॥
 হরি আনন্দ-পদ যারা নাহি স্মরে ।
 জ্ঞানী, যোগী, কর্মজড় হ'য়ে তারা মরে ॥

হরি-ভক্ত জন্মে যদি কোন বংশে তবে ।
 পিতৃগণ নেচে বলে, তরিলাম এবে ॥
 হরিভক্ত কভু পর-হিংসা নাহি করে ।
 অহিংসা-যম-নিয়ম সদা সাথে ফিরে ॥
 ভক্ত-সঙ্গে লভে জীব ভক্তি-বীজ-মূল ।
 ভক্ত-সঙ্গ ফলে জীব ছাড়ে সব ভুল ॥
 ভুক্তি-মুক্তি-কামী যদি ভক্ত-দয়া পায় ।
 ভক্তি যোগ সাধিবারে অধিকারী হয় ॥
 হরি-ভক্ত দুঃখ-হীন, কাম-ক্রোধ-হীন ।
 হরি-প্রণয়-সেবা-স্বথেতে প্রবীণ ॥
 হরিতে যে ভক্তি, ভক্ত-গুরুতে সেরূপ ।
 করিলে বৃদ্ধিতে পারে তত্ত্বের স্বরূপ ॥
 পূজে হরি, নাহি ভজে ভক্তের চরণ ।
 সাধক না হয় সেই দত্তের কারণ ॥
 যার ঘরে করে পর-ব্রহ্ম বিচরণ ।
 শ্রুতি-স্মৃতি ছাড়ি' ভজে শ্রীনন্দ-চরণ ॥

ভক্তি-তারতম্যে ভক্ত-মহিমা কখন ।
 প্রকাশ করিল তবে রূপ-সনাতন ॥
 কৰ্মী, জ্ঞানী হ'তে বড় প্রহ্লাদ ধীমান্
 তাহা হ'তে আরো বড় ভক্ত হনুমান্ ॥
 তাহা হ'তে আরো বড় শ্রীপঞ্চ-পাণ্ডব ।
 তাহা হ'তে আরো বড় শ্রীভক্ত-উদ্ধব ॥
 তাহা হ'তে বড় ব্রজে দাস ভক্তগণ ।
 তাহা হ'তে বড় সব কৃষ্ণ-সখাগণ ॥
 তাহা হ'তে বড় সে দেবকী, বসুদেব ।
 তাহা হ'তে বড় যশোমতী, নন্দদেব ॥
 তাহা হ'তে বড় মথুরার কান্তাগণ ।
 তাহা হ'তে বড় দ্বারকার প্রিয়াগণ ॥
 তাহা হ'তে বড় আরো ব্রজে গোপীগণ ।
 সব হ'তে বড় তবে রাধিকা-রতন ॥
 কৃষ্ণের সকল আশা সদা আরাধনে ।
 সব হ'তে বড় তিনি পুরাণে বাথানে ॥
 হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৰুণা-কান্দাল ।
 'ভক্তি-ভরজিণী' গায় আনন্দ-গোপাল
 —শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী
 আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূৰ্ব প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

জীবের বদ্ধাবস্থা ও তাহার প্রতিকার শিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণকে তুলিয়া সেইসকল জীব অনাদি-বহিস্মৃৎ হইয়া সংসারাদি দুঃখ ভোগ করিতেছে । এইরূপ কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে তাহাদের গতাগতি । যেরূপ দণ্ড ব্যক্তিকে রাজা নদীতে চুবাইয়া শাস্তি দেয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া, তাহাতে অভিনিবেশ-বশতঃ জীবের 'ভয়' উপস্থিত হইয়াছে । ভগবানে বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াজনিত জীবের কৃষ্ণ-বিস্মৃত । এতন্নিবন্ধন বিজ্ঞ ব্যক্তি গুরু-দেবতাত্মা হইয়া অনন্ত-ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজন করিবেন । কৃষ্ণ-বহিস্মৃততা হইতে যে জীবের পতন,—ইহা সাধু ও শাস্ত্র-রূপায় জানা যায়, এবং তাহা জানিয়া যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি নিস্তার লাভ করেন এবং মায়া তাহাকে

পরিত্যাগ করে। এই ত্রিগুণময়ী মায়ায় হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। আমাতেই যিনি প্রপন্ন হন, তিনিই কেবল এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন—অন্তে নহে। মায়ামুক্ত জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি নাই, সেহেতু কৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ বা বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, ভাগবত-শ্রেষ্ঠ গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মা-রূপে কৃষ্ণ জীবকে সমস্ত তত্ত্ব অবগত করান। তখনই জীবের সৌভাগ্যে ‘কৃষ্ণ আমার প্রভু, জ্যাতা’ ইত্যাদি জ্ঞান হয়।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় শিক্ষা

সমগ্র বেদশাস্ত্রে ‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’ এবং ‘প্রয়োজন’ জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের সহিত কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহা ‘সম্বন্ধ-জ্ঞানে’ পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধনের নাম—‘ভক্তি’; উহা ‘অভিধেয়’ নামে অভিহিত। কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে ‘প্রেম’ নামে একটি চমৎকার ব্যাপার আছে; তাহার নাম—‘প্রয়োজন’। সেই প্রেম পুরুষার্থ-শিরোমণি মহাধন-স্বরূপ।

এই তত্ত্বত্রয় সম্বন্ধে মহাজনগণ একটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—
পিতার ধন আছে জানিয়া তাহার সন্ধান করিতে না পারায় পুত্র দারিদ্র্য-ভোগ করিতেছেন—এমন সময় একজন সর্বজ্ঞ ঘরে আসিয়া তাহাকে পিতৃধনের সন্ধান দিলে সেই ধনের কথা অবগত হওয়া মাত্রই তাহার যেরূপ অবস্থা, ক্রিয়া ও ফল হয়, তাহাই উক্ত তত্ত্বত্রয়ের উদাহরণ। এস্থলে সর্বজ্ঞ মহাজন যেরূপ দারিদ্র্যকে পিতৃ ধনের উদ্দেশ্য দেন, তদ্রূপ জীবের পরম মুগ্ধ একমাত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রেমধন মায়াবদ্ধ জীব সন্ধান না পাওয়ায় অবস্থাকে বস্তু-ভ্রমে—অধনকে স্ব-ধন-জ্ঞানে বঞ্চিত হইতেছে। তজ্জন্তু পরম-কাকণিক কৃষ্ণচন্দ্র তাদৃশ ভ্রান্তবুদ্ধি কুবিচার-সম্পন্ন ও ভোগপর ব্যক্তিকে অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত বেদ-পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রই মূল উদ্দিষ্ট বিষয়রূপে অভিহিত। **ইহাই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।**

“বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।

সর্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায়॥” (চৈঃ চঃ)

সেই ধন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণ-শাস্ত্র হইতে অনেক প্রকার উপাদেয় কথা স্থানে-স্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীচরিতামৃতকার জানাইয়াছেন—
দক্ষিণ দিকে ভীমক্লল-বকুলী, অর্থাৎ বোল্‌তারূপ কন্দকাণ্ড, এই কন্দমার্গে জীব সংসার-ভোগ-বাসনারূপ ভীমক্লল-কর্তৃক দষ্ট হইয়া দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন, ভোগের আশা নিবৃত্তি হয় না। যমদণ্ডাগণ ‘দক্ষিণা’ গ্রহণ করিয়া ফল আরোপ করেন।

পশ্চিম দিকে,—জ্ঞান-কাণ্ডরূপ যক্ষ ; যক্ষ ধন-প্রদাতা নহে, তাহার নিকট ধন-প্রার্থিগণের প্রাণ বিনাশ ব্যতীত ধন লাভ - ছুরাশা মাত্র । উত্তর দিকে,—কৃষ্ণবর্ণ অজগর-রূপ ‘যোগ-কৈবল্য’ । সেই কৈবল্য-রূপ কৃষ্ণবর্ণ অজগর-সর্প শুদ্ধজীব-সত্তাকে গ্রাস করিয়া ফেলে । পূর্বদিকে,—মাটি অল্প খুদিলেই রক্ষিত-ধনের পাত্র অল্প পরিশ্রমেই হাতে পড়িবে । কৃষ্ণ-ভক্তিই বন্ধ-জীবের পূর্ব অর্থাৎ সিদ্ধধন ; তাহা লাভ করিয়া শুদ্ধজীব নিত্যকাল ধনী । বেদশাস্ত্র কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়, তাহাই বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্গ্যং ধর্ম উদ্বব ।

ন সাধ্যায়ত্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ—হে উদ্বব ! আমার প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গযোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাঙ্গ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ সাধ্যায়, সর্ববিধ তপস্তা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না ।

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।

ভক্তিঃ পুনাতি মল্লিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাং ॥” (ভাঃ ১১।১৪।২১)

সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্ত-শ্রদ্ধাজনিত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য হই । ভক্তিই মল্লিষ্ঠ চণ্ডালকেও জন্ম-দোষ হইতে পরিত্রাণ করে । অতএব সেই ভক্তিই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ । সর্ব-শাস্ত্রে সেই ভক্তিকে ‘অভিধা’ আখ্যা দিয়াছেন ।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে-প্রকার,—ধন প্রাপ্ত হইলে স্বখভোগ-রূপ ফল হয় ; স্বখভোগ হইলে দুঃখরাশি স্বতঃই পলায়ন করে, তদ্রূপ ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম আবাদন হইলে ভবব্যাধি-রূপ দুঃখ স্বতঃই দূরীভূত হয় । দারিদ্র্যাদি ‘স্বঃখ-নাশ,’ ‘ভবক্ষয়’ ইত্যাদি প্রেমের মুখ্যফল নয় ; প্রেমের মুখ্যফল—একমাত্র প্রেমস্থ-ভোগ ; ইহাই মুখ্য প্রয়োজন ।

সনাতনের সহিত প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-বিচার

কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার ।

চিহ্নভক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয় ।

স্বরূপশক্তি—শক্তি-কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪২-৫০)

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার, শুন, সনাতন ।

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥

সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী, কিশোর-শেখর ।

চিদানন্দ-দেহ, সর্বাশ্রয়, সর্বৈশ্বর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২-৫৩)

“ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥” (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫।১)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; তিনি অনাদি, সমগ্র তত্ত্বেরও

আদি এবং সকল কারণেরও তিনি একমাত্র পরম-কারণ । স্বয়ং ভগবান্ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ; গোবিন্দ তাঁহার অপর নাম । সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীগোলোকাদি ধামে তিনি নিত্য বিরাজমান ।

এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রাব্যাকুলং লোকং মুড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (ভাঃ ১৩২৮)

এতাবৎ কাল যেষ-সকল অবতারাবলীর কথা কথিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহ পুরুষাবতারের অংশ, কেহ কলা ; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ । তিনি চিন্ময় কিশোর-মূর্তি, সর্বাশ্রয়, সর্বৈশ্বরের ও প্রকৃতির অতীত নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে লীলারত ।

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতিতে ত্রিবিধ প্রকাশ

বদন্তি তং তত্ত্ববিদগুহ্যং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

‘ব্রহ্মে’তি ‘পরমাত্মা’তি ‘ভগবানি’তি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

সেই পরতত্ত্ব নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদীর জ্ঞান-প্রতীতিতে নিকির্গেয ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গ-যোগাত্মশীলনকারী যোগীর হৃদয়ে সর্বাত্মার্থামী ভগবদংশ বৈভব ‘পরমাত্মা’রূপে এবং তাঁহারা শুদ্ধভক্তির অহুষ্ঠানে পবনবস্তুর চিন্ময়-সেবায় নিরত, তাঁহারা তাঁহাকে ‘ভগবান্’রূপে চিন্ময় নেত্রে দর্শন ও শুদ্ধ-হৃদয়ে অহুভব করিয়া থাকেন ।

সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অঙ্গ-কাণ্ডিই ‘ব্রহ্ম’ ; তাঁহার অংশ ‘পরমাত্মা’ । তিনি সকল আত্মার আত্মা । চিন্ময় ব্রহ্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি অনাদি ও আদি পরাংপর-বস্তু পরমব্রহ্ম, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—তিনি অসমোদ্ধ-তত্ত্ব । সেই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশে পর, বাহ্য, বৈভব, স্বাংশ, কলা, আবেশ ইত্যাদি অনন্ত অবতার নিত্য বৈকুণ্ঠে প্রকটিত এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত ; তাঁহারাও অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট ভগবৎ-তত্ত্ব ।

সনাতনকে শক্তিত্রয় শিক্ষা

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই ত্রিবিধ শক্তি । চিচ্ছক্তি হইতে অনন্ত চিন্ময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম, চিন্ময়-রূপ, চিন্ময়-পরিকর, নিত্য চিন্ময় লীলাদি প্রকটিত । চিচ্ছক্তির ছায়ারূপিনী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারী মহামায়া শক্তি । সেই মায়া শক্তির অনন্ত বিক্রম হইতে অসংখ্য প্রাকৃত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ । চিচ্ছক্তির ভেদাংশ-বিক্রম-সম্বৃত অনন্ত জৈব-জগতে জীবের অবস্থিতি । (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ড সামী শ্রীমন্তপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

ভগবান্ ভক্ত-বংশল

পুরাকালে হস্তিনা-নগরে ধৃতরাষ্ট্রের পুল্ল মহামানী দুর্যোধন রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজসিংহাসন লাভ করিয়া অভিমানে ‘ধরাকে সরা’ সম জ্ঞান করিতেন। তাহার মাতুল শকুনিকে মন্ত্রী করেন; রাজা দুর্যোধন তাহার কুপরামর্শে পরম দাণ্ডিক যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশা খেলায় পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ এবং এক বংশের অজ্ঞাত বাস, ঘোড়ের উপর ১৩ বংশের বনবাস প্রদান করেন। পাণ্ডবগণ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—ইহারা পঞ্চ ভ্রাতা; ইহারা কণ্টকময় অরণ্যে গমন করিয়াও ভগবানের চিন্তায় বিভোর হইয়া, এই দারুণ দুঃখকেও কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না।

পাণ্ডব-পত্নী পরমা সতী দ্রৌপদী দেবী সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া একটি অক্ষয় ভাণ্ড প্রাপ্ত হন। সেই পাক-পাত্রে একটি গুণ ছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সূর্য্য অস্তমিত হইবেন ততকাল পর্য্যন্ত দেবী ঐ পাক-পাত্রে গুণে সহস্র সহস্র লোক অনায়াসে ভোজন করাইতে পারিতেন, কিন্তু সূর্য্যাস্ত হইলে—ঐ পাত্রে আর সে গুণ থাকিত না।

এক দিবস প্রাতঃকালে মহাঋষি দুর্কীসা ষাট সহস্র শিষ্য লইয়া, ‘শিব শিব’ শব্দে রাজা দুর্যোধনের অতিথি হইলেন। রাজাও পরম আনন্দ-সহকারে চতুর্দ্বিধ পরম উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া শিষ্যসহ ঋষিকে তৃপ্ত করাইলেন। রাজ-ভাণ্ডারে তাহার কিছু অভাব ছিল না; সকলকেই দিব্য-মণি-খচিত স্বর্ণ-পাত্রে ভোজ্য দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। মহর্ষি দুর্কীসা রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে রাজা দুর্যোধন, মামা শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই বর চাহিলেন,—“আপনি একদিন সশিষ্য সূর্য্যাস্তের পর, রাজা যুধিষ্ঠিরের বনস্থ পর্ণ কুটীরে অতিথি হইবেন।” দুর্কীসা ‘তথাস্ত’ বলিয়া রাজাকে বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে, দুর্যোধনের প্রার্থনামত মহাঋষি দুর্কীসা সঙ্ক্যায় ষাট হাজার শিষ্য লইয়া অরণ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অতিথি হইলেন। অসময়ে হঠাৎ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিহিত ভাবে মুনিকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। এবং আসিবার কারণ জানিতে পারিয়া করযোড়ে ঋষিকে বলিলেন—“নিকটস্থ নদীতে গমন করিয়া আপনারা আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া আসুন, আমি আপনাদের ভিক্ষার উদ্যোগ করিতেছি।”

এই কথা শুনিয়া সশিষ্যে দুর্কীসা সঙ্ক্যাহ্নিকের নিমিত্ত নদী-তীরে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির অন্তঃপুরে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন,—“সতি! আজ বহু

শিষ্টা লইয়া মহামতি দুর্দাসা অতিথি হইয়াছেন ; সুতরাং তুমি ইঁহাদের আহ্বারের
যাহাতে কোন প্রকার ক্রটি না হয়, তজ্জগৎ প্রস্তুত হও ।” রাজার এই বাক্য শুনিয়া
দ্রোপদীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল । তিনি বলিলেন,—“রাজন্ ! সন্ধ্যার পরে
আমার পাক-পাত্রের কোন গুণই থাকে না । সুতরাং কি করিয়া এই অসংখ্য ব্রাহ্মণ
ভোজন করাইব, তাহা ভাবিয়া আর কুল কিনারা পাইতেছি না ।” তখন পাণ্ডবগণ
বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া সকলেই ব্যাকুলিত হইয়া বিপদ-ভঞ্জন মধু-
সূদনের নাম অরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের অশ্রুজলে বদন প্রাবিত হইয়া গেল ।
‘হে কৃষ্ণ ! হে বিপদ-তারণ ! শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর । তুমি না আসিলে
ক্ষুধার্ত্ত শ্বশির অভিধাপে আজ পাণ্ডব-বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে ।”

সেই আকুল ক্রন্দনে ভগবান্ কি আর স্থির থাকিতে পারেন ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
দ্বারকায় সবে মাত্র আহ্বারে বসিয়াছিলেন । লক্ষ্মী, কল্মিণী দেবী পরিবেশন করিতে-
ছিলেন,—ভগবানের আর আহ্বার হইল না, কেননা তাঁহার প্রিয় ভক্ত পাণ্ডবগণ
বিশেষ বিপদে পাড়িয়াছেন । অন্তর্ধামী ভগবান্ জানিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ‘গরুড় !
গরুড় !’ বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন । পবন-বেগে বাহন গরুড় আসিয়া
উপস্থিত হইল ; তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে কাম্যবনে
যেখানে যুধিষ্ঠিরাদি অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন ; ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পাণ্ডবগণের আর আনন্দের সীমা নাই ।

ভগবান্ স্বরিত গমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্রোপদীকে কাতর-স্বরে বলিলেন,
—“আজ আমার ভাল করিয়া আহ্বার হয় নাই, বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার নিকট
আসিয়াছি, তুমি কিছু ভোজ্য দ্রব্য প্রদান কর ।” এই বলিয়া ভগবান্ দ্রোপদীর
নিকট হস্ত পাতিলেন । তখন দ্রোপদীর কি অবস্থা হইল, তাহা আর ভাষায়
বর্ণনা করা যায় না । তিনি হরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“হে ভগবন্ !
তোমাকে যোগিগণ ধ্যানে আরাধনা করিয়া পায় না ; যোগীর অগম্য-ধন তুমি
আমার দরজায় আসিয়া, আমার নিকট হস্ত পাতিয়া আহ্বার প্রার্থনা করিতেছ ;
কিন্তু আমার ঘরে যে কিছুই নাই, তাহা কি তুমি অন্তর্ধামী হইয়াও বুঝিতে
পারিতেছ না ? হা ধিক্ বিধি !”—এই বলিয়া দ্রোপদী মুখে বজ্রাচ্ছাদন করিয়া
আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

ভগবান্ বলিলেন,—“তোমার পাকপাত্র আনয়ন কর, দেখি উহার মধ্যে কি
আছে !” দ্রোপদী পাক-পাত্র উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলে, ভগবান্ বলিলেন—“ঐ যে
একটু শাকের কণা দেখা যায়—উহাই জলের সহিত আমার হস্তে প্রদান কর ।” এই

কথা শুনিয়া দ্রোপদী অনন্তোপায় হইয়া তাহাই করিলেন। তখন ভগবান্ ভক্তের হস্তস্থিত দ্রব্যে তৃপ্ত হইয়া বলিলেন—“অহো! আমি যেমন তৃপ্ত হইলাম, নদী-তীরস্থ শশিষ্ঠা দুর্কাসা ঋষিরও এইরূপ তৃপ্তি হউক।”

যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—যিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হয়, সেই ভগবান্ যখন সকলের তুষ্টি ইচ্ছা করিলেন,—তাহার ইচ্ছায় শশিষ্ঠা দুর্কাসারও তুষ্টি সাধিত হইয়া গেল। অনন্ত-শক্তি ভগবানের পক্ষে এ আর বেশী কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবান্ দ্বারকা যাইবার সময় পাণ্ডবগণকে বলিয়া গেলেন—“ঋষিবর্গ আজ আর কেহই আসিবেন না। আগামীকল্য যত্ন-সহকারে দুর্কাসা-ঋষিকে ভোজন করাইবে।”

এদিকে দুর্কাসা দেখিলেন—তাহার পেট যেন ক্রমশঃ ফাঁপিয়া উঠিতেছে; পেট ভরিলে যেমন উদ্যার উঠে, সেইরূপ ঋষির উদ্যার উঠিতে লাগিল। তিনি শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন—“আজ আমার যাওয়া হইবে না—তোমরা যাও।” এই বলিয়া ঋষি সেই নদী-তীরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অত্যাগত সকল শিষ্যই পরস্পর বলিতে লাগিল—“ভাই হে! আমারও ঐ অবস্থা, পেট ফাঁপিয়া যে জ্বালা ধরিয়া গেল! আমি আর উঠিতে পারিতেছি না—ঘন শ্বাস বহিতেছে; হঠাৎ এ' কি হইল, বুঝিতে পারিতেছি না।” সকলেই এই বলিয়া নদীতীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

পর দিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া শিষ্যসকল পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—“ভাইসকল! কি লজ্জার কথা, রাজ-বাড়ীতে প্রচুর ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল, ভাগ্যে নাই; তাহারাই বা কি বলিবেন। আমরা যে কেহই যাইতে পারিলাম না!” অনন্তর দুর্কাসার আদেশে শিষ্য-সকল রাজা বৃধিষ্টির কুটীরে উপস্থিত হইলে, তিনি পরম আদরের সহিত তাহাদের সকলকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইলেন। ঋষিও ভোজনে তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণকে বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে কু-মতি দুর্ধ্যোধন গোপনে দূত পাঠাইয়া দিল। বলিল—“হে দূত! গোপনে কাম্যবনে গিয়া দেখ—পাণ্ডবগণ দুর্কাসার অভিশাপে ভস্ম হইয়াছে কিনা।”

দূত ফিরিয়া আসিয়া দুর্ধ্যোধনকে সংবাদ দিল,—“ভস্ম ত' হয় নাই, বরং মুনি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।” এই সংবাদ শুনিয়া দুর্ধ্যোধনের বদন অমাবস্তার মত কালিমা-বর্ণ ধারণ করিল। তিনি বিষম-বদনে শকুনি মামাকে বলিলেন—“মামা! আমাদের ষড়যন্ত্র সবই বিফল হইয়া গেল।”

“জয়ন্ত পাণ্ডু-পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ।” যেখানে ভগবান্ সহায়, সেই-খানেই বিজয়-লক্ষ্মী বিরাজ করিয়া থাকেন।

—ত্রিদিগ্ভাস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩২ পৃষ্ঠার পর)

আমরা ক্রমশঃ অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বেলা অনুমান ৩।০ টার সময় অযোধ্যা ষ্টেশনে পৌছিয়াছি। গাড়ী এখানে অনুমান ৩।৪ মিনিট অপেক্ষা করে, যদিও রেল-কোম্পানির সময়-তালিকায় এই ক্ষুদ্র সময়ের অবস্থিতির কোন উল্লেখ নাই। আমরা বিগত ১৩৫৬ সালে আশ্বিন-কার্তিক মাসে উজ্জ্বল উপলক্ষে ন্যূনাধিক বিংশতি দিবস এখানে অবস্থান করিয়া উজ্জ্বলত পালন করিয়াছি। আমাদের যাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা স্মরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কয়েকজন সেবক সেই বৎসর অযোধ্যা-ধামে আসিতে না পারায় আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকেন। আমি তখন তাহাদের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রীঅযোধ্যা-ধামের প্রতি যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তৎক্ষণাৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমান্ গদাধর-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সত্যধ্যান ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ মধু-বিজয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন সেবক অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে নীচে নামিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করত শ্রীশ্রীঅযোধ্যা-ধামের প্রতি পঞ্চাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন-পূর্বক ধামের ধূলি মস্তকে লইয়া অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া স্ব-স্ব স্থান অধিকার করে। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ সুদাম-সখা ব্রহ্মচারী অযোধ্যার বিখ্যাত ছোট ছোট পেয়ারা প্ল্যাটফর্ম হইতে খরিদ করিয়া সমস্ত যাত্রীদের বিলি করিতে লাগিল। সুদামের সকলকে ভাল করিয়া খাওয়ানই স্বভাব। সে আগাগোড়া সমস্ত রাস্তাই যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার ভার লইয়া যত্ন করিয়াছে। তাহার মধুর ব্যাহারে সকলেই খুব মুগ্ধ।

অযোধ্যা-ষ্টেশনে বহু বানরকে সন্দর্শন করিতে দেখা যায়। এত বানর আর অন্য কোন ষ্টেশনে দেখা যায় না। অর্ধের মহিলা-যাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ ছোট ছোট পেয়ারা ক্রয় করিয়া বানরগুলিকে খাওয়াইতেছিলেন। উহারা মানুষকে তত ভয় করে না; তাহাদের হাত হইতেই কাড়িয়া কাড়িয়া পেয়ারা খাইতে লাগিল। এই বানর-জাতি রামচন্দ্রের সেবক-স্বরূপে অসুর ধ্বংসের সহায়তা করিয়াছিল। তৎকালই রামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্রে অযোধ্যা-ধামে যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু আদায় হওয়া তাহাদের যেন একটা দাবী। নর ও পশুর মধ্যবর্তী জীব বলিয়াই তাহাদের স্বভাবে পশু-বৃত্তি ও মানব-প্রবৃত্তি কিয়ৎ-পরিমাণে প্রতিফলিত দেখা যায়। আগরা

ভগবত্তার বিকাশ-ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের আপামর সকলের প্রতিই করুণা-কটাক্ষপাতের মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। শ্রীরামচন্দ্র পশু-পক্ষী, নর-বানর, দেব-দানব সকলকেই কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সর্বজীবের তাঁহার করুণ-করুণাই ভগবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। আমরা তজ্জন্তু অবতার-সমূহের মধ্যে বলরাম ও রামচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ অবতার বলিয়া গণ্য করি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব অবতার নহেন—অবতারা। তাঁহারা উভয়েই একই তত্ত্ব, হুতরাং যাবতীয় অবতার-সকলই কৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতার বা কলা। শ্রীকৃষ্ণ-পুরাণের বিচার-অনুসারে রামচন্দ্র পরতত্ত্ব কৃষ্ণের এক তৃতীয়াংশ; ইহা নাম-মহিমা-বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের কারুণ্যামৃত লীলাসুধি মূর্তি শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-ক্ষেত্র এই অযোধ্যা-ধাম। ভক্তির পরমতা ভারতীয় ভৌগলিক ক্ষেত্রের অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমরা ইহালোকের সংসারচ্ছন্ন অত্যাভিলাষাদি বাসনানয় অন্ধকার রাত্রি অতিক্রম করিয়া প্রত্যাষে কক্ষের পারলৌকিক অবিষ্টান-ক্ষেত্র গয়া পরিত্যাগ করিয়াছি—ইহা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। তৎপরে জ্ঞানের অত্যন্ত জ্বালাময় প্রখর আতপ-তাপিত কাশীক্ষেত্র দ্বিপ্রহরে অতিক্রম করিয়া, তাপ-বিদ্রিত শান্ত শীতলোমুখ অপরূহ বেলার অযোধ্যা-ধামের কথা স্মরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলাম। ক্রমশঃ আরও কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা লক্ষ্মণাবতী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। তখন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা (৬।০)। গাড়ী যেন দ্রুত-গতিতে নির্দিষ্ট সময়ের একটু পূর্বেই এখানে পৌঁছিল। এই মহানগরী লক্ষ্মণাবতী'র বর্তমান নাম লক্ষৌ। এই ষ্টেশনে গাড়ী সর্কাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করে, তাহার উপর গাড়ী নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই লক্ষৌ জংসন ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের যাত্রিগণ প্রায় অধিকাংশই গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বিরাট প্রশস্ত প্লাটফর্মের পায়েচারী করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ ২২।২৩ ঘণ্টা গাড়ীতে অবস্থান করিয়া যাত্রিগণ যে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, গাড়ীর বহির্দেশে আসিয়া মুক্ত আকাশ বাতাস পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। পূর্বভারতের রেল কোম্পানির (E. I. R) এই ষ্টেশনটী অতীব সুন্দর। দূর হইতে ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আগ্রা-তাজমহলের সুদৃশ্য গম্বুজগুলির কথা স্মরণ করিতেছিলেন।

ইতোমধ্যে পুজারী ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। সন্ধ্যারতির আয়োজন হইয়াছে, সকলেই আরতি দর্শনের জন্ত একত্রিত হইয়া আমাদের কক্ষের সম্মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের সমস্ত লোক আমাদের গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলিল। লক্ষৌ যুক্ত-প্রদেশের (বর্তমান উত্তর-প্রদেশ) প্রধান নগর; হুতরাং

বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্য-মান্য বিশিষ্ট লোকের স্থান। তৎক্ষণাৎ রেল-স্টেশনেও ঐ শ্রেণীর লোকের ভীড়ও প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই ঘণ্টা-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই সমবেত হন। আরতি আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ মহারাজ কীর্তন ধরিলেন—“জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকে শোভা” ইত্যাদি (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)। সত্যবিগ্রহ ও পূর্ণানন্দ মুদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীমন্নমোহনপ্রভুর অশূর দর্শন সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ পূজারী মহাপ্রভুর রজত-অলঙ্কার মুক্ত করিয়া স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করেন। মস্তকে শিখিপুচ্ছ-সমন্বিত মুকুট, হস্তে অনন্ত, বালা, গলদেশে বিবিধ রত্নমণ্ডিত হুবর্ণ হার, পাদদেশে নুপুর, অঙ্গেতে অভিনব বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি দর্শক-মণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমন্নমোহনপ্রভুর অঙ্গকাস্তি হুবর্ণ জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া অতীব চমৎকার উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত হইতেছিল। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি দিব্য-দৃষ্টিতে শ্রীমন্নমোহনপ্রভুর এইরূপ বৈভব দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীমন্নমোহনপ্রভুর অর্চ্য-অবতাব্যের করুণা-বৈশিষ্ট্য। “যমৈবৈষ বিণুতে তেন লভাঃ।” গাড়ীর অধিক সময় স্থিতি লক্ষ্য করিয়া ধীরক্ৰমে বেশ ভাব-ভরে দীর্ঘ সময় ধরিয়া আরতি করিল।

সেই সময়ে স্টেশনে সমাগত সকলেই তাহাদের নিজ নিজকে ধৃত্ত জ্ঞান করিয়া পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিল। সকলেই করঘোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীবিগ্রহের শোভা অনিমেঘ নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু প্রণামিও আমাদের কক্ষাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমাদের কক্ষের বহির্দেশে হিন্দি “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, নবদ্বীপ (পশ্চিম বঙ্গাল)” ৬ হাত দীর্ঘ এবং ২ হাত প্রস্থ লাল “সালু” কাপড়ে সাদা অক্ষরে লিখা, বড় নিশানটী ভাল করিয়া বাধিয়া রাখা হইয়াছিল। উহার দিকে সকলেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। কেহবা আরতি সমাপ্ত হইলে পর সাক্ষাদভাবে আমাদের নিকট সমিতির সম্বন্ধে অনেক কথা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আরতি সমাপ্তির পর “সংসার-দাবানল-লীচ-লোক” ইত্যাদি শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত সংস্কৃত গুরুষ্টক কীর্তন আরম্ভ হইল। তৎপরেই গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি হইল এবং গার্ড গাড়ী ছাড়িবার ইঙ্গিত করিলে আমাদের যাত্রীসকল অত্যন্ত তৎপর হইয়া স্ব-স্ব স্থান অধিকার করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমরা সন্ধ্যা-কীর্তনাদি সমাপন করিয়া লক্ষণাবতীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই লক্ষণাবতী নগর রামানন্দ শ্রীশ্রীলক্ষণের প্রতিষ্ঠিত। ত্রেতাযুগ হইতে এই মহানগরী লক্ষণাবতী নামে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের হিন্দু-রাজত্বের সময় হইতে

মোগল ও ব্রিটিশ রাজত্বের অন্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় পর্য্যটক-মণ্ডলীর নিকট ইহা মনোরম সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের বিকাশ চিরদিনই অবগুষ্ঠিত। প্রাকৃত সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের ছায়া। ছায়াতে মূল কায়ার পূর্ণ ছবি নির্বিশেষ-ভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রাকৃত কবিসকল তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির অন্তর্গত জগতের ধ্বংস ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রেশ অহুভব করেন। তজ্জন্য আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া লক্ষণাবতীতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্যণের সেবা-সৌন্দর্য্যের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। ভগবতুপাসনার ক্রম-বিকাশ আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। সেব্য অপেক্ষা সেবক-তত্ত্বের প্রাধান্যই বৈষম্য-তত্ত্বে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবন্তের রসময় তত্ত্বে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার ক্রম-বিকাশ হৃদয়কে আনন্দে আশ্রুত করে। তাই আমরা সেব্য-তত্ত্বের আবির্ভাব-ভূমি অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া সেবা-বিলাসের ক্ষেত্র লক্ষণাবতীতে পৌছিয়া আনন্দ অহুভব করিতেছি। আমরা আরও অগ্রসর হইলে সেবার আরও উন্নততম স্থানসমূহ আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইবে।

রামানুজ লক্ষণ ও কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব তত্ত্বতঃ এক হইলেও সেবা-বিলাসের মধ্যে তারতম্য আছে। আমরা ইহার উৎকর্ষ-মূলক পার্থক্য মথুরা-বৃন্দাবনে লক্ষ্য করিয়া ছ। সেবানন্দে উৎকর্ষতা লইয়াই সেবা-সেবক-তত্ত্বের তারতম্য বিচারিত হয়। এস্থলে রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্যণের সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণ প্রতি বলদেবের সেবার উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বলা-বাহুল্য, এ সম্বন্ধে শ্রবণেচ্ছু হইয়া আমাকে প্রশ্ন করাতে আমি আলোচনা করিতে বাধ্য হই। ভগবানের প্রীতি-বিধান লক্ষ্যণের দ্বারা অধিক হইয়াছিল বা বলদেবের দ্বারা অধিক হইয়াছিল, ইহাই বিচারা্য। রাম-লীলায় লক্ষণ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ, কৃষ্ণ-লীলায় বলদেব কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার আমরা সাধারণতঃ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে সেবা-স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া সুখানুভব করে। এ স্থলে কনিষ্ঠ সেবা-সুখের ভোক্তা এবং জ্যেষ্ঠই ভোগ্য। এতদ্ব্যতীত কনিষ্ঠ সেবা-সঙ্কল্পে জ্যেষ্ঠের আদেশের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার সেবা-তৎপরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। স্মরণ্য শ্রীলক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতে গিয়া তাঁহার আদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা রাখিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত সেবা করিতেন। শুধু তাহা নহে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি

স্নেহাদিকা-বশতঃ লক্ষ্মণের কোন অস্থবিধা না হয়, সেজন্য তাঁহাকে বিশেষ তৎপর থাকিতে হইত। বিশেষতঃ স্নেহ নিয়গামী, স্মৃতিরূপ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের স্নেহে পুষ্ট হইয়া আনন্দ অস্থভব করিতেন। রামের বাৎসল্য লক্ষ্মণের প্রতি প্রচুর; কিন্তু ভ্রাতৃ-বন্ধনের সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র বিদিত।

শ্রীলীলদেব-তত্ত্বে কৃষ্ণ-লীলায় আমরা দেখিতে পাই, বলদেব কৃষ্ণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ হইয়া বাৎসল্য-মিশ্রিত সখ্যের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি লাল্য-ভাব তাঁহাকে সর্বদা কৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন রাখিত। কৃষ্ণের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সর্বদা কৃষ্ণ-প্রীতি-তৎপর ছিলেন। কৃষ্ণকে সর্বদা কিছু দেওয়াই তাঁহার স্বভাবে পরিষ্কৃত। তাঁহার নিকট হইতে লওয়া, তাঁহার সেবা-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা হইতেই লক্ষ্মণ অপেক্ষা বলদেবের সেবা-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

রসগত নানা কারণে রাম-লীলা অপেক্ষা কৃষ্ণ-লীলার অধিক মাধুর্য্য অস্থভব করা যায়। রামচন্দ্রের পিতা দশরথের সহিত বাহুদেব-কৃষ্ণের পিতা বহুদেবের তুলনা করিলেও আমরা ইহার সত্যতা অস্থভব করিতে পারিব। দশরথ তাঁহার পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরদান উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধতার সত্যতা সংরক্ষণ করিতে গিয়া দশরথ রামচন্দ্রের প্রতি ষেক্ষরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ রামচন্দ্রকে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বহুদেব কংসের নিকট সমস্ত পুত্র সমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণাবির্ভাবের সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, ভগবান্কে কংসের হস্তে লাক্ষিত হইতে দেন নাই। বহুদেব বিচার করিলেন, আমি সত্য ভঙ্গ করিয়া যদি ভগবানের বিন্দুমাাত্রও প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহাই সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। এক জনের সেবা-বৃত্তিতে ভগবান্কে ক্লেশে পতিত করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রাধান্য দেখা যায়। অপর ক্ষেত্রে নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও ভগবানের প্রীতি-বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই প্রকার নানা কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রামলীলা অপেক্ষা কৃষ্ণলীলার অধিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হইয়াছেন।

এইরূপ নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে অধিক রাত্র হইয়া পড়ে। তৎপর শ্রীগন্যপ্রভুর নৈশ-ভোগ প্রদানের পর ভগবৎ-প্রসাদ সমস্ত যাত্রিগণকে প্রচুর-পরিমাণে বিতরণ করা হইল। তাঁহারা পরমানন্দে প্রসাদ সেবা করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। তখন রাত্র অস্থমান দশটা। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুরাজো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫২

সাদর সন্তোষপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ, রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্তন, রক্তজা, ইফ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত ৯টি দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎ-স্থান-মাহাত্ম্য কীর্তনমুখে ষোল-কোশ পরিক্রমা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাক্ষব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধতত্ত্ব-রূপালেশ-প্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্তস্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)— ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

- ১। ১১ই ফাল্গুন, সোমবার—(১) **ত্রীগৌড়ম-দ্বীপ** (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গা-
স্পর্শান্তে ত্রীগৌর-যোগপীঠ ত্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত
হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, স্রবর্ণ-বিহার,
হরিহর-ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব-পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবাস্তে)
(২) **ত্রীমধ্যদ্বীপ** (সুরণাখ্য)—মাজিঙ্গা,
হাটডাঙ্গা, আমন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন।
- ২। ১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—(৩) **ত্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-
খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ,
কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি (ত্রীত্রীগৌর-গদাধর-মন্দির) এবং
(৪) **ত্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর।
- ৩। ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার—(৫) **ত্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জাহ্নগর
(জহ্নু মুনিস্থান), বিত্তানগর (ত্রীসার্কভৌম ভট্টাচার্যের পাট)।
(৬) **ত্রীমোদক্রম-দ্বীপ** (দাস্তাখ্য)—
মামগাছি (ত্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা,
মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।
- ৪। ১৪ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(৭) **ত্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—পোড়া-
মাতলা ও ত্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে
রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা।
- ৫। ১৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার—(৮) **ত্রীসীমন্ত-দ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া,
শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং
(৯) **ত্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—
ত্রীমায়াপুরে ত্রীগৌর-জন্মভিটা, ত্রীবাস-অঙ্গন, ত্রীঅবৈত-ভবন, ত্রীচৈতন্ত
মঠ (ত্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি,
চাঁদকাজীর সমাধি, ত্রীধর-অঙ্গন এবং (প্রসাদ-সেবাস্তে) ত্রীমুরারি
গুপ্তের পাট।
- ৬। ১৬ই ফাল্গুন, শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।
- ৭। ১৭ই ফাল্গুন, রবিবার—সাধারণ মহামহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীল ঠাকুর নরহরি

অঞ্জলি মস্তকে ধরি', তবাদর্শ গুরুসেবা, নমি আমি করজোড়ি', সর্বকাল গুরু-সেবা, ধন্য 'দেয়াড়া' নগর, কৃষ্ণ-ভক্ত-জন্মস্থান, আত্ম বাল্যকাল হ'তে, বিশুদ্ধ ভাবে অর্চন, সেই সেবা হৃদে ধরি' নবদ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবের যতগুণ, মধু হৈতে মধুভাষী, গুরুদেব শ্রীভক্তি, কায়-বাক্য-মনে তুমি, শুধু গুরু-সেবা নয়, সেবা-ভক্তি শিখাইতে, অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে, শ্রীচৈতন্য মঠ হয়, চেতনের ভিত্তি গড়া, চারি কক্ষে চারিজন, বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রেষ্ঠ, ঠাঁহাদের প্রভাবেতে, জীব নিত্য কৃষ্ণ-ভৃত্য, সেই চারি মহাজন, শ্রীগৌর, রাধা-বিনোদ, কিবা সে রূপের ভাতি, সে মহা সেবার রীতি, সে-সব সম্ভার যত,	সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি, হেন দেখিয়াছে কেবা, ঠাকুর শ্রীনরহরি, করিয়াছ রাত্রি-দিবা, নাতি-দূর যশোহর, উদ্দেশ্যেতে পরণাম, কৃষ্ণ-সেবা এক-চিত্তে, শ্রবণ আর কীর্তন, কোথায় শ্রীগৌরহরি, যথা গৌর, গৌর-শ্রেষ্ঠ, একাধারে হুশোভন, অতীব প্রিয় সম্ভাষী, শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী, সেবিত্তে গুরু-গোস্থামী, গুরু-ভক্ত সেবা হয়, এসেছিলে এ' জগতে, শ্রীচন্দ্রশেখর ঘরে, সর্ব বিধে জয় জয়, চেতনের বাণী ভরা, মধব-বিষ্ণুস্থামী হন, সবে ভগবৎ প্রেষ্ঠ, এ' ছদ্মিনে এ' ধরাতে, কৃষ্ণ-সেবা সদা কৃত্য, চারি 'কোণ' হুশোভন, ত্রি-জগতের হুসম্পদ, সাক্ষাৎ জগৎ জ্যোতি বর্ণে কার আছে শক্তি, গৌর ধামের মঠ কত,	গুরু-পাদপদ্ম-ভূজ পায়। ধন্য ধন্য তুমি এ' ধরায় ॥ গুরু-সেবা আদর্শ মুরতি। সেবানন্দে মগ্ন ছিল মতি ॥ ঠাকুরের আবির্ভাব ভূমি। পরম পবিত্র তীর্থ তুমি ॥ দুঃসঙ্গ ভ্যজিয়া এক ঘরে। ভোগ-রাগ একান্ত অন্তরে ॥ রাগাবেশে উদ্ভিন্ন অন্তরে। উত্তরিলে সেই মায়াপুরে ॥ তুলনা নাহিক পাই তার। সেবাময় জীবন তোমার ॥ অদ্বিতীয় মহা মহাজন। সেবা তব সাধ্য ও সাধন ॥ সদা-কাল তোমার জীবন। নমি তব কমল চরণ ॥ আত্ম মঠ স্থাপিলেন প্রভু। তুলনা নাহিক তার কভু ॥ চেতনের পশরা লইয়া। নিষার্ক, আর রামানুজীয়া ॥ মায়াবাদ-মত ধ্বংস কৈল। 'আমি ব্রহ্ম'-ভাব দূরে গেল ॥ আচরিয়ে বিধে প্রচারিলে। রত্নবেদী শোভে মধ্যস্থলে ॥ দরশিলে জগ-মন ভোলে। আখি ধন্য রূপ নিরখিলে ॥ দরশনে সর্ব-চিন্ত হরে। (প্রভু) সব ভার দিলেন তোমারে
--	---	--

সর্ব সজ্জন হৃদয়, সর্ব-গুণ-বিভূষিত, 'অজাত-শক্র' তোমার নাম ।
 শ্রীখণ্ডের নরহরি, তোমাতে স্মরণ করি, 'ঠাকুর-মশায়' সেই নাম ॥
 সর্ববিধ সেবা দেখি', গুরুদেব মহা স্থখী, পরসন্ন তোমার উপরে ।
 যুবা-শিশু অগণন, প্রভুপদে আগমন, মহাষত্রে পালিতে সবারে ॥
 সেবাতার মায়াপুরে, স্থাপিলেন তব 'পরে, কি রূপে তোষিতে ধাম-বাসী ।
 গুরু-দাস রহু দূরে, গ্রামবাসী সবাকারে, কি স্নেহ করিতে দিবানিশি ॥
 তোমার বাৎসল্য-রসে, সব ছিল তব বশে, তুমি ভিন্ন আর না জানিত ।
 সদা তব জয় জয়, ধন্য ঠাকুর মহাশয়, সকলেই ঘোষণা করিত ॥
 কৃষ্ণ-কাঞ্চন সেবা রীতে, দেখিয়া পরম প্রীতে, শ্রীসেবা-বিগ্রহ তব নাম ।
 সেবাই জীবনে শ্রেষ্ঠ, শ্রীগুরু ও গুরু-প্রেষ্ঠ, সেবাই ছিল হে ধ্যান-জ্ঞান ॥
 বৈষ্ণবের গুণ-কণ্ঠে, সাধ্য নাহিক বর্ণনে, স্মরণেতে সর্বানর্থ নাশ ।
 কাতর প্রার্থনা করি, ঠাকুর শ্রীনরহরি, দোষ ক্ষমি' স্ব-রূপা প্রকাশ ॥
 আপনি আচার করি' সেবা ভক্তি-সুপ্রচারি', ভাগ্যবান জনে জানাইলে ।
 মূই যে অধম মন্দ, পতিতা পান্ডু-ভণ্ড, সে-কারণে মোরে উপেক্ষিলে ॥
 হৃদীয় 'সাতাশ' বর্ষ মায়াপুর-সেবা । হেন হৃষ্ট ভাবে আর করিয়াছে কেবা ॥
 হরি কথায় সর্বদা প্রসন্ন বদন । সেবায় মগন, আর শ্রীনাম-কীর্তন ॥
 কর্ম-জ্ঞানেন্দ্রিয় যত সর্বদা সেবায় । নিয়োগ করিয়াছিলে তুমি মহাশয় ॥
 মাধব-পঞ্চমী দিনে নিশা দ্বিপ্রহরে । বিজয় করিলে তুমি শ্রীগুরু-মন্দিরে ॥
 দেবানন্দ গৌড়ীয়মঠ অন্ধকার করি' । অন্তমিত হইলেন ঠাকুর নরহরি ॥
 সদাকাল শ্রীবদনে গাহিতেন গীতি । 'প্রভু মোর শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' ॥
 ভক্তাধীন গুরুদেব ভক্ত-দুঃখ হেরি' । নিত্যসেবায় নিয়োজিলেন ঠাকুর নরহরি ॥
 জয় জয় জগদ গুরু প্রভুপাদ জয় । তব যোগ্য দাস জয় 'ঠাকুর মহাশয়' ॥
 অনন্ত গুণের মণি শ্রীসেবা-বিগ্রহ । তব গুরুপদে মোরে বিন্দু ভক্তি দেহ ॥
 পতিত-পাবন সবে তাঁর নিজ জন । সবে মিলি রূপা মোরে কর বিতরণ ॥
 নরহরি প্রভু-পাদপদ্ম সদা ধরি' । অধম কাঙ্ক্ষাল এই নিবেদন করি ॥—
 পরদুঃখ দুঃখী বড় ছিলে মহাশয় । জীব-দুঃখ দেখি বড় কাঁদিত হৃদয় ॥
 অদোষ-দরশী তুমি বৈষ্ণব ঠাকুর । ও পদে স্মরণ লয় অধম কুকুর ॥
 শ্রীঠাকুর নরহরি পদে এই ভিক্ষা । সাধু-গুরু-ভগবানে সেবা দেহ শিক্ষা ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী

শ্রীল প্রভুপাদের নিরুহ-বাসনে সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর)

বড় বড় সম্মানী ও ব্রহ্মচারী দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের মন পান নাই। ইহা আমরা তাঁহার প্রকটকালে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। অতিমর্ত্য পুরুষের 'মন' পাইতে হইলে কিরূপ চিন্তাবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদের আলোচনা না থাকিলে কি-প্রকারে মন পাওয়া যাইবে? গুরুপাদপদের মন যোগাইয়া চলাই গুরু-সেবকের একান্ত কর্তব্য। আমরা যদি গুরুদেবকে মনে করি, তাঁহার প্রচুর অর্থের অভাব হইয়াছে, প্রচুর সামর্থ্যের দরকার; আমরা যেমন করিয়াই হউক, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলেই বোধহয় প্রভুপাদের মন পাইব। উৎসবাদি ব্যাপারে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব দিবারাত্র 'গায়ে খাটিয়া' দিলেই সেবা হইবে - এইরূপ মনে করি। কিন্তু অতিমর্ত্য পুরুষের কৃষ্ণসেবাময়ী চেষ্টা 'অর্থ-সামর্থ্যের দ্বারা' পরিপূরণ না হইলে, তাহার মন গুরুদেবের 'মন' পাওয়া যাইবে কেন? গুরু-পাদপদের 'মন' পাইতে হইলে তাঁহার নিরঙ্কুশ আভ্যন্তরীণ মনের গুঢ় ইচ্ছাটুকু অনুসন্ধান করিয়া তদনুসারে সর্বতোভাবে সেবা সমাপণ করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-নীলাম্র তাঁহার নিগূঢ়তম সেবা-প্রবৃত্তি নিখুঁত অনুশীলন করিবার যাহাদের সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে দত্ত। আমরা নিজেদের মনোভা ধারণাগুলি শ্রীগুরুপাদপদের সেবার উপর চাপাইয়া দিলে তাহা এখনও সেবা বলিয়া গণ্য হইবে না। আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাটি গুরুদেবের চিন্তাধারার সহিত এক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া তদনুসারে আমাদের যে চেষ্টা, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সেবা নহে— ইহা এক প্রকার auto-suggestive nature.

পার্শ্বিক জগতের চিন্তাস্রোত অপার্শ্বিক জগতে চাপাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ চেষ্টাতেই আমরা প্রকৃত পথ হইতে বিচলিত হইয়া পড়ি। সেবার ইঙ্গিত বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতে সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। আমরা পার্শ্বিক জগতের ভোগ-প্রবণতা লইয়া যে সেবা-দেখা দেখাইয়া থাকি, তাহার মূলে ইন্দ্রিয়-তর্পণই পরিলক্ষিত হয়; অথবা তাহার বাধা-স্বরূপ প্রাকৃত বৈরাগ্য প্রস্ফুটিত হয়। ইহা কিন্তু আদৌ সেবা নহে। শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে আমাদের দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, সরলভাবে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও গুরু-পাদপদের সন্তোষ-বিধান করা

যায় নাই। শ্রীগুরুদেবের অন্তরাদেশের সহিত বাহ্যিক আদেশ ও লৌকিক নির্দেশের পার্থক্য বুঝিয়া যিনি তাহা পালন করিবেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের একজন সন্ন্যাসী (ভক্তিবিলাসাম্বর) শিষ্য ছিলেন, বর্তমানে তিনি প্রকট নাই। তাঁহার জীবনে আমরা তাঁহার কোন বাহ্যিক কর্ম-কুশলতা আদৌ লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার সমসাময়িক ‘হোমড়া-চোমড়া’ পাঠক ও বক্তা সন্ন্যাসী-বৃন্দ দুই একদিন তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার প্রতি কিছু কটাক্ষ করিলে গুরুপাদপদ্ম সিংহ-গর্জনে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ‘আমি খুব বড় বক্তা, আমি খুব ভাল পাঠক, সমস্ত লোককে পাঠ-বক্তৃতার দ্বারা আমি মুগ্ধ করিতে পারি, আমার প্রচুর ক্ষমতা, আমার বক্তৃতা শুনিয়া বহু লোক মঠে চলিয়া আসিতেছে, অতএব আমি একজন ‘প্রিয় ও প্রধান শিষ্য’—এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠ সেবকের আসন দেন নাই। ভক্তিবৃত্তি পৃথক্ বস্তু। তাহা অতি সৌভাগ্যের ফলেই লাভ করিতে পারা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে তাঁহার আচরণ হইতে আমরা কতকগুলি আপাত-বিরোধ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা বাহ্যতঃ তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বৎকুল-বরেণ্য, সিদ্ধাস্ত-মার্ত্তণ্ডস্বরূপ দেখিতে পাইতাম। অথচ, সর্বাপেক্ষা নিরক্ষর ব্যক্তিকেও তিনি ‘গুরু’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা প্রভুপাদকে সাক্ষাৎ বাণী-স্বরূপ বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। তাঁহার বাণী-বিলাস-লীলার প্রধান সহায়করূপে কোন একজন স্ববোধ-লেখক হৃদয়-দৌর্ভাগ্যহেতু হটাতঃ মঠ-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া ‘ঢাকা’ গেলে তিনি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হন নাই। অপর পক্ষে, তাঁহার কোন নিরক্ষর সেবক-পঞ্চানন চক্ষুর বিন্দুমাত্র অন্তরালে গেলেও তিনি খুব উদ্বেগ অল্পভব করিতেন। ইহা আপাততঃ অত্যন্ত startling ও perplexing বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহা আদৌ সেরূপ নহে। এই ব্যবহারের অন্তরে ভক্তিবৃত্তির পূর্ণ-ধারা প্রকাশিতা রহিয়াছে। লেখনী-পরিচালনার দ্বারা জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়া প্রভুপাদের যতটুকু সেবা করা হইয়াছে, তাহার অনন্ত-গুণে সেবাবৃত্তি নিরক্ষর ব্যক্তির প্রাণের টানে প্রকাশিত। গুরুপাদপদ্মে আসক্তিই ভক্তিবৃত্তির মূল-সূত্র।

আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি,—অনেকেই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কামনায় মতিচ্ছন্ন হইয়া পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি লিখন, গ্রন্থ-প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যে বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি নিজের কিছু প্রাপ্তিযোগ অথবা প্রশংসাস্বরূপ প্রতিষ্ঠাটুকুও না পাই, তাহা হইলে আমাদের আর গুরুসেবা করা

হয় না। আমরা সর্বদাই গুরুদেবের নিকট হইতে উৎসাহের নাম করিয়া প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়া থাকি। ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরুসেবা বা শরণাগতির লক্ষণ নহে। যিনি গুরুদেবে যতটা আসক্ত, তিনি ততটাই গুরুসেবক। আমরা মহাজন-পদাবলী হইতে শিক্ষা পাই যে, “বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছে আমার। সেইমত প্রীতি হউ চরণে তোমার ॥” মায়িক বিষয়কে ‘আপনার’-জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি এত আসক্ত হইয়াছি যে, তাহাকে বিন্দুমাত্রও চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করি। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বস্তুতে ঐ প্রকার ‘আমার’-বোধ না হইলে ভগবদনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? ‘হরিগুরু-বৈষ্ণবের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি নষ্ট হইয়া যায় যাউক, কিন্তু আমার জিনিসটা ঠিক থাকুক’—এইরূপ বুদ্ধি সেবাবুদ্ধি নহে। এমন কি, ‘মায়িক জগতের যাবতীয় জিনিস ধ্বংস হয় হউক, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার দ্রব্যের কণামাত্রও আমি ধ্বংস হইতে দিব না’—ইহাই প্রকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের লক্ষণ।

শ্রীল প্রভুপাদ, অণু যাহার বিরহ-তিথি, তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বহরমগঞ্জে সহস্র সহস্র লোক-সমক্ষে বিরাট সভায় বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন, ‘আমি ভগবানের এক কপর্দক রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ অনর্থগ্রস্ত জীবের বিনাশ সাধনের প্ররশ্ন দিতে পারি।’ সে আজ ৩২ বৎসর পূর্বের কথা। তখন ঐ কথাটা শুনিয়া হৃদয়ের মধ্যে বিরাট ‘তোলপাড়’ হইতে লাগিল। যে-মহাপুরুষ আজীবন নিরামিষ আহার করিয়া সমস্ত জৈব-জগৎকে অপ্রাকৃত অহিংস-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহার মুখে আজ প্রকাশ্য সভায় এইরূপ কথা কি শুনিলাম! ইহা সত্ত্বসত্ত্ব অত্যন্ত revolting বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাই যাবতীয় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির সার-শিক্ষা-স্বরূপ মহাবাক্য।

আমরা গণিত-শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—Plus one is greater than minus any large amount or infinity অর্থাৎ minus (বিয়োগ) power এর সংখ্যা কোটা কোটা নিদ্ধারিত হইলেও, উহা plus (যোগ) ‘এক’ অপেক্ষা বহু নিয়ে অবস্থিত। মায়িক জগৎ ‘অভাবের’ দ্বারাই নিষ্প্রিত। সুতরাং ইহা সর্বদাই minus power; কিন্তু অপার্থিব অপ্রাকৃত জগৎ পূর্ণ। সুতরাং সে-স্থানের একটি বালুকণার ছায়া অতি ক্ষুদ্র বস্তুও পূর্ণ-স্বরূপ। তাহাতে মায়িক অভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। তজ্জন্ম হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার একটি বালুকণা-স্বরূপ কপর্দকও পূর্ণ বস্তু, এবং তাহা অভাবপূর্ণ মায়িক জগতের কোটা কোটা অপূর্ণ অর্থস্বরূপ প্রাণী অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এই শিক্ষাই অপ্রাকৃত জগতের অতিমর্ত্য জীবন-চরিতে প্রক্ষুটিত হইয়াছে।

পাখিব জগতেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়, এমন নহে। কোন সাম্রাজ্যের সম্রাট তাহার নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্ত লক্ষ লক্ষ সৈনিকের প্রাণবধ করিতে দ্বিধা-বোধ করেন না। সম্রাটের ঐরূপ ইচ্ছা-পূরণই তখন সৈন্ত-সেনাপতিগণের জীবন উৎসর্গের হেতু হয়।

সাধারণ সৈনিকগণ নিজের জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্ত অথবা স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুগণের অনিত্য অস্থায়ী ভোগ-বিলাসের জন্ত মাসিক সামান্য কয়েকটা মুদ্রা লাভের আশায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জনে প্রস্তুত হয়। এমন কি, স্ত্রী-পুত্র, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনদের স্নেহ-মমতা, ভালবাসা যাহা কিছু সমস্তই এক মুহূর্তের মধ্যে বিসর্জন দিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখা যায়। কিন্তু আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্ত তাহার কতটুকু করিয়া থাকি? যে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির দ্বারা আমার অনন্তকাল সুখ-সম্পদের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্ত আমি প্রাণ উৎসর্গ করা দূরে থাকুক, নিম্নোক্তও ক্রেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা কি হরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের লক্ষণ? প্রকৃতপ্রস্তাবে যিনি বৈষ্ণব-সেবার জন্ত প্রাণোৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা-বোধ করেন না, তাহার হৃদয় কত উদার, কত প্রশান্ত, কত মহান! আমরা ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই সেবকগণের বৈষ্ণব-প্রীতির পরিমাণ বুঝিয়া লহতে পারি।

আমাদের মধ্যে কেহ ষ contagion বা infectious (সংস্পর্শজ বা সংক্রামক) কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তখনই ধরা পড়িয়া যায় কাহার কতদূর বৈষ্ণবে প্রীতি। আমরা তখন পুনরায় ঐ ব্যাধিগস্ত হইবার ভয়ে বা প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অগ্রত বাইতে দ্বিধা-বোধ করি না। ইহা কি অনিত্য পুঞ্জ-রক্ত-মিশ্রিত মনোনিপীড়-স্বরূপ শরীরের প্রতি মমতার লক্ষণ নহে?—যে শরীর অস্ত বা বর্ষণভাগে অবশ্যই পাতত হইবে। আমরা সর্বদাই পাঠে, কীর্তনে, বক্তৃতায় বলিয়া থাকি,—‘দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়,’ অথচ সর্বদাই তাহার প্রাধান্য দিয়া থাকি। কথা ও কাজে যদি একরূপ না হইল, তবে বুঝা বাকব্যয় করিয়া লৌক ঠকাইয়া লাভ কি? সত্যসঙ্কল্প বৈষ্ণবের প্রধান গুণ। আমরা সর্বদাই বলিয়া থাকি,—বৈষ্ণবের জন্ত প্রাণ দিতে হইবে, বৈষ্ণবের জন্ত সর্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, যাহা কিছু কর্তব্য বৈষ্ণব-সেবার জন্তই করিতে হইবে। ইহা কি কেবল বাক্যবিজ্ঞাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে? কোন ব্যক্তি বৈষ্ণবসেবার জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে কোন পাষাণ তাহা হইতে বাধা প্রদান করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে—ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অতঃ প্রত্যয়ে আপনারা “জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়” গীতটী শ্রবণ করিয়াছেন। তাহাতে একটা ঘটনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যথা, “কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যারা, তা’সবার দোষ ক্ষমা করি” ইত্যাদি। এই পদটী কুলিয়ার যে ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই আমার স্মরণ হইতেছে। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ সেবকগণের সেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বহু যাত্রীসজ্জের সহিত শ্রীনব প-।ম পরিক্রমা লইয়া চাঁপাহাটী ঘাইবার পথে নবদ্বীপ কুলিয়া-সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে আজ ২৫ বৎসর পূর্বের কথা। তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে কুলিয়ার কতকগুলি পাষণ্ড তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈষ্ণবের ইচ্ছামাত্রে সমস্ত বিপদ দূরীভূত হইলেও জগতে সেব্য ও সেবকের মহিমা প্রকাশ করাই আচার্যের আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য তাই সেই সময়ে কলির তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ কোন এক ক্ষুদ্র গৃহে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সেবকগণের আর্তি ও আসক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। তখন দুই একজন ব্যতীত ঐরূপ দুর্ববস্থার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খ্যাতনামা শিষ্যগণ স্ব স্ব জীবন লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বেক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা সহস্র সহস্র গুণ্ডার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। এমন সময়ে, তাঁহার কোন সেবক পরম্পর বেষ পরিবর্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে ছদ্মবেশে সৈন্যে দুর্দান্ত কলির চরণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ত্রিধাম মায়াপুরে নিরাপদে লইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই গুরুসেবকের প্রবৃত্তি প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। যাহারা গুরুপ্রেষ্ঠ, প্রভুপ্রেষ্ঠ বা আচার্য্যাপ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত এবং যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অ-।ত জন বলিয়া পরিচয় দিতে কুষ্ঠাবোধ করেন নাই, অথবা যাহারা মঠ-মিশনের সৃষ্টিকর্তা বা তাঁহার প্রধান সহায়ক বলিয়া গৌরব করিতে চাহেন, তাঁহাদের কাহাকেও সেই অন্তত মুহূর্ত্তে গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। গুরু-সেবায় প্রাণ বিসর্জন করাই গুরু-সেবকের একান্ত কর্তব্য। আপনারা আচার্যের এই প্রকার একটা লীলা-বিলাসের প্রতি মন্ত্য ধারণা করিবেন না। যেহেতু, এইরূপ ঘটনাই আচার্যের অতিমন্ত্য মহিমা-প্রকাশক।

এই প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীরামানুজের জীবনী স্মরণ করুন। তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া বিপক্ষদল তাঁহাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, একনিষ্ঠ প্রধান শিষ্য আচার্য্য কুরেশ শ্রীরামানুজকে স্ত্রীলোকের বেষ পরাইয়া ছদ্মবেশে তাঁহার

প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও কাপালিকের হস্তে হত হইতে উদ্ধৃত হইলে—আচার্য্য পদ্মপাদ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গুরু-সেবকের ইহাই আদর্শ। এইরূপ প্রত্যেক আচার্য্য-লীলাতেই তাঁহাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নানা প্রকার দুর্ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আচার্য্যের অতিমর্ত্য স্বভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে, সেবকের তারতম্য-মূলক বিচারও জগজ্জীবের শিক্ষার নিদর্শন হইয়া থাকে। তাই বলি, ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই সেবকের সেবা-বৃত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

—প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত

বর্ষ-বিদায় বা বেদান্ত (?)

আমরা ‘বেদবর্ষ’-শীর্ষক একটি প্রবন্ধের দ্বারা বর্তমান ৪র্থ বর্ষের আলোচ্য স্মৃচনা করিয়াছি। গণিতের ৪র্থ সংখ্যার সঙ্কেতই ‘বেদ’ শব্দে অভিহিত—ইহা আমরা ঐ প্রবন্ধে জানাইয়াছি। বর্তমানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় ‘বেদ’-বর্ষের অন্ত হইতেছে। সুতরাং আমরা ‘বর্ষ-বিদায়’ কালে এই প্রবন্ধকে ‘বেদান্ত’ সংজ্ঞা দিয়া এক অভিনব রহস্য প্রকাশ করিতেছি। ‘বেদান্ত’ বলিলে ‘বেদ’-বর্ষের অন্ত, অতএব বেদান্ত। এই পত্রিকা! শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র। ‘বেদান্ত’ শব্দে আমরা সাধারণতঃ উর্বর মস্তিষ্কের অত্যন্ত কঠিন মর্দর-প্রাকারের অভ্যন্তরস্থ দুর্ভেদ্য চিন্তাশ্রোত-সমন্বিত বাক্য-বিজ্ঞাসকেই বুঝিয়া থাকি। আমরা কিন্তু এখানে সেই ‘বেদান্ত’-শব্দের সার-স্বরূপ চিল্লীলা-মিথুন পূর্ণ-রসময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততত্ত্ব শ্রীমন্নহাপ্রভুর অমৃতময় অস্থি-বঙ্কলহীন সুকোমল প্রেম-কলকেই লক্ষ্য করিতেছি। ইহাই শ্রীপত্রিকার বর্ষ-বিদায়ের ফল।

বেদ—ঈশ্বরের বাক্য, তজ্জন্ম শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাক্য—সাক্ষাৎ বেদ। বেদ হইতেও শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার মাধুর্য্য আরও অধিক। যেহেতু, বেদ—ঈশ্বরের ‘নিঃশাস’ এবং স্বয়ং ভগবান্ গৌরহৃদয়ের ‘শিক্ষা’ও—তাঁহার ‘বাণী’। ‘নিঃশাস’ অপেক্ষা ‘বাণী’র শ্রেষ্ঠত্ব আছে। যদিও নিঃশাস বায়ু-স্বরূপ এবং বাণীও তদ্রূপা, তথাপি বাহ্য-দৃষ্টিতে উভয়ের জাতীয়তা এক হইলেও ‘নিঃশাস’ আপেক্ষা ‘বাণী’রই বৈশিষ্ট্য অধিক। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্নহাপ্রভুর সাক্ষাৎ বাণী-স্বরূপ। বাণীর অপর নাম—সরস্বতী। আমরা এই শ্রীল সরস্বতীকেই গুরুরূপে বরণ করিয়া

তাহার আদেশ-নির্দেশ সর্বতোভাবে পালন করত তাহারই নিগূঢ়তম শিক্ষাসমূহকে শ্রী গোড়ীয়-পত্রিকায় চারিবর্ষ যাবৎ নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি।

যাহারা বেদের বাণী—শুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ণবগণের লেখনী-নিঃসৃত বিচার হৃদয়ে ও গৃহে সংরক্ষণ করিতেছেন, তাহারাই পরম ভাগ্যবান। শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা যে-গৃহে শুভ-প্রবেশ করেন, সাক্ষাৎ শ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গিরিধারী বাণীরূপে সেই গৃহে বিরাজিত থাকিয়া সমস্ত চेतন-অচেতন গৃহকে মঙ্গলময় করিয়া থাকেন। হুতরাং, আমরা তজ্জন্ত শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক ও সেবকবৃন্দের সকলকেই নমস্কার জানাইতেছি। আমরা বৈষ্ণব-গুরুবর্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে চাহি,—“সব শ্রোতা বৈষ্ণবেই করি নমস্কার”। শুধু তাহাই নহে, যাহারা দূরে দেশ-বিদেশে থাকিয়া বর্তমানে গ্রাহক, পাঠক ও লেখক হইয়া শ্রীপত্রিকার সেবা করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন, আমরা তাহাদের সকলেরই চরণ বন্দনা করি।—

“হইয়াছেন, হইবেন প্রভুর যত দাস।

সবার চরণ বন্দেঁ। দন্তে করি' ঘাস ॥

যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গোরাঙ্গের গণ।

উর্দ্ধবাহু করি' বন্দেঁ। সবার চরণ ॥”

পরিশেষে সকলের নিকট আমার সকাতির নিবেদন,—শ্রীপত্রিকার পাঠক, শ্রোতা, গ্রাহক, লেখক, কাব্যকারক, পরিচালকবর্গ সকলেই আমাদের প্রতি নিজ নিজ গুণে প্রসন্ন হউন। আমরা নিছক সত্যকথা বলিতে গিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ও অনবধানতাবশতঃ কাহারও হৃদয়ে যদি বিন্দুমাত্রও আঘাত করিয়া থাকি, তজ্জন্ত তাহাদের সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—“প্রাণীমাত্রে কায়-মনো-বাক্যে উদ্বেগ না দিবে।” অতএব—

“দোষ ক্ষমি' মো অধমে কর নিজ দাস।

তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস ॥”

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাঙ্গ—৪৬৭; ফাল্গুন—১৩৫৯

১১ বিষ্ণু, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ, বুধবার—কৃষ্ণ-একাদশী রা ১৫৯২। পাপ-

বিমোচনী একাদশীর উপবাস।

১২ বিষ্ণু, ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১১।৫১।

দি ৭।২৩ গতে পূর্বাহ্ন ৯।৪৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীমমহাপ্রভুর
বরাহ-নগরে শুভবিজয় স্মরণ-মহোৎসব।

চৈত্র—১৩৫৯

২০ বিষ্ণু, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ, শুক্রবার—গৌর-পঞ্চমী দি ৭।২৫।৩১। শ্রী
রামানুজাচার্যের আবির্ভাব।

২৪ বিষ্ণু, ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ, মঙ্গলবার—গৌর-নবমী দি ৬।৫২। শ্রীশ্রীরাম-
চন্দ্রের জন্মোৎসব। শ্রীরামনবমী-ব্রতোপবাস।

২৫ বিষ্ণু, ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ, বুধবার—গৌর-দশমী দি ৮।৯। দিবা ৮।৯
মধ্যে শ্রীরাম-নবমীর পারণ।

২৬ বিষ্ণু, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী দি ৯।৪২।
কামদা একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু, ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী দি ১১।৩৫। পূর্বাহ্ন
৯।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ।

৩০ বিষ্ণু, ১৬ চৈত্র, ৩০ মার্চ, সোমবার—পূর্ণিমা সন্ধ্যা ৫।৪০।
শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা।

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাংমীং মধুং মাধবমেব চ।

রামঃ ক্ষপাশ্চ ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্।

পূর্ণচন্দ্র-কলামৃষ্টে কৌমুদী-গন্ধ-বায়ুনা।

যমুনোপবনে রেমে সেবিতো স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাসযাত্রা। শ্রীল বংশীবদনানন্দ গোস্বামী ও শ্রীল
শ্যামানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব।

৭ মধুসূদন, ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল, সোমবার—কৃষ্ণ-সপ্তমী রা ৭।৬। শ্রীল
অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মধুসূদন, ২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দশমী দি ১।২৪। শ্রীল
যুন্দাবন-দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মধুসূদন, ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল, শুক্রবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১।১৪।
বরুণিনী একাদশীর উপবাস।

১২ মধুসূদন, ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল, শনিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৮।৩৯।
দি ৮।৩৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১৪ মধুসূদন, ৩০ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল, সোমবার—অমাবস্যা রা ১।৪৪ গতে
মলমাস-প্রবৃত্তি বা পুরুষোত্তম-মাস আরম্ভ।